শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মহানাদ

বা

বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

"আত্মৈব বেদিতব্যেষু প্রিয়েষ্বিব হি জীবিতং।
ইতিহাসঃ প্রধানার্থঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বাগমেষ্বয়ং॥"
(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ২ অঃ,)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রণীত ও প্রকাশিত।

পোষ্ট—মহানাদ,
জেলা—হুগলী।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৮

মূল্য—৩৸৶০ মাত্র
বাঁধাই ৪৲ চারি টাকা।

উৎসর্গ পত্র

বাঙ্গলার

বর্ত্তমান বিকৃত-ইতিহাস পাঠকের

এবং

স্বেচ্ছাচারী ইতিহাস লেখকের

ভ্রান্তি অপনোদনার্থে

তাঁহাদেরই

করকমলে—

আমার জীবন-মধ্যাহ্নের

অপরিসীম আকাঙ্ক্ষার প্রাণ দিয়া গাঁথা

এই বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস

"মহানাদ দ্বিতীয় খণ্ড"

সাদরে অর্পিত

হইল।

গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

মহানাদ এ যাবৎ বাঙ্গলার ইতিহাসে অপরিচিত সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া বঙ্গের অন্য কোন প্রাচীন নগর হইতে ইহা আধুনিক নহে। "মহানাদ প্রথম খণ্ড" প্রকাশিত হইবার পর সাধারণের চক্ষে যাহাতে এ পুস্তক পরিচিত না হয়, সে সম্বন্ধে গুপ্তভাবে অনেক কিছুই হইয়াছে শুনিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ "হিতবাদী" ও "বঙ্গবাসী" পত্রিকা মহানাদ প্রথম খণ্ডের সমালোচনা করিয়া উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য অনেকগুলি পত্রিকার সম্পাদক সমালোচনা পর্য্যন্ত করেন নাই। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" একখানি উপহার পাইয়া আলমারী সাজাইয়া রাখিয়াছেন মাত্র। ঐতিহাসিক লেখকরা এপর্য্যন্ত মহানাদ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, পাহাড়পুর প্রভৃতি আধুনিক স্থানগুলির ন্যায় "সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা"য় মহানাদের প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের কোন আলোচনা করেন নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে অধিক কষ্ট না হইলেও ইহাতে ঐতিহাসিক চর্চ্চার ক্রমাবনতিই সূচিত হইতেছে।

"মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস (Unwritten History of Bengal) দ্বিতীয় খণ্ড" বাহির করিলাম। বাঙ্গলার ইতিহাসের এরূপ উপকরণ আমার আগে আর কেহ প্রকাশ করিয়াছেন, এমন কথা বোধহয় কেহ বলিতে পারিবেন না। তবে যাঁহারা "পদ্মাকে গঙ্গা" বলিয়া গ্রীক্‌দের বর্ণিত "গঙ্গারাষ্ট্র" পূর্ব্ববঙ্গে বলিতে চাহেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।

মনুষ্য জাতিকে অসত্যের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই "মহানাদ" লিখিত হইতেছে। ঐতিহাসিক সত্য গোপন করিয়া

প্রত্যেক জাতি উচ্চ স্তরের উচ্চ সোপানে স্থান পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং এযুগে বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিবার জয়াশা না দেখিলেও আমি বিরুদ্ধবাদীদের সম্মুখে আজ নিজ জন্মভূমির ইতিহাস "মহানাদ" দুইখণ্ড প্রকাশিত করিলাম। মহানাদে "ইতিহাসের মহা নাদ" নিনাদিত হইল।

মহানাদের পশ্চিম ও দক্ষিণ বাহিয়া ঐ দেখ বশিষ্ঠ গঙ্গার শুভ্র-রেখা সুদূর বিস্তৃত শুষ্ক সৈকতের পরে ক্ষীণা রজত ধারার মত প্রবাহিতা। চন্দ্রকেতু সিংহের বিশাল দুর্গের ভগ্নাবশেষের স্থানে স্থানে এখনও কয়খণ্ড পাষাণ পড়িয়া আছে। মহানাদের সিংহবংশ শক্তিপূজা ত্যাগ করিয়া শক্তিহীন হইয়াছে। কিন্তু শত শত বর্ষ পূর্ব্বে সিংহাসনচ্যুত সিংহবংশীয় সন্তানগণ এই যবন স্পৃষ্ট ধূল্যবলুণ্ঠিত মহানাদের ইষ্টদেবী জয়কালীর কবন্ধের সম্মুখে নতশির হইয়া থাকিত। এই মহানাদের ভীষণ দর্শন দুর্গ, এই স্থানে একদিন গৌড়ের বাঙ্গালী ও রাজপুত,—মরুভূমির আরবরক্তের স্রোত প্রবাহিত করিয়া সাম্রাজ্য পদলোভে অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল। যখন দিল্লী, আজমীড়, কালঞ্জর ও গৌড়, বিজেতা যবনের পদতলে লুণ্ঠিত, তখন এই পবিত্র মহানাদ-দুর্গ শিখরে সিংহ হরিশ্চন্দ্রের * পুত্র—বীরবা[illegible]ক বিজয় সি[illegible] [illegible]াঙ্গালীর জাতীয় কেতন সগর্ব্বে উড্ডীয়মান রখিয়াছিল। মহানাদ দুর্গের গৌরব রবি অবসানের কাহিনী পাওয়া যায় না। বীর বিজয়রাম সিংহ কেমন করিয়া এই ভীষণ দুর্গ শিখরে প্রতি তোরণে নর রক্তের পর্ব্বত-নির্ঝরিণীর সৃষ্টি করিয়া হিন্দুর ত্রিশতবর্ষব্যাপী বিশ্বাসঘাতকতার ও স্বার্থপরতার প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, নদীয়ার একপ্রান্তে হয়ত সেনবংশ যখন কাপুরুষের মত লুকাইয়াছিল, আর সেইদিন মুষ্টিমেয়

* ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "বাঙ্গলার ইতিহাস" প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

দেশভক্ত সন্ন্যাসী লইয়া কেমন করিয়া নিজরক্তে হরিশ্চন্দ্র হিন্দুর ইতিহাসের অনন্ত পত্রে দেশভক্তির চরম দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছিল, সেকথা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। একদিন হইবে, "মহানাদ" একদিন জানাইবে। কারণ সপ্ত শতাব্দীর পূর্ব্বে লিখিত কাহিনী এখন অগ্নির অক্ষরে জ্বলিয়া উঠিবে, আমি কেবল সে অগ্নির ধূমমাত্র লিখিয়া গেলাম—তুইখণ্ড "মহানাদ"এ।

মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাসের প্রত্যেক অক্ষরটী সত্য। প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরই অনুমান প্রমাণের স্থান, ইহা ন্যায়-শাস্ত্রের দ্বিতীয় প্রমাণ। এই প্রমাণেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যে প্রমাণে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, সেই প্রমাণেই এই 'ইতিহাসের গুপ্ত কথা' লিখিত হইয়াছে। অক্ষম আমি, যাহা প্রস্ফুট করিতে পারি নাই, তাহা আপনারা ফুটাইয়া তুলুন—ইহাই দীন লেখকের সানুনয় প্রার্থনা।

মোগল রাজত্বের সময় বঙ্গের বিভিন্ন জেলার জমিদার এবং রাজ-বংশের নাম ও ইতিহাস উর্দ্দু ও পার্শী ভাষায় লিখিত গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঢাকার মিউজিয়ামে সেই সকল গ্রন্থের কতক রক্ষিত আছে। তাহা আজ পর্য্যন্ত অনুবাদিত হয় নাই এবং ঐ সকল গ্রন্থের নাম পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে উল্লেখ নাই। এই গ্রন্থগুলি অনুবাদিত হইলে বাঙ্গলার পুরাতন ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নাম জানা যাইবে। মোগল রাজত্বের সময় সংবাদপত্রও ছিল, যাহাতে প্রত্যেক জেলায় কখন্ কোথায় কি হইতেছে, সেই সকল সংবাদ উজির ওমরাহদের জন্য প্রকাশ করা হইত। এখনও তাহার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তাহার অনুবাদ আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া সম্প্রতি "জয়ন্তী" নামক মাসিক পত্রিকায় ঢাকার একজন বৃদ্ধ মৌলভী দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সকল 'গ্রন্থ ও সংবাদপত্র' অনুবাদিত হইলে আমার লিখিত মহানাদের

সিংহ ও গুহ প্রভৃতি রাজবংশের বিবরণের সত্যতা প্রমাণিত হইবে এবং আরও অনেক নূতন তথ্যও প্রকাশিত হইতে পারে।

জন্মভূমির সাধনায় বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া আত্ম সমাহিত ভাবে জন্মভূমির যে আরাধনা, তাহাকেই বলে তপস্যা। সঙ্কল্প সাধন করিতে যতখানি ঐকান্তিকতার প্রয়োজন, ততখানি ঐকান্তিকতা যিনি উৎসর্গ করিতে পারেন, এযুগে তাঁহাকেই বলিব তপস্বী। মহানাদের মাটীতে যাঁহারা ত্যাগের মহিমা দ্বারা আমাদের মাথা উঁচু করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারাই তপস্বী. তাঁহাদের অফুরন্ত কাহিনী বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না, তথাপি অনেক কথাই বলিয়াছি। একটী মানুষ একটী বিষয় লিখিলেই যদি তাহা ফুরাইয়া যাইত, তবে মানুষ কোন অতীতেই ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইত

এই যে আমাদের "শস্য-শ্যামলা" বঙ্গভূমি লইয়া আমরা অবিরত গান বাঁধিতেছি এবং স্বদেশ প্রেম দেখাইবার জন্য কবিতা রচনা করিয়া দেশ প্লাবিত করিয়া দিতেছি, সে স্বদেশ প্রেমকে গৌরবের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, আমাদের সমস্ত প্রাচীন ইতিহাস পরের হাতে ছাড়িয়া দিয়া ভিখারীর ন্যায় তাঁহাদের নিকট হাত পাতিয়া প্রসাদ পাওয়ার বিড়ম্বনা হইতে আত্মরক্ষা করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য।

উন্মুক্ত আকাশের কোলে উড্ডীয়মান বিহঙ্গমেরই মত আপন হারা হইয়া সিংহ ও গুহ নরপতিগণ কোথায় কোন অনন্তের উদ্দেশে ছুটিয়া গিয়াছে. এই সিংহ ও গুহবংশ বাঙ্গলার এক বিরাট অংশ। এ বংশদের বাদ দিলে 'বাঙ্গলার ইতিহাসে' বড় বিশেষ কিছু থাকে না। হুগলী জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই সিংহ ও গুহবংশের কীর্ত্তি বর্ত্তমান, তথাপি আধুনিক হুগলীর ইতিহাস সঙ্কলিত হইবার উপকরণ সংগ্রহ হইতেছে না! যে সকল উপাদান লইয়া সচরাচর ইতিহাস রচিত হইয়া থাকে, সৌভাগ্য বশতঃ গুহ ও সিংহ বংশের অতীত উজ্জ্বল

কাহিনীর মধ্যে তাহার কিছুরই অভাব নাই। "মহানাদ" এই সকল সংগ্রহের পথ প্রদর্শক। লুপ্ত অজ্ঞাতনামা বংশের নামে অর্ঘ্য প্রদান করুন, কিন্তু জীবিত প্রাচীন রাজবংশ সমূহের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে।

বার্দ্ধক্যের জীর্ণতা শৈশবের সুখস্মৃতিকে জাগাইয়া যেমন জীবনে একটী মোহের আবরণ ঢালিয়া দেয়—তেমনই জাতীয় জীবন সন্ধ্যায় স্তিমিত আলোকে প্রভাতের অরুণ লেখার দিকে মনকে স্বতঃই টানিয়া লইয়া যায়। মনের এই সহজ স্বাভাবিক গতি, একদিন আমাকে অলক্ষ্যে প্রাচীন মহানাদের 'আর্য্য ঋষিদের ইতিহাস' ধারার দিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বাঙ্গলার ইতিহাসের সহজ সরল স্মরণীয় স্মৃতিকথা আমার হৃদয়ে যে রেখাঙ্কপাত করিয়াছে, তাহারই একটী অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ ছবি এই পুস্তিকায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। আমার এই জ্ঞান—আমার নহে, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী উন্নত চেতা স্বর্গগত ব্যক্তিগণের কাছে ঋণী, হয় ত বা আমারই পূর্ব্বজন্মের সঞ্চিত মালমসলা। বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত আমার মনের পঙ্কিল পথে স্থানে স্থানে মলিন করিয়াছে সত্য, তথাপি আমি প্রাচীন কালের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে বাঙ্গলার বহু প্রাচীন রাজবংশের জীবনের আলেখ্য যথাসাধ্য "মহানাদ—দ্বিতীয় খণ্ডে" ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। সহায় সম্পদ বিহীন অবস্থায় মহানাদের নিভৃত অরণ্যে বসিয়া আমার এই অসাধ্য চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান ও নিকট এবং সুদূর ভবিষ্যৎ বংশধরগণ বিবেচনা করিবেন।

কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, বিগত ১৩৩৭ সালের ১০ই পৌষ রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন B. A., D. Litt মহাশয় মহানাদ দর্শন করিতে আসিয়া কথা প্রসঙ্গে পাটুলীর 'দেব রায়' রাজবংশের একটী প্রাচীন কবিতার উল্লেখ করিয়াছিলেন। কবিতাটী মাত্র

দুই পংক্তি হইলেও উহাতে ঐ রাজবংশের পরিচয় অনেকটা সুস্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়। উহা এই গ্রন্থের ৩৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ইতিহাস লিখিতে ভুল ভ্রান্তির হাত এড়াইতে পারাও যায় না, সুতরাং এই গ্রন্থে সেরূপ কিছুমাত্র দোষ নাই, ইহা আমি মনে করিতে পারি না। যদি কেহ কোন স্থানের কোন ভ্রম প্রমাদ প্রমাণ সহ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমি তাহা আনন্দের সহিত পরবর্ত্তী সংস্করণে সংশোধন করিয়া দিব।

গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে কেবল একটা অবয়ব দাঁড় করান হয় মাত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ ব্যতিত সকল ত্রুটী বিচ্যুতির সংশোধন হয় না। মফঃস্বলে থাকিয়া কলিকাতায় পুস্তক মুদ্রিত করিতেও বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। বিশেষতঃ নিত্য নৈমিত্তিক নানা কার্য্যের মধ্যে থাকিয়া আমাকে পুস্তক মুদ্রণ করিতে হইয়াছে, সেজন্য আমার অনবধানতায় এই গ্রন্থের অনেক স্থানে বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে, সুধীগণ তাহা পাঠ কারবার সময় সংশোধন করিয়া লইবেন। আর যে যে স্থানে অন্যরূপ ভূল হইয়াছে, তাহা পৃথক "শুদ্ধিপত্রে" উল্লেখ করিলাম, পাঠকগণ সেইগুলি যথাস্থানে লিখিয়া লইবেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ইতিহাসের দুর্ব্বলতা কোন্‌খানে, তাহা দেখাইবার জন্য অপ্রিয় সত্যেরও আলোচনা করিতে হইয়াছে। কিন্তু আমি কাহারও সাপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলি নাই; কোন স্থানবিশেষ, ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষবশেও কিছু লিখি নাই এবং নিন্দা, প্রশংসা, লাভালাভ প্রভৃতির দিকেও দৃষ্টিপাত করি নাই। গবেষণা (Research) করিয়া যাহা সত্য বলিয় বুঝিয়াছি, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এক্ষণে ইহার কর্ম্মফল সর্ব্বকার্য্য কারণের নিয়ন্তা "শ্রীকৃষ্ণায়" অর্পণ করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের কার্য্য শেষ করিলাম।

মহানাদ
১০ই আশ্বিন, রবিবার,
বঙ্গাব্দ, ১৩৩৮।
পিতৃতর্পণ দিবস।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা

চিত্রসূচী

শুদ্ধিপত্র

৪৫ পৃষ্ঠা সর্ব্বনিম্ন পংক্তিতে "গণেশ দেবের" স্থলে "গণেশ দেবের কন্যার"—৯৩ পৃষ্ঠা ১২ পংক্তিতে "ধ্বলিত" স্থলে "ধবলিত"—ঐ পৃষ্ঠায় ২৩ পংক্তিতে "পরোপকারাজ্ঞী" স্থলে "পরোপকারাকাঙ্ক্ষী"—এবং ৯৬ পৃষ্ঠা ৫ পংক্তিতে 'বসুচার' স্থলে "বসুয়ার" হইবে।

২৯৫ পৃষ্ঠায় ৯ পংক্তিতে—"কুশমাইল ও হালালিয়ার ভাদুড়ীগণ তর্ক সিদ্ধান্ত মহাশয়ের জ্ঞাতি ধীতপুর নিবাসী ৺রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শিষ্য" ইহা টীকায় লেখা উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না লিখিয়া ভ্রম বশতঃ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের শিষ্য বলিয়া তাঁহার শিষ্যগণের তালিকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

৩০০ পৃষ্ঠায় ১৮ পংক্তিতে—৺গিরিজা প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণতীর্থ" স্থানে—"গিরিজা প্রসন্ন লাহিড়ী M. A. কাব্য ব্যাকরণতীর্থ' হইবে।

৩১০ পৃষ্ঠায় ১৮ পংক্তিতে—"রাজা শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর" স্থলে—"রাজা ৺প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর" হইবে।

৩১১ পৃষ্ঠায় ২ পংক্তিতে—"রাজা মহেশচন্দ্রের দৌহিত্র" স্থলে—"রাজা মহেশচন্দ্রের দৌহিত্রবংশীয়" হইবে।

৩১৩ পৃষ্ঠায় ১৬ পংক্তিতে—"সুরেন্দ্রনাথ" স্থলে—"সুরেন্দ্রচন্দ্র" হইবে।

৪২৯ পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তিতে—"মিথিলে যুদ্ধযাত্রায়াং বল্লালেহ ভূস্মৃতধ্বনিঃ।" স্থলে হইবে—"মিথিলে যুদ্ধ যাত্রায়াং বল্লালেহ ভূস্মৃতধ্বনিঃ।" লঘুভারতকারের এই শ্লোক অর্থশূন্য।"
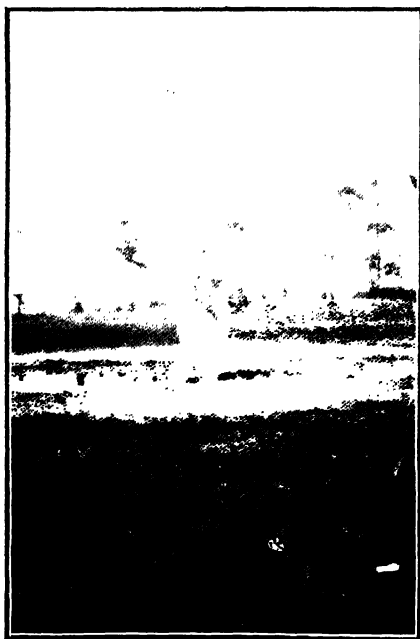
মহানাদের "প্রয়াগ" তীর্থ

(প্রাচীনকালে এই স্থানের জল লইয়া রাজাদের অভিষেক হইত।)

মহানাদ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বন্দনা গীতি।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

*　　*　　*　　*

তুলসী কাননং যত্র যত্র পদ্মবনালয়ম্।
পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥

এস দেব! আমি সনাতন প্রথায় ঋষি-কথিত মন্ত্রে তোমার আবাহন ও বন্দনা করিতেছি। আমি দীন হীন। তোমার কীর্ত্তিগাথা—তোমার লীলামাহাত্ম্য বর্ণন করিবার শক্তি আমাকে প্রদান কর। আমার এই পুরাণ গানের প্রারম্ভ ও পরিসমাপ্তি তোমার কৃপার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। এস দেব, তুমি সন্নিহিত হও। তোমার কৃপা লাভ করিয়া যাঁহারা ইতিহাসে অমর হইয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের উজ্জ্বল কীর্ত্তিকাহিনী এতকাল অনাদৃত, বিকৃত ও অব্যক্ত হইয়া রহিয়াছে,—তাহা আমি আজ মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিব। হে বিঘ্ন-বিনাশন! সকল বিঘ্ন দূর করিয়া দাও।

গ্রন্থারম্ভ।

কালক্রমে বঙ্গে এমন এক অন্ধ তামসিক যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, শ্রুতি, ইতিহাস, আর্য্যজ্ঞান সমস্তই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ভারত তখন (খৃঃ পূঃ ৪০০ পর্য্যন্ত) মহা তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া নিশ্চেষ্ট অন্ধ জড়বৎ হইল। সেই সময় বর্ত্তমান রাজপুত ক্ষত্রিয় জাতি সকল দিল্লীর তখ্‌ত তাউসে বিরাজমান। লোকে জানে বাঙ্গলা হিন্দুধর্ম্মের দেশ, এটা কে করিল? বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থে মিলিয়া রাজশক্তির (বৌদ্ধের) সহিত অনবরত সংগ্রাম করিয়া দেশটাকে হিন্দু করিয়া তোলা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। সিংহপুর মহানাদে ব্রাহ্মণ কায়স্থে তাহাই করিয়াছিলেন। তাই মহানাদের ইতিহাসে দেখাইতে চেষ্টা করিব,—সিংহপুর রাজ্য বাঙ্গালীকে কত বড় করিয়া দিয়াছে।

মহানাদ বাঙ্গলার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে। কারণ? মহানাদকে সমাকীর্ণ কর্ম্মের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে, প্রলয়ের ঝটিকাবর্ত্তে বিঘূর্ণিত হইতে হইয়াছে, মহা সিন্ধুর তুঙ্গ তরঙ্গের মাথায় মাথায় নাচিতে হইয়াছে, মহাশ্মশানে মৃত্যুলীলার ভৈরব সঙ্গীতে ছুটিতে হইয়াছে।

"মহানাদ" সাহিত্য ও ইতিহাস,—হবে জাতীয় গৌরবদৃপ্ত অথচ বিশ্ব মানবতার ভাবে অনুপ্রাণিত; ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ অথচ জ্ঞানকর্ম্মে মহীয়ান্। "মহানাদ" হবে বিশ্বজন মনোমোহন অথচ আমাদের যাহা কিছু সত্য, মঙ্গল, সুন্দর আছে, তাহার নিদর্শন। মধুসূদনের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"বিরচিব মধুচক্র বিশ্বজন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

মহানাদের ইতিহাস।

বৃন্দাবন নিত্য সত্য। আমাদের পৃথিবীতে সৌন্দর্য্যের মেলা বসে, ফুল ফুটে, পাতা কাঁপে, মলয় পবন বহিয়া যায়, পক্ষীকুল মধুর স্বরে গান করে। এই সৌন্দর্য্যের হাটে আমরা মুগ্ধ ও আত্মহারা হই, কিন্তু কিছুই থাকেনা। ফুল ঝরিয়া যায়, পাখী থামিয়া যায়, আমরাও শুকাইয়া যাই; সকলই নশ্বর।

জগতে কত মহাপ্রলয়ের সংগঠন হইল—কত শত বাধা—সহস্র বিঘ্ন আসিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিলীন হইয়া গেল, কত তুঙ্গগিরি অতলস্পর্শী সাগরে ডুবিল, কত উত্তাল সিন্ধু সাহারায় পরিণত হইল,—তবু মহানাদ বাঁচিয়া আছে। আমি মহানাদের ইতিহাস রচনা করিতেছি বিশ্বের জন্য। বিশ্বের হিতসাধন করিলে বিশ্বাধীপ প্রীত হয়েন। আত্মপ্রীতির জন্য মহানাদকে ভালবাসি নাই। মহানাদ বিধ্বস্ত কেন? নশ্বর জগতে উত্থান হইলেই পতন অবশ্যম্ভাবী।

এই মহানাদের বুকের উপর দিয়া আর্য্য অনার্য্য, শক হুন, দ্রাবিড়াদি জাতির পর জাতি তাহাদের বিজয়ধ্বজা উড়াইয়া গিয়াছে। এরই শ্যামল উপত্যকা, সিংহল পাটন ভেদ করিয়া অনাদি কাল হইতে কত লক্ষ লক্ষ বৈদেশিক তাহাদের অতৃপ্ত রাজ্যলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য যাতায়াত করিয়াছে। এর প্রতি ইষ্টক খণ্ডের উপর অতীত যুগের সহস্র সহস্র মানবের বুকের রক্তরেখা রহিয়াছে! সে কি ভীষণ!

মহানাদ পৃথিবীর সার, তাহার অতীত কাহিনীর শোভার তুলনা নাই। মহানাদে বাসন্তী শোভা। মলয় পবনে পল্লব সমূহ নাচিতেছে। আর মহানাদ কোকিলের স্বরে তোমাকে নৃত্য করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

"শ্রবণে কুন্তল, করে ঝলমল,
সঘনে কম্পিত চুড়ে,
তাহার উপরি, ভ্রমরা ভ্রমরী,
মধুলোভে বৈসে উড়ে॥"

শুক পক্ষীর কণ্ঠস্বর বড়ই কোমল, বড়ই মধুর। কণ্ঠস্বরের এই কোমলতা কি কেবল একটি বাহিরের ব্যাপার? তাহা নহে। যাহার চিত্তে উজ্জ্বল রসের ক্রিয়া অধিক, তাহার আলাপ স্বভাবতঃ কোমল ও মধুর। উজ্জ্বল রসই আদিরস, ইহার অপর নাম শৃঙ্গার রস। মহানাদের এই অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, সিংহরাজবংশ সারাজীবন কেবল শ্মশানের দেবতারই পূজা করিয়াছে, এ আঁধারে কখনও উষার জন্ম হয় নাই; মহানাদ শ্মশানে পরিণত হয় নাই, চক্ষু খুলিয়া দেখ, সিংহবংশের বেণু বীণা সোহাগের নিকুঞ্জ কাননে বাজিতেছে। এখনও নূতন রবি, মহানাদের ললাটে গৌরবের সিন্দুর বিন্দুরূপে ফুটিয়া উঠে; এখনও নূতন বাঁশী, শরতের নীল গগনে প্রেমের লুকোচুরি খেলা মেঘের আড়াল হইতে খেলে।

সারা ভারতের রুদ্ধ মহানাদের বুকে যে আগুন পূর্ণশিখায় জ্বলে উঠেছিল—তারই অগ্নিহোত্রীদের জীবন লিপি বঞ্চিত মহানাদের বিরাট বঞ্চনা—বেদনার রক্তমাখা ইতিহাস। মুসলমান আক্রমণ মহানাদের বুকে নামিয়া আসিয়াছিল, একটা অভিশাপের মত।

"তৃণ ফুল সম পিষে গেল যারা ধনীর রথের তলে।
তাদেরি বুকের বোবা ব্যথা যত শিশির হইয়া ঝলে॥"

ভারতের মাটির গুণ এমনি যে, যে এখানে আসে সে নির্বীর্য্য হয়ে পড়ে। তার সাক্ষী দেখ, আর্য্যেরা কি বীর পরাক্রম লইয়া আসিয়াছিল। এসে কিছুদিন থাকার পর এলিয়ে প'ড়ল। গ্রীক, শক, হুন এলো, গায়ের জোরে ঢুকে প'ড়ল; কিন্তু দুদিন বাদে ঠাণ্ডা। পাঠান এল,—

যেন "বন থেকে বেরুল টিয়ে, সোণার টোপর মাথায় দিয়ে"। দুদিন বাদে মুসলমান হ'ল জড়ভরত। মোগল এল—কি শৌর্য্য বীর্য্য! সেই ভাবে সে ও ডুবে গেল। পতিতকে তোলার সঞ্জীবনীমন্ত্র হচ্ছে—তার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস দাঁড় করিয়া দেওয়া। মহানাদের সিংহবংশের কথা পর—তাদের শিক্ষার গভীরতা বা বিস্তার যথেষ্ট ছিল। রণনিপুণ যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদও ঢের ছিল। বিলাসিতায় আমজ্জা ডুবে যখন সিংহবংশ হাতীর দাঁতের আসবাব আর হীরা জহরত ভোগ করিতেছিল, ঠিক তেমন সময় অসভ্য পাঠান মোগল, সিংহরাজবংশকে ছারখার ছত্রিচ্ছন্ন করিয়া দিয়া গেল।

মহানাদের চন্দ্রকেতুর বিশাল সিংহদুর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কাহার না ধমনীর রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠে? তাই মহানাদের ছন্দনৃত্যে কাব্য লিখিতে চাই, যাহার প্রতি ছত্রে কাপুরুষের হৃদয়ও নাচিয়া উঠে, যাহার ভাবে, ভাষায় শৌর্য্যের দীপ্তি ফুটিয়া উঠে।

চন্দ্রকেতু আপনার বাহুবলে অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। মহানাদ যদি একটা শতাব্দী নিশ্চিন্ত মনে অতিবাহিত করিতে পারিত, যদি তাহাকে কেহ লুণ্ঠনে জর্জ্জরিত না করিত, তাহা হইলে মহানাদের সিংহবংশ পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কিছু দান করিতে পারিত, যাহা তাহাদের নাম অনাগত যুগে কীর্ত্তিমণ্ডিত করিয়া রাখিত। কিন্তু সিংহ বংশ সে সুযোগ পায় নাই; সভ্য জাতি অসভ্য জাতিকে সে সুযোগ দেয় নাই। সবাই সিংহ বংশের রুধিরাক্ত দেহের উপর দিয়া তাহাদের বিজয় শকট চালাইয়া গিয়াছে। যে মহানাদ হয়ত আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে পরিণত হইত, সে তাই অন্ধকারের নিম্নতম গহ্বরে পড়িয়া আছে।

মহানাদে মহারাজ চন্দ্রকেতু সিংহের দুর্গে পাওয়া যায়—শিবের নানারূপ নৃত্যকলাপটু মূর্ত্তি। শিব এক সময় এখানে তাণ্ডব নৃত্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার নৃত্যের ছন্দে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কার্য্য তালে তালে

চলিতেছিল। মহানাদে প্রস্তরের শিকল পাওয়া গিয়াছিল। মহানাদে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে এক অশ্বে সহস্র অশ্বমেধের ফল হয়—তাই একবার এইখানে ব্রহ্মা পিতামহ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে কে বড়,—এই কথা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় ব্রহ্মা লক্ষ্মীর অনুকুলে মত প্রকাশ করেন, তাহাতে সরস্বতী ব্রহ্মার উপর রুষ্ট হইয়া থাকেন। প্রতিশোধ লইবার মানসে ব্রহ্মার এই যজ্ঞ পণ্ড করিবার অভিপ্রায়ে সরস্বতী নদীরূপে মহানাদ রাঢ়ে যজ্ঞভূমির সন্নিকট উপস্থিত হন। ব্রহ্মা প্রমাদ গণিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু (বন বিষ্ণুপুর) সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় সরস্বতী নদীর গতিরোধ করিয়া দাঁড়ান। সরস্বতী নগ্ন পুরুষ মূর্ত্তি দর্শনে সঙ্কুচিতা হইয়া (চক্ষু মুদ্রিত পূর্ব্বক কাণানদী হইয়া) রহিলেন। তাহাতে ব্রহ্মার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু ভক্তেরা বিষ্ণুকে এইখানে জঙ্গলে আটকাইয়া ফেলিল। তদবধি বিষ্ণু বনবিষ্ণুপুরের মদনমোহন হইলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পহ্লব রাজ লোকাদিত্য বনবিষ্ণুপুর আক্রমণ করিয়া কৈলাসনাথ বিগ্রহ দাক্ষিণাত্যে লইয়া যান। মহানাদের নিকটে পক্ষীতীর্থ নামে একটি স্থান ছিল, মুসলমান যুগে তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

অতি পূর্ব্বকালে মহানাদে কুম্ভমেলা হইত। এক্ষণে হরিদ্বার, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানে কুম্ভমেলা হয়। কুম্ভ শব্দের অর্থ কলস। সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত-কুম্ভ উত্থিত হইয়াছিল, তাহার সত্ত্বাধিকার ও উপভোগ লইয়া দেবতা ও অসুরগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে দেবগণের পক্ষ হইতে উহা প্রথমে হরিদ্বার, পরে তথা হইতে গয়ায় (পেলাসা গয়া—Of Homer তৎপরে ধারানগর, উজ্জয়িনী (এই নগর আগ্নেয় গিরি কর্তৃক ধ্বংস হয়, পরে দ্বিতীয় উজ্জয়িনী স্থাপিত হয়) ও তৎপরে মহানাদ, গোদাবরী তীরে, নাসিকতীরে লুকাইয়া রাখা হয়। পুরাবৃত্ত আলোচনা রাহিত্যে, তৎপরে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ বিপ্লব ধ্বংস করিয়া তাঁহার

শিষ্যদিগের একত্র সম্মেলনের জন্য মাত্র চারিস্থানে মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি প্রতি বার বৎসর অন্তর ঐ সকল স্থানে কুম্ভমেলা হইতেছে। আধুনিক "তীর্থ প্রদীপ" গ্রন্থে আছে—

"পদ্মিনীনায়কে মেষে কুম্ভ রাশিগতে গুরৌ।
গঙ্গাদ্বারে ভবেদ্ যোগঃ কুম্ভনামা তদোত্তমঃ॥"

অর্থাৎ—রবি মেষ রাশিতে এবং বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে অবস্থান করিলে গঙ্গাদ্বারে উত্তম কুম্ভ মেলা হইবে। আরও আছে—

"মেষ রাশিং গতে জীবে মকরে চন্দ্র ভাস্করৌ।
অমাবস্যা তদা যোগঃ কুম্ভাখ্যতীর্থনায়কঃ॥"

অথবা

"মকরেচ দিবানাথে অজগে চ বৃহস্পতৌ।
কুম্ভ যোগো ভবেৎ তত্র প্রয়াগে হ্যতিদুর্লভঃ॥

অর্থাৎ—বৃহস্পতি মেষরাশিতে আসিলে এবং চন্দ্র সূর্য্য মকর রাশিস্থ হইলে, তীর্থরাজ প্রয়াগক্ষেত্রে কুম্ভযোগ হইয়া থাকে।

এই গঙ্গাদ্বার কোথায়? রাঢ়দেশ যদি প্রাচীন গঙ্গারাষ্ট্র রাজ্য হয় এবং যাঁহারা আজিকার ভগ্ন-জঙ্গলাবৃত মহানাদ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য একবার দেখিয়াছেন, তিনি এই মহানাদকেই "গঙ্গাদ্বার" বলিবেন। একথাও সত্য যে, বাঙ্গলায় প্রচলিত কোন পঞ্জিকাতেই বৃহস্পতির মেষ রাশিতে অবস্থান দেখা যায় না।

মহানাদ সম্বন্ধে একখানি হস্তলিখিত কাগজে ইংরাজিতে লেখা আছে,—"Tradition says that Bhagirath, when bringing the Ganges from Himalaya to Ganga Sagar to water his forefathers' bone, left the traces of his chariot wheel (chakra) here; hence the name. Not much appears to be known of the ancient history of the town."

মহানাদে তেত্রিশ কোটি দেবতার বাস ও মহানাদ তীর্থস্থান বলিয়াই পূর্ব্বকালে ভক্ত হিন্দুগণ মহানাদের সীমায় প্রবেশের সময় পাদুকা খুলিয়া হস্তে লইতেন এবং মহানাদের সীমানা অতিক্রম পূর্ব্বক পায়ে দিয়া গন্তব্য স্থানে গমন করিতেন, এখনও প্রাচীন লোকেরা ইহা বলিয়া থাকেন।

বিশ্বনাথের কৃপায় বারাণসীর ন্যায়, মহাকালের কৃপায় মহানাদ চির-দিনই হিন্দুমাত্রের পরম পবিত্র তীর্থস্থান ও অপরিহার্য্য আকর্ষণ ক্ষেত্র।

এই মহানাদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যেরূপ প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি সমূহ এখনও ভগ্নাবস্থায় বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা হিন্দু মাত্রেরই দেখিবার এবং গৌরব করিবায় স্থল। হায়! যাঁহারা এ সকল অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহারা আজ কোথায়? কত চিন্তা, কত অর্থ ব্যয় ও কত খ্যাতনামা শিল্পিগণের গৌরব বৈভব প্রতি মন্দিরের প্রতি কাণিশে প্রতি প্রস্তর গাত্রে খচিত, তাহা কে বলিতে পারে?

বিষ্ণুর জাগরণ, মহানাদের নর নারীর একটি খুব বড় জীনিষ। সূর্য্যের গতি পরিবর্ত্তনই ইহার অর্থ। বেদে সূর্য্যই বিষ্ণু। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে বিষ্ণুর জাগরণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাই যেন মূল জাগরণ। মহাবিষ্ণু— নাভিপদ্মে ব্রহ্মা বসিয়া আছেন। ব্রহ্মা তখন শিশু ও অসহায়। নব সৃষ্টির উষা আরম্ভ হয় হয়, এমন সময় দুই দৈত্য—মধু আর কৈটভ, ইহারা বিষ্ণুরই কর্ণমল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ইহারা ব্রহ্মাকে হত্যা করিতে উদ্যত। অসহায় ব্রহ্মা মহামোহরূপিণী যোগনিদ্রার স্তব করিতেছেন,—"মা তুমি বিষ্ণুকে পরিত্যাগ কর; মা তুমি পরিত্যাগ করিলেই বিষ্ণু জাগিবেন, তাহা হইলেই আমি রক্ষা পাইব।" মা যোগনিদ্রা বিষ্ণুকে ছাড়িলেন, বিষ্ণু জাগিলেন। পাঁচ হাজার বৎসর যুদ্ধ হইল। মোহান্ধ অসুর যুগল নিজেদের মোহ ও দম্ভের জন্য নিপাতিত হইল। তাহাদেরই মেদে বা মহানাদে মেদিনী গড়িয়া উঠিল। নব সৃষ্টির নবীন উষায় ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নব গঠনের সূত্রপাত হইল, মহাশঙ্খ মহানাদ বাজাইল।

ভারতের সুবিপুল জনসঙ্ঘের সম্মিলিত মত ও শক্তিই মহাবিষ্ণু। নব্য ভারত গড়িয়া তোলার শক্তি বা লক্ষ্য মহানাদের সিংহ বংশেরই ছিল, তাহা ছাড়া আর সকলই সুগভীর মোহান্ধকার।

মহানাদের ইতিহাসের ধারা যে সেই অখণ্ড অনন্ত প্রাণেরই পবিত্র বিগ্রহ। সেই প্রাণ তরঙ্গে অকস্মাৎ ফুটিয়া উঠিল,—এক অপূর্ব্ব অসংখ্য দলপুষ্পের মত "মহানাদ"। তাহার প্রত্যেক কাহিনীর মধ্যে যে অনেক গান, অনেক কথা। তাহার গল্পের মধ্যে যে অনেক কালের স্মৃতি—অনেক মধু ছড়াইয়া থাকে। তাহার ডাঁটায় যে জন্মজন্মান্তরের চিহ্ন লুকান থাকে। ফুল যে অনন্ত কাল ধরিয়া ফুটিতে ফুটিতে ফুটিয়া উঠে।

মহানাদের কত ভগ্নস্তূপে ও আবর্জ্জনাপূর্ণ দীর্ঘিকার অন্তরালে লুকাইয়া আমাদের রাজলক্ষ্মী অভিশপ্তা হইয়া অশ্রুপাত করিতেছেন; তাঁহার অঞ্চলে এখনও অনেক মহার্ঘ রত্ন রক্ষিত আছে।

মহানাদের ইতিবৃত্ত কোন্ আদিম রক্ত উষায় ফুটিতে আরম্ভ করিল জানিনা। কতকাল, কত যুগ; কোন্ অন্ধকারের অন্ধকারে, রূপের ধ্যানে মগ্ন আমার মহানাদ।

মহানাদ জাগিয়া দেখিল,—উর্দ্ধে অনন্ত নীল, নীলের পর নীল, অঞ্চল ধারে কল কল্লোলে বশিষ্ঠ গঙ্গা বহিয়া যায়, চরণতলে কল হাস্যময় মহাসমুদ্র অনন্ত সুরে গাহিয়া উঠিয়াছে,—তাহার বুকের উপর আছড়াইয়া পড়িয়াছে; শিরে হিমালয় কাহার ধ্যানে নিমগন।

ভগ্ন মহানাদ, নারী জগতের রাণীরূপে জাতিগঠনের বেদী স্বহস্তে রচনা করিতেছেন। প্রাচীন লোল্লট শঙ্কুক কীর্ত্তিবর প্রভৃতির নাট্য পুস্তক বিলুপ্ত। নির্ম্মাণের ঋষি তাই হৃদয় নিঙ্ড়াইয়া বজ্রকণ্ঠে গঠনের বাণী উচ্চারণ করিতেছেন। এই মহানাদ, সিংহ বংশের শ্বেতবর্ণ সুগন্ধি ফুলের মালা, যেন চাঁদের আলো মেঘ ভেদ করিয়া ছড়িত হইতেছে।

সিংহরাজ বংশ মহানাদকে চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে চাহিয়া দেখিল—অনন্ত সাগর দূরে যেখানে দিক্ চক্রবালের পরিধি পারে মিলিয়াছে, সেখানে শুধু এক রেখার মত সরল, নিবিড়, যেন মিলাইয়াও মিলায় নাই মিশিয়াও মিশায় নাই, প্রভেদ অথচ অভেদ। আবার ফিরিয়া দেখিল, ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজা মহেন্দ্র সিংহ দেখিল—ধরণী মহাকালকে চুম্বন করিতেছে। দেখিল সে এক মহামিলন। যাদবেন্দু সিংহ দেখিল, বাহির শুধু বাহির নয়, অন্তর শুধু অন্তর নয়। ইন্দ্রিয় দিয়া যাহা প্রথম ধরা যায়, তাহা শুধু বহিরাবরণ। জীবন এক মহা মিলন মন্দির।

সার্থ সিংহ রাঢ়ে যে সিংহপুর রাজ্য স্থাপন করেন, তাহার বিবরণ পুরাণে নাই, কিন্তু ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এই লুপ্ত রাজ্যের ইতিহাস "মহানাদ" দেখাইতেছে। ইনি বঙ্গে বিষ্ণুর চক্র স্থাপন করেন।

সুন্দর একটি চিত্র দেখিলে আত্মা সন্তোষ লাভ করে। সেই জন্যই মহানাদে মূর্ত্তি-শিল্প অঙ্কন করিতে শিল্পিগণ উৎসাহিত হইয়াছিলেন। প্রাচীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে হস্তাক্ষর সুপ্রচলিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই দিকে লোকের দৃষ্টি পড়িল। এক সময় তাঁহারা সুন্দর হস্ত লিপিকে চিত্র-শিল্পের ঊর্দ্ধে স্থান দিয়াছিলেন। গজন খাঁর মন্ত্রী রসিদউদ্দিন 'পৃথিবীর ইতিহাস' নাম দিয়া যে গ্রন্থ সঙ্কলন করেন, তাহাতে কতকগুলি মনুষ্য চিত্র আছে ও মহানাদের নামোল্লেখ আছে। মহানাদের চিত্র-শিল্প সেদিন অপূর্ব্ব গৌরব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে পারস্যের সাহ আব্বাস তাঁহার সভাস্থ শিল্পীকে অঙ্কন বিদ্যা শিক্ষার জন্য রাঢ় দেশে প্রেরণ করেন। মহানাদ সমস্ত জগৎকে শিখাইয়াছিল, শিল্প-সাধনা মানুষের কত বড় আনন্দের বস্তু।

মহানাদের মাটিতে আজ আর সে রস নাই, তরুলতা আর সেরূপভাবে গজায় না, সিংহ জন্মায় না, সে ফুল ফুটে না, বসন্ত আসে না, মলয় বহে না,

অরণ্যময় মহানাদ।

৺ব্রহ্মময়ীর মন্দিরের ত্রিতল হইতে গৃহীত চিত্র (উত্তর দিক)।

জমিদার ৺ গিরীশচন্দ্র বসুর

জঙ্গলাবৃত ভগ্ন প্রাসাদ।

চারিদিকে প্রাণশূন্য নিরুৎসব। মহানাদ আজ মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তাহার ঐশ্বর্য্যগুলি কালের করাল কৃপায় সমস্তই মুছিয়া গিয়াছে।

সমুদ্রকূলে পাণ্ডব ঘাট নামক প্রাচীন তীর্থ ছিল। মহানাদ হইতে এই সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত সিংহবংশের অধিকার ভুক্ত ছিল, ইহার পর হেম মল্লদিগের বিস্তৃতি ঘটে।

"At Mahanad :—There is a tank here known as Jiban kund, where it is said that dead Hindus were restored to life again, until it was defiled by the Mussalmans throwing cow's flesh in it. Here too the remains of a high embankment from Tribeni to Mahanad, 8 miles, can still be seen, which goes by the name of Jamai Jangal (son-in-laws embankment)."—

Bengal District Gazetters, Hooghly.

মহানাদ গ্রামে মুসলমান বাদশাহেরা যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিল, তাহার ফলে মহানাদ শ্মশানে পরিণত হয়। মুসলমানগণ আরবের দুর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া তরবারি হস্তে যখন মহানাদের নরনারী হত্যা করিতে লাগিল, প্রাচীন অট্টালিকা সমূহ ও দেব মন্দিরগুলি যখন ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিতে লাগিল, তখন তাহারা ভারতের ত্যাগ বৈরাগ্য তপস্যা সাধনার মূল্য বুঝেন নাই। মরুভূমের অসভ্য আরবেরা ভারতে আসিয়া হত্যার পর হত্যা করিতে লাগিল, আর খাইতে আসিল গোমাংস।

পরাজয়ের ভয় সিংহবংশীয় নরপতিগণ করেন নাই। কারণ যাহারা মরিতে ও দুঃখভোগ করিতে প্রস্তুত, তাহাদের কখনও পরাজয় ঘটিতে পারে না ; তাই তাঁহারা বুঝিতেন—মরণেও পরাজয় নাই। উশৃঙ্খল বীরবালক অভিমন্যুর মতই নির্গমের পথ না জানিয়াও দুর্ভেদ্য ব্যূহমধ্যে

প্রবেশ করিতেন। সিংহরাজগণ আপনাকে নিহত, মর্দ্দিত, মথিত করিয়া মহানাদকে বিজয় সম্মান দিতেন। স্বদেশবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় সিংহবংশ দলিত, মথিত ও হীনবল হইয়া মনের দুঃখে পল্লীর নিভৃত কুটীরে নীরবে অবস্থান করিতেছেন।

মহারাজা বীরেন্দ্র সিংহ নিজ বাহুবলে পূর্ব্বদিকে লোহিত্য নদের উপকণ্ঠ হইতে গহন তালবনাচ্ছাদিত মহেন্দ্র গিরির উপত্যকা পর্য্যন্ত ভূভাগ বশীভূত করিয়া তিনি গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বীরেন্দ্র সিংহ জীবিত থাকিতে হর্ষবর্দ্ধন কিছুতেই বঙ্গ জয় করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা বাক্য মাত্রেই রহিয়া গেল।

উড়িষ্যার অন্তর্গত বড়ম্বা একটি সামন্তরাজ্য ছিল। উত্তরে হিন্দোল, পূর্ব্বে তিঘরিয়া, দক্ষিণে খণ্ডপাড়া ও বাঙ্কি এবং পশ্চিমে নরসিংহপুর সামন্তরাজ্য। কণিকাশিখরই এখানকার গিরিশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ স্থান। এই অঞ্চলের রাজাদের সহিত মহানাদের রাজগণের মিত্রতা ছিল। এই অঞ্চলে কন্ধ নামক এক জাতির বাস ছিল (১৩৮০ খৃষ্টাব্দ)। ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা হাটকেশ্বর রাউত কন্ধদিগকে তাড়াইয়া বড়ম্বা রাজ্য স্থাপন করেন। রাজা নবীন রাউত ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে বড়ম্বার রাজা ছিলেন। মহানাদে ত্রিলোচন শিবের একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা বড়ম্বার রাজগণের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

বদরীহাট ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী একটি প্রাচীন স্থান। ভাগীরথী বক্ষ হইতে বহুক্রোশব্যাপী স্থানের ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি মনে জাগিয়া উঠে। এখনও এখানে সিংহরাজবংশের রাজপ্রাসাদ ও ভগ্নাবশেষ দুর্গের চিহ্ন লক্ষিত হয়। বেণীমাধব সিংহ অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা ও স্তম্ভগাত্রে পালি অক্ষরে খোদিত লিপি দেখিয়াছিলেন। গৌড়ের নবাব গিয়াসউদ্দীন এইস্থানে যাদবেন্দু সিংহকে পরাজিত ও নিহত করেন।

৯০৫ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধ নামক জনৈক আহিররাজ এই নগর প্রান্তে ভীষণ যুদ্ধ করিয়া সিংহবংশকে পর্য্যুদস্ত করেন। ১২০০ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে কেবল বিদ্রোহ ও নরহত্যা সংসাধিত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহ বহ্নিতে সিংহবংশ নিঃসম্বল হইয়া যায়।

বনাস নদী সাহাবাদ জেলায় আছে, শোণ নদীর সমুদয় জল এই বনাস নদীর খাত দিয়া প্রবাহিত হইত। রাজপুতনায়ও আর এক বনাস নদী আছে। উদয়পুরের কমলমেরু দুর্গের অনতিদূরে আরাবল্লী শিখর হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণে গোগণ্ডার অধিত্যকা ভূমি দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সমতল ক্ষেত্রে এই নদীর উপর রথদ্বার নামক বৈষ্ণব তীর্থ আছে। বিজয়মন্দর বা মান্দারণ দুর্গ প্রাচীন কালের নির্ম্মিত। এই স্থানের প্রাচীন নাম বাণাসুর। উষাচরিতে লিখিত আছে, রাজা বাণ শান্তিপুরে রাজত্ব করিতেন। বায়না বা বয়ড়া পরগণায় এখনও উষা মন্দির নামে একটি ভগ্ন মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। তৎ সন্নিকটেই সিংহ বংশের ভগ্ন অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। প্রাচীন উষা মন্দিরে ১০৮৪ শকে উৎকীর্ণ কুটিলাক্ষরে লিখিত একখানি শিলালিপিতে সিংহরাজ বংশের কথা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বিষ্ণু সূরি, মহেশ্বর সূরি, পঘায়ান সূরি প্রভৃতি হিন্দু রাজগণের নাম পাওয়া গিয়াছে। ১২৫১ খৃষ্টাব্দে মহানাদের রাজা কোন হিন্দুরাজা চাহড়দেবের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বিজয়মন্দরগড় স্থাপয়িতা যদুবংশীয় রাজা বিজয় পাল সিংহ ১১০০ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন। এখানকার শেষ রাজা কুমার পাল সিংহ ত্রিহুণগড় বা থানগড়ে ছিলেন। ৮৩৭ হিজিরায় সিদ্ধ পাল নামক জনৈক কায়স্থ এইস্থান দখল করেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র সিংহ কোলাঞ্চ, কুবঞ্চ * বা কাঞ্চীদেশ হইতে তথাকার

* কুলঞ্চ, কোলাঞ্চ বা কুবঞ্চ, সপ্তগ্রামের নিকটস্থ কোন স্থানের নাম ছিল, উহা এক্ষণে লুপ্ত হইয়া যাওয়ায়, অনেকে কান্যকুব্জের নামান্তর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

পূজিত দেবতা আনয়ন করিয়া ৺কঙ্কালী মহাপীঠে "কাঞ্চীশ্বর" নামে একটি দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবতাটির মূর্ত্তি শ্রীসম্পন্ন প্রস্তরাকৃতি। ইহা এক্ষণে বোলপুর ষ্টেশনের উত্তর-পূর্ব্বে ৫ মাইল ব্যবধানে দেখিতে পাওয়া যায়।

বারগাম্বে আবিস্কৃত কান্নাডা ভাষায় লিখিত জগদেক মল্ল দ্বিতীয় জয়সিংহ রাজার রাজ্যকালীন একখানি খোদিত লিপি হইতে পাওয়া গিয়াছে যে, চালুক্যরাজ পরাজিত হইলেও প্রশস্তিকারগণ তাঁহাকে বিজয় সিংহের সহিত এবং রাজেন্দ্র চোলকে হরিশ সিংহের সহিত তুলনা করিয়াছেন। মুশাঙ্গি যুদ্ধক্ষেত্রে চালুক্যরাজ পারাজিত হন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র সিংহ "গর্গ যবন প্রলয় কালরুদ্র" উপাধি ব্যবহার করিতেন। হরিশ্চন্দ্রের বাঙ্গাবাড়ী স্থান দখল করিয়া মুসলমানেরা "ফিরোজাবাদ" নাম রাখিয়াছিল। ফিরোজাবাদ পরে মহম্মদাবাদ হইয়াছিল।

নান্যদেব ১০৪২ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। রাজা হরিশচন্দ্র সিংহ দোস্তিয়া পরগণার প্রচীন শিমুরুণগড় ধ্বংস করেন। কূটযুক্তি দেখাইয়া বিজয় সিংহ ও হরিশ সিংহকে ইতিহাস হইতে আর বাদ দেওয়া চলেনা। চোড়গঙ্গ ১১৪২ খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। নদীয়া জেলার বিজয় নগর ও হুগলী জেলার বিজয়পুর একই স্থান নহে।

দমদমার ভিটা ও সাগুতার দীঘি হইতে দুইটি জাঙ্গাল রামপাল ও নবদ্বীপ পর্য্যন্ত যে সম্প্রসারিত ছিল, তাহা সত্য বটে, এবং এই জাঙ্গাল বিজয়রাম সিংহের নির্ম্মিত। দমদমা হইতে বিক্রমপুর ৫ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার মধ্যস্থলে সাহসাঙ্ক সিংহ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন।

সেকালে প্রবাদ ছিল, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা পবিত্র চেতা ঋষিগণের ব্রহ্মারাধন জন্য এই মহানাদ মনোনীত করিয়াছেন। রামচন্দ্রের পুত্র লব রাপ্তা নদীর

তীরবর্ত্তী শ্রাবস্তী হইতে মহানাদে আগমন করিতেন। শাক্যবুদ্ধের অভ্যুদয়ে মহানাদ বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রীড়াভূমি হইয়াছিল। বুদ্ধ উত্তর কোশল রাজ্যে কপিলাবস্তু নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহানাদে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং শ্রাবস্তীতে ১৯ বর্ষকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তগুবা নামক গ্রামেও কতকগুলি বৌদ্ধ কীর্ত্তির সহিত মহানাদের উল্লেখ নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। মহানাদে বুদ্ধমাতা মহামায়া মূর্ত্তি "সীতামাই" রূপে পূজিত হইতেন। রাজপুতনার ভরগণ এই পূজা মহানাদে আনয়ন করেন।

ব্রহ্মার ইচ্ছায় যাগযজ্ঞের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয় বলিয়া "বরাট" স্থান ব্রহ্মা-ইচ্ছা, বা ব্রহ্ম-ইষ্টি হইতে 'বরাইচ' নামে প্রসিদ্ধ হয়। কেহ কেহ ভর নামক অধিবাসী হইতে এই স্থানের 'ভরৈচ' নাম নির্দ্দেশ করেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে বহলোল লোদীর ভাগিনেয় কালাপাহাড়ের সময় মহানাদের পার্শ্ববর্ত্তী এই বরাট কতক পরিমাণে ধ্বংস সাধিত হয়। এই সময় মহানাদের সিংহরাজগণ দাসত্বের অধীনতা শৃঙ্খল উন্মোচন করিয়া স্বাধীনরাজ্যরূপে মহানাদকে গড়িতে চেষ্টা করেন। মহেন্দ্র খাঁ সিংহ অর্থদ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া রাজকোষ বর্দ্ধিত করেন।

বরাকর ভূমিতে শঙ্খতোরিয়া গ্রামে রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মন্দির আছে। এ ছাড়া বিষ্ণুর নানা অবতার মূর্ত্তি শোভিত অনেক মন্দির গাত্রে মহানাদের সিংহবংশের নামোল্লেখ আছে। ইহার তিন ক্রোশ উত্তরে কল্যাণেশ্বরীর মন্দির বা দেবীস্থান। এখানকার একখানি শিলালিপিতে পঞ্চকোটের ও মহানাদের রাজার নাম পাওয়া যায়। কল্যাণেশ্বরী মন্দিরের সম্মুখে শিলালিপিতে "শ্রীশ্রীকল্যাণেশ্বরী চরণ পরায়ণ শ্রীযুক্ত দেবনাথ দেবশর্ম্মা" এইরূপ পাঠ লিখিত আছে। মূল মন্দিরের পার্শ্বদেশে আরও কয়েকটি মন্দির দেখা যায়। ঐ দেবী

মূর্ত্তির অধিষ্ঠান সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ কথা ৺নবীনচন্দ্র সিংহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "একদা জনৈক রোহিনী (দেওপাড়াঘর) বাসী ব্রাহ্মণ সম্মুখের নালায় একটি রত্নালঙ্কার বিভূষিত হস্ত উত্তোলিত হইতে দেখিয়া মহানাদের রাজা (পঞ্চগ্রামের) কল্যাণ সিংহকে সংবাদ দেন। দেবীর স্বপ্নাদেশ অনুসারে রাজা জলমধ্য হইতে উঠাইয়া ঐ প্রস্তরময়ী দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। আরও শুনা যায়, মহানাদ (বঙ্গরাজ) রাজকন্যা কল্যাণী দাসী শ্বশুরালয়ে গমন কালে পিতৃ-কুলদেবী লইয়া আইসেন। দেবী বালিকাকে স্বপ্ন দেন যে, তিনি একবার মৃত্তিকায় রক্ষিত হইলে আর উঠিবেননা। বালিকা এই নদীতীরে আসিয়া হস্তপদ প্রক্ষালনার্থে দেবীমূর্ত্তি এখানে স্থাপন করেন। দেবী আর এস্থান ত্যাগ করিলেন না দেখিয়া কল্যাণী দাসী এই মন্দির পিতৃকুলের সম্মানার্থে নির্ম্মাণ করিয়া দেন।"

মহানাদে সিদ্ধেশ্বর নামক এক প্রাচীন মন্দির ছিল। স্থানীয় প্রবাদ যে অসুররাজ বাবা এই মন্দির স্থাপন করেন। ঐ অসুররাজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর ভাদ্রপদে এখানে মেলা হইত। সেই স্থান মালপাড়া নামে খ্যাত ছিল।

অতি প্রাচীনকালে রাজা শার্দ্দুল সিংহবর্ম্মা ও রাজা অনন্ত সিংহবর্ম্মা এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিস্তার কল্পে দেবমাতা কাত্যায়নী ও মহাদেব প্রভৃতি হিন্দু দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

মহানাদের রাজা রুদ্র সিংহ ৩৪৮ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রগুপ্তের নিকটে পরাজিত হন।

চীগৎ খাঁ সিংহ নামক এক ব্যক্তি ১৩৯৭ খৃষ্টাব্দে তিমুরলঙ্গের ভারত আক্রমণ কালে বারাণসী নগর রক্ষা করিতে মহানাদ হইতে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন।

লাট ও কঙ্কদ্বীপের মাহিষ্য রাজারা সিংহ বংশের রাজত্বকালে অনেকাংশে হীনপ্রভ হইলেও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন না। ইঁহারা সিংহবংশের সামন্তরাজ ছিলেন।

৬৩০ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলাস্থ রুইখনপুরের রাজা মহানাদ আক্রমণ করেন। এই সময় হুগলী জেলার হরালদাসপুর, মহারামপুর গড়ের রাজারা মহানাদের রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। তমলুক, সুজামুঠা, ময়নাগড়, তুর্কা, বালিসীতা প্রভৃতি প্রাচীন কৈবর্ত্ত জাতির প্রাচীন ইতিহাসের সহিত মহানাদ রাজ্যের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। মহানাদ যখন স্বাধীন ছিল, তখন এই রাজ্যগুলি সামন্তরাজ্যরূপে গণিত হইত। বালিসীতাগড় যে কোন্ যুগে কত বৎসর পূর্ব্বে কোন্ ভূপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

বর্দ্ধনকুঠীর রাজবংশ কায়স্থ ছিলেন, কাকিনা ও টেপার কায়স্থ রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ। অর্থাৎ কাকিনার পূর্ব্ব বসতি গাজনা, ও টেপার পূর্ব্ব বসতি কাউননাড়ী গ্রাম। বর্দ্ধনকুঠীর রাজা আর্য্যবর দেব মহানাদের রাজা দুর্জ্জন সিংহের কন্যা গ্রহণ করেন। "পাদসাহ নামা" গ্রন্থে ইহাকে শ্রীনগরের রাজা দুর্জ্জন সিংহ বলিয়াছে।

মৌরগামী ও পেঁচাকুলীর রাজারা মহানাদের রাজার সহিত ৯৫৭ খৃষ্টাব্দে ভীষণ যুদ্ধ করেন। পুড়বাগড়ের বশিষ্ঠ গোত্রের দত্ত বংশীয় রাজা অর্জ্জুন দত্ত মহানাদের রাজার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন (১০৯১ খৃঃ)।

খেতরী গ্রাম রাজসাহী জেলার পশ্চিমাংশে পদ্মানদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ছিল, তথায় রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের বাটী ছিল। তিনি মহানাদের রাজার সহিত বন্ধুভাবে ছিলেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত মহানাদের কায়স্থ সমাজে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন (১১৪৫ খৃঃ)।

"সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সদা শুভ কার্য্য।
বিপ্র সঙ্গে দেখিলেন মহানাদ রাজ্য॥
রাজা কন নবগুণ কুলীনের মূল।
বিনয় হীনেতে দত্ত হইলা নিষ্কুল॥

করড়া গ্রাম মহানাদের নিকটেই ছিল। শাখারি গ্রাম মহানাদের অন্তর্গত বলিয়া কুল গ্রন্থে আছে।

"শাখারি সমাজে দাস যে বিরাজে
আদি পৃথ্বীধর দাস।"

কয়েতা গ্রাম মহানাদের নিকটে ছিল। হুগলীর নিকটে বর্ত্তমান কেওটা গ্রাম হইবে কি?

"কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ পরে রাজা কৃষ্ণ রায়।
কয়েতা নিবাসী বটে গোষ্ঠীপতি প্রায়॥

রাজা কৃষ্ণরায় ঢেকুরের ইছাই ঘোষের বংশধর হওয়ায়, ইছাই ঘোযকে কায়স্থ বলিবার ইহা আর এক জ্বলন্ত প্রমাণ।

রামায়ণের বর্ণিত ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা বিভাণ্ডকের বিভাণ্ডক বন সিংহল পাটনের অন্তর্গত ভাণ্ডীরবন ছিল। অঙ্গাধিপ লোমপাদ বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম হইতে তৎপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে কৌশল করিয়া নিজ রাজধানীতে জলপথে লইয়া গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বীরভূম জেলার পশ্চিমাংশ হইতেই প্রাচীন অঙ্গরাজ্য আরম্ভ। পুণ্যক্ষেত্র বক্রেশ্বরও অষ্টাবক্র ঋষির আশ্রম বলিয়া পরিচিত। এখানে অনেকগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ ও পুণ্যতোয়া নদী আছে।

মহানাদের নিকটে শৃঙ্গবেরপুর—উহার বর্ত্তমান নাম সিঙ্গুবোর বা সিঙ্গুর। এইখানে গুহক আসিয়া রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেন।

মহানাদের নিকটবর্ত্তী বালিচড়া গ্রাম আছে। পূর্ব্বকালে বল নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত দৈত্য ছিল। ইন্দ্র, চন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ এবং যক্ষ

ও গন্ধর্ব্বগণ তাহাকে ভয় করিত। এই অসুর দেবতাদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া স্বর্গে ইন্দ্রের সিংহাসন অধিকার করে এবং মহাবিষধর নাগেন্দ্রদিগকে বলপূর্ব্বক সতত আজ্ঞাবহ ও গরুড়কে ভৃত্য করিয়া ব্রহ্মার সহিত সপ্তস্বর্গবাসী দেবগণকে স্বর্গ হইতে দূরীভূত ও শত বৎসর পর্য্যন্ত পাতালতলে বাস করিয়াছিল,—সেই স্থান সপ্তগ্রাম। দেবগণ এইরূপে নিপীড়িত হইয়া বৃহস্পতির শরণাপন্ন হন, বৃহস্পতির পরামর্শ পাইয়া পরে তাঁহারা বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হন। মহামায়ার মোহিনী বিদ্যায় বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধরিয়া বেদ পাঠ করিতে করিতে বলাসুরের বালিচড়ার দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হন। বিষ্ণু সুদর্শনচক্রে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। তখন দানব তাহার ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যদেহ ধারণ করিল। বলাসুরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে জগতে হীরক ও তেজোময় পদ্মরাগাদি রত্ন সকল উৎপন্ন হইল এবং সৎপাত্রে প্রদান হেতু তাহার শরীর রত্নাকর হইল।

এই রাঢ়ের মহানাদ হইতে সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতট ক্ষেত্রে পূর্ব্বকালে বালখিল্য ঋষিগণ তথায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সরস্বতীর পরপারে দধিচী মুনির আশ্রম ছিল। সরস্বতী নদী নিষাদগণের দোষে অতিশয় বিরক্ত হইয়া মহীতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম পূর্ব্বে "চমসোদ্ভেদ" নামে বিখ্যাত ছিল।

পুরাণে বর্ণিত আছে,—ধর্ম্মপরায়ণা জটিলা নাম্নী গৌতম বংশীয় এক কন্যা সাতজন ঋষিকে বিবাহ করেন। এই সপ্তর্ষি হইতেই দক্ষিণ রাঢ়ে মহানাদের সন্নিকট সপ্তগ্রাম হইয়াছে বলিয়া একটা প্রবাদ ছিল। এই রাঢ়দেশ হইতে বাক্ষি নাম্নী এক মুনিকন্যা প্রচেতা কান্যকুব্জ রাজকে (জয়াদিত্যকে) পরাজয় করিয়াছিলেন। গমনকালে পৌরুষ ও উদারতা প্রকাশ পূর্ব্বক সেই রাজার রাজচিহ্ন সিংহাসন গ্রহণ করেন নাই। এই জয়াদিত্য ত্রিবেণীর অন্তর্গত স্থানে জয়পুর নগর নির্ম্মাণ করেন। জয়পুর

বাঘাটি গ্রামের ৺নরনারায়ণ ঘোষ বলেন,—জয় দত্ত নামে একজন কর্ম্মচারী ঐ স্থানে একটী বৃহৎ বৌদ্ধ মঠ স্থাপন করেন। ললিতাপীড়ের (?) পুত্র বৃহস্পতি বা চিপ্পট জয়াপীড় ত্রিবেণীতে অনেক বর্ষ বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা জয়াদেবী—অথুবকল্প পালের কন্যা ছিলেন এবং ত্রিবেণীতে দেহত্যাগ করেন। কবি শঙ্কুক রচিত "ভুবনাভ্যুদয়" কাব্য গ্রন্থে এই প্রবাদ কাহিনী পাওয়া যায়। এই গ্রন্থ এক্ষণে লুপ্ত হইলেও ১৮৭০ খৃঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিল।

সাতগাঁয়ের প্রায় এক ক্রোশ দূরে পর্ত্তুগিজগণ ভাগীরথী তীরস্থ কিছু জমি মহানাদের রাজা রাজীবলোচন সিংহের (রাজীব সিং) নিকট হইতে বন্দোবস্ত করিয়া লয়। এইরূপ সিংহ বংশের দুর্ব্বলতার জন্য হুগলী বন্দরের উৎপত্তি হয়। রাজা রাজীবলোচন সিংহ উড়িষ্যারাজ মুকুন্দ দেবের পূর্ব্বের ব্যক্তি। ঐ নামীয় উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেবের একজন বিচক্ষণ সেনাপতি রাজীবলোচন রায় ছিলেন। মুকুন্দদেব কর্ত্তৃক ত্রিবেণী হইতে সমস্ত হুগলী, নদীয়া, ২৪ পরগণা ও হাবড়া বা হাওড়া জেলা ১৫৬০ হইতে ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় আট বৎসর উড়িষ্যা রাজ্যের অধীন থাকে। রাজীবলোচন রায় ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের ব্রাহ্মণ রাজবংশীয় ছিলেন। তৎকালে রাজা রুদ্র নারায়ণ রায় ভূরিশ্রেষ্ঠের রাজা।

হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, স্মরণাতীত কাল হইতে সরস্বতী নদীই সমুদ্র যাত্রার জন্য সপ্তগ্রামকে এসিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বন্দরে পরিণত করিয়াছিল। অতি পূর্ব্বকালে প্রায় ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে এই সরস্বতী তীরেই সিংহপুর রাজ্য (বর্ত্তমান সিঙ্গুর) বর্ত্তমান ছিল। এইস্থান হইতেই সিংহ বংশীয় রাজকুমার বিজয়বাহু সিংহ সানুচর

* আমাদের এমনই ইতিহাস চর্চ্চার দেশ যে, প্রাচীন সপ্তগ্রামের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত কেহই লিখিতে চেষ্টা করেন নাই।

সুবৃহৎ অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া লঙ্কায় উপনীত হন এবং ঐ স্থান জয় করেন। সপ্তগ্রাম—সরস্বতী তীরে ঝাঁপুরদহ মাপুরদহ গ্রামে সিংহ বংশের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। মায়াপুরে এক চণ্ডীদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা রাজা বনমালী সিংহের প্রতিষ্ঠিত এবং ঐ অঞ্চলে ঐ সিংহ বংশীয়গণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। সিংহ বংশের ভাগ্য বিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সপ্তগ্রামের পতন হইল।

শক্রজিৎ নামে এক হিন্দুরাজা সপ্তগ্রামে রাজত্ব করিতেন। ইনি আন্দুলিয়া গড়ের রাজা সুদর্শন সিংহের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছিলেন।

"শক্রজিৎ রাজার নাম তার অধিকারী।
বিবরিয়ে যত গুণ বলিবারে নারি॥"

মহানাদের ঘনশ্যাম সিংহ সরকার সপ্তগ্রামের ডিহিদার ছিলেন। তৎপুত্র শক্রজিৎ ইহাও দেখিতে পাই।

"সপ্তগ্রামে মৌলিক মিলিল আসি যত।
আর যত কায়স্থ আইল তার তত॥"

দ্বিজ ঘটক চূড়ামণির কারিকা।

মহানাদের সিংহ বংশীয় ভূষণা পরগণার রাজা শক্রজিৎ সিংহের সভাপণ্ডিত রামানন্দ মিশ্রের "কুল দীপিকায়" মহানাদ নগরীর প্রশংসা করিয়াছেন। পুরাতন কাগজ পত্রে রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর দানপত্রে 'সিংহবর্ম্মা চৌধুরী' উপাধি দৃষ্ট হয়।

সপ্তগ্রামের রাজা শক্রজিৎ সিংহের পুত্রের সময়ে সপ্তগ্রাম মুসলমানের অধিকৃত হয়।

সপ্তগ্রাম বিজয়ের পর ১২৯৫ খৃঃ বা ৬৯৮ হিঃ—জাফর খাঁ, শক্রাজতের পুত্র সর্দ্দার বীর বলবান সিংহকে পরাস্ত করিয়া মুসলমানগণকে ধনরত্ন প্রদান করেন এবং বহু হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংস করিয়া একটি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন।

রাজা শত্রুজিতের বংশ পরে সপ্তগ্রাম সন্নিকট কুলীন গ্রামে বাস করিয়া, কুলীন গ্রামে সিংহ সমাজ স্থাপন করেন।

এই সময় সপ্তগ্রামের জমিদার গোবর্দ্ধন সিংহের পুত্র রঘুনাথ সিংহ—মৌদ্গল্য গোত্রীয় সিংহ বংশীয়দের ভূমিদান করিয়া, সরকার সপ্তগ্রামের অন্তর্গত গ্রাম সমূহে বাস করাইয়াছিলেন।

ইন্দ্রনাপুর ও পদ্মনাপুর সরস্বতী নদী তীরে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। স্থানটি জঙ্গলাবৃত হইয়া সপ্তগ্রামের সহিত মিলিত হইয়া যাইতেছে। এই স্থানে ২০ পর্য্যায় রামেশ্বর সিংহ দেহত্যাগ করেন।

পাহাড়পুর, তারকেশ্বর হইতে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এইস্থানে মৌদ্গল্য গোত্র রাজা নয়ন সিংহের ভগ্ন দুর্গের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। রাজা গোবর্দ্ধন সিংহ হুগলী জেলার অন্তর্গত ঘরপুর গ্রামে একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত দুর্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই দুর্গ দাউদখাঁ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় এবং এই স্থানে টোডরমল্লের সহিত দাউদের যুদ্ধ হয়।

এই সময়ে চেতুয়ার মৌদ্গল্য গোত্রীয় সিংহ বংশীয় রাজা রঘুনাথ সিংহ রসদ যোগাইয়া এবং পথ প্রদর্শন করিয়া মোগলের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। চেতুয়ার রাজার এই আচরণে বিরক্ত হইয়া দাউদখাঁ কটক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুবর্ণরেখা নদীর তীরস্থ তুকরুই গ্রামে মোগল-পাঠানের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া উঠিল (১৫৭৫ খৃঃ)।

নানাকারণে আমুলিয়া ও মহানাদের রাজা পৃথ্বীধর সিংহ বঙ্গের বিখ্যাত বীর প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় লয়। বিশ্বাসঘাতকতা ও নানাবিধ অত্যাচারের জন্য প্রতাপাদিত্য মোগল হস্তে নিহত হন; এবং তাঁহার পুত্র প্রতাপভীম মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

অন্যত্র আর এক প্রতাপ ভীমের মুসলমান হওয়া দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালে দত্ত উপাধিধারী রাজা বুদ্ধিমন্ত খাঁ চৌধুরী বারুজীবি জাতি মহানাদে বাসের জন্য ভূমি ক্রয় করিয়াছিলেন। ইনি সুন্দর বনের রাজা

ছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রতাপভীম মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ আজিও খুলনা ও চব্বিশ পরগণায় দৃষ্ট হয়।

ঘটক কারিকায় পাই—রাজা বীরেন্দ্র সিংহের ভয়ে আকবর সর্ব্বদাই কম্পিত থাকিতেন। এই ভয়ের আরম্ভ হইয়াছিল ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে। চৌহাল নদী যেখানে হর বা হুরা সাগরে পড়িয়াছে, সেই স্থানে নৌযুদ্ধে বীরেন্দ্র সিংহ অসংখ্য রণপোত লইয়া ভাটিদেশ হইতে বহির্গত হন ও মোগল সৈন্য বিনষ্টপ্রায় করেন। এই সময় যশোহরের প্রতাপাদিত্য আকবরনামা মতে আকবরের সভাসদ ছিলেন, অর্থাৎ তখনও প্রতাপাদিত্যের প্রাণে দেশ সেবা জাগে নাই। প্রতাপাদিত্য মোগল সৈন্য দ্বারা আনুলিয়ার সিংহ বংশকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ ভূগোল নহে, ইতিহাস। উহাতে ১৫৭০ সনের পরবর্ত্তী কালে যে যে স্থানে আনুলিয়ার সিংহ বংশীয় সন্তানের দ্বারা মোগল সৈন্যের পরাজয় এবং বাদশাহের অধিকৃত দেশ অধিকারের কথা গোপন করা সম্ভব হয় নাই, সেই সেই স্থানে আবুল ফজল ঈশাখাঁ বা তাহার সহকারী (নাম অজ্ঞাত) "বিদ্রোহী কর্ত্তৃক যুদ্ধজয়" বা দেশ অধিকারের কথা বলিয়াছেন। ১৫৮০ সনের পরে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ হইতে এক কপর্দ্দকও রাজস্ব আকবর প্রাপ্ত হন নাই। বাদশাহকে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার নব বিজিত রাজ্য বঙ্গদেশ হইতে বেদখল করিয়া রাখিয়াছিল কে? ইনিই রাজা মহেন্দ্র খাঁ সিংহ।

রাজা মহেন্দ্রখাঁ সিংহ একটি পবিত্র অরণ্য কুসুমের ন্যায় প্রকৃতির অঙ্কে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। মহানাদের এক গৃহকোণে ফুটিয়া থাকিলেও, সৌরভ সম্ভারে গুণ-গরিমায় এই ফুলটি স্বর্গের পারিজাতের সমতুল। স্থির প্রতিজ্ঞ রাজা মহেন্দ্র সিংহ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, পুণ্যভূমি বঙ্গদেশ তমসাচ্ছন্ন ভীতি-ব্যঞ্জক শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

ইনি যদি মুসলমান হইতেন, তাহা হইলে আকবরনামাতে নাম পাওয়া যাইত, আর "তাহার নামে খোদবা পড়া যায় নাই"। ক্ষিতীশ বংশাবলী প্রতাপাদিত্যের শত্রু ভবানন্দ মজুমদারের বংশধরের লেখা, আম্বুলিয়ার সিংহ বংশের শত্রুও বটে। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্য ধুমঘাটে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং তাহার পরে ইসলাম খাঁ তাঁহাকে বন্দী করিয়াছিলেন। "ক্ষিতীশ বংশাবলী" যাহা বলেন তাহা এইরূপ হইতে পারে— "ভবানন্দের সাহায্যে মানসিংহ মহেন্দ্রখাঁ সিংহকে বন্দী করিয়া লৌহ পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং এইরূপ পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় আগ্রার পথে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।" মানসিংহ ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী বীরের ন্যায় আগ্রায় গমন করেন নাই, তিনি জাহাঙ্গীরের আদেশে পদচ্যুত হইয়া এদেশ হইতে গিয়াছিলেন। আবদুল লতিফের ডায়েরী ও বাহারিস্তান মতে আবুল ফজল "অনেক সত্য গোপন করিয়াছেন এবং অনেক কথা মিথ্যা করিয়া বলিয়াছেন।" মহেন্দ্রখাঁ সিংহই দ্বাদশ ভৌমিকের অধীশ্বর ছিলেন কিনা, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে।

"রাজসাহ" নাম হইতে উত্তর বঙ্গের রাজসাহী নাম হয়। মহেন্দ্রখাঁ সিংহ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের পর ক্রমে ক্রমে সমগ্র পশ্চিম বঙ্গ জয় করেন, পাঠানদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য "রাজসাহ" উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ২২ যুদ্ধে জয়ী হন। রাজা মহেন্দ্র সিংহ পরম ধার্ম্মিক নৃপতি ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে সস্ত্রীক দানব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। রাজা মহেন্দ্রখাঁ সিংহ শান্তিপুরে কপিলেশ্বর দেবের প্রতিষ্ঠা কর্ত্তা।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বামনপাড়া নামক মহাস্থানের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া যায়। তাহার একদিকে পাল রাজগণের অক্ষর শ্রীমহেন্দ্র সিংহ (পরাক্রম) ও অপরদিকে কুমার গুপ্ত লিখিত আছে। বাঁশবেড়িয়া নিবাসী পরেশ নারায়ণ সিংহ বলিতেন,—আম্বুলের সিংহ বংশ মহেন্দ্র সিংহের বংশ।

রাজা মহেন্দ্র খাঁ সিংহ ৪০০শত রণতরী সহ তাঁহার আত্মীয় সংগ্রাম সিংহকে গঙ্গার মোহানায় রাখিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে সংগ্রামসিংহ যুদ্ধে পরাজিত হইতে লাগিলেন। যে পর্য্যন্ত তাঁহার আন্দুলিয়ার প্রাসাদ-দুর্গের দ্বার পর্য্যন্ত না আসিয়াছিলেন, সে পর্য্যন্ত তিনি অসি হস্তে মোগল ও স্বজাতি কতিপয় হিন্দু জমিদার শত্রুর পথরোধ করিয়াছিলেন, তারপর তিনি শত্রুর হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন। এই সময় বোধ হয়—তিনি মাতৃভূমিকে বলিয়াছিলেন—"My mother! I could not love thee so much loved I not honour more!" বাঙ্গালী কি এই ভস্মাচ্ছাদিত অমূল্য রত্নগুলি মহানাদের ভস্মস্তূপ হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিবেন না।

অতি গৌরবান্বিত মোগল বাদসাহদিগের ১০০ বৎসরের শাসনে সমস্ত দেশ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইলে, শোভাসিংহ উঠিয়াছিলেন। যে সময় শোভাসিংহ জন্মভূমি উদ্ধার কল্পে অস্ত্র ধারণ করেন, সেই সময় এই দেশের সর্ব্বত্র মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণ জলপথে এই প্রদেশ লুণ্ঠন করিত। তাহারা হিন্দু পুরুষ ও রমণীদের ধরিয়া লইয়া যাইত। উহারা বন্দীদিগের হাতের তালু ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সরু বেত চালাইয়া দিত এবং এই ভাবে হালি গাঁথিয়া হতভাগ্যদিগকে তাহাদের জাহাজের পাটাতনের নিম্নে একটির উপর আর একটি রাখিয়া স্তূপিকৃত ভাবে বোঝাই করিয়া লইয়া যাইত। লোকে যেমন কুক্কুটাদি পক্ষীর খাদ্যের নিমিত্ত শস্য ছড়াইয়া দেয়, সেই ভাবে বন্দীদিগের খাদ্যের নিমিত্ত অসিদ্ধ তণ্ডুল মুষ্টি নিক্ষেপ করিত। এই দুর্দ্দিনের সময় শোভাসিংহ যখন অস্ত্র ধারণ করিলেন, হিন্দু জমিদারেরা একজোট হইয়া তাঁহাকে গুপ্তহত্যা করে ও এই বীর যুবকের নামে মিথ্যা কথা প্রচার করিতেও লজ্জা বোধ করে নাই। এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনারা বঙ্গদেশের সম্রাট ঔরঙ্গজীবকে উপরে স্থান দিবেন—না রাজা শোভা সিংহকে?

শোভাসিংহ যদি বৰ্দ্ধমান রাজকুমারীকে সত্য সত্যই বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল কখনও প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে ইহা জানিও,—পুরুষ মানুষ নারীর ছলনা বুঝে না, সরল প্রাণেই নারীর কুহকে ঝাঁপ দেয়।

চিতুয়া বরদার শোভাসিংহকে হত্যা করিতে এক ভীষণ গুপ্ত কাহিনী ছিল। লিখিত বিবরণ না থাকায়, হাণ্টার সাহেবের গল্পই দেশে ইতিহাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সময় হিন্দু জনসাধারণ সর্ব্বদাই পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদে নিযুক্ত থাকিয়া স্বার্থপরতা, হিংসা ও পরশ্রী কাতরতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্তস্থল হইয়া উঠিয়াছিলেন। শুধু শোভাসিংহের হত্যা নয়, এইরূপ স্বজাতি বীরের হত্যায় দেশ রঞ্জিত হইত। সেই সময়কার নারকীয় দৃশ্য দেখিয়া আপনাদের মস্তক ঘুর্ণিত হইবে, দেহ রোমাঞ্চিত হইবে, প্রতিহিংসার জ্বালা হৃদয়ে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে, শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইবে, হৃদয় মধ্যে রণ-রঙ্গিনী চণ্ডীর আবির্ভাব হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাৎকালিক শক্তিমান বঙ্গবাসীগণের উপর দুর্ব্বিসহ ঘৃণা আসিয়া আপনাদের মস্তক অবনত করিয়া দিবে, অসহ্য দুঃখে আপনাদের অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিবে, হিন্দু সমাজ ও হিন্দু জাতির অবস্থা দেখিয়া ক্রোধে, দুঃখে, লজ্জায় আত্মহারা হইয়া যাইবেন।

বিশ্বাস ঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ ভবানন্দ মজুমদার, কৃষ্ণরাম রায়, দেবীসিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রভৃতি জায়গীর ও প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন।

বাৎস্য গোত্রীয় গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে ভীষণ ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যে অত্যাচারের প্রতিবিধান জন্য মহারাজের দেওয়ান মৌদ্গল্য গোত্রীয় কালীপ্রসাদ সিংহকে মণিকার সাজিয়া লর্ড হেষ্টিংসের পত্নীর নিকটে গুপ্তভাবে যাইয়া একছড়া বহুমূল্যের

মণিময় মালা উপহার দিতে হইয়াছিল, সে সকল বৃত্তান্ত "ক্ষিতীশ বংশাবলী"তে বিস্তারিত ভাবেই বর্ণিত আছে।

সামান্ত তেলিয়াগড়ী দুর্গ অধিকার করিতে মহানাদের সিংহরাজ-বংশকে বিধ্বস্ত করিয়া সাজাহান হুগলী জেলার বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সাজাহান এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে বাঙ্গলার অধিকাংশ জমিদার ও রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহার পক্ষভুক্ত হইল। অনন্তর সাজাহান মহানাদ ও আম্লুলিয়া অধিকার করিয়া রাজকোষ লুণ্ঠন করিলেন।

বঙ্গেশ্বর দাউদ খাঁ মোগলগণকে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য প্রবল শক্তি সঞ্চয় করেন। তাঁহার এই সাহায্যের জন্য আম্লুলিয়ার ধরাধর সিংহ ওরফে শ্রীধর (রায়) নিযুক্ত হন। ধরাধর সিংহের পরামর্শে দাউদ লোদীখাঁকে বন্দী ও নিহত করেন। বিহারের রাজা গজপতি রায়ের প্রতি খান আলামকে সাহায্য করিবার আদেশ দিয়া, হাজিপুর আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিলেন। হাজিপুরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দাউদ খাঁ আম্লুলিয়ায় পলাইয়া আসিলেন। শ্রীধর রায় দাউদ খাঁ কর্ত্তৃক রাজা বিক্রমাদিত্য পদে সম্মানিত হইয়াছিলেন। দাউদের পলায়নের জন্য পাটনা জয়ই মোগলগণের বঙ্গ বিজয় হইয়া গেল।

পানিপথের দ্বিতীয় সমরে মোগল আকবর, দিল্লীর হিন্দু সম্রাট সুবর্ণ বণিক বংশীয় হিমু বা হেমচন্দ্র দেবকে * পরাস্ত করিয়া হিন্দু-বীর্য্য-বহ্নি এক প্রকার নির্ব্বাপিত করিয়া ফেলিল। তাহার পর হিন্দুরা এত অধিক গোলামে পরিণত হইয়াছিলেন যে, আকবরকে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো" বলিয়া জগদীশ্বরের সহিত সমান আসন প্রদান করিতেন। আম্লুলিয়ার রাজা কাশীনাথ সিংহ বল সঞ্চয় করিয়া বহুদেশ আকবরের অধীনতা-পাশ

* হিমুর প্রকৃত নাম হেমচন্দ্র। ইনি রাজপুতনার ভার্গববংশে জন্মগ্রহণ করেন। ভার্গববংশ আপনাদিগকে জামদগ্নির বংশ বলিয়া পরিচয় দেন।

হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। সমস্ত বঙ্গদেশ পুনরধিকার করিবার জন্ত তিনি হিন্দু রাজগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেও কোন রাজাই কাশীনাথকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হয়েন নাই। ইহাই আমুলিয়ার পতনের প্রধান কারণ হইল।

আকবরের সময় আমুলিয়া 'বাল্‌ঘাক খানা' বা বিদ্রোহের আড্ডা বলিয়া বিবেচিত হইত। মানসিংহ চাকদহ নগরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া আমুলিয়ার সিংহদের উচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া উত্তর রাঢ় ও বারেন্দ্রের কলিতা জাতিদের হস্তগত করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হন। আকবর বিদ্রোহী হিন্দুগণকে ক্ষমা করিলেন, এই অভিমত প্রচার করিয়া, রাজা কাশীনাথ সিংহকে হস্তগত করেন।

এদিকে দাউদ খাঁ তেলিয়াগড়িতে পৌছিয়া ঈশান খাঁ সিংহকে উক্ত গিরিপথ রক্ষার্থে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়া রাজধানী টাঁড়ায় * গমন করিলেন। দাউদ খাঁ তাঁহার দুই বিশ্বস্ত বন্ধু শ্রীহরি ও জানকীবল্লভকে বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় উপাধি দিয়া ও তাঁহাদিগকে বিস্তর ধন রত্ন দান করিয়া দক্ষিণ প্রদেশে গিয়া বাস করিতে উপদেশ দিলেন। রাজা টোডরমল্ল মান্দারণের নিকটে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে, দাউদ খাঁ ঋণকেশরীতে অবস্থান করিয়া আপন বিক্ষিপ্ত সেনাদলকে একত্রীভূত করিতেছেন। দাউদ খাঁ আমুলিয়ার সিংহ বংশের সাহায্যের আশা করিয়া মেদিনীপুর হইতে মান্দারণে সরিয়া আসিলেন। আমুলিয়ার নিকটবর্ত্তী স্থান মোগল পাঠানের রণভূমে পরিণত হইল। পৃথ্বীবর সিংহ মোগল সেনাপতি মানাইম খাঁকে তিন মাইল পথ তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। এমন সময় বিশ্বাস ঘাতক হিন্দুসৈন্ত মোগল পক্ষে হইয়া পশ্চাৎদিক হইতে, প্রধাবিত পাঠান সৈন্ত সহ পৃথ্বীবর সিংহকে আক্রমণ

* ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মোগলরা বঙ্গদেশ জয় করে। ১৫৭৬—১৫০২ খৃঃ বঙ্গের রাজধানী টাণ্ডা নগরে (টাঁডা বা টাঁড়ায়) স্থানান্তরিত করা হয়।

করিয়া সমস্ত সৈন্যদলকে শেষ করিয়া ফেলিল। শেষে মোগল সেনার বিক্ষিপ্ত শরে বীর শার্দ্দুল পৃথ্বীবর সিংহ প্রাণ হারাইলেন (১৫৭৬ খৃঃ)* আইন-ই-আকবরীতে উক্ত হইয়াছে রাজা পৃথ্বীবর (সিংহ) ৬৫ বৎসর (রাজা সৃষ্টিধর ৫৮ বৎসর) রাজত্ব করেন।

এই সময়ে রাজা টোডরমল্ল অনুলিয়ার চতুর্দ্দিকে লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। দাউদ ভয়ে রণস্থল ও রণশিবির পরিত্যাগ করিয়া কটকের দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোগল সেনাগণ আনুলিয়ার দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল। তখন কাশীনাথ সিংহ অন্য উপায় না দেখিয়া বিজেতার নিকটে আত্মসমর্পণই প্রকৃষ্ট উপায় বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ খান খাননের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। প্রত্যুত্তরে রাজা টোডরমল্ল—রাজা কাশীনাথকে জানাইলেন যে, "এই যুদ্ধে আমি বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি, যেহেতু ইহাতে আপনার ন্যায় উপযুক্ত ও মহানুভব সেনাপতি আহত হইয়াছেন।" ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে দাউদ খাঁ কাশীনাথ সিংহের সাহায্যে পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন।

খুলনা জেলায় সাতক্ষীরা মহকুমার রাজা ঈশ্বরী সিংহের স্থাপিত ঈশ্বরীপুর স্থানে প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী আজিও বিরাজ করিতেছেন। এই প্রতাপাদিত্যের চক্রান্তে বঙ্গবীর রাজা কাশীনাথ সিংহ রায় ওরফে সমররাম সিংহ নিহত হন, এবং রাজা ঈশ্বরী সিংহের স্থাপিত ঈশ্বরীপুর প্রতাপাদিত্য দখল করেন। সুচতুর টোডরমল্ল দিল্লী হইতে সৈন্য সাহায্য প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার সৈন্যসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিবার মানসে বঙ্গদেশস্থ জমিদারবর্গের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন। তাহার ফলে তদানীন্তন নদীয়ার অন্তর্গত আনুলিয়ার চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গস্বামী রাজা

* অন্যত্র কথিত হইয়াছে,—১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে আনুলিয়ার রাজা পৃথ্বীধর সিংহ ব্রাহ্মণ বংশীয় কালাপাহাড় কর্তৃক নিহত হন।

কাশীনাথ টোডরমল্লের সহিত মিলিত হন, এবং মোগলের পক্ষ হইয়া পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে অতুল বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ইহা এক্ষণে চৌবেড়িয়া নামে খ্যাত। ইহা গোপাল নগর ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গুণগ্রাহী আকবর, সেনাপতি রাজা টোডরমল্লের নিকট বঙ্গবীর কাশীনাথ সিংহ রায়ের অসাধারণ যুদ্ধ কৌশল ও অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী শ্রবণ করিয়া এবং পাটনা অবরোধের সময় স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিয়া পাটনা অধিকারের পর প্রকাণ্ড দরবারে রাজা কাশীনাথ সিংহ রায়কে "সমর সিংহ" এই গৌরবজনক উপাধি, বাদশাহী ঝাণ্ডা, নাগরা, পাল্কী ও অশ্ব গজাদি প্রদান পূর্ব্বক নানারূপে সম্মানিত করেন। মহা বীর্য্যশালী রাজা সমর সিংহের শেষ জীবন অতি শোকাবহ। কুলী খাঁ ও সমর সিংহের কতিপয় কৃতঘ্ন কর্ম্মচারী সমর সিংহের সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য এক ভীষণ ষড়যন্ত্র করে। প্রতাপাদিত্যের চক্রান্তে রাজদ্রোহ অপরাধে তদানীন্তন বঙ্গের সুবেদারের অদ্ভুত বিচারে সমর সিংহের শিরশ্ছেদন হইয়াছিল।

রাজা কাশীনাথ সিংহ মোগল পক্ষে যাওয়ায় আকবর তাঁহাকে জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বহু অর্থব্যয়ে গোমতীর উপর যে প্রকাণ্ড ও প্রশস্ত সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা দর্শক বৃন্দের চক্ষে যেন নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

তারিখ-ই-দাউদীর মতে ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে (রাজা কাশীনাথ সিংহ রায়ের) মোগল বাহিনীর তোপে কালাপাহাড় রাজচন্দ্র রায়ের জীবলীলা শেষ হয়। কালাপাড়ের ভীষণ অত্যাচার ধর্ম্মপ্রাণ বঙ্গ ও উৎকলবাসীর প্রাণে গুরুতর আঘাত করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সকলেরই হৃদয়ে একটি জ্বালাময়ী আকাঙ্খা জাগিয়াছিল; কিন্তু উপযুক্ত শক্তি সামর্থ ও সহায় সম্পদের অভাবে পাঠান সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে কেহ সাহসী হয় নাই।

দাউদ ৫০,০০০ অশ্বারোহী যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া, টাঁড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সসৈন্যে আকমহল বা রাজমহলে উপস্থিত হইলে, রাজা কাশীনাথ সিংহ তাঁহার দলভুক্ত হইলেন। পরে ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত হইলে, খানজাহানের আজ্ঞাক্রমে মহাবীর কাশীনাথ সিংহের ও বঙ্গেশ্বর দাউদ খানের ছিন্ন মস্তকদ্বয় আকবরের সমীপে প্রেরিত হইল। ২৩৬ বৎসর রাজত্বের পর, দাউদ খানের সঙ্গে সঙ্গে আন্দুলিয়ার সিংহ বংশের রাজ সূর্য্য অস্তমিত হইল। দাউদ খাঁন দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন।

এই ঘটনার অল্পকাল পরে, অনেক জায়গীরদার বিদ্রোহীদলে মিলিত হইয়া সকলে গৌড় নগর অধিকার করিল। ক্রমে বঙ্গের সমস্ত জায়গীরদার বিদ্রোহীগণের পতাকা-নিম্নে সম্মিলিত হইয়া বিদ্রোহের তুমুল বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিল এবং মোগলের রাজকোষ লুণ্ঠন আরম্ভ করিল (১৫৮০ খৃঃ বা ৯৮৮ হিঃ)।

মহেন্দ্র খাঁ অল্পকাল মাত্র সরকার সলিমাবাদের ডিহিদার ছিলেন ও ৩৬ পরগণার মালিক ছিলেন। আন্দুলিয়া মোগল কর্তৃক বিধ্বস্ত হইলে তিনি আন্দুলিয়া হইতে মহানাদ, পরে নতিবপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। মাধব খাঁ বিদ্রোহী দলে যোগ দেন নাই, তাঁহার

* বর্ত্তমান অন্দুলিয়া গ্রাম, রাজা নরেন্দ্র রায় প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপন করেন। প্রাচীন আন্দুলিয়া আকবরের সময় মোগল সৈন্য কর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ঐ রাজা নরেন্দ্র রায়, কৃষ্ণনগর রাজবংশীয় ছিলেন। তাঁহার বংশধর শ্রীযুক্ত পুলিন গোপাল রায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিরোদ গোপাল রায় বর্ত্তমান আন্দুলিয়ার জমিদার আছেন। তাঁহাদের দৌহিত্র সন্তানগণ আন্দুলিয়া গ্রামে বাস করেন। সিংহীপোঁতা হইতে প্রাপ্ত বৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরের বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, একটি শিবলিঙ্গও পাওয়া যায়, উহা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালেও সিংহীপোঁতা পরম রমণীয় স্থান, এইরূপ বৃহৎ ভগ্নগড় নদীয়া জেলায় আর নাই।

পুত্রেরা দিয়াছিলেন। বসুয়া নিবাসী রায় নিত্যানন্দ বলেন যে, তাঁহারা নতিবপুর হইতে বসুয়া বাস করেন। মাধব খাঁ প্রথমে চিংড়ে নতিবপুরে, পরে মহানাদে বাস করেন। তাঁহার পুত্র শিবানন্দ সিংহ চৌধুরী মহানাদ ত্যাগ করিয়া "শ্রীশ্রী রাধা গোবিন্দ জীউ" শালগ্রাম সহ বসুয়া গ্রামের অধিপতি হইয়া বাস করিতে থাকেন। তিনি নিজ নামে একটি গ্রাম ও পিতৃদেবের নামে একটি গ্রাম হুগলী জেলায় নির্ম্মাণ করেন। শিবানন্দ সিংহ চৌধুরী বিক্রমপুর (আরামবাগ) অঞ্চলে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির পুনঃ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতিত তিনি অনেকানেক গ্রামে মন্দির প্রতিষ্ঠা ও ভগ্ন মন্দিরের সংস্কার করিয়া দিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা (ক্ষেত্র মোহন সিংহ ?) রাজা শিবানন্দ সিংহকে নিহত করিয়া "গারো পরগণা" কাড়িয়া লয়েন।

মহেন্দ্র খাঁ মহানাদে আগমন করিয়া তথায় সিংহসমাজ স্থাপন করেন সত্য। কিন্তু আন্দুলিয়া হইতে আগমন করিয়া সিংহবংশীয়গণ একাধিক ব্যক্তি নতিবপুর অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন, তাহা নতিবপুর অঞ্চলের চতুর্দ্দিকে বিশাল ধ্বংসস্তূপ দেখিলে সত্য বলিয়া মনে হয়। চিংড়ে ও নতিবপুর গ্রাম দুইখানি দেখিলেই মনে হয়, এক সময় এই স্থানে সিংহবংশীয়গণ বহুসংখ্যক আসিয়া বাসস্থান করিয়া থাকিবেন।

১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যুর পর, মোগল সাম্রাজ্যে কে সম্রাট হইবেন, ইহা লইয়া দিল্লীতে সামান্য গোলমাল উপস্থিত হইলে, মহানাদের রাজা মহেন্দ্র খাঁ সিংহ পুনরায় মোগল শক্তিকে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতে ক্ষান্ত হন নাই।

মোগল পাঠানের লুণ্ঠনের রাজ্যে রাজা মহেন্দ্র খাঁ সিংহের সময় রাঢ়দেশে দুর্দ্ধর্ষ পর্টুগিজ-শক্তি প্রবল হইয়া দুর্ভাগ্য হিন্দুজাতির উপর যথেচ্ছ অত্যাচারের অবকাশ পাইয়াছিল। ইহাদের মহেন্দ্র খাঁ বোম্বেটে

নামে পরিচিত করেন। যুবতী নারী দেখিলেই এই বোম্বেটেরা ধরিয়া লইয়া যাইত, তাহাদের আর পরিত্রাণের উপায় থাকিত না।

মহেন্দ্রখাঁ সিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পর হইতেই গৃহ-বিবাদ-বহ্নি নির্ধূমভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সকলেই স্বীয় স্বীয় প্রাধান্ত বিস্তারে ব্যস্ত হইলেন। শান্তির কোমল কুসুমে অশান্তি-কীট ধীরে ধীরে প্রবেশ পূর্ব্বক আবাসস্থান স্থাপন করিল।

বর্দ্ধমান জেলার পাটুলীর ব্রাহ্মণ রাজবংশের সাহায্যে ও পুঁটিয়ার দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বিশ্বাস ঘাতকতায় মুর্শিদকুলি খাঁ মহানাদের রাজা পূরণ খাঁ সিংহকে বন্দী করিতে সক্ষম হন। সমুদ্রগড়ের ব্রাহ্মণ রাজবংশ পূরণ খাঁকে বিদ্রোহে সাহায্য করেন। বর্ত্তমান ভাস্তাড়ার নিকট গুড়োপ গ্রামে কাশ্যপ গোত্রীয় সিংহ ও নাগবংশ পূরণ খাঁর সাহায্যে অগ্রসর হইয়াই সর্ব্বস্বান্ত হন। পাটুলীর ব্রাহ্মণ রাজবংশের শেষ বংশধর নিহত হইলে, এই বংশের নাম ইতিহাসে লুপ্ত হইল এবং "দেবরায়" উপাধির এক কায়স্থ বংশ তথাকার রাজা হইলেন।

১৭৪০—১৭৬১ অব্দ পর্য্যন্ত মারহাট্টাগণের উপদ্রবে বাঁশবেড়িয়ার সিংহবংশের পতন হয় এবং পাটুলীর দেবরায় বংশ আসিয়া তথায় বাস করিয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠার সুযোগ প্রাপ্ত হন। এই উভয় বংশের বংশাবলীর সহিত সময়ের ঠিক ঐক্য হয় না। মহানাদ হইতে রাজা রামেশ্বর সিংহ বর্গীর হাঙ্গামার বহুপূর্ব্বে বাঁশবেড়িয়ায় দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহাই সিংহবংশের কাগজে পাওয়া যায়। পাটুলীর রাজবংশের যে বংশাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে জানা যায় বর্গীর হাঙ্গামার সময় রামেশ্বর দেব রায় পাটুলী হইতে বাঁশবেড়িয়ায় আসেন ও বাঁশবন কাটিয়া রাজধানী স্থাপন করেন। উভয় বংশেরই আদি পুরুষ রামেশ্বর। অবশ্য ইহা প্রমাণিত হয় যে, বর্গীর হাঙ্গামার সময়েই সিংহ বংশের পতন ও রায় বংশের অভ্যুত্থান। বাঁশবেড়িয়ার সিংহ বংশের

রাজবাটী ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের প্রবল ঝটিকা ও ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু দেব রায় বংশের অক্ষয় কীর্ত্তি তেরটি চূড়া বিশিষ্ট ৺ হংসেশ্বরীর সুরম্য মন্দির তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় দিতেছে। এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন রাজা নৃসিংহ দেব রায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর সমাপ্ত করেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী শঙ্করী (১৮১৪—১৫ খৃঃ)। রাজা নৃসিংহ দেব রায় কতিপয় বৎসর কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে আসিয়া বাঁশবেড়িয়ার মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে মনোযোগী হন। তাঁহার কাশীবাস সময়ের একটি কবিতা পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার নিবাস বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়া বলা হয় নাই। সে কবিতাটি—

"সোণাভাণি কুলে জন্ম পাটুলী নিবাস।
রাজা নরসিংহ দেব করে কাশীবাস॥"

মহানাদের রাজা পূরণখাঁ সিংহ, রাজা মহেন্দ্রখাঁ সিংহ, রাজা শোভা সিংহ বিপ্লবী ছিলেন। জাতির হৃদয়ে যখন জাতীয় ভাব প্রদীপ্ত হয়, তখন সপ্তসিন্ধুর সম্মিলিত সলিলেও তাহা নির্ব্বাপিত হয় না—হইতে পারে না। তাহা জাতি সযত্নে রক্ষা করে—ত্যাগের বন্ধনে দেশাত্মবোধের অনল প্রজ্বলিত রাখে। রাজা শোভাসিংহ মহানাদ হইতে ধনতন্ত্রতার শেষ চিহ্নও মুছিয়া ফেলিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। শোভাসিংহের বিপ্লব ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেদিন যে হোমানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা নির্ব্বাপিত হইবার নহে। শোভাসিংহ বিদ্রোহী নহেন। আজ সমগ্র পৃথিবীতেই কি বিপ্লব দেখা দেয় নাই? মুক্তি বাসনা জীবের পক্ষে স্বাভাবিক—মানুষের তাহা ধর্ম্ম। শোভাসিংহের কামনা যদি অপরাধ হয় (বর্ত্তমান ঐতিহাসিক লেখকগণের মতে বটে), তবে স্বদেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত মানব সকলেই অপরাধী।

আজ বড় জোর চক্ষের জল দিয়াই মহানাদের অতীত সিংহরাজগণের স্মৃতি তর্পণ করা হইতেছে, কিন্তু আজ মানুষ চাই, যাহারা বুকের রক্ত

দিয়া মহানাদের স্মৃতি তর্পণ করিবে,—সিংহের স্বপ্নকে, সিংহের নির্দ্দেশকে কার্য্যে পরিণত করিবে। যেদিন তাহা সম্ভব হইবে, সেদিনই স্বাধীনতার পুরোহিত মহানাদের অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্ত হইবে। হাজার জনের মাঝে যার মানুষের মত বাঁচিবার অধিকার নাই, তাহার হাসিমুখে মরণ-বরণও একটা গৌরব—এ একটা বীরত্ব। আর সেই মূল্য দিয়াই সে জাতিকে বাঁচাইবার অধিকার দিয়া যায়—মানুষের মাঝে মানুষের—মত।

শোভাসিংহ তাঁহার জীবন দিয়া সমগ্র পৃথিবীর চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন,—অন্তরের অন্তস্তলে যখন স্বাধীনতার অত্যুগ্র বাসনা জ্বলিয়া উঠে, তখন যেমন মাতার অশ্রুজল, প্রিয়ার হতাশ্বাস, বিচ্ছেদের হাহাকার, তাহার প্রলয়-পথিক মনকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না, তেমনি তাহাকে আলো বাতাসহীন নির্জ্জন কারাগারে চিরবন্দী করিয়া বা ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া দিয়া তাহার সেই উন্মত্ত মনকে কখনও টুঁটি টিপিয়া মারা যায় না। আর মরণেই যে পরাজয় তা নয়,—চরম ব্যর্থতার মাঝেও চূড়ান্ত সার্থকতা নামিয়া আইসে।

খৃষ্টাব্দ ১৩৪০ পর্য্যন্ত বঙ্গে পাঠানেরা দিল্লী মহানগরী হইতেই এই হতভাগ্য রাঢ়দেশে দস্যু প্রেরণ করিয়া লুণ্ঠনাদি নরহত্যা সম্পন্ন করিত এবং গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী নগরীই বাঙ্গলার রাজধানী ছিল। রাজা বিজয় সিংহের সময়ে বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়।

১। গৌড়।

২। সোণারগঞ্জ।

তখন ঢাকা সহর একটি ক্ষুদ্র পল্লী মাত্র ছিল। এই গ্রাম "ঢাকেশ্বরী" বিগ্রহের নাম হইতে উৎপন্ন হয়। প্রকৃত সোণারগাঁ যে রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার শত শত প্রমাণ থাকা সত্বেও ঐতিহাসিকেরা রাঢ় দেশের ইতিহাস কখনও লিখিবার চেষ্টা করেন নাই। মহম্মদ তোঘলকের শাসন কালে কাদের খাঁ গৌড়ে, এবং বেরাম খাঁ সোণারগাঁয়ে বসিয়া

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম লুণ্ঠন করিতেছিলেন। গঙ্গারাম সিংহ নামক এক যুবা এই সময় রাঢ়দেশ শাসন করিতেন ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে বেরাম খাঁর মৃত্যু হয়। এই সময় তোঘলকের খামখেয়ালীর তাণ্ডব নর্ত্তনে সাম্রাজ্যবাসী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তখন মহানাদের রাজার পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহে পাঠানদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল। এই সময় দিল্লী হইতে দৌলতাবাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সর্ব্বত্র নরমেধ যজ্ঞের লোমহর্ষণ কাণ্ড মহানাদে অনুষ্ঠিত হইতেছিল। মহানাদের রাজাকে হত্যা করিতে সেকেন্দার শাহ মহানাদ অধিকার করিয়া লইল। আম্লুলিয়ার রাজা যথা সময়ে এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন,—কিন্তু তিনি বুদ্ধির দোষে নানাভাবে বিপন্ন হইয়া, মহানাদ উদ্ধার করিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার পুত্রকে এই মর্ম্মে পরওয়ানা পাঠাইলেন যে, বরাটের জয়রাম গুহরায়ের উচ্ছেদ পূর্ব্বক তাহার ছিন্ন মস্তক আম্লুলিয়ায় প্রেরণ করিবে। বিপুল শক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজপুত্র বরাটগড় আক্রমণ করিলেন। মহানাদের সীমান্তে বড় রকমের একটি যুদ্ধ হইল। মহানাদ বিজয়ী সিংহ-শাবকের অধিকারে আসিল। ইতিমধ্যে বিদ্রোহীসেনাগণ সহসা দুর্গমধ্যে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আলি মুবারক মহানাদ লুণ্ঠন করিল। আবার এক তুমুল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে মহানাদের সিংহ-দুর্গ প্রাসাদ চূর্ণ হইয়া গেল। বাঙ্গলার ইতিহাসে মহানাদ—আম্লুলিয়ার মিলিত শক্তির রাজত্ব নিষ্ঠুরভাবে আহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। হিন্দুজাতি নিজেদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য নিজেদেরই ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিল।

মুসলমানেরা মহানাদ দুর্গে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিল, দুর্গ ভস্মীভূত হইয়া গেল। মহানাদ সিংহ-দুর্গের একাংশ প্রস্তর নির্ম্মিত ছিল। এখনও দুর্গের পূর্ব্বাংশে ভগ্নস্তূপের মধ্যে রাশি রাশি প্রস্তর চূর্ণ পতিত রহিয়াছে। প্রস্তরে অগ্নিসংযোগ হইলে ফাটিয়া চটা উঠে। কারুকার্য্য-

খচিত ঐ সকল ভগ্ন প্রস্তরখণ্ড দেখিয়া এখনও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে।

এ দেশের পুরাণের কথা—সমুদ্রের পরপার হইতে "রত্নসৌধ কিরীটীনী" স্বর্ণ লঙ্কার উদয়াস্ত ভাস্কর কিরণ সমুজ্জ্বল শোভা দেখিয়া যখন শ্রীরামচন্দ্রের যোদ্ধৃগণও মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তখন যুগাবতার ভগবান রামচন্দ্র ভ্রাতা লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"স্বর্ণময়ী লঙ্কার চেয়ে আমার জন্মভূমি ভাল"।

"মুর্শিদাবাদ কাহিনী" "কলিকাতার একাল ও সেকাল" গ্রন্থ প্রণেতারা জানিত না যে, দেশকে জননীর মত জ্ঞান করিতে—চিন্ময়ী মাকে মৃন্ময়ীরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া পূজা করিতে ভারতবাসী অভ্যস্ত, তাই তাহারা শোভা সিংহকে গালাগালি করিতেছে।

হিন্দু বিশ্বাসঘাতক জমিদারদের দ্বারায় মহানাদের সিংহরাজবংশ পুনঃ পুনঃ বিধ্বস্ত করিয়া আরঙ্গজীব হুগলী জেলায় প্রকৃত মোগল অধিকার সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন।

শোভাসিংহ যখন দেশোদ্ধারের ব্রত লইয়া সমগ্র দেশে এক বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, সে সময় ভূরশুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ, দেশোদ্রোহী বর্দ্ধমান রাজ ও কৃষ্ণনগর রাজকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলে নতিবপুরের রাজা দাতারাম সিংহ ভূরশুট আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। শোভাসিংহ—সপ্তগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে জ্ঞাতিগণের সাহায্য পাইয়া হুগলী অবরোধ পূর্ব্বক পর্টুগিজ* দস্যুদের অত্যাচার বন্ধ করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

যাহা হউক, বিশ্বাসঘাতক স্বজাতীয় হিন্দুদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শোভাসিংহের মৃত্যু হয়। বিদ্রোহীগণের অধিকৃত জমিদারী, জায়গীর

*শক্তিগড়ের রাজার সহিত ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে পোর্টুগিজ গবর্ণর এক সন্ধি বন্ধন করেন।

প্রভৃতি পূর্ব্বাধিকারীগণের কিম্বা নূতন লোকের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া আজিমুখান্ প্রচুর ধনসঞ্চয় করিলেন। আজিমুখান্ ঢাকায় গমন করিলে দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক হিন্দু জমিদারগণ দেশ লুণ্ঠন করিতেছিলেন।

মুর্শিদকুলি বঙ্গদেশে আসিয়া বঙ্গের জায়গীরদারগণের সমস্ত জায়গীর উড়িষ্যায় পরিবর্ত্তন করিলেন।

মুরাদ মহানাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের হিন্দু দেবালয় চূর্ণ করিয়াছিলেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ,—কয়েকজন রাজভক্ত গোলাম হিন্দুর সাহায্যে বঙ্গের অর্দ্ধ স্বাধীন জমিদারকুলকে ধ্বংস করিয়া তিনি কিরূপে হিন্দুশক্তির নাশ ও বঙ্গে মুসলমান শক্তির সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেন, তাহার বিবরণ মহানাদের রাজবংশের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত ও লুক্কাইত আছে।

হুগলীর ফৌজদার আসানুল্লা খাঁ (আশানুল্লা খাঁ) সপ্তগ্রাম সরকারের উত্তর পূর্ব্ব দিগবর্ত্তী টুঙ্গী স্বরূপপুরের জমিদার বৃদ্ধ রাজা রামচন্দ্র সিংহকে বন্দী করিয়া মুরশিদাবাদে পাঠান। এই সময় আমুলিয়ার সিংহবংশের রাজত্ব টুঙ্গী নগরে লোপ পাইল।

পশ্চিম বঙ্গে বর্দ্ধমানের কপূরবংশ প্রকাণ্ড জমিদারী লাভ করিয়া মহানাদের সিংহবংশের উচ্ছেদ করিতে লাগিলেন। নবাব মুরশিদকুলি খাঁ মহানাদ সিংহরাজবংশীয় ভূপতিগণকে শাসন করিবার জন্য কীর্ত্তিচন্দ্রকে প্রেরণ করেন।

কীর্ত্তিচন্দ্র হুগলীর ফৌজদারের সহিত মিলিত হইয়া সদলবলে বর্ত্তমান তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ছাওনাপুর দুর্গ অবরোধ করিলেন। বসুয়া নিবাসী রাজা রামেশ্বর সিংহ তখন এই দুর্গের মালিক ছিলেন। রামেশ্বর সিংহ শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইলেন। এখনও দুর্গ পরীখার একস্থান 'গর্দ্দান হানা' নামে কথিত হয়। এই দুর্গস্বামী যুদ্ধ করিতে করিতে নিহত হন।

রাজবলহাটে তথাকার সিংহবংশীয়গণের এক সেনানিবাস ছিল। ভূরিশ্রেষ্ঠের ব্রাহ্মণ রাজার বিশ্বাসঘাতকতার জন্ম রাজবলহাট বিধ্বস্ত হয়। সিংহবংশীয় সন্তানদের নিহত ও ধনরত্নাদি লুণ্ঠিত করিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র ভূরিশ্রেষ্ঠ আক্রমণ করিলেন। পেঁড়ো, গড়ভবানীপুর ও দোগেছের গড় হস্তগত করিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র মথুরাবাটীর সিংহবংশ আক্রমণ করিলেন। নস্করডাঙ্গার দুর্গে সিংহবংশকে উচ্ছেদ করিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র—মুরশিদ কুলি খাঁর প্রিয়পাত্র হইলেন। তৎপরে মুরশিদ কুলির আদেশে ও সাহায্যে কীর্ত্তিচন্দ্র চন্দ্রকোণাধিপতির* রাজ্য আক্রমণ করেন এবং রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেন। তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী বলগড় নামকস্থানে সিংহবংশীয় এক রাজা রাজত্ব করিতেন। বলগড়ের রাজা গোবিন্দসিংহ মুরশিদ কুলির বন্দোবস্ত মত বর্দ্ধিত রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় ইহার রাজ্য কাড়িয়া লইবার জন্য কীর্ত্তিচন্দ্র সসৈন্যে প্রেরিত হন। তুমুল যুদ্ধে বলগড়রাজ পরাস্ত ও নিহত হইলে তাঁহার রাজ্যও বর্দ্ধমানাধিপের জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত হয়। অনুগত হিন্দুর সাহায্যে স্বাধীনচেতা শক্তিমান হিন্দুর দলনই মোগলদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সে কথাটি বুঝিবার শক্তি হিন্দুর ছিল না। সিংহবংশের উপর অত্যাচার কাহিনী পৃথিবীর কোন দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করে নাই।

২৪ পরগণান্তর্গত দোগাছিয়ার সন্নিকট বহুস্থানে আমুলিয়া বা মহানাদের সিংহ বংশের অনেক স্মৃতি, পুরাতন গড়ের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। এই স্থানের সন্নিকট রাজীবপুর গ্রামখানি রাজা রাজীবলোচন সিংহ নির্ম্মাণ করেন। তদীয় বংশধরেরা এই অঞ্চলে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। ইতিহাস এই সব খবরের সংগ্রহ না রাখিলেও, তথায় "মধুকুল্য দীঘি" সিংহবংশের গোত্রের প্রকাণ্ড সাক্ষ্য দিতেছে।

---

*চন্দ্রকোণার রাজবংশ মহানাদ রাজবংশেরই একটি শাখা, পাদশাহনামায় এই বংশের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় আছে।

১০৯০ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জ হইতে চন্দ্রদেবের পৌত্র গোবিন্দচন্দ্র বাঙ্গলার পালবংশীয় রাজা রাম পালের মাতুল রাষ্ট্রকূট বংশীয় মথন বা মহনের দৌহিত্রী কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র জয়চাঁদ, অবিশ্বাসযোগ্য কাহিনী অনুসারে দিল্লীর চৌহান বংশীয় পৃথ্বীরাজের "শ্বশুর"। ১২২৬ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন কান্যকুব্জের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছিল। এই অব্দেই মুসলমান দস্যুরা সমস্ত মহানাদ নগর মরুভূমিতে পরিণত করিয়া গিয়াছে। এখন মহানাদ একটি বড় গ্রাম মাত্র। তীর্থস্থান হিসাবেও ইহার সুখ্যাতি কমিয়া গিয়াছে। ইহাই সিংহবংশের কলঙ্কের কথা।

প্রাচীন কোট বা পাইকোড় গ্রামে নরসিংহ জয়দুর্গা দেবার মন্দির-গাত্রে মহানাদের নাম খোদিত ছিল।

কালঞ্জরাধিপতি মহারাজাধিরাজ পরমার্দ্দিদেবের ১২২৩ সংবত বা ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসনে আম্বুলিয়ার সিংহবংশের নাম অস্পষ্ট অক্ষরে পাওয়া গিয়াছে।

বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ শৈলশ্রেণী সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ১৪০০ ফিট উচ্চ। সুশুনিয়া নামক পাহাড় ১৪৪২ ফিট উচ্চ। এই পাহাড়ের শিখর দেশে চন্দ্রকেতু বা চন্দ্রবর্ম্ম সিংহের একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

সলিমাবাদ বা প্রাচীন সুলেমনাবাদ গ্রামে সিংহবংশের অনেক কীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

সমুদ্র সেন—চন্দ্র সেনের পিতা। কুলুর একজন সামন্তরাজ (৬০০ খৃষ্টাব্দে)—শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বরুণ সেনের পুত্র সঞ্জয় সেন, তৎপুত্র বরি সেন, তৎপুত্র সমুদ্র সেন। ইঁহারা মহারাজ উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

তিস্তা বা আত্রাই, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, নাগর, করতোয়া বা ফুলঝর, বঙ্গালী

ও মানস নদী তীরস্থিত স্থান সমূহে মহারাজা চন্দ্রকেতুর নির্ম্মিত দেব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান ছিল।

মহানাদের রাজা বলদেব সিংহ প্রাচীনকালে বলদেব ক্ষেত্র স্থাপন করেন। ইহার পূর্ব্বনাম তুলসীক্ষেত্র তীর্থ স্থান ছিল।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে মলয় দ্বীপের নাম পাওয়া যায়। তাহাতে এই দ্বীপ বহু বিস্তৃত বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। মাল দ্বীপ মতান্তরে দিব মহল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মহল অর্থে রাজ প্রাসাদ। এই দ্বীপে রাজা বিজয় সিংহের মহল ছিল। এই দ্বীপের শৈলময় উপকূল ভাগে সমুদ্র তরঙ্গ প্রবল বেগে আঘাত করিয়া থাকে।

উমাঙ্গাধিপতি মহানাদের রাজকন্তার পাণিগ্রহণ করেন। রাজা অভয়দেব—চন্দ্রবংশীয়।

১৪৮০ খৃষ্টাব্দে রাজা গৌরীবর সিংহের দুইজন সেনাপতি বলজিৎ সিংহ ও ভিখারী সিংহ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক কতুবপুর দুর্গ অধিকার করে।

গড় মান্দারণ ও খানাকুলের মধ্যে "দিশাহারা" নামে একটি মাঠ বা জমি আছে। প্রবাদ যে, এই স্থানে রাজা দুর্য্যোধন সিংহ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইলে, তদীয় সৈন্তগণ দিশাহারা হইয়া রাজহাটী দিয়া কাশীপুর গ্রামে পলায়ন করে।

দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্ত্তী বহু প্রাচীন গ্রামে সিংহবংশের অতীত কীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্ত্তমান রঘুবাটী গ্রাম পূর্ব্বকালে রাজগ্রাম বলিত। এই স্থানে রাজা গঙ্গাধর সিংহ মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে "জনক দুহিতা ও রামচন্দ্রের" কৃষ্ণ প্রস্তর মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া মন্দির প্রতিষ্ঠা ও "রঘুবাটী" গ্রাম স্থাপন করেন। ১২৫০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর সিংহ জীবিত ছিলেন।

গোঘাট গ্রামের প্রান্ত দিয়া দ্বারকেশ্বর নদ প্রবাহিত হইত। রাজা মহেন্দ্র খাঁ সিংহের সন্তানেরা এই স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

যে স্থানে খানাকুল গ্রাম অবস্থিত, ঐ স্থান পূর্ব্বকালে জলময় স্থান ছিল। প্রায় ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বেও দ্বারকেশ্বর নদের ভীষণ বন্যা দেখা দিত এবং মধ্যে মধ্যে এই অঞ্চল বন্যায় ডুবিয়া যাইত। সেই জন্য এই অঞ্চলে প্রাচীন অট্টালিকা, দেবমন্দির মৃত্তিকায় ঢাকা পড়িয়াছে। কালক্রমে যে সকল খাল মহানাদ হইতে অন্যান্য স্থানের সহিত সংলগ্ন ছিল, সিংহ বংশের দারিদ্রতার জন্য সংস্কার অভাবে লুপ্ত হইয়াছে। দেশের ঐতিহাসিক লেখকের অভাবে তাহার কোন নিদর্শন না থাকিলেও পল্লীগ্রামে অন্বেষণ করিলেই তথ্য আবিষ্কার হইবে।

দেপসার দেউলে মৌদ্গাল্য গোত্রের সিংহ বংশের অনেক কীর্ত্তি লুক্কাইত আছে।

নাগপুর পরগণায় আবিস্কৃত একখানি শিলালিপিতে মহানাদের রাজার নামোল্লেখ আছে।

বড়গাঁ গ্রাম পার্শ্বে পূর্ব্বপশ্চিমে এক মাইলের উপর লম্বা এক দীঘি আছে, এত বড় দীঘি বর্দ্ধমান জেলায় নাই। এই দীঘি মধুকুল্য গোত্রীয় রাজা গজসিংহ খনন করেন।

চন্দননগরে "পদ্মপুকুর" রাজা বিজয়রাম সিংহ চৌধুরীর পুত্র রাজা পদ্মলোচন সিংহের স্মৃতিচিহ্ন দৃষ্ট হয়। নবীনচন্দ্র সিংহের রক্ষিত কাগজ পত্রে "মহারাজ" পদ্মলোচন সিংহ বলিয়া প্রাপ্ত হই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক গ্রাম ও নগর ছিল, অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

বাতিকার নিবাসী মুকুন্দলাল সিংহ ১২৬৯ খৃষ্টাব্দে, বড়ম্বার রাজা নবীন রাউত ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে, বিষ্ণুপুরের রাজা চৈতন্য সিংহ ও তাঁহার পিতৃব্য পুত্র দামোদর সিংহ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মহাসমারোহের সহিত মহানাদে বশিষ্ঠ গঙ্গা স্নান করিতে আসিয়াছিলেন।

নারায়ণগড় রাজবংশের আরম্ভ ২৬৫ বঙ্গাব্দে। তখন রুদ্রাণী, ব্রহ্মাণী, ইন্দ্রাণী, ভদ্রাণী দেবীর পূজা মহানাদে হইত।

খড়্গপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানের রাজা রাজেশ্বর সিংহ সিংহবংশের প্রতিষ্ঠাতা কিনা, তাহা অজ্ঞাত। বেত্রগড় বা গড়বেতায় সিংহবংশের স্মৃতি আছে।

কুতূহলী মানব-মন মহানাদে বকাসুরের বাস দেখিতে পাইল, এবং প্রমাণ স্বরূপ প্রস্তরীভূত বৃক্ষকাণ্ডে বকাসুরের হাড় দেখাইয়া দিল। অসুরের মৃত্যু কালবশে হইতে পারেনা, অসুর বধ করিতে পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশে ভীমকে আসিতে হইয়াছিল।

স্থানে স্থানে বংশাবলী দৃষ্টে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সিংহবংশীয় নরপতিগণ একস্থানে অধিকদিন বাস করিতেন না। একাধিক স্থানে নগর পত্তন ও রাজবাটী নির্ম্মাণ করিতেন এবং গুপ্তস্থানেও রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া রাখিতেন।

রাজা সূর্য্য সিংহ নবগ্রামে স্মৃতিসার রচয়িতা শ্রীপতি দত্ত মিশ্রকে বাস করাইয়াছিলেন। প্রাচীন "প্রেমবিলাস" গ্রন্থে স্পষ্টই আছে, রাজা দিব্য সিংহই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণদাস নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

"অদ্বৈত আদেশে সেই দিব্যসিংহ রায়।
শান্তিপুরে সেই রাজা উপস্থিত হয়॥"

শ্রীসূর্য্যের পাহাড়ে দশভূজা শান্তেশ্বর মন্দির গাত্রে এক শিলাফলকে মহানাদের চন্দ্রকেতুর নাম ছিল।

১৪৭৬ খৃঃ হইতে ১৪৮৩ খৃঃ পর্য্যন্ত রাঢ়ান্তর্গত পাণ্ডুয়ার রাজা ছিলেন,—রাজা রাজীব সিংহ।

১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের পর মুসলমান সৈন্য রাঢ়দেশান্তর্গত পাণ্ডুয়া ও মহানাদের হিন্দুরাজ্য জয় করিতে অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। এই সময় পাণ্ডুয়ায় বা মহানাদে রাজা রত্নাকর সিংহ * রাজত্ব করিতেন বলিয়া সিংহ বংশের কাগজ পত্রে পাইতেছি।

পাণ্ডুয়ার সূর্য্য মন্দির এবং নারায়ণের মন্দির, মসজিদ ও মিনারে

পরিণত হয়। ইহার ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান কালে "বাইশ দরওজ" নামে পরিচিত। ইহা দেখিলে মহানাদ রাজবংশের বহু শিলাস্তম্ভ ও অন্যান্য ধ্বংসাবশিষ্ট দ্রব্য নয়ন গোচর হয়।

উড়িষ্যার অধিপতি প্রতাপরুদ্র (১৪৯৬—১৫৪০ খৃঃ) এ সময় অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

"প্রতাপরুদ্র মানাদ জিনিতে করে আশ।
শুনিয়া সিংহ পৃথ্বীবর তারে করেন উপহাস॥"

উড়িষ্যার রাজা চন্দ্রশেখর সিংহ মহানাদের রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

মহানাদের রমাকান্ত সিংহরায় উড়িষ্যা কটক জেলার অন্তর্গত অসুরেশ্বর পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। টোডরমল্ল তাঁহাকে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন।

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সুলেমান কররানি, মহানাদের রাজা বাহাদুর সিংহের বলবৃদ্ধি দেখিয়া 'বঙ্গদেশে মুসলমান রাজ্য অচিরে ধ্বংস হইবে' ভাবিয়া ভীত হইল। দিল্লীর শেরসাহ মহানাদ, আন্দুলিয়া ও চিংড়ের হিন্দুরাজগণের শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য সুলেমানের সাহায্যার্থ অগণিত সৈন্য প্রেরণ করিল। মহানাদে ঘোরতর সমরানল জ্বলিয়া উঠিল। এই সময় হিন্দুজাতির নির্ব্বাপিত প্রায় বীর্য্য বহ্নি পুনর্ব্বার দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল। হিন্দু-সৈন্যগণ বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া বহু মুসলমান সৈন্য বধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র অরাতি রুধিরে প্লাবিত করিল।

নসরৎ সাহ কাটাদুরের মৌদগল্য গোত্রীয় রাজা নীলাম্বর সিংহের রাজ্য জয় করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার সহজপুর ও আমরা (পুর) হইতে রাজা হরিবল্লভ সিংহের সন্তানগণ ১৬০০ খৃষ্টাব্দে ঢাকার নবাবের দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত

হইয়া তথায় বাস করেন। তাঁহারা তথায় পূর্ব্বোক্ত গ্রামের নাম হইতে ঢাকা জেলায় ঐ নামে দুই নগর পত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রী অর্থে লক্ষ্মী এবং বাড়ী অর্থে বাসস্থান—এই ভাবেই "শ্রীবাড়ী" নামকরণ হইয়াছে। আন্দুলিয়ার রাজা বলরাম সিংহ শ্রীবাড়ীতে তাঁহার আগমন বিখ্যাত করিবার জন্য তথায় ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত পঞ্চপুকুর নামক পুষ্করিণী খনন করান। উক্ত পুষ্করিণী যথাক্রমে দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২০০০ ও ৪০০ হস্ত পরিমিত। হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে যে, যিনি এরূপ পুষ্করিণী খনন করান, তিনি ভগবানের আশীষ লাভে সমর্থ হন এবং স্বর্গের তোরণদ্বার তাঁহার জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকে।

১৬১২ খৃষ্টাব্দ হইতে মোগল পশ্চিম বঙ্গ হইতে রাজস্ব আদায় করিতে লাগিল। মগ ও ফিরিঙ্গির অত্যাচার হইতে দেশরক্ষার কোন ব্যবস্থাই হইল না, ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে।

শাহ-জাহান ১৬২২ খৃষ্টাব্দে জমিদারগণকে তাহাদের পৈত্রিক জায়গীর প্রত্যর্পণ করিয়া দারাব্‌কে বাঙ্গলার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পর্টুগিজদের দূরীভূত করিল শাহ-জাহান। এইক্ষণ হইতে হুগলী বঙ্গদেশের একটি বন্দরে পরিণত হইল ও সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম হইতে দপ্তরখানা হুগলীতে উঠাইয়া আনা হইল।

১০৭১ হিজরা বা ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে শাহজাহানের পুত্র, এবং বঙ্গ-বিহার উড়িষ্যার সর্ব্বজন সমাদৃত, প্রজাগণের ভক্তি প্রীতির আধার—সুবাদার কুমার সুজা আরও তাঁহার স্ত্রীপুত্র কন্যাগণের নশ্বর দেহের শোচনীয় অবসান হইল।

* রাজা রত্নাকর সিংহ প্রায় ৯৮ বৎসর বয়সে সাঁতোড়ের রাজা অবনী নাথ সান্যালের হস্তে নিহত হন। রত্নাকর সিংহ গোমগড়ের (ভুরশুট পরগণায়) রাজা গণেশ দেবের পাণিগ্রহণ করেন।

মতান্তরে ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে বা ১১১৬ হিজরী রামেশ্বর সিংহ ৩৫ বৎসর বয়সে বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়ায় বাস করেন। তখন তাঁহার পুত্র রাজারাম সিংহের অনুমান হয় ১১।১২ বৎসর বয়স মাত্র ছিল। মুরশিদকুলি খাঁ এই সময় জায়গীরদারের পদ্ধতি উঠাইয়া দিয়া, ঐস্থলে নূতন আদায়কারী নিযুক্ত করিলেন ও জায়গীরদারগণকে উড়িষ্যা বিভাগে জায়গীর প্রদান করিলেন।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে মুকসুদাবাদের পত্তন হয়। মুরশিদকুলির রাজত্বকালে বঙ্গের রাজস্ব একক্রোর পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। রামেশ্বর সিংহ মুরশিদকুলির দেওয়ান ছিলেন। রামেশ্বর সিংহ হুগলীর ফৌজদার জয়েনাল আবদীনকে পদচ্যুত করিয়া নিজেই ফৌজদার হইয়াছিলেন।

রামেশ্বর সিংহ একজন অবাধ্য জমিদার, তাঁহার অধীনে একদল দস্যু প্রতিপালন হইত বলিয়া তিনি দেওয়ানী পদ হইতে বিতাড়িত হন।

রাজা সীতারাম রায় ধৃত হইয়া মুরশিদাবাদে প্রেরিত হইলে, মুরশিদকুলি খাঁ সীতারামের প্রতি জীবিতাবস্থায় চর্ম্ম মোক্ষণ করিয়া লইবার আদেশ দিলেন। অভাগা সীতারামের স্ত্রীপুত্রকন্যাগণ রামেশ্বর সিংহের আশ্রয়ে আনিত হন। রামেশ্বর সিংহের প্রথমা স্ত্রী রাজারাম সিংহের জননী রাজা সীতারাম রায়ের কন্যা ছিলেন।

রাজা সীতারাম রায়ের পরাজয়ে, দাতারাম সিংহ মুসলমান সেনাগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ধৃত হইবার প্রাক্কালে একটী বৃহৎ ছুরিকা দ্বারা প্রথমতঃ নিজ সহধর্ম্মিণীকে স্বহস্তে হত্যা করিয়া পরে স্বীয় বক্ষে ঐ তীক্ষাগ্র ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন।* দাতারাম সিংহ "সংগ্রাম সাহ" উপাধি লইয়াছিলেন এবং সংগ্রামগড় নগর স্থাপন করেন; ইনি ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জিলা লুণ্ঠন করিয়া শোভাসিংহ কর্তৃক পুরস্কৃত হন।

* দাতারাম সিংহ মহানাদে স্বর্গারোহণ করেন, ইহাই অনেকের বিশ্বাস।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ দাতারাম সিংহকে দুরন্ত পৌত্তলিক ও সেই সঙ্গে সিংহ উপাসক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন

রাজা দাতারাম সিংহ এই বোম্বেটেদিগকে হস্তগত করিয়া প্রবল প্রতাপ মোগল বাদশাহের হারেমের কতিপয় অসূর্য্যম্পশ্যামহিলাকেও বন্দিনী করিয়া হুগলীর দুর্গে নীতা করিয়াছিলেন। মোগল হারেমের এই লজ্জাজনক কলঙ্ক কাহিনী কবিকল্পিত নহে, ঐতিহাসিক সত্য। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত গ্রন্থে জাহাঙ্গীরের পুত্রবধূ মমতাজ মহলের সহচরী হরণের কাহিনী সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। দাতারাম সিংহের নেতৃত্বে মগদস্যুগণ নৌবলে বলীয়ান হইয়াছিল, নদী-তীরবর্ত্তী স্থান সিংহরাজগণের অধিকৃত হয়। মোগলসৈন্য নবাব ইব্রাহিম খাঁর নেতৃত্বে রাঢ়ের এই হিন্দু রাজার নৌবল ধ্বংস করিতে নিযুক্ত হন। দাতারাম সিংহ মগদিগকে হস্তগত করিয়া মোগলরাজ্য একরূপ ধ্বংসপ্রায় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি তৎকালীন রাঢ়ে কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি বিধানে আকৃষ্ট হইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে বঙ্গের শস্য সুলভতার দিক দিয়া বঙ্গদেশ আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল, বঙ্গের বস্ত্রশিল্পও তেমনই যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। ঢাকার কোমল মসলিনের খ্যাতি এই সময়েই বিশ্ববিদিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। মগগণ পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ উপদ্রব করিয়াছিল। এই উপদ্রবের জন্য মুসলমানদের গ্রাম নগর পূর্ব্ববঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তাহাই বর্ত্তমানে অনেকে হিন্দুযুগের নিদর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় পরাজয়ের মধ্য দিয়া সাহজাহান যখন রাঢ়ে উপস্থিত হন, তখন মহানাদের রাজা গণেশ খাঁ সিংহ যেরূপ দক্ষতা সহকারে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন, তাহাতে হুগলীর পর্টুগিজ-শক্তিও যে তাঁহার নৌবহর পরিপুষ্ট করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সাজাহানের দুর্দ্ধর্ষ আফগান সেনাপতি দরিয়া খাঁ ও মহানাদের সিংহবংশীয় বিশ্বাসঘাতক

সুন্দরলাল সিংহ রায়ের বুদ্ধিমত্তায় রাঢ়ের জমিদারগণ সাজাহানের পক্ষাবলম্বন করায়, তাঁহাদের কৌশলে অতর্কিতভাবে ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া সাজাহান বঙ্গের সুবেদার ইব্রাহিম খাঁকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে গণেশ সিংহ অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়া সমর ক্ষেত্রে আত্মবিসর্জ্জন করেন। বারানসীর সান্নিধ্যে মহানাদের রাজা গণেশ সিংহ জাহাঙ্গীরের পক্ষাবলম্বন করেন।

সোণারপুর চিংড়িপোঁতা নিবাসী ৺গিরিশচন্দ্র সিংহ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন যে, রাজা দাতারাম সিংহ মহানাদ ত্যাগ করিয়া ভবানীপুরে গড় কাটাইয়া একটি দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় বাস করেন ও নিজনামে একটি পরগণা স্থাপন করেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে দৈনিক নায়ক পত্রিকায় "চিতুয়া বরদার ইতিবৃত্ত" প্রবন্ধে সিংহ বংশের অনেক কথা প্রকাশিত হইয়াছিল, ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বসুমতী সংবাদ পত্রেও প্রকাশিত হইয়াছিল—"অল্পকাল পরে তাঁহার সহিত হুগলী জেলার সরসা গ্রামের অত্রিগোত্র সিংহবংশীয় রাজা দেবীসিংহের একটি যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে দাতারাম সিংহ পরাজিত হইয়া বোধ হয় কিছুকাল দত্তপুকুরিয়ায় লুকাইয়া থাকেন। পুনরায় বল সঞ্চয় করিয়া নবিবপুরের 'সিংহগড়' মুসলমানদের হস্ত হইতে উদ্ধার মানসে অগ্রসর হন।" এই সকল প্রবাদ কথা সত্য হইতেও পারে।

সম্রাট সাহজাহানের মোহরাঙ্কিত ফরমানের মর্ম্ম—"বিদিত হইল যে বাঙ্গলা সুবার অধীন সলিমাবাদ সরকারের অন্তর্গত মূলগড়, আমুলিয়া পরগণা ও সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্ভুক্ত আঙ্গুরিয়া পরগণার চৌধুরী বিষ্ণুদেব রাঘবানন্দ, রঘুনাথ ও রামবিনোদ মালগুজারি করিতে অসমর্থ হইয়া পলাইয়াছে। নানাকারণে ঐ সকল পরগণার চৌধুরায়ী, তালুকদারী, জমিদারী পূর্ব্বোক্ত চৌধুরীদিগের হস্ত বহির্ভূত করিয়া রাজা দাতারাম সিংহকে অর্পণ করা গেল। তারিখ দ্বাবিংশ জলুস।"

রাজা মানসিংহের পর কুতবুদ্দীন খাঁ বাঙ্গলার প্রাচীনতম গ্রাম, নগরী ও পুরাতন রাজবংশ সকল ধ্বংস করিতে নিযুক্ত হন। ইনি সের আফগান কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। সের আফগানের বেগম মেহের উন্নিসা স্বামীর নৃশংস হত্যা সাধনের পর আগরা দুর্গে নীত হইয়া কালক্রমে লম্পট জাহাঙ্গীরের বেগম নুরজাহান নামে বিখ্যাত হয়। সের আফগান বর্দ্ধমানের কোতায়াল ছিল। তৎপর জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক কুলিখাঁ বাঙ্গলা লুণ্ঠন কার্য্যে নিযুক্ত হয়। এক বৎসরের মধ্যে যাদবেন্দু সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হইলে ইসলাম খাঁ বঙ্গের সুবেদার হয়। এই সময় যাদবেন্দু সিংহ কতলুখাঁর পুত্র ওসমান খাঁর সহিত বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তখন পুরাতন জমিদারবর্গের তপ্ত হিন্দুরক্ত আবার ধমনীতে প্রবাহিত হইয়া উঠিল। যাদবেন্দু সিংহের পতাকাতলে অবিলম্বে ৩৫ হাজার হিন্দুসেনা সমবেত হইল। সমগ্র রাঢ় প্রদেশ পুনরায় সিংহবংশের করায়ত্ত হইল। বিষ্ণুপুরের রাজা মোগলপক্ষ হইয়া বিদ্রোহাচরণের বিরুদ্ধে প্রথমেই অস্ত্রধারণ না করিয়া দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু যাদবেন্দু সিংহ দূতের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, তিনি সদর্পে সেই দূত (বর্দ্ধমানের আবু রায়) কে বলিলেন—তোমার প্রভুকে বলিও যে, মহানাদের সিংহরাজবংশ এখনও তরবারি ত্যাগ করিয়া লাঙ্গল ধরিতে অভ্যস্ত হয় নাই, তাহাদের ন্যায্য অধিকার তাহারা আয়ত্ত না করিয়া এবার আর নিরস্ত হইবে না। অগত্যা নবাব গিয়াসউদ্দীন রাজা যাদবেন্দু সিংহের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণে বাধ্য হইলেন। ইসলাম খাঁ গিয়াসউদ্দিনের আদেশ পালন করিতে চিংড়েগড় আক্রমণ করিল। সুজায়েত খাঁ মহানাদ আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া মোগল সুলতান তাহাদের পক্ষাবলম্বী হিন্দুদিগকে জায়গীর প্রদান করিয়া নূতন নূতন জমিদার সৃষ্টি করিল। ইহাদের দ্বারা হিন্দুর অবশিষ্ট প্রাচীন

স্মৃতি ও ইতিহাস নষ্ট হইতে লাগিল। তাই আজ বাঙ্গলার ইতিহাসের ধন-ভাণ্ডার শূন্য, তাই প্রাচীন শত শত সংস্কৃত গ্রন্থ লুপ্ত।

মুরশিদকুলি খাঁকে রামেশ্বর সিংহ পরাজিত করিয়া তাহার একটি বেগমকে ধৃত করিয়া নতিবপুর গড়ে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার নাম বেগম নুরন্নেছা খাতুন। পরে বেগম স্বেচ্ছায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এইরূপ প্রবাদ আছে।

রামেশ্বর সিংহ গোপনে থাকিয়া নিজ ছত্রভঙ্গ সেনাগণকে মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণার নিকট পুনঃ সংগ্রহ করিয়া, পৌত্র কালীচরণ সিংহ সঙ্গে, কটকের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার কালে, অমিততেজে মারহাট্টা বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন ও তাহাদিগকে প্রায় ধ্বংস করিয়া ফেলিবার সময় দৈব-নির্ব্বন্ধ বশতঃ স্বয়ং নিহত হইলেন। পর বৎসর ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে রঘুজী নূতন সেনাবলে বলীয়ান্ হইয়া বাঙ্গলায় প্রবেশ করিলেন। রঘুজী বীরভূম দিয়া ঘুরিয়া আসিয়া, বর্দ্ধমানের সন্নিকট শিবির স্থাপন করিলেন।

রাজা রামেশ্বর সিংহ বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ১১১১ বা ১১১৬ বঙ্গাব্দে বাস করেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে রামেশ্বর সিংহ আলিওয়ার্দ্দি খাঁ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই সময় চন্দননগরে ফরাসীদের গোপনে সাহায্য করিয়া দলভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রামেশ্বরের পুত্র রাজারাম সিংহ পরে এই ফরাসীদের সাহায্যে মীরজাফরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার সাহস পাইয়াছিলেন।

রাজারাম সিংহ মহানাদ গ্রামে মহা তেজস্বী স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন। তাঁহার সুন্দর, সুঠাম, সুদীর্ঘ দেহ, সুগোল বাহু যুগল, বিশাল বক্ষঃস্থল, উন্নত নাসিকা, স্নিগ্ধোজ্জ্বল গৌরকান্তি, দীর্ঘায়ত নয়নযুগল এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার চরিত্র মাধুর্য্য ও গুণ গরিমা প্রভৃতি রঘুবংশের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়—

"ব্যুঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশু মহাভুজঃ।
আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহ ক্ষাত্রধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ॥"

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে এক প্রবল ঝটিকা উৎপন্ন হইয়া ভাগীরথীর উপর দিয়া প্রায় ১০০ ক্রোশ উত্তর পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ভূমিকম্পও হইয়াছিল। ইহাতে বংশবাটীর সিংহরাজ প্রাসাদ ভূমিসাৎ হয়। গঙ্গার জল ৪০ ফুট উচ্চ হইয়া উঠে। এই দুর্ঘটনায় প্রায় তিন লক্ষ লোক কাল-কবলিত হয়। পরবর্ষে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বাঁশবেড়িয়ার রাজারাম সিংহ খাদ্যাদি বিতরণ করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত বহু ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করেন।

বিদেড়া বা ব্যাজড়া গ্রামে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে একটি যুদ্ধ হয়। ডাচেরা তদানীন্তন বংশবাটীর রাজা রাজারাম সিংহের সহিত গোপনে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন, এবং ইংরাজদিগকে উচ্ছেদ মানসে মালয় সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করেন।

দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে স্বামী সত্যদেব সরস্বতী বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি তীর্থ করিবার পথে হুগলী জেলাস্থ গুপ্তিপাড়া গ্রামে ও বংশবাটীর রাজারাম সিংহের পুত্র কালীচরণ সিংহ চৌধুরীর বাটীতে কিছুকাল বাস করেন। সত্যদেব গুপ্তিপাড়ায় উপস্থিত হইয়া প্রাচীন কৃষ্ণপুর নামক পল্লীতে মৌদ্গল্য গোত্রীয় সিংহদের আশ্রয়ে থাকেন। এই কৃষ্ণপুর, পল্লীগ্রামের পূর্ব্ব সীমায় গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গা কিছু দূর দিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, এবং কৃষ্ণপুর নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া ঠাকুর পাড়া হইয়াছে। কৃষ্ণপুরের সিংহগণ দরিদ্র হইয়াও, পরিবারের সকলে উপবাসী থাকিয়াও অতিথির পরিচর্য্যা করিতেন। এই বংশেরই বংশধর, ছিনা আকনা নিবাসী ৺বেণীমাধব সিংহ ও ৺নবীনচন্দ্র সিংহ ছিলেন।

রাজারাম সিংহের পৌত্র সহস্ররাম বাঁশবেড়িয়া গ্রামে বাস করিতেন। তিনি মল্লিবপুর পরগণা প্রভৃতি সাতটি পরগণার মালিক ছিলেন।

আসুরগড়ের রাজা গন্ধর্ব সিংহের সাহীরাজা উপাধি ছিল। তাঁহার জমিদারী আমিনপুর, বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় ভাগীরথী তীরে কলিকাতার অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই জমিদারী তাঁহার বংশধর বাঁশবেড়িয়ার রাজা কালীচরণ সিংহ ও তৎপুত্র সহস্ররাম সিংহ ১৭৯০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ভোগ করিতেছিলেন। সহস্ররাম সিংহ বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটীতে চারিটি নাবালক পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করিলে এই জমিদারী শক্রহস্তে যায়। এই বংশীয়েরা বলেন পাটুলীর রাজা এই সিংহবংশের শক্র ছিলেন। ১৪ পরগণায় ইহার রাজস্ব ১,৪০,০৪৬ টাকা ধার্য্য হয়। মীর কাশিমের বর্দ্ধিত রাজস্ব ৩,২৬,৭৪৭ টাকা হইয়াছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হইবার সময় মহানাদের সিংহবংশের জমিদারী নিলামে বিক্রীত হইলে বাঙ্গলাদেশে অনেকে জমিদার হন। বাঁশবেড়িয়ার বা বংশবাটীর রাজা কালীচরণ সিংহের অধীন তালুকদারগণ কোম্পানীর সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজস্ব প্রদানের বন্দোবস্ত করেন এবং রাজা কালীচরণ সিংহ 'পৃথ্বীপতি' বাহাদুরের দেয় করও বর্দ্ধিত করা হয়। ইহাতে রাজা কালীচরণ সিংহ আপত্তি করেন, কিন্তু কোম্পানী বাহাদুর সে আপত্তিতে কর্ণপাত না করায় তাঁহার হৃদয়ে নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে কালীচরণ সিংহের দেহাবসান হয়। মতান্তরে নদীপুরের রাজা দেবী সিংহ কর্ত্তৃক নিহত হন।

সহস্ররামের পুত্র রামলোচন সিংহের সময়ে শান্ত সুস্থ, সরল পল্লী-বাসীগণ অতি সরল সহজভাবে, মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণ সুস্থদেহে নিশ্চিন্ত মনে শান্তির আরামে শ্যাম-শোভাময় গ্রামটি ভরিয়া বাস করিত। রামলোচন সিংহ সুলেখক, সুকণ্ঠ এবং সমৃদ্ধি সম্পন্ন ভদ্রলোক ছিলেন। রামলোচন সিংহ বয়ড়া পরগণার মালিক ছিলেন। প্রজাগণ রামলোচন

সিংহকে দেবতার স্থায় ভক্তি করিত এবং সানন্দে তাঁহার আদেশ মানিয়া লইত। রামলোচন সাহসী ছিলেন। স্বজাতির হিতসাধন ও উন্নতি বিধান—এই দুই কার্য্যের জন্য তাঁহার ভাণ্ডার উন্মুক্ত ছিল। কথিত আছে, তিনি নিঃস্ব পরিবারের ভরণ পোষণ ও বহু আশ্রিতকে অন্নদান করিতেন। বার মাসে তের পার্ব্বণ তাঁহার করণীয় ছিল। তিনি 'জয় দুর্গা' পূজা করিতেন। তাঁহার ললাটে নূপুর অঙ্কিত থাকিত। তাঁহার লিখিত "লক্ষণ দিগ্বিজয়" "সুভদ্রা হরণ" "সত্য নারায়ণের পাঁচালী" প্রভৃতি গ্রন্থ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়ায় তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সহিত সহমৃতা হন, শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় 'কায়স্থ পত্রিকা'য় তাহা উল্লেখ করিয়াছেন।

জয়নাথ সিংহ * সমস্ত দেশের সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখরূপে অনুভব করিতেন। তাই তাঁহার দধিচী ও শিবির মত বিরাট ত্যাগ এবং বুদ্ধদেব ও চৈতন্য দেবের স্থায় অপূর্ব্ব সন্ন্যাস। ভাষার এমন শক্তি নাই যে, তাহা সুবক্তার কণ্ঠ নিঃসৃত হইলেও তাঁহার বিরাট স্বার্থত্যাগ ও অপূর্ব্ব দেশপ্রেম বিবৃত করিতে সমর্থ হয়।

উষার আগে সূর্য্যের কিরণ, বিহঙ্গের গান, সন্ধ্যায় অন্ধকার, গভীর রজনীর নিস্তব্ধতা, সমুদ্রের তরঙ্গের ধ্বনি—জয়নাথ সিংহের প্রাণে কি সুর সৃষ্টি করিয়াছিল, তাঁহার হৃদয় যে কি ভাবে ভরপুর হইয়াছিল, তাহা তাঁহার কীর্তিকলাপের স্মৃতি হইতেই বুঝা যায়। সন্ন্যাসীগণ দেখিয়াছে, কখন সুখের রাশি পুষ্প হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে ফুটিতেছে, কখন বা সকল দুঃখ যেন গীত হইয়া উঠিতেছে।

বংশবাটী বা বাঁশবেড়িয়ার ব্রজমোহন সিংহ কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ বাহাদুরের পরম বন্ধু ছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনাথ

* ইনি সুন্দরবনে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ করেন। "বাঙ্গলার নবাবী আমল" গ্রন্থে উল্লেখ ছিল।

কলিকাতার চিতপুর রোডের স্বীয় ভবনে আত্মহত্যা করিলে ব্রজমোহন সিংহ অল্পদিন রাণী স্বর্ণময়ীর দেওয়ানী করিয়াছিলেন। রাজীব লোচন রায় নামক একব্যক্তির শত্রুতায় রাণী স্বর্ণময়ী ব্রজমোহনকে পরিত্যাগ করেন। ব্রজমোহন শেষ জীবনে সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ব্রজমোহনের পৌত্র নবীনচন্দ্র সিংহ ১২৫৬ বঙ্গাব্দে ভাদ্রমাসে ছিনা আকনা গ্রামে মাতামহালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের সময় যে নমঃশূদ্র ধাত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল মল্লিকা; যাঁহাকে তিনি আজীবন "মা" নামে সম্বোধন করিতেন। অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ পি, ঘোষ (প্রসন্ন ঘোষ) তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন। শৈশবে তিনি কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মবীর ছিনা আকনা গ্রামে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। নিজের স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া পরের উপকার করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত ছিলেননা। এখন ঐ গ্রামে নবীনচন্দ্রের স্থাপিত স্কুল ছাড়া আর কোন স্মৃতি নাই। তিনি ৺কাশীধামে অনেকগুলি মন্দির মেরামত করিয়া দেন। ৺বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ভিতর যে রৌপ্য সিংহাসন আছে, তাহা হাতুয়ার মহারাজার নির্ম্মিত, উহাতে নবীনচন্দ্র সিংহের নামোল্লেখ আছে। পিশাচমোচন রাজবাটীর বৃহৎ প্রস্তর মন্দির ও হাতুয়া মহারাজার রাজ অট্টালিকা তিনিই প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল ২৭ বৎসর মাত্র। এতদ্ব্যতিত ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হাতুয়া রাজের সমস্ত রাজ অট্টালিকা তাঁহার দ্বারায় নির্ম্মিত হয়। হাতুয়ার মহারাণী ও দেওয়ান দেবেন্দ্রনাথ দত্তের দুর্ব্ব্যবহারে তিনি ঐ সময় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া 'কোর্ট অব ওয়ার্ড' হইতে পেন্‌সন প্রাপ্ত হন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ৺কাশীধামে তাঁহার জননীর স্বর্গারোহণ হয়। মাতৃশ্রাদ্ধে নবীনচন্দ্র পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করেন। তাঁহার বিপদের বন্ধু ছিলেন—বালমুকুন্দ ভট্ট, যিনি হাতুয়া রাজার সভাসদ এবং বৈদিক শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত

৺ নবীনচন্দ্র সিংহের সহধর্ম্মিণী
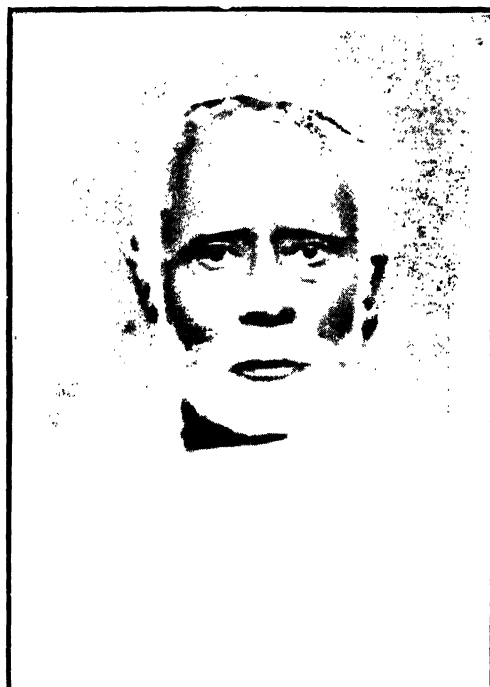
ছিলেন। নবীনচন্দ্র সিংহ সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কবি কল্পনার সহিত বাস্তব জীবনের অনুভূতি মিশাইয়া নবীনচন্দ্র সিংহ বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষ জীবন সুখকর হয় নাই। নিত্য অভাব ও লাঞ্ছনা, নবীনচন্দ্র সিংহের কি দুর্দ্দিনই না গিয়াছে! তাঁহার লক্ষাধিক টাকার রাজবাটী (৪নং গোধূলিয়া রোড, কাশীধাম) বিক্রয় হইয়া গেল ১৬ হাজার টাকার দেনার দায়ে। তখন তিনি গ্রামে গ্রামে যাইয়া সিংহবংশের বংশাবলী সংগ্রহ করিতেছেন! মানুষের দুঃখ ও দুর্গতি যে কতদূর নামিতে পারে, সে কথা বুঝা যায় তাঁহার স্ব-লিখিত জীবনী পাঠ করিলে। তিনি আজীবন দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া শেষ বয়সে উন্মাদের মত হইয়া গিয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র সিংহ বৈতরণী তটে মহারাজ যযাতি কেশরীর জীর্ণ অট্টালিকার একটি নির্জ্জন কক্ষে, সৃষ্টির মনোহর শোভা দেখিতে দেখিতে একটি ফুল হস্তে লইয়া তদ্গত চিত্তে ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক, চিরকালের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

নবীনচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"বালুকাময় মরুভূমির মধ্যে জলস্রোত বহাইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকে একটি অচ্ছেদ্য যোগসূত্রে বাঁধিয়া দিবার অপূর্ব্ব কল্পনা, রাঢ়ের বক্ষে দাঁড়াইয়া যে প্রতিভাশালী লোকটির মনে উদয় হইয়াছিল, তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠ। সেই বিরাট কল্পনা যিনি কার্য্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার প্রতিভাকে নমস্কার।"

বৌদ্ধ রাজন্য কর্ত্তৃক নিগৃহীত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আশ্রয়স্থল হইয়া সিংহ নরপতি হরিশ্চন্দ্র সিংহ যেদিন তদানীন্তন ভারতের সমগ্র শক্তির রোষ রক্তিম নয়নের সম্মুখে নির্ভয়ে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, সেই দিনই ভারতে মহানাদের সিংহ সাম্রাজ্যের ভিত্তি আবার দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার কিছুকাল পরে মুসলমানের হস্তে সিংহ শক্তি নির্জ্জিত হয়। তাহার পরেই সিংহ বংশ কায়স্থ জাতির মধ্যে নিশ্চিহ্ন হইয়া লুপ্ত হয়,— একটা শক্তি হিসাবে তাহাদের আর স্বতন্ত্র সত্বাই কিছু ছিলনা; তাঁহারা

তখন "আম্লুলের সিংহ"। আবার মৌদ্গল্য গোত্রীয় সিংহের পরিচয় পাইলেই মুসলমানগণ তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিত বলিয়া অনেকে মৌদ্গল্য গোত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য গোত্র গ্রহণ করিতেও বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দুর্ব্বলতার দিনে মুসলমানদের জায়গীর লোভে বাৎস্য গোত্রীয় ঘোষ বংশীয় সন্তানেরা মুসলমান নবাব প্রদত্ত "সিংহ" উপাধি ধারণ করিয়া উত্তর রাঢ় দেশের কোন গ্রামে "জমিদার" হইয়া উঠেন। অবশেষে শ্বেতদ্বীপাগত বৃটিশ সিংহের গর্জ্জনে ভারতের সিংহ কুলের বাক্‌রোধ ত হইয়াছেই, অধিকন্তু তাঁহারা সিংহ নাম বর্জ্জন করিয়া আত্মগোপন করিতেও চেষ্টা করিতেছেন; ইতিমধ্যেই কেহ শিং (Singh), কেহ সিনহা (Sinha) হইয়াছেন।

আম্লুলিয়া বা মহানাদের সিংহ বংশই যে এই রাঢ়দেশ ও তথাকথিত প্রাচীন সিংহলের গৌরব, তাহা বোধ হয় নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। সুকৃতের প্রতি অকৃতজ্ঞতার জন্যই "সিংহবংশ" আজ তাহার পুরুষ পরম্পরাধ্যুষিত পবিত্র পুণ্য প্রবাহিত আবাস ভূমিতেই উপেক্ষিত ও পরপ্রত্যাশী।

মহানাদের বশিষ্ঠ গঙ্গার তীর! সেখানে শ্রদ্ধাপূত চিত্তে দাঁড়াইয়া আছি, আর ধ্যানের মাঝে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—শ্মশান ব্রতী সম্রাট হরিশ্চন্দ্র তাঁহার মৃতপুত্র দাহের মূল্য চাহিতেছেন! ইহাই মহানাদের সাধনা! সিংহাসন অপেক্ষা শ্মশান শ্রেয়ঃ—সত্য! সত্যই মহানাদের প্রতিষ্ঠা ও অমরতা! "প্রয়াগ" শ্মশানে সিংহবংশের শবদাহ করিয়া মহানাদ বাঁচিয়া অমর হইয়া আছে। গাও, উচ্চকণ্ঠে জয় মহানাদের জয়।

একটা সুন্দরীর রূপ লইয়া যে বিদ্রোহ বহ্নি সিংহপুর রাজ্যকে ছারখার করিয়াছিল, তাহা ঐ শ্মশান-কুক্কুরের কাড়াকাড়ির একটা সভ্যতার রূপান্তর।

"মানাদ নৃপতি যদি রণ বার্ত্তা পাইল।
সিংহনাদ করি বীর গড়ের দ্বারে আইল্ ॥
অশ্ব গজ দল বল আর যত রথী।
সংগ্রামে সাজিয়া আইল অতি শীঘ্রগতি ॥
রণস্থল বন্দিলেক ব্রহ্মা সাজ করি।
নিজু ছিলসেনাগণ খড়্গ চর্ম্ম ধরি ॥"

রাজা গৌরীবর সিংহের জনৈক নায়েব কর্ত্তৃক তাঁহার প্রজার উপর অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়া তিনি উক্ত নায়েবের পাকাবাড়ী ধ্বংস করিয়া চূর্ণীনদ-জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অতীতের সে সমৃদ্ধ সিংহরাজ বংশ অবনতির অধঃস্তরে পতিত হইয়া পার্থিব গৌরবের নশ্বরতা সপ্রমাণ করিতেছে।

রাজা দুর্য্যোধন সিংহের জীবনের পূর্ণ পরিবর্ত্তন হয় সপ্তগ্রামের রণস্থলে। সপ্তগ্রাম অধিকৃত হইল, এবং সেই জয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার হৃদয়ের ধারাও পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাঁহার দিগ্বিজয়ের বিরাট স্পৃহা—বিশাল ঐশ্বর্য্যের অনন্ত প্রলোভন, সমস্তই ঐ হতাহত সৈন্যদের মতই ভূলুণ্ঠিত হইল। আন্দুলিয়া হইতে যে দুর্য্যোধন সিংহ দিগ্বিজয়ের জন্য সুদূরবর্ত্তী সপ্তগ্রাম যাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি আর ফিরিলেন না। তিনি মহানাদে ফিরিলেন,—তিনি সাম্য, মৈত্রী ও করুণার এক অভিনব প্রতিমূর্ত্তি। সেই অনন্ত ভালবাসা এবং বিরাট উৎসাহ এইবার নিযুক্ত হইল প্রজাদের উন্নতি কল্পে।

মহানাদের রাজা রামেশ্বর সিংহের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে রাজা রাজারাম সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। একদা রামেশ্বর সিংহ কোনও কারণে পত্নীর উপরে ক্রোধান্ধ হইয়া পুত্র রাজারামকে আদেশ করিলেন,—"তুমি স্বহস্তে তোমার মাতার শিরশ্ছেদন কর।" পুত্রকে এই আদেশ করিয়া তদীয় হস্তে শাণিত কৃপাণ প্রদান পূর্ব্বক রামেশ্বর সিংহ বাঁশবেড়িয়া গ্রামে

দ্বিতীয় স্ত্রীর নিকট গমন করিলেন। কয়েক দিন পর রামেশ্বর সিংহ একদিন উন্মত্তের ন্যায় মহানাদে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—পুত্র রাজারাম কৃপাণ হস্তে বশিষ্ঠ গঙ্গার ঘাটে যোগমগ্ন রহিয়াছেন, তাঁহার দুই কপোল বহিয়া প্রেমাশ্রু পড়িতেছে। পিতার আহ্বানে পুত্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল। রাজারাম সিংহের মাতা দূর হইতে পতিকে দর্শন করিয়া উন্মত্তার ন্যায় বেগে আসিয়া পতির চরণে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন রামেশ্বর সিংহ পুত্রকে বলিলেন যে, "তুমি পিতার আজ্ঞায় যে আঘাতে মাতৃহত্যা করিতে, সেই আঘাতেই তোমার পিতৃহত্যা করা হইত। বৎস, তুমি যে অদ্বৈত ভক্তিযোগে একাধারেই প্রকৃতি পুরুষের যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছ, মাতার মধ্যেই পিতাকে দর্শন করিয়াছ। তুমি যথার্থ ই পিতৃভক্ত কুলপাবন পুত্র।"

চক্ষুকে আরও ফোটাও, আরো ফোটাও; ঐ দেখ, চাঁদের জ্যোতি আকাশেরও উপরে কোন্ অদৃশ্য জগৎ ছাইয়া অনন্তে ভাসিতেছে।

যে সময়ে মহানাদের সিংহরাজগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন, তখন সবপ্রাণ এক করিয়া তাহাদের আপনার হইতে আপনার বলিয়া ভালবাসিতেন। এমন সুরে বাঁধা হইত সব সিংহপ্রাণ, যেন একটিতে আঘাত দিলে সবগুলি একসঙ্গে বাজিয়া উঠে।

মহানাদে একদিন সিংহসুতগণ ধর্ম্ম আনিয়াছিল মুক্তির বাণী বহন করিয়া; তখন বশিষ্ঠ গঙ্গাতীরে ধর্ম্মের অর্থ ই ছিল, মুক্তি, মহানাদের মুক্তকুণ্ড ছিল বাঁধন কাটা—নিখিল বন্ধন মোচন। সেদিনের সিংহ-সুতগণ ছিল চরম বিদ্রোহী, মহানাদের আর্য্য মন্দিরে জড় জগতের জরা ব্যাধি মৃত্যু আদি সব নিয়মের বিরুদ্ধে করিয়াছিল যুদ্ধ ঘোষণা। সিংহবংশ এখন দরিদ্র, আর যোগ নাই, তপস্যা নাই, সাধনা নাই, পরমতত্ত্বের জ্ঞান সে হারাইয়া বসিয়া আছে—অন্তরকে ভুলিয়া বাহিরকে নিয়ে। জীবনে সে সত্যকে রূপ দেয় না, কর্ম্মে সে সত্যকে ফোটায় না—

সফল করে না। সে আর বোঝেনা যে, তাহার মহানাদ আসল দেবতার মন্দির, জাগ্রত জীবন্ত ভগবানের দেউল। অন্তরের জ্ঞান কর্ম্ম ও প্রেমের ত্রিবেণী তার হারাইয়া গিয়া বাহিরের ত্রিবেণী-সঙ্গমের কর্দ্দমই হইয়াছে সার। সিংহবংশের জীবন-তরণী নিবিড় কালবৈশাখীর কোলে দুলিতেছে, কোন্ দুর্গম দুস্তর অকূল পথে না জানি বানের টানে চলিয়া যাইতেছে।

বঙ্গদেশে মৌদ্গল্য গোত্রীয় সিংহবংশ দরিদ্র হইলেও বংশ মর্য্যাদা, বিদ্যা, ধন ও পদপ্রতিষ্ঠায় একটি বিশিষ্ট গৌরবের অধিকারী। মহানাদের সিংহবংশ বাঙ্গলার ইতিহাসে বাঙ্গলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইতিহাসের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত।

"গৌরবের কথা যত, গাঁথা মনে অবিরত,
মানাদের স্বাধীনতা নহে ত কাহিনী।"

ভীষণ শাসন দ্বারা সুরক্ষিত ছিল বলিয়া মহানাদ সৌধমালাকীর্ণ ছিল, হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর উচ্চ সুবর্ণ মণ্ডিত মন্দিরে নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মহানাদ এইক্ষণ স্মৃতির শ্মশান। পুরাতন স্মৃতির জ্বলন্ত ইন্ধনে রাবণের চিতা জ্বলিতেছে—স্বর্ণপ্রসূ সিংহল পাটনের—মহানাদের পাষাণ বুকে; আর এক চিতা জ্বলিতেছে লুপ্ত সিংহপুরের উর্ব্বর বক্ষে।

মানুষ একদিন মহানাদের মাটিতে সভ্যতার উচ্চস্তরে উঠিয়াছিল। অন্ধকার হইতে আলোকে, মৃত্যু হইতে অমৃতের দিকে চলিয়াছিল। হাতে তার জ্ঞানের মশাল। মহানাদের সিংহবংশ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়া আছে; এই যে দুঃখ ইহার মূলে অদৃষ্টের অত্যাচার নয়—মানুষের অবিচার। মহানাদের ইতিহাসে সিংহবংশ যেদিন ফুটিয়া উঠিবে,—নীল নির্ম্মল আকাশের নিম্নে সেই মুহূর্ত্তে সে মুক্তির আনন্দের মধ্যে নব গৌরবে বাঁচিয়া উঠিবে।

প্রকৃতি ভেদেই কর্ম্মভেদের সৃষ্টি হইতেছে। আমরা যতক্ষণ কল্পনার জগতে বিচরণ করি ততক্ষণই ভাল; বাস্তব জগতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে অপ্রিয় বোধ হয়,—সেখানে যে সত্য জীবনের পরিচয় দিতে হয়। স্বপ্নভাঙ্গার ভয়ে চক্ষু বুজিয়া থাকি। এই যে নিজের কণ্ঠনালী ছিন্ন করিয়া নিজের রক্ত পান করার ভীষণ ছিন্নমস্তার বীভৎস উপাসনা—এ নেশা কি সিংহ বংশের দূর হইবেনা! মহানাদের সিংহ রাজবংশ বিধাতার বরদৃপ্ত শক্তির সন্তান, সে বংশের অধিকার কেহ কি কাড়িয়া রাখিতে পারে? সে একদিন ছিল মহানাদের সিংহ রাজবাটীতে প্রতি ধমনীর মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা, মুক্তির মন্ত্রে মাথা দেওয়ার করুণ নিবেদন, সে যুগ অন্তরে বাহিরে সমান মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রুদ্রকে জাগাইয়াছিল। যে সিংহ বংশের আত্মদানের ইতিহাস ছত্রে ছত্রে রোমহর্ষণ সৃজন করে, তাহার পরিচয় বাঙ্গলার ইতিহাসে এতদিন লিখিত হয় নাই। বংশের চেতনার বিদ্যুৎ-রেখাটুকু আশ্রয় করিয়াই বংশধরদের বুকে ভবিষ্যরূপ ফুটিয়া উঠিতে পারে। সিংহ বংশকে জাগাইতে মহানাদ মঙ্গল শঙ্খ বাজাইল।

ব্যবহারিক জীবনের কোনও বৃহৎ সমস্যা দীর্ঘ-চারি শতাব্দী এই সিংহবংশকে কর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষিত করে নাই। উর্ব্বর পলি-মৃত্তিকা ও বালুচরের উপর সে আবার সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাভূমি নির্ম্মাণের প্রয়াস করে নাই। ভাবজীবনই এই সিংহবংশের সত্যকার জীবন; সমাজ বা রাষ্ট্রে সে কোনওরূপে টিকিয়া থাকিতে চায়, সেখানে তাহার কোনরূপ আত্ম প্রসারের চেষ্টা নাই, ভাবের ধাক্কা ভিন্ন আর কোনও প্রয়োজনে সে সাড়া দেয়না। এজন্য, অলস, আত্ম-তৃপ্ত, নিরুৎসাহ, নিঃসাহস, তর্কপ্রিয়, বচন-বিলাসী প্রভৃতি বিশেষণের সে যথার্থই উপযুক্ত! দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বে সিংহবংশের রক্ত, ভাষা, এমনকি তাহার বাস্তু সীমান্তের পরিচয় পর্য্যন্ত অনুমান সাপেক্ষ। যতদিন বাঙ্গলার চন্দ্রকেতুর রাজবংশের ইতিহাস উদ্ধার না হইতেছে, ততদিন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া

কোনওরূপে একটা কয়কোষ্ঠী নির্ণয় করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পাঞ্জাবের ইতিহাস বাঙ্গালার সিংহলের ইতিহাস নয়। বেদ, বেদান্ত, ষড়দর্শনের মনীষা, ভাস কালিদাসের—ভবভূতির প্রতিভা, অজন্তা—কোণারক—এলিফাণ্টা—খণ্ডগিরির শিল্প চাতুর্য্য সিংহবংশের পরিচয় পত্র নয়। মহানাদ গড়িবার স্ফূর্ত্তিতে সে প্রথম প্রচণ্ড বাধা পাইয়াছে মুসলমান অধিকার কালে। এই সময় হইতে মহানাদের মাটিতে এমন একজন কবি জন্মিলনা, যাহার বাণীতে হিমালয়ের বিরাট গাম্ভীর্য্য বা বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গোচ্ছাস প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়! এককালে পৃথিবী যাহার গৃহপ্রাঙ্গণ ছিল, গিরি লঙ্ঘন ও সমুদ্র পারাপার যাহার নিত্যকর্ম্ম ছিল, সে এক্ষণে আম্রবনচ্ছায়ে সুপ্ত, গুপ্ত অথবা লুপ্ত হইয়াই রহিল! তার গানে ছন্দের পক্ষ বিস্তার নাই, তার কাব্যে কল্পনার নিরুদ্দেশ যাত্রা নাই। বাঙ্গলার ইতিহাস আজ কতকগুলি গ্রাম্য গীতি ও গাথা এবং গৃহদেবতার মহিমা বর্ণনই তাহার শেষ নিদর্শন। বৌদ্ধ হিন্দুর নব সমন্বয়ের যুগে মহানাদের সিংহবংশের কীর্ত্তির স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সংবাদ ঐতিহাসিকের বিস্ময় উৎপাদন করে। সিংহবংশীয় সন্তানদের আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে। জাতি হিসাবে সে এখন কাণ্যকুব্জাগত কায়স্থের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করে না। "মহানাদ" তাহার মনের দুয়ার জানালা খুলিয়া দিতেছে, তাই বহুকাল মুক্ত অসাড় প্রাণ-ধর্ম্ম আবার এক নব জাগরণে জাগিয়া উঠিয়াছে।

"মুরগীগুলো দেখতে ভাল
মাথায় রাঙ্গা ফুল,
আনবো তার ধরে দু'টো
যায় যাবে জাতকুল।"

ইতিহাসের চয়ন।

সৃষ্টির আদি হইতে কলিযুগের আদি পর্য্যন্ত ১৯৬৯৯২০০০০ বর্ষ, শকাব্দের আদি পর্য্যন্ত গত কলিবর্ষ ৩১৭৯, বর্ত্তমান শকবর্ষ—১৮৫২ = মোট ১৯৬৯৯২৫০৩১ বর্ষ। দিনের পর মাস, মাসের পর বৎসর, অবাধে চলিয়া যাইতেছে। বিশ্বপ্রণেতার গূঢ় রহস্য উদ্ভেদ করা মানব-বুদ্ধির অতীত।

সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি এবং তন্মধ্যে ভাসমান একটি পদ্মপত্র ভিন্ন আর কিছুই ছিলনা। প্রজাপতি বরাহ স্বরূপ হইয়া সেই জলরাশিতে প্রবেশ করিয়া মৃত্তিকা উত্তোলন করেন, এই মৃত্তিকা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করিয়া প্রস্তর খণ্ড দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

সৃষ্টি ব্যাপারের উপাদান-কারণ পঞ্চভূত এবং নিমিত্ত-কারণ সৃজ্যমান পদার্থ সমূহের ধর্ম্মাধর্ম্ম।

রহস্যময়ী প্রকৃতির সহস্র সহস্র প্রহেলিকার মধ্যে এই পৃথিবীতে জীবের প্রথম আবির্ভাব এক অতি গুঢ় রহস্যপূর্ণ ব্যাপার। এ মহাব্যাপার আজও গাঢ়তম অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

বিখ্যাত ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক প্রফেসর হ্যালডেন অল্পদিন হইল (২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১) লণ্ডনের রয়েল ইনষ্টিটিউশনে বলিয়াছেন,—"সভ্যতার প্রথম সূচনা ৪টি বিভিন্ন স্থানে এবং স্বতন্ত্রভাবে আত্ম প্রকাশ করিয়াছিল,—একটি সম্ভবতঃ মিশরে এবং অপর কয়টি আফগানি স্থানে ও পঞ্জাবের মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানে দেখা দিয়াছিল।" প্রফেসর তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, "লোকের বিশ্বাস এই যে, মানব জাতির প্রথম জন্ম স্বর্গোদ্যানে এবং সম্ভবতঃ মিসর চীন বা অন্য কোথাও; কিন্তু এক্ষণে বোধ

হইতেছে যে, ৪টি বিভিন্ন স্থানে মানব জাতির প্রথম সৃষ্টি হয় এবং এই ৪টি জাতির পরস্পর বৈষম্যও খুব স্পষ্ট। মানব জাতির ধমনীতে যে শোণিত প্রবাহ চলিতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতেছে যে, এই রক্তের সম্বন্ধ চারি প্রকারের, ইহা দ্বারা বর্ত্তমান মানব জাতিকে মোটামোটি চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।" এই মতবাদ হইতে একই মানব জাতির নানাদেশে পরিব্যাপ্তির মত খণ্ডন হউক বা না হউক, ঐ চারি জাতি চতুর্ব্বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হইবে কি ?

মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই যখন কাঁদিল, তখন হইতেই মুক্তির মোহ তাহাকে পাইয়া বসিল।

ভগবান মানুষকে একটি অনন্য সাধারণ বস্তু দান করিয়াছেন, তাহার বলে সে অনন্ত উন্নতির অধিকারী। এইখানেই মানব সৃষ্টির বৈশিষ্ট।

বামন পুরাণাদিতে বর্ণিত হইয়াছে,—উত্তরে তুরস্ক Turkey), দক্ষিণে অন্ধ্র (Pacific ocean Islands), পশ্চিমে যবনদেশ (Ionia, Morecco, Greece, Illyria প্রভৃতি) পূর্ব্বে কিরাত (Crete) মধ্যে ভূমধ্য সাগর, এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী দেশ—প্রাচীন ভারতবর্ষ, জম্বুদ্বীপ বা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী নামে অভিহিত।

রামায়ণ যুগে—রামচন্দ্র ও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা স্বর্গারোহণের পূর্ব্বেই আপনাদের বিস্তীর্ণ রাজত্ব আপনার চারি ভ্রাতার আট পুত্রকে বিভাগ করিয়া দেন। রামচন্দ্রের পূর্ব্বের ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই।

রামচন্দ্রের বংশধরেরা কয়েক পুরুষ রাজত্ব করার পর গঙ্গার ধারে হস্তিনাপুরে কুরুবংশীয় রাজারা পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন। এবং কুরুকুলের একজন রাজা মগধ অধিকার করিয়া তথায় গিরিব্রজ নামক নগরের ধ্বংস করিয়া রাজগৃহ নগর স্থাপন পূর্ব্বক সিংহলপাটন রাজ্য উচ্ছেদ করিতে দলবদ্ধ হন।

রামকে আশ্রয় করিয়া রামায়ণ রচিত হইয়াছে, কিন্তু রচনাকারী ব্রাহ্মণ। রাম ও কুরু পাণ্ডব ক্ষত্রিয়।

কুরুবংশের গৃহ বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় কুরুক্ষেত্রের ভীষণ যুদ্ধ হইল। তাহাতে বড় বড় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, শূর, অসুর রাজা মারা পড়িলেন। তাহার পর যদুবংশ ধ্বংস হইল।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির সমস্ত ভারতের সম্রাট হইলেন। তাঁহার পর পরীক্ষিৎ সম্রাট হন।

যিনি বেদকে বিভাগ করেন, তিনিই বেদব্যাস। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বিবরণ লইয়া তিন বৎসর পরিশ্রম করিয়া তিনি একখানি ভারত-সংহিতা মহাকাব্য রচনা করেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতেরা ইহাকে ইতিহাস গ্রন্থ—মহাভারত বলিয়া মনে করিতেন। বেদব্যাস ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আঠার খানি মহাপুরাণ ও অনেকগুলি উপপুরাণ লিখিবার মাল মসলা রাখিয়া যান।

পরীক্ষিৎ-পুত্র জনমেজয় রাজা হন, ইনি নাগবংশ ধ্বংস করেন। তখন বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে সমস্ত মহাভারত শুনাইলেন। এইরূপে তক্ষশিলায় সর্ব্ব প্রথম মহাভারতের প্রচার হয়। সম্রাট জনমেজয়ের পুত্র শতানীকও অত্যন্ত ইতিহাস প্রিয় ছিলেন। প্রবাদ যে, শতানীকই ভবিষ্যপুরাণের কর্ত্তা।

শতানীকের পৌত্র অধিসীম কৃষ্ণের পুত্রের সময় গঙ্গার ভাঙ্গনে প্রাচীন হস্তিনানগরী ধ্বংস হইয়া যায়। তখন কৌশাম্বীনগরে রাজধানী তুলিয়া আনা হয়। অনেক পুরুষ পরে উদয় নামে একজন রাজা হন। ক্রমে কুরুবংশ হীনপ্রভ হইল। বংশধরেরা এখনও ভারতবর্ষের নানা স্থানে বর্ত্তমান আছেন।

জরাসন্ধ মগধের রাজা ছিলেন, যুধিষ্ঠিরের সময়। কুরুবংশ হীনপ্রভ হইলে জরাসন্ধের বংশ স্বাধীন হইলেন। তাঁহাদেরই একজন মন্ত্রী শিশুনাগ রাজাকে হত্যা করিয়া নিজেই মগধের কর্ত্তা হইয়া দাঁড়াইলেন।

আর্য্য-শাসিত ভারতে জগৎবরেণ্য ব্রাহ্মণ ও অসিজীবী মসীজীবী ক্ষত্রিয় মিলিয়া কাজ করায় ভীষণরূপ অন্তর্বিদ্রোহ ঘটে নাই।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর, যদুবংশ ধ্বংসের পর সিংহল পাটন ধ্বংসের ইতিহাস আমাদের নাই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে,—"এই দীর্ঘ সময়ের ইতিহাসই নাই।" ইহা রাঢ়ের দুর্ভাগ্য।

যযাতি তনয় যদুবংশধরগণ যাদব * নামে অভিহিত। শ্রীকৃষ্ণের বংশধর যাদবগণ তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। অধিকদূর মহাপ্রস্থানে অগ্রসর হইতে না পারিয়া তাঁহারা সিন্ধুনদের পরপারস্থ জাবালি স্থানে উপনিবিষ্ট হইলেন এবং গজনী নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় রাজপাট স্থাপন করিলেন। খৃঃ পূঃ ৯০০ হইতে দুই শত বর্ষ পর্য্যন্ত পারস্য ও গ্রীক দিগের তাড়নায় তাঁহারা পুনরায় ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। তুয়ার যদুকুলের অন্যতম শাখা। মহাকবি চাঁদভট্ট ইহাকে পাণ্ডুর শাখাকুল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের রাজত্বকাল ভারতের সুবর্ণযুগ। তখন ভারতবর্ষ জগন্মান্য পণ্ডিতবর্গে অলঙ্কৃত হইয়া সভ্য জগতের শীর্ষস্থল অধিকার করিয়াছিল। ভারতের সার্ব্বভৌম আধিপত্য লাভের জন্য সূর্য্য-বংশীয় রাঠোরগণের দারুণ গৌরব লিপ্সাই ভারতরাণীর কণ্ঠে যবনের দাসত্ব হার পরাইয়া দিয়াছিল। বাস্তবিক অতলস্পর্শ গভীর রত্নাকরের মধ্যে কত রত্নই যে লোকলোচনের অগোচর রহিয়াছে এবং কত সুন্দর ও সুগন্ধ কুসুমরাজি মরুভূমির সুতপ্তক্ষেত্রে উৎপন্ন হইয়া মানবগণের অজ্ঞাতসারে ও অদৃশ্যভাবে পরিশুষ্ক ও বিলীন হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে, তাহাদের সীমা সংখ্যা কে করিবে?

* যদু হইতে যাদব, তুর্ব্বসু হইতে যবন, দ্রুহ্য হইতে বৈভোজ, অণু হইতে ম্লেচ্ছজাতি এবং পুরু হইতে পৌরব বংশ উৎপন্ন হইল।

প্রজাপতি সোম কুরুকুলের পূর্ব্বপুরুষ। নহুষ নন্দন যযাতি সেই সোমের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। পুরু, বৃষপর্ব্বার দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যদু অমিত তেজা শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর গর্ভে সমুৎপন্ন হয়েন। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত বীর হইতেই যাদব (Judea) গণের বংশ বিস্তৃত হইয়াছে। যযাতি, পুত্রের গর্ব্ব দর্শনে নিতান্ত ক্রোধাভিভূত হইয়া তাঁহাকে অভিশপ্ত ও রাজ্যচ্যুত করিলেন।

পৌরব বংশীয় রাজারাও যে পশ্চিমে পঞ্চনদ হইতে পূর্ব্বদিকে মগধ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাহার সাক্ষ্য প্রত্যেক পুরাণেই পাওয়া যায়। অম্বর বংশীয় রাজাদের সিংহল পাটন আক্রমণ করিতে, পৌরব বংশীয় রাজাদের কখন সাহস হইয়াছিল মনে হয় না।

ভরতদিগের রাজার নাম সুদাস এবং তাঁহার গৃহ পুরোহিতের নাম বশিষ্ঠ ছিল। পুরোহিতের নেতৃত্বের প্রভাবে সুদাস তাঁহার প্রকাণ্ড শত্রুদলকে বিপাসা এবং শতদ্রু নদীর তীরে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অজমীঢ় নৃপতির অনেকগুলি পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে নীলী বা নীলিনী রাণীর পুত্র হইতে পঞ্চালগণ, ধূমিনী বা ধূম্রবর্ণা নাম্নিকা রাণীর পুত্র হইতে কুরুগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। নীলীরাণী হইতে যে বংশধারা প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইতে উত্তরকালে মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর এবং কাম্পিল্য নামে পঞ্চ ভ্রাতার জন্ম হয়। এই পঞ্চ ভ্রাতার শাসিত জনপদের নাম পাঞ্চাল এবং বংশও পাঞ্চাল নামে প্রথিত হয়। উক্ত পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুদ্গলের বংশে দিবোদাস, তাঁহার পুত্র চ্যবন বা পিজবন এবং পৌত্র সুদাস জন্মগ্রহণ করেন। ধূমিনী বা ধূম্রবর্ণার পুত্র হইতে কুরুগণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

শক, নাগ, অসুর জাতিরা ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হইতে কৃষ্ণ সমুদ্র, কাশ্যপ সমুদ্র, পারস্য সমুদ্র, লোহিত সমুদ্র, ভূমধ্য সমুদ্র পর্য্যন্ত সকল স্থানই অধিকার করিয়াছিলেন। রাক্ষসকুল পুলস্ত মুনির বংশ।

কাপাডোমিয়া দেশের আবিস্কৃত মৃন্ময় সন্ধিপত্র ও পত্রাবলী এবং আসিরীয়া দেশের রাজা অসুরবাণী পালের বা অসুর অবনীপালের পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত মৃন্ময়ী লিপিমালার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া বলা যায়,—খৃঃ পূঃ ১৫০০ শতাব্দের কাছাকাছি সময়ে পশ্চিম এসিয়া মাইনরের উত্তরাংশ হইতে ব্যাবিলনের উত্তর পশ্চিমাংশ দিয়া পূর্ব্বদিকে মিডিয়া দেশ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে যে "আর্য্য" নামক কুলের নানা জাতির লোকে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারিত করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সেই সময়ের পূর্ব্বে বা পরে আর্য্য কুলের কোন কোন জাতি বা দল "য়ন-মিডি" হইতে পূর্ব্ব এবং উত্তর দিকে অক্সাস (Oxus) এবং জাকজার্তিস (বৈদিক বংক্ষু বা রক্ষু ও সীতা এবং আধুনিক আমুদরিয়া সীরদরিয়া) নদীর উপকূল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ফিজিয়ান নামে এক জাতি পশ্চিম এসিয়ায় ছিল। ইহারা বেদের বৃজি জাতি। কালক ও কালতোয়, যবন বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

যদি আক্রমণকারী আর্য্যগণ হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালার পশ্চিমাংশের দুয়ার দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া তথা হইতে সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকেন, ঋগ্বেদে তাঁহাদের এই অভিযানের কোনই প্রমাণ বা আভাস পর্য্যন্ত নাই; এবং ঋগ্বেদের অধিকাংশই সরস্বতী নদীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশেই রচিত বলিয়া মনে হয়।

খড়্গ বংশের পতনের পর হইতে শকাব্দ ৯১০ বা খৃঃ ৯৮৮ বর্ম্মবংশের অভ্যুত্থান পর্য্যন্ত বাঙ্গলার ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন।

দৈবযুগের গ্রন্থ ব্রহ্মসংহিতা, প্রজাপতি সংহিতা, অগ্নিসংহিতা ও বলভিৎ-সংহিতা, বোধ হয় এই যুগের কাল—বৈদিক যুগের পূর্ব্বে। এই যুগের কাল লুকাইয়া রাখিয়াই বিদেশীয় লেখকেরা ভারত-সভ্যতার আয়ু মিশর প্রভৃতি দেশের সভ্যতার যুগ হইতে নিম্নে রাখিতে চাহেন।

শিশুনাগ মগধের রাজা হইয়া বসেন এবং চারিদিকে রাজ্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি রাজা হইয়াই এক পরোয়ানা জারি করেন যে, আমার দরবারে কেহ ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ প্রভৃতি অক্ষর উচ্চারণ করিতে পারিবেন না। তিনি সংস্কৃত ভাষা ত্যাগ করিয়া প্রাকৃত ভাষার প্রচলন করিয়া দেন। আর্য্যাবর্ত্তে এই সময় যে ১৬টি রাজ্য ছিল, তাহাতে সিংহল পাটনের নাম দৃষ্ট হয় না।

শাক্যবংশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিলেন। বৈশালীরই এক বংশে বর্দ্ধমান বা মহাবীর নামে একজন সিদ্ধ পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়া পার্শ্বনাথের জৈন-ধর্ম্মের সংস্কার করেন। এই সময় হইতে ভারতবর্ষের ইতিহাস একরূপ ঠিকই আছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম ত্রিপিটক। জৈনদের দিগম্বরদিগের পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, শ্বেতাম্বরদিগের প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। বুদ্ধজন্মের ৪০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে জৈন-ধর্ম্মের সংস্কার হয়। এই ধর্ম্ম মিশর দেশেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

গ্রীক-বর্ব্বরদল পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া পাঞ্জাব লুট করিয়া যায়। পরে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য গ্রীক দস্যুদিগকে তাড়াইয়া তক্ষশিলা এমন কি সমস্ত আফগানিস্থান পর্য্যন্ত হিন্দু সামাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

শুঙ্গ রাজবংশের সময় ব্রাহ্মণদের স্মৃতি সংহিতাগুলি সরল ভাষায় রচিত ও সঙ্কলিত হয়। ব্রাহ্মণদিগের দর্শন ও বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলি কথিত ভাষায় অনুবাদিত হয়। রামায়ণ ও মহাভারত ও পুরাণগুলিকে এই সময় বর্ত্তমান আকারে আনিতে গিয়া প্রাচীন ইতিহাস গোলমাল হইয়াছে, সিংহল বা লঙ্কা—আধুনিক ভারতের তাম্রপর্ণি দ্বীপকেই গৃহীত হইয়াছে! মহাবংশ ও দ্বীপবংশ তাম্রপর্ণি দ্বীপ হইতে না প্রাপ্ত হইলে বিজয় সিংহের উপনিবেশ স্থাপনও লুপ্ত হইত।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পর একটি নব ভাবের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা আমরা দেখিতেছি, মহানাদের সিংহবংশ ইহাই দেখাইতেছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরই যুগান্তরের সূচনা হইয়াছে। ঐ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ একটি ঘটনা —গল্প নহে—যুগান্তকারী অতি ভয়ানক ঘটনা। এই ঘটনায় পৃথিবীর ইতিহাস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, মানুষের সাজানো বাগান শুকাইয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বনাট্যের এক অঙ্কের যবনিকা পাত হইল, নূতন আর্য্য অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হইবে। জীবনের আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইল, মানবের অনুভূতি ও চিন্তা বদলাইয়া গেল। এই পরিবর্ত্তনের নাম যুগান্তর। এই যুগান্তরের মুখে এই যুগান্তরের বিভিন্ন মুখী শক্তি, চিন্তা ও চেষ্টাধারাকে নিজের জীবনে ও সাধনায় যিনি কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—"ব্রাহ্মণ অধম হইলেও বধ-যোগ্য নহে।" মহাভারতের সৌপ্তিক পর্ব্ব এখন যে আকারে রহিয়াছে, তাহা প্রাচীনতম মূল মহাভারতের অন্তর্গত নহে বলিয়াই মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণ কি, তাহাত আমরা জানি না, আমরা কেবল পাণ্ডবের কুললক্ষ্মী উত্তরার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি, এই বিশ্বাস ও নির্ভরভাব জানি। আমাদের নিকট এই অনুভূতিই প্রথম ও প্রধান সত্য। ভক্ত-হৃদয়ের সত্যতার উপরেই ভগবানের সত্তা, জ্ঞান, আনন্দ আস্বাদন ও লীলা। ভীষ্ম পিতামহের প্রতিজ্ঞা রক্ষা জগতে অতুলনীয়। শ্রীকৃষ্ণকে যাঁহারা চিনিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ভীষ্ম একজন প্রধান। রাজসূয় যজ্ঞের সময় তিনি ভারতের রাজবৃন্দকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা সকলে একমত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকার কর।" এই উপদেশ করার জন্য তিনি শিশুপাল কর্ত্তৃক কদর্য্য ভাবে নিন্দিত হইয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম কি ভয়ঙ্কর! সৃষ্টিচক্র প্রবর্ত্তিত হওয়ার পর হইতেই দেবতা ও অসুরে (Ahura-Mazda) যুদ্ধ, চির সমুদ্র মন্থন চলিতেছে।

আলোকের পুত্রগণের সহিত আঁধারের পুত্রগণ সংগ্রাম করিতেছে! কুরুক্ষেত্রে অসুর তখন বাহিরের লোক নহে, ভিতরের—কামরূপ আসামের। আসামের লোক অসুর প্রকৃতির তাহা আজিও দেখা যায়।

কুরুক্ষেত্রে দেবতারাও ধর্ম্মবদ্ধ হইয়া অসুরের স্বপক্ষ হইয়াছেন; কাজেই কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম বড়ই কঠিন হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ডের বা সৌরমণ্ডলের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের এখন কোনই জ্ঞান নাই, কিন্তু মানবের জ্ঞান-বিকাশে এমন এক দিন আসিবে, যেদিন সৌরমণ্ডলের ইতিহাসও আমরা বুঝিতে পারিব।

প্রাচীনকালে যুদ্ধের দ্বারা মানব জাতির বিকাশে যে সাহায্য হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা অহিংসা-ধর্ম্মের নিতান্ত গোঁড়ামীর পরিচায়ক। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন বিকাশে যুদ্ধের এই উপযোগীতাকে লক্ষ্য করিয়াই গীতা যুদ্ধকে স্বর্গদ্বারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যুদ্ধেই ক্ষত্রিয়ের আনন্দ;

ভারতের ক্ষাত্রশক্তি কি প্রবল না হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তি চূর্ণ না হইলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষ মাথা তুলিতে পারিত না; ভারতের ক্ষেত্রে—এই দেব নির্ম্মিত কর্ম্মভূমিতে মহামানবের মহামিলনেরও সম্ভাবনা হইতনা। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের প্রকৃত গভীর মর্ম্ম অবধারিত হইতে এখনও বিলম্ব আছে।

সম্রাট যুধিষ্ঠির পরীক্ষিতকে হস্তিনাপুরের ময়ুর সিংহাসনে আর অনিরুদ্ধের পুত্র বজ্রকে মথুরার হংস সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়া মহাপ্রস্থানে গমন করিলেন। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ একটি রহস্য। পুরাণের উপাখ্যান যে সাধারণ গল্প নহে, ইহা মানব বুঝে না, তাই সাহেব সাজিয়া চশমা চোখে দিয়া আবোল তাবোল বকে। পুরাণের মধ্য দিয়া এই ভারতীয় আর্য্য জাতির আধ্যাত্মিক মনীষা পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের সমগ্র সাধনার প্রতিবিম্ব এই পৌরাণিক সাহিত্যেই পাওয়া যায়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অবিকৃত হৃদয়-স্পন্দন যদি যথাযথরূপে হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে এই পৌরাণিক সাহিত্যেরই শরণাপন্ন হইতে হইবে। যাহার দ্বারা বেদের অর্থ পূর্ণ হইয়াছে, তাহার নাম পুরাণ। পুরাণ পঞ্চম বেদ। পুরাণের প্রকৃত অর্থ দুর্ব্বোধ্য। এই ব্রহ্মাণ্ড বহু সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জলে শয়ান ছিল, এই সময় সৌরমণ্ডলে "ওকার" মহানাদ—শব্দ (Word) ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।

যোগিতন্ত্রকলা ও অনাদি পুরাণে "নিলবেদ ও শোসম্বেদ" নামে আরও দুই খানি বেদের উল্লেখ পাইয়াছি।

"সামবেদ যজুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদ ঋগ্বেদ আর।
নিল অনিল বেদ ষষ্ঠম বেদ সার॥
"পঞ্চমুখী ব্রহ্মা এক মুখ কাটিয়াছে রুদ্র।
সেই মুখ হইতে সুসম্বনা বেদ উৎপন্ন॥"

অগ্নিধ্রের পুত্রের নাম নাভি, নাভির স্ত্রীর নাম সুদেবী। তৎপুত্র ঋষভদেব (দেব উপাধি দেখিয়া আধুনিক কোন ইতিহাস লেখক বটুভট্টের দেববংশীয় মনে না করেন।) ঋষভদেব মুক্তসঙ্গ, সমদর্শী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিত্য সমাধি আশ্রয় পূর্ব্বক পরমহংস পদের চিন্তা করিতেন। বেদব্যাস বেদ বিভাগ করিলেন, ভারত-সংহিতা রচনা করিলেন। অপ্রসন্নচিত্তে বেদব্যাস সরস্বতী নদী তীরে বসিয়া আছেন, সেই সময়ে নারদ (Nimrod) আসিয়া তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। নারদ একাধিক ছিলেন। কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধের আয়োজন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলা অপ্রকটের কাল পর্য্যন্ত বিদুর তীর্থ পর্য্যটন করিতেছিলেন, ভারতের ইতিহাসে কত বড় বড় ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি জানিতেন না।

যে সময় মহাভারত লেখা হয়, তখন দুর্গার পূজা খুব প্রতিষ্ঠিত। অথর্ব্ববেদে রুদ্র ঠিক শিবে পরিণত হয় নাই, অম্বিকা তাঁহার সহচারিণী ভগিনীমাত্র ছিলেন। যজুর্ব্বেদে অম্বিকা রুদ্রের পত্নী নহেন, ইনি রুদ্রের ভগিনী। সমধিক আরও প্রাচীন যুগে এই অম্বিকার পর্ব্বতের সহিত সংস্রব ছিল। হিমালয়ের শিখরবিশেষ কোন সময়ে দেবীরূপে পূজিত হইত এবং এই দেবীই হৈমবতী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনিই হিমালয়ের শিখররূপ পর্ব্বতকন্যা, সুতরাং ইনি পার্ব্বতী। ইনিই পরে উমা ও হৈমবতী নামে অভিহিত হন।

মানাধিষ্ঠাত্রী দেবতা চামুণ্ডা, তাঁহার একটা বিশেষ পূজা আছে, তাহার নাম সন্ধিপূজা। দুর্গার বসন্ত কালে পূজা হইত, রামচন্দ্র শরৎকালে সেই পূজা আরম্ভ করেন, ইহাই আমাদের দেশের সংস্কার। বাল্মিকী রামায়ণে, কুম্ভঘোনমের রামায়ণে, তুলসী দাসের রামায়ণে, রামরসায়নে নাই—আছে কেবল কৃত্তিবাসে। চণ্ডীতেও পূজা শরৎকালের পূজা বলিয়াই বর্ণনা আছে। বহুকাল ধরিয়া শরৎকালে একটি মহাপূজা হইত। মনে হয় সেটি নবপত্রিকা পূজা। মেধস ঋষির কথা শুনিয়া সুরথ রাজা মাটির মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন। সে মূর্ত্তি যে কি, তাহা ঋষি বলেন নাই। সে মূর্ত্তি দশভূজা কি না, তাহা কেহ জানে না। তবে শারদীয়া পূজায় মূর্ত্তিপূজা এই আরম্ভ। ডাকিনী শাকিনীর পূজা খৃষ্টীয় আট শতকের পূর্ব্বে ছিল বোধ হয় না। কারণ মহাযান ও মন্ত্রযানের পরে বজ্রযান কালচক্রযানেই ডাক-ডাকিনী শাক-শাকিনী প্রভৃতি উপদেবতার পূজার কথা পাওয়া যায়। দুর্গোৎসবের পুথি খুঁজিতে গেলে আমরা দুর্গোৎসব সম্বন্ধে যে প্রাচীন পুস্তক পাইয়াছি তাহা শূলপাণির লেখা। শূলপাণি তাঁহার গ্রন্থে মাধবাচার্য্যের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে ১৩৫০ খৃঃ পূর্ব্বে ফেলা চলে না। তিনি তাঁহার পুস্তকে জিকন ও ধনঞ্জয়ের মত তুলিয়াছেন রায় মুকুট

১৪৩১ খৃঃ তাঁহার পুস্তকাদি লেখেন, তিনি কিন্তু দুর্গোৎসবের কথা বলেন নাই। তাঁহার স্মৃতির পুস্তকে বরং জগদ্ধাত্রী পূজার কথা আছে, কিন্তু দুর্গোৎসবের কথা নাই।

বাল্মিকী, কালিদাস প্রভৃতি পৃথিবীর মহাকবিগণের কাব্য বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। তখন ছাপাখানা ছিলনা। এক এক খানা কাব্যের এক একটি প্রতিলিপি করিতে অনেক সময় লাগিত। এই সকল কাব্যের রচনা কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে নৈসর্গিক নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, রাষ্ট্রবিপ্লব অনেকবার হইয়াছে। তাহাতে কত নগরী, কত প্রাসাদ, কত প্রস্তর ও ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি বিনষ্ট ভগ্ন বা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণগণ যেমন বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা হইয়া সমাজে উচ্চতর আসন লাভে যত্নপর ছিলেন, তেমনই ক্ষত্রিয় রাজগণ (সে সকল ক্ষত্রিয় আর ধরা পৃষ্ঠে নাই) উপনিষদ নিচয় প্রণয়ন করিয়া তাঁহারা যে ব্রাহ্মণাপেক্ষা হীন ছিলেন না, তাহা দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। পরন্তু বৈদিক জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ড লইয়া উভয় বর্ণমধ্যে একটা মনোমালিন্য ঘটিয়াছিল। ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিকালে এই বিবাদের পরিণাম অতীব শোচনীয় হইয়া উঠে। অগ্নিসম তেজস্বী পরশুরাম স্বভুজবীর্য্যবলে নিখিল ক্ষত্রিয় কুল উৎসাদন করিয়া তাঁহাদের রুধিরে স্যমন্ত পঞ্চকে পাঁচটি শোণিতময় হ্রদ প্রস্তুত করেন। তথায় তিনি তদীয় পিতৃগণের তর্পণ করিয়া নিদারুণ ক্রোধাগ্নি নির্ব্বাপিত করেন।

ব্রাহ্মণসহ ক্ষত্রিয়ের বিবাদের কারণ সম্বন্ধে পুরাণাবলীতে মতান্তর নাই। ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের প্রথম সংঘর্ষ স্বায়ম্ভুব মনুর মন্বন্তরে ঘটে।

দণ্ডক নৃপগণের রাজ্য ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। বিন্ধ্য ও শৈবাল পর্ব্বতের মধ্যভাগে এই রাজ্য ছিল।

মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পা অঞ্চলে সম্বর দিগের যে (সুমেরু) কীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই নিদর্শনগুলি ১০,০০০ খৃঃ পূঃ বৎসরের। মহাভারতে তাহাদিগকে সৌবীর বলা হইয়াছে। তাহাদের ভাষাই শম্বর ভাষা। পরবর্ত্তীকালে তাহারা চাবড় বলিয়া খ্যাত হয়। সিন্ধু প্রদেশের সম্বরদিগের প্রতিবেশী অম্বর জাতি তাদৃশ শৌর্য্য সম্পন্ন ছিলনা, তথাপি তাহারা এক সময় রাঢ় প্রদেশ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহারাই আমোরাইট (Amorite)।

রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে পৌণ্ড্রদেশ দক্ষিণ দেশীয় জনপদ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। মহাভারতে উত্তর ভারতের জনপদ বলিয়া খ্যাত। মৎস্য পুরাণে প্রাচ্যদেশে। গরুড় পুরাণে ভারতের পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। বৃহৎ সংহিতায় পূর্ব্ব দেশের অন্তর্গত। কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন গৌড় রাজ্যের জয়ন্তের রাজধানী ছিল। মৌর্য্য সম্রাট বিন্দু-সরের মৃত্যুরপর তাঁহার মন্ত্রী বাঙ্গালী কায়স্থ রাধাকান্ত অশোককে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজর্ষি ময়ুরধ্বজ একটি নগর প্রস্তুত করেন। তিনি রতনপুরের রাজা ছিলেন। অনুমান ৫০০ খৃষ্টাব্দে তিনি তাম্রলিপ্ত নগর আক্রমণ করেন।

ময়ুরধ্বজবংশ উচ্ছেদ করিয়া কয়েক শতাব্দী পর দিব্য সিংহ তাম্রলিপ্ত জয় করিয়া মহানাদের সিংহবংশের প্রতাপ বাড়াইয়াছিলেন।

১৪১২ খৃষ্টাব্দে রাজা রাঘব সিংহ অতিবৃদ্ধ বয়সে তাম্রলিপ্ত রাজ ভাঙ্গর রায় ভুঁইয়াকে নিহত করেন। এই সময় মহানাদের সিংহাসনে রাজা গণেশ ভুঁইয়াকে দেখিতে পাই।

ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে নৃপতিগণের বংশ পর্য্যায় নিশ্চয়ই ক্রম ভঙ্গ হইয়া আছে, আর সেই জন্যই মিশর প্রভৃতির সহিত ভারতীয় প্রাচীন নৃপতিগণের সংখ্যার তারতম্য ঘটিয়াছে।

পৌরাণিক যুগে আসাম প্রদেশ প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর,কামরূপ,শোণিতপুর, তেজপুর, হিড়িম্ব, মণিপুর, কৌণ্ডিল্য প্রভৃতি প্রাচীন দেশগুলি বিভিন্ন নামে প্রচলিত ছিল, সে সময়কার ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এই আসামে অসুরদের আধিপত্য ছিল।

মহানাদ ও চক্রদহ মধ্যবর্ত্তী এই প্রাচীন ভূভাগ প্রাগ্‌বৈদিক, বৈদিক ও অবৈদিক সভ্যতার লীলাস্থলী। বেদ সংহিতা হইতে আমরা জানিতে পারি এখানে আর্য্য সভ্যতা বিস্তারের পূর্ব্বে পণি নামে এক সুসভ্য জাতির বাস ছিল, তাহারা ব্যবসা বাণিজ্য করিত। তাহাদের ঐশ্বর্য্য দর্শনে আর্য্যবীরগণের হৃদয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব সময় এই সমগ্র বঙ্গদেশ প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরের অধীন ছিল, প্রবল প্রতাপ মহারাজ ভগদত্ত এই প্রদেশের রাজা ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের মহা সমর প্রাঙ্গণে তিনি মহাবীর অর্জ্জুন কর্তৃক নিহত হইলে, তাঁহার বংশের ক্রমাগত ২৩ জন ভূপতি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। ঐতিহাসিকগণ এই সমস্ত ভূপতির রাজত্বকাল ২২০০ বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ ১৯০০+ ২২০০=৪১০০ বৎসর। এই হিসাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ১৯০০ খৃঃ পূঃ হয়না। ভবানী প্রসাদ নিয়োগী বলিয়াছেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ২৪৪৮ খৃষ্ট পূর্ব্ব হইয়াছিল। স্মিথ সাহেব লিখিয়াছেন—ইহা ৩১০২ খৃঃ পূঃ ঘটিয়াছিল। ঠিক কি কি প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ঐ তারিখ গ্রহণ করা যাইতে পারে, তাহা দেখান হয় নাই। শিশুপাল কর্ণকে বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ করিয়াছিলেন। সভাপর্ব্ব শিশুপালবধ পর্ব্বাধ্যায় ৯ম শ্লোক,—

"বঙ্গাঙ্গবিষয়াধ্যক্ষং সহস্রাক্ষসমং বলম্।
তংহিকর্ণ মিমং ভীষ্ম মহাপাপ বিকর্ষণম্॥"

অজমীঢ়ের নলিনী নামে যে ভার্য্যা ছিল, তাহাতে নীল নামা এক তনয় হয়। তাহার পুত্র শান্তি। শান্তির সন্তান সুশান্তি, তাহার পুত্র

পুরুজাত, তাহা হইতে অর্ক উৎপন্ন হন। অর্কের পুত্র ভস্মাস্ত, তাঁহার মুদ্গল প্রভৃতি বহুতর পুত্র হয়। অর্থাৎ মুদ্গল, যবীনর, বৃহদশ্ব, কাম্পিল এবং সঞ্জয় এই পঞ্চ সন্তান জন্মে। মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য নামক ব্রহ্ম গোত্র নিবৃত্ত হয়। ভস্মাস্ত পুত্র মুদ্গল হইতে শুভ নর মিথুন উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে দিবোদাস নর এবং অহল্যা নারী। সেই অহল্যা গৌতম হইতে শতানন্দ জন্মগ্রহণ করেন।

বশিষ্ঠ এবং ভার্গব পুরাতন ঋষি। বশিষ্ঠ অযোধ্যার (A—Judhea) ইক্ষাকু (Okka) বংশীয় রাজকুলের পুরোহিত ছিলেন। তাহার ৯।১০ পুরুষ পরে ভার্গব ঋষিদিগকে পশ্চিম ভারতে কচ্ছদেশে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং কেহ কেহ বলেন হৈহয় তালজঙ্ঘ রাজবংশ মেসোপোটেমিয়া হইতে পশ্চিম ভারত আক্রমণ করিয়াছিল এবং তাহারা ভার্গবদিগকে রাজপুরোহিতরূপে কচ্ছদেশে আনিয়াছিল। অথর্ব্বণ আঙ্গিরস ব্রাহ্মণ ঋষিকে ভার্গবদিগের কিছু পরে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদিগকে বিদেহরাজ হর্ষ্যশ্বের প্রথম কুলপুরোহিত বলিয়া কথিত হইয়াছে। হর্ষ্যশ্ব হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতের সমসাময়িক ছিলেন। হর্ষ্যশ্ব ও ব্রহ্মাশ্ব পারস্যতল সমুদ্রের তটস্থ উরনগর হইতে সমুদ্রের কিনারা দিয়া ক্রমে ক্রমে অগ্রসর ও গঙ্গাপার হইয়া আগমন করিয়াছিলেন। কাশ্যপ বংশীয় কাশ্যপ ঋষি ইঁহার সমসাময়িক। ভার্গব পরশুরাম হৈহয় রাজবংশ ধ্বংস করিয়া কাশ্যপকে (jupiter cassopeans) পৌরহিত্যে বরণ করেন।

আঙ্গিরস বংশোদ্ভব ঋষিরাই ঋগ্বেদের অত্যধিক ঋক্ রচনা করিয়াছিলেন। ভার্গববংশীয় ঋষি শুক্রাচার্য্য অসুরদিগের (Assyrians) কুল পুরোহিত ছিলেন।

ঋক্ সংহিতায় ঋভু—ইন্দ্র, অগ্নি ও আদিত্যের নামান্তর রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাণ মতে ঋভু ব্রহ্মার পুত্র, ইনি তপোবলে বিশুদ্ধ

জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। পুলস্ত পুত্র নিদাঘ ইঁহার শিষ্য। ঋক্‌বেদে ঋভুগণ অতিশয় কার্য্যকুশল, ইহারা ইন্দ্রের রথ ও অশ্বগণকে শোভান্বিত করিয়াছিলেন। আঙ্গিরস গোত্রীয় সুধম্বার তিন পুত্র। এই তিনজন বেদে ঋভবঃ (Orpheus) বলিয়া উল্লিখিত আছে।

ঋষভ দেব ক্ষত্রিয় জাতি ও পিঙ্গলবর্ণ, উৎপত্তির স্থান শাকদ্বীপ (Skythia), ব্রহ্মা ইহার ঋষি ও দেবতা (সঙ্গীত রত্নাকর)। ইনি ভাগবতোক্ত ২২ জন অবতারের মধ্যে অষ্টম। ইনি ভারতবর্ষাধিপতি নাভি রাজার ঔরসে মরুদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ঋষভদেব রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে ইন্দ্র তাঁহাকে জয়ন্তী নামে একটি কন্যা দান করেন। দৈবাৎ বনে দাবানল উত্থিত হইলে, সেই অনলে ঋষভদেব ভস্মীভূত হইলেন। জৈনরা এই ঋষভদেবকে আপনাদিগের আদি তীর্থঙ্কর বা আদিনাথ বলিয়া গ্রহণ করেন। ঋষভদেব সর্ব্বার্থসিদ্ধি নামক বিমান হইতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ধনুরাশিতে চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ইক্ষাকুবংশীয় নাভির ঔরসে মরুদেবীর গর্ভে বিনীতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নয় মাস চারি দিন মাত্র গর্ভে ছিলেন। এক বর্ষকাল নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া পুরীমতল নামক স্থানে আগমন করেন। এই স্থানে ফাল্গুন মাসে কৃষ্ণপক্ষে তিন দিন উপবাসের পর জ্ঞান লাভ করেণ।

দেবাসুরের যুদ্ধে দেবতাদের গুরু আঙ্গিরস ও বৃহস্পতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। রোহিতের শুনঃশেফ যজ্ঞে আঙ্গিরস ঋষি অজস্র পৌরহিত্য করিয়াছিলেন। বৃহস্পতির উতথ্য নামে সুবিখ্যাত এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার পত্নীর নাম মমতা। বৃহস্পতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করিয়াছিলেন। মমতার গর্ভে অন্ধ ভরদ্বাজ ঋষির জন্ম হয়। দীর্ঘতমা প্রদ্বেষী নাম্নী এক রমণীকে বিবাহ করিয়া তাহাতে গৌতম নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। দীর্ঘতমা ঋষি তাঁহার ভ্রাতা উতথ্য তনয় শরদ্বানের আশ্রমে বাস করিতেন। দীর্ঘতমা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা

শরদ্বানের পত্নীসহ সঙ্গত হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন। ইহাতে শরদ্বান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দেন। ভাসিতে ভাসিতে তিনি প্রায় ১০ মাইল দক্ষিণে আনব (মহানাদ) রাজা বলির রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। আনব রাজ্য সিংহল পাটন নামে অভিহিত ছিল। দীর্ঘতমা বৈশালী রাজ্যে গঙ্গাতীরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মামতেয় দীর্ঘতমা দুষ্মন্ত তনয় ভরতের রাজ্যাভিষেক করিয়াছিলেন।

ভরদ্বাজের সন্তান বিতথ ভরদ্বাজকে বৈশালীরাজ মরুত্ত তাহাদের বন্ধু রাজচক্রবর্ত্তী ভরতকে পোষ্যপুত্র দেন। আঙ্গিরস সম্বর্ত্ত ঋষি মরুত্তকে রাজ্যাভিষেক করিয়াছিলেন। মহাভারতে আর একজন ভরদ্বাজের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, সেই ভরদ্বাজের পুত্র—দ্রোণাচার্য্য ছিলেন। দ্রোণাচার্য্য পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদকে পরাজয় করিয়া মাকুন্দী এবং কাম্পিল্য নগরীতে রাজধানী সংস্থাপন করতঃ চর্ম্মন্বতী নদী পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে পাঞ্চালদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য কৌরব ও পাণ্ডব ক্ষত্রিয় কুলের অস্ত্র শিক্ষার গুরু ছিলেন। দ্রোণাচার্য্যের পুত্র—অশ্বত্থামা। আঙ্গিরস ঋষি গুরু অগ্নিবেশের শিষ্য দ্রোণাচার্য্য। ভরদ্বাজ গোত্রীয়দিগের গোত্রদেবী তারণী। তারণকে মহাভারতে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। বরাহ মিহিরের বৃহৎ-সংহিতায় তারণকে সূর্য্যার্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। তারণী বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী বাচ্য হইতে পারেন। স্কন্দপুরাণে ভরদ্বাজ বংশীয় ব্রাহ্মণগণের কমলা, মহালক্ষ্মী এবং যক্ষিণী—কুলদেবী ছিলেন।

শ্রীপঞ্চমীর দিনে স্কন্দের সহিত লক্ষ্মীর পরিণয় হইয়াছিল। কিন্তু এই তিথিতে লক্ষ্মী পূজা না পাইয়া সরস্বতী পূজা পাইতেছেন। নারদীয় পুরাণে ও কূর্ম্মপুরাণের মতে সরস্বতী শিবের কন্যা—লক্ষ্মীর সহোদরা, কিন্তু দুর্গার কন্যা নহেন। তন্ত্রমতে ইনি শিব ও দুর্গা উভয়েরই কন্যা।

দেবীপুরাণে অনুরূপ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে সরস্বতীর শিব বা দুর্গা কাহারও সহিত সম্পর্ক নাই, সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণের মুখ-সমুদ্ভূতা। আবার অন্যান্য পুরাণের মতে সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী, গঙ্গা ও লক্ষ্মীর সপত্নী। অন্যদিকে সরস্বতী (Sarah and Abraham) ব্রহ্মার পত্নী, তিনিই সাবিত্রী—তিনিই গায়ত্রী, ব্রহ্মাণী বলিতে তাঁহাকেই বুঝায়। বৌদ্ধযুগে ব্রহ্মার নাম পরিবর্ত্তন হয়। তিনি মঞ্জুশ্রী নামে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার (কন্যা) সরস্বতী বামে পত্নীরূপে বীণাবাদিনী বাগ্দেবী উপবিষ্টা—চরণ যুগল প্রস্ফুটিত কমলের উপর ন্যস্ত; কিন্তু পাশেই পশুরাজ সিংহ শায়িত—উত্তর ভারতের হংস কিম্বা দাক্ষিণাত্যের ময়ুর কোনটিই নাই।

শশ্বতী সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম, মহর্ষি অঙ্গিরার কন্যা। পিতৃগৃহে জীবনের শিক্ষাকার্য্য সমাপ্ত করিয়া অবশেষে স্বেচ্ছায় আসঙ্গ নামক নরপতিকে পতিত্বে বরণ করেন। শশ্বতী নিজে সুশিক্ষিতা ব্রাহ্মণ কন্যা হইয়াও একজন ক্ষত্রিয় নরপতিকে পতিত্বে বরণ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই! কথিত আছে, রাজা আসঙ্গ এক সময়ে অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বামীর পূর্ণাঙ্গতা সাধনের জন্য শশ্বতী কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন, পত্নীর আরাধনায় ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিয়া আসঙ্গ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপেই দারিদ্র্য-ব্রতী ঋষি তনয়া শশ্বতা যৌবনে রাজৈশ্বর্য্য মণ্ডিতা হইয়াও আপনার সুশিক্ষিতা জীবনের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাহারও মতে মহানাদের সিংহ রাজবংশ এই শশ্বতী ও আসঙ্গর বংশ।

শুক্রাচার্য্য পিতৃকন্যা অর্থাৎ স্বীয় ভাগিনী গোকে বিবাহ করেন। শুক্রাচার্য্য নহুষ-তনয় যযাতির সমসাময়িক ছিলেন। যযাতি দেবযানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চ্যবন অনর্থ রাজা সর্য্যাতি-কন্যা সুকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ভার্গবেরা পশ্চিম ভারতে নর্ম্মদা তীরে বাস করিতেন।

সগরের সময় ইক্ষাকুগণ দ্বারা হৈহয়রাজ বিতাড়িত হন, তখন হৈহয়গণ ভার্গবদিগের নিকট অর্থ চাহিয়াছিল, ভার্গবগণ অর্থ দিতে অস্বীকৃত হন; তাহাতে হৈহয়গণ ভার্গবদিগকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করেন, এবং ভার্গবগণ প্রতিহিংসা পরবশ হইয়া উত্তর দিকে পলায়ণ করেন।

ঋচিক ঋষি ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং গাধিতনয়া সত্যবতীকে বিবাহ করিবার প্রার্থনা করেন। তাহাদের পুত্র জমদগ্নি। প্রসেনজিৎ তাহার কন্যা রেণুকাকে দান করেন। কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্য রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। মধ্য প্রদেশ (Mediterranean Sea) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরশুরাম (Parseus) কার্ত্তবীর্য্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাহাকে সংহার করেন।

"পুরাকালে বসু নামে একজন রাজা ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণ বংশীয় ও মহাবীর, তাঁহার পৌরুষ ত্রিভুবনে বিখ্যাত, রাজগৃহ বনে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।" ইনি কে? পুরাণে ও ভারতে জরাসন্ধের পিতামহ গিরিব্রজ প্রতিষ্ঠাতা যে বসুরাজের উল্লেখ আছে, তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ নহেন।

একই মূল পুরুষ কুশ (Cusa) হইতে কোশাম্বী, কাণ্যকুব্জ, গিরিব্রজ বা রাজগৃহ এবং ধর্ম্মারণ্য এই চারি নগরের বা রাজ্যের স্থাপয়িতা চারিজন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের নাম—
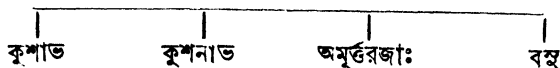
কুশনাভের বংশেই বিখ্যাত বিশ্বামিত্রের এবং বসুর বংশেই সম্রাট জরাসন্ধের জন্ম হইয়াছিল।

গয়া (In Homeric poems, gaya the earth) নগরীর স্থাপয়িতা গয় নৃপতি অমূর্ত্তরজাঃর পুত্র ছিলেন।

যযাতি পুত্র অণুর বংশে বিখ্যাত বলি রাজার রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে (এবং বৈদিক দীর্ঘতমা গৌতম ঋষির আশীর্ব্বাদে) অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম (রাঢ় বা মহানাদ) এবং পুণ্ড্র এই পাঁচটি পুত্র জন্মে। বর্দ্ধমান ও হুগলী বিভাগকে সুহ্ম বলিত। সুহ্ম উত্তরকালে রাঢ়, মহানাদ এবং ঝাড়খণ্ড নামে প্রথিত হইয়াছিল। ঝাড়খণ্ড পরে জঙ্গল মহল নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। জঙ্গল মহল পরিষ্কার করিয়া সিংহপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অঙ্গর পঞ্চম পুরুষে দশরথ-লোপপাদের পৌত্র চম্প নামক নৃপতি চম্পা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা।

হরিবংশে যযাতি পুত্র অণুর বর্ণনায় কর্ণ যে বঙ্গ ও অঙ্গ উভয় প্রদেশেরই অধ্যক্ষ ছিলেন, তাহা চেদিরাজ শিশুপাল বাক্যে জানিতে পারা যায়। কর্ণের পিতা অধিরথ হইতে উর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষ অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপিতামহ বিজয় নামক রাজা ভুল করিয়া এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করায় তাঁহার বংশে "সুতত্ব" অপবাদ ঘটে। এই অপবাদ হইতে মহাবীর কর্ণকে সুতপুত্র বলা হয়। যেহেতু কর্ণ অধিরথ কর্তৃক গঙ্গাগর্ভে মঞ্জুষা মধ্যে প্রাপ্ত এবং প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

মহাভারতে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় পাঞ্চাল রাজধানীতে পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব, বঙ্গরাজ সমুদ্র সেন এবং তাঁহার পুত্র চন্দ্র সেন, তাম্রলিপ্ত রাজ (সুহ্ম রাজ) প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। বাঙ্গলার সকল রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে এবং কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। ঐ সকল বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই প্রাচ্য দেশের প্রায় সকল স্থানেই ব্রাহ্মণেরা বৈদিক যজ্ঞ করিতেন। তন্ত্রগ্রন্থে বাঙ্গলার সীমা "বঙ্গদেশ হইতে ভুবনেশ্বর পর্যান্ত" নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্য দণ্ডী "গৌড়ী"কে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের সংস্কৃত রচনার আদর্শ রীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যদি রামায়ণ, মহাভারত লেখার সময়ে আমাদের গৌড়বঙ্গ আর্য্য-সভ্যতার লীলা ক্ষেত্র এবং আর্য্য ধর্ম্মের বিবিধ তীর্থক্ষেত্রে

পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক প্রমাণেই দীর্ঘতমা এবং কাক্ষীবান প্রভৃতি বৈদিক-মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণের সময়ে এ দেশের আর্য্য-সভ্যতা কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি।

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে আছে,—"মহা তেজস্বী অসুরদিগের কলি, হৈহয়দিগের উদাবর্ত্ত, নীপদিগের জনমেজয়, তালজঙ্ঘদিগের বহুল, ক্রমীদিগের উদ্ধত বসু, সুবীরদিগের অজবিন্দু, সুরাষ্ট্রদিগের রুষর্দ্ধিক, বলীহদিগের অবর্জ, চীনদিগের ধৌত মূলক, বিদেহদিগের হয়গ্রীব, মহৌজাদিগের বরযু, সুন্দরবংশীয়দিগের বাহু, দীপ্তাক্ষদিগের পুরূরবা, চেদিমৎস্যদিগের মহজ, প্রবীরদিগের বৃষধ্বজ, চন্দ্রবংশদিগের ধারণ, মুকুটদিগের বিগাহন ও নন্দিবেগদিগের সম, এই অষ্টাদশ ভূপতিবংশের কলঙ্ক স্বরূপ; ইহারা যুগান্তে জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় জ্ঞাতি ও বান্ধবদিগকে এককালে উচ্ছিন্ন করিয়াছে।

অপ্রমেয় শক্তি, স্বাধীনতার প্রতি অপরিসীম ভালবাসা, মৃত্যুকে তুচ্ছ করিবার স্পর্দ্ধা, এ সমস্তের দৃষ্টান্তে ভারতের ইতিহাস পরিপূর্ণ।

বিদেশীয়েরা রক্তের ধারায় মাটী ভিজাইয়া; সহস্র সহস্র লোকের জীবন বলি দিয়াই ভারতের স্বাধীনতাকে হরণ করিয়াছেন।

সংবৎ ১০৮৪ অব্দে মামুদ সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করেন। সনাতন সিংহ রাজপুতের পুত্র মুসলমান হইয়া জাফর খাঁ নাম গ্রহণ করে ও তাহা কর্ত্তৃক এই মন্দির ভগ্ন হয়। ঐ জাফর খাঁর পুত্র প্রথম মহম্মদ নাম গ্রহণ পূর্ব্বক গুজরাটের রাজা হন। জাফর খাঁ নিজ পুত্র মহম্মদকে হত্যা করিয়া পরমা সুন্দরী পুত্রবধূকে বিবাহ করেন ও দ্বিতীয় মহম্মদ নাম ধারণ করিয়া গুজরাটের রাজা হন। এই সময় বারবাঙকী জেলায় সতরিংস নামক একটি সমৃদ্ধিশালী ও বাণিজ্য প্রধান নগরী ছিল। মাণিকপুরের ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ ও বস্তি জেলার বীর সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ মিলিত

হইয়া মহারাজ সুহল দেবের নেতৃত্বে তাহাদের গতিরোধ করিল। কুটিলা নামক নদীর কূলে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বহুদিবসব্যাপী ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইল। যখন সৈয়দ মসুদ অনুভব করিতে পারিল যে, সম্মুখ সমরে হিন্দুগণের নিকট জয়লাভ করা তাহার পক্ষে অতি সুকঠিন এবং বাহ্রাইচ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করাও উহার পক্ষে দুষ্কর, তখন গরুর প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হওয়ায় হিন্দুগণ বিচলিত হইয়া উঠিল। সুহল দেব একরাত্রেই শত্রু শিবির আক্রমণ করিলেন এবং সমস্ত গাভী তদীয় গোশালায় নীত হইল। পরবর্ত্তী দিবসে হিন্দুসৈন্যগণ মহোল্লাসে এবং দ্বিগুণ উৎসাহে মুসলমান বাহিনী আক্রমণ করিল। মহারাজ সুহল দেব স্বহস্তে তূণীরাবাতে স্রোতস্বিনী কুটিলার তটে সৈয়দ মসুদের প্রাণ বধ করিলেন। মসুদের সৈন্যগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। উক্ত যুদ্ধ ১০৯১ বিক্রমাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল। প্রাণ ভয়ে গাভী দান করিয়াছিল বলিয়া সেই দলের নাম গোদী হইল। পরবর্ত্তীকালে গোদী বাক্যই গদ্দী রূপ প্রাপ্ত হয়।

সংবৎ ১০৫৭ হইতে ১৬১৩ বিক্রমাব্দ পর্য্যন্ত ভিন্ন দেশাগত মুসলমানদিগের সহিত ভারতবাসীর অনেকানেক বিকট সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল। সেই "যুদ্ধযুগে" মুসলমানগণ ইতিহাস প্রসিদ্ধ দিল্লী নগরীকে নিজেদের ছাউনী স্বরূপ করিয়া লইয়াছিল। বাহ্রাইচের নাম তখন বালার্ক তীর্থ ছিল। তখন সে স্থানের বালার্ক নামক কুণ্ডে স্নান করিলে কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য হইত।

শান্তিপুরের প্রায় আধক্রোশ দক্ষিণ দিয়া গঙ্গাদেবী প্রবাহিতা হইতেছেন। কিন্তু অন্ধতমসাচ্ছন্ন সুদূর অতীতে এই গঙ্গাদেবীই শান্তিপুরের অন্যূন একক্রোশ উত্তর দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। রাজা বসুমতী সিংহ এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। সেকালের গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জমান হরিনদীর উত্তর দিক দিয়া গঙ্গাদেবী প্রবাহিতা হইয়া বর্ত্তমান

বাসিনী) resident.] হইয়াছে।* মুসলমান অধিকার কালে দ্বারপাল নামে এক সৎগোপ রাজা রাজত্ব করিতেন। মহম্মদ আলি নামে একজন মুসলমান সেনাপতি তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। দ্বারপালের রাজবাটীতে জীবৎকুণ্ড ছিল, যাহাতে মৃত ব্যক্তির প্রাণদান দেওয়া হইত। একজন মুসলমান ফকীর (সাহ জোকাই) দ্বারপালের আজ্ঞায় জীবৎকুণ্ডে স্নান করিবার অধিকার পায়, এবং সাহ জোকাই বস্ত্রাভ্যন্তরে গোমাংস লইয়া গিয়া কুণ্ডটি নষ্ট করে। কোন সাহায্য না পাইয়া দ্বারপাল তাঁহার পরিবারবর্গ সহ দ্বিতীয়বার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, রাজবাটীতে অগ্নি লাগাইয়া পুড়িয়া মরিয়াছিলেন। রাজবাটীর ধ্বংসস্তূপ ছাই হইয়া গেল এবং তাহাই লোকে ধন পোঁতা বলে। জীবৎকুণ্ড কামনা কুণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত আছে। জীবৎকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে (?) পীর সাহ জোকাইয়ের কবর আছে। অপর একটি বৃহৎকুণ্ড একটু পূর্ব্বদিকে, এক্ষণে বাঁধদ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, উহা চন্দ্রকুণ্ড নামে খ্যাত আছে। একটু দূরে উত্তরদিকে অপর একটি বড় কুণ্ড আছে, যাহা পাপহরণ কুণ্ড বলিয়া খ্যাত আছে। এবং সাতটি দীর্ঘিকা—সাত সতীনের পুকুর বলিয়া খ্যাত আছে। পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে একটি উচ্চ ঢিপি, ভগ্ন ইষ্টক রাশি, পুরাতন কেল্লা বা গড় বলে। সমস্ত দ্বারবাসিনী গ্রামে একটু মাটীর বা জমির নীচে ভগ্নবাটী ও দেয়ালের চিহ্ন পাওয়া যায় এবং মাটীদ্বারা ঢাকা কূয়া বা কূপ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকের বিশ্বাস এই সকলের মধ্যে ধনরত্নাদি লুক্কাইত আছে। সময়ে সময়ে অনেকে খনন করিয়া অর্থাদি পাইয়াছেন এবং ভগ্ন দেবদেবীর প্রস্তর

* প্রবাদ—এখানে দ্বারিকাচণ্ডী বা দ্বারবাসিনী নামে এক দেবী প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন, তাঁহার নামানুসারেই গ্রামের নাম হইয়াছে। দেবীর মন্দির অথবা মূর্ত্তির কোন চিহ্ন নাই, কিন্তু একটি স্থান এখনও দ্বারিকাচণ্ডী নামে কথিত হয়।

শম্ভু করের বাসগৃহের "চাদনী"

৫ বিরহেশ্বরের মন্দির—দ্বারবাসিনী

৬ বিশালাক্ষীর মন্দির—সেনেট।

মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। মুসলমান রাজত্বের সময় দ্বারবাসিনীতে কোন সংগোপকে বাস করিতে দেওয়া হইত না ”

Bengal Distriot Gazetters, Hooghly.

গোস্বামী মালিপাড়ার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে দ্বারবাসিনী গ্রামের বিষহরির মন্দিরের দক্ষিণ হইতে সেনেটের বিশালাক্ষীর মন্দির পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগ দামোদরের বন্যায় জলমগ্ন হইত, এখানে কোন গ্রাম ছিলনা। কালক্রমে দামোদর সরিয়া গেলে এই বন্যা আসা বন্ধ হয় এবং রাজা দ্বারপাল ঐস্থানে বাগান ও মালিদের বাসস্থান নির্ম্মাণ করায় মালিপাড়া নাম হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের স্বর্গারোহণের পর রাজা দ্বারপাল তাঁহার গুরু খঞ্জনাচার্য্যকে পুরী হইতে আনয়ন করিয়া এইস্থানে বাস করান। খঞ্জনাচার্য্য এখানকার গোস্বামী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। গোস্বামীরা শ্রীশ্রীরাধাকান্ত, মদনগোপাল, মদনমোহন ও বল্লভ চাঁদ বিগ্রহ স্থাপন করেন ও তদবধি এই স্থানকে বৃন্দাবনের ন্যায় তীর্থ স্বরূপ মনে করেন। এখানকার গোস্বামীদের অনেক ধনবান রাজা মহারাজা শিষ্য আছেন। এই প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায়,—রাজা দ্বারপাল চৈতন্তের সমসাময়িক রাজা ছিলেন।

ফি:রাজ সাহ পুত্র বাহাদুর শাহর সময় কুম্ভকার বংশীয় দেপাল বা দ্বারপাল রাজা দ্বারবাসিনীতে রাজত্ব করিতেন। অবশ্য দ্বারবাসিনী দুইটি পাওয়া গিয়াছে, একটি—মালদহ জেলার পাণ্ডুয়ার সন্নিকট ও অপর একটী—মহানাদ-পাণ্ডুয়ার সন্নিকট দ্বারবাসিনী। কালীগঙ্গা নদীর তীরস্থ ঘোড়ানাচের ভগ্নাবশেষগুলি দ্বারপাল নামক এক ব্রাহ্মণ রাজার ভগ্ন বাটী বলিয়া কথিত।

দ্বারিকা বক্ষে রত্নগড় বা রাতগড়ায় রাজা রত্নেশ্বর সিংহ বাস করিতেন। এখানে শ্রীগঙ্গাদেবীর পূজা হইত। এইস্থানে পুণ্যক্ষেত্র তারাপীঠ। শাল্মলীমূলের অদূরে ব্রহ্মময়ীর শিলামূর্ত্তি ছিল। বণিক জয় দত্ত যে স্থানে

তারাদেবীর শিলামূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, সেই "কৈওরের নালা" এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। জয় দত্তের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদি দ্বারিকার জলপ্লাবনে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে বংশবাটীর রাজা কালীচরণ সিংহ বহু অর্থব্যয়ে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। দ্বারিকার তীরে নিম্নভূমি ভরাট কালীচরণ সিংহ যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, নদীর ধ্বংসে মাটি বসিয়া গিয়া তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপরে মাল্লারপুর নিবাসী একজন সদ্‌গোপ ১২২৫ বঙ্গাব্দে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তারাপুরের পশ্চিমে সাতসতীনের দীঘি নামে একটি অনতি বৃহৎ জলাশয় আছে, দীঘির উত্তর পাড়ে "চতুরো" নামে একটি ডাঙ্গায় এখনও পরিখা প্রাকারের বিলুপ্তাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রবাদ—তথায় 'চতুর' নামে এক রাজা ছিলেন। নতিবপুরের সিংহ মহাশয়গণ তাঁহাদের পূর্ব্ব বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অনতিদূরে জয়সিংহপুর গ্রাম আছে। প্রবাদ, তথায় জয়সিংহ নামে এক রাজা ছিলেন। এক মাইল দূরে 'দাঁড়কের' বা ভালকথায় 'দণ্ডকের মাঠ' নামে এক প্রান্তর শস্য ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখান হইতে কিয়ৎ দূরে দাঁড়কা নামক গ্রাম ময়ূরাক্ষী নদী তীরে অবস্থিত, নিকটে রাজহাট ও রাণীপুর গ্রাম। জয়সিংহপুরের রাজা জয় সিংহ, দণ্ডেশ্বর রাজার বংশধর। এই স্থানের জয়সিংহকে সন্ধ্যাকর নন্দী উল্লেখ করিয়াছেন। ১০২৪ খৃষ্টাব্দে সিংহ উপাধিধারী কেহ আসিয়া এতদঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। দণ্ডভুক্তির প্রাচীন সীমা রাঢ়ের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সুতরাং ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর, তাঁহারই উত্তরাধিকারী সিংহবংশীয় কেহ দণ্ডভুক্তি ত্যাগ করিয়া এই অঞ্চলেই দণ্ডভুক্তির রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তারাপুরের নিকটবর্ত্তী কড়কড়িয়া গ্রামে একটি রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।* মুদ্রার এক পৃষ্ঠে বাঙ্গলা অক্ষরে "শ্রীশ্রীহর গৌরী পদ পরস্য"

* 'বীরভূম-বিবরণ' নামক গ্রন্থে এই মুদ্রার বিষয় লিখিত আছে, এবং হেতমপুর রাজবাটিতে মুদ্রাটি রক্ষিত আছে।

ও অপর পৃষ্ঠে "শ্রীশ্রীগৌরীনাথ সিংহ নৃপস্য" এই কথা কয়টি খোদিত আছে। এই গৌরী নাথ সিংহ চিংড়েগড়ের রাজা ছিলেন।

মল্লারপুর গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে মল্লেশ্বর নামে অনাদিলিঙ্গ শিব বর্ত্তমান আছেন। এই গ্রাম পূর্ব্বকালে রাজা প্রদ্যুম্ন মল্ল সিংহের রাজধানী ছিল। প্রবাদ অনুসারে এই মল্লরাজ, দেশে যবনাগমনের দৈববাণী শুনিয়া প্রাসাদ পার্শ্বস্থ সরোবরে নৌকারোহণে ভরাডুবি হইয়া আত্মহত্যা করেন। রাজার সেই সলিল-সমাধি,—গোউরা বা গৌড় সরোবর এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মল্লেশ্বর মন্দিরের দ্বার-উর্দ্ধে ১১২৪ শকাব্দা খোদিত আছে। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে তরায়ণের রণক্ষেত্রে দিল্লীর শেষ হিন্দুসম্রাট রায় পৃথ্বীরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সৌভাগ্য-সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হইয়াছে। তদবধি কত সম্রান্তবংশ লাঞ্ছিত হইয়াছেন, কত অভিমানী আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য জীবনাধিক স্বজন পরিজন সহ স্বেচ্ছায় মরণকে বরণ করিয়াছেন, কে তাহার সন্ধান রাখে? সে সবের সকল ইতিকথাই এখন বিস্মৃতির অতলতলে সমাধি-শায়িত। শুধু মাঝে মাঝে এইরূপ ধ্বংসস্তূপ আর জনশ্রুতির মুখর রসনায় রটিত,—স্থানে স্থানে প্রচলিত সেই অতীত কাহিনীর এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন সূত্র,—থাকিয়া থাকিয়া একটা বেদনার ব্যথা জাগ্রত করিয়া দেয়।

কাবেরী নদ তীরবর্ত্তী তাঞ্জোরের সুবৃহৎ নগরটিতে উপস্থিত হইয়া মাত্র চারিদিকে পুরাকালের জাগ্রত স্মৃতি চিহ্নগুলি দেখিয়া মনে হয়, যেন সেই সুদূর ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এককালে এ গুলির কি গৌরব ও গরিমার দিন গিয়াছে; তাই আজ তাহা আবার প্রাচীনের বিচিত্র দৃশ্য ও ঘটনা পরম্পরায় অন্তরের মধ্যে জাগিয়া উঠে। তাঞ্জোরের সহিত চোলবংশেরই সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, কারণ তাঞ্জোরের যাহা কিছু কীর্ত্তি ও প্রতিপত্তি প্রায় সবই চোলদের সময়েই। অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বেকার ইতিহাস চোলদের পাওয়া যায় না। প্রথম শতাব্দীর

গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখায় চোলদের উল্লেখ আছে। তখন তাহাদের রাজধানী ত্রিচিনপল্লীর নিকট ছিল। তাহার পর আরও দুইটি স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করার পর অবশেষে তাঞ্জোরে রাজধানী স্থাপিত হয়। চোল ও পাণ্ড্য (Greek Pandian)দের মধ্যে কলহ হয়। এই কলহে পাণ্ড্যরা বিজয় নগরের রাজাকে পক্ষাবলম্বন করিবার জন্য আমন্ত্রণ করে। বিজয়নগর পাণ্ড্যদের সাহায্যের জন্য প্রতিনিধি পাঠান ও তাহার পর হইতেই চোলদের শক্তিতে ভাঙ্গন ধরিতে সুরু হয়। বিজয়নগরের প্রতিনিধি, মাদুরার নায়ক কর্ত্তৃক নিজের দুর্গের মধ্যেই আক্রান্ত হন। নায়ক যখন দেখিলেন যে, জয়ের আশা নাই, কথিত আছে—প্রাসাদে আগুন লাগাইয়া তখন পুত্রগণের সহিত তরবারী হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া ঝাঁপ দেন ও বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণপাত করেন।

বাঙ্গালার প্রান্তভাগে চোল রাজগণের কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদিগের বাঙ্গলা আক্রমণের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

১০২২ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র রাজত্ব করিতেন। ঐ সময়ে রাজেন্দ্র চোল রাঢ়বঙ্গ আক্রমণ করেন।

"পটিক নগরে রাজা গোবিন্দ চন্দ্র ভূপ।
জালন্ধরী হাড়িপা হইল হাড়িরূপ॥"

আইন-ই-আকবরীতে অসুশূর, অসুরুধ নামে উক্ত হইয়াছে।

বিদ্যাধরী নদী তীরস্থ হাসাড়া গ্রাম আছে। বর্ত্তমান মেদনমল্ল পরগণার অধিকাংশ স্থানই বন্যজন্তু সমাকীর্ণ জঙ্গলে আবৃত ছিল। হরিনাভী গ্রামে দে মহাশয় বংশ মহানাদ হইতে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া এই অঞ্চলের জঙ্গল কাটাইয়া চক্রপাণি দে বাসোপযুক্ত করিলে দেবানন্দপুরের দত্তমুন্সী বংশীয়দের লইয়া আসিয়া আসিয়া বাস করান। বাঁশড়ার জঙ্গলে

মোবরা গাজী নামে এক ফকীর বাস করিত, বন্য পশুগণের উপর তাঁহার অসীম প্রভুত্ব ছিল। কেবল এই পরগণায় নহে, সুন্দরবন সন্নিহিত সকল পরগণাতেই মোবরা গাজীর আস্তানা দেখা যায়। এই দে বংশের একটী প্রাচীন ইতিহাস আছে। বারান্তরে ঐ ইতিহাস উল্লেখ করিব।

মস্নুনদ হরিণঘাটার নিকট সমুদ্র করতোয়াকে গ্রহণ করিয়াছিল। কোন সময়ে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের নিম্নদিকের প্রবাহ স্বতন্ত্রভাবে সমুদ্রে পতিত হইত। উভয়ের প্রবাহ নিম্নবঙ্গে ৭৫ ক্রোশ অন্তরে ছিল। এখনও সুন্দরবনে করতোয়া নাম্নী একটি স্রোতস্বতী আছে। মহানন্দা নামে একটি নদী ছিল। মাথাভাঙ্গা, চূর্ণী, কুন্তি, কাণা, বল্লুকনদ করতোয়ার বা মহানন্দার দেহ বলিয়া অনুমিত হয়। করতোয়া উপর দিক হইতে বিলুপ্ত হইলে, কুমার, ইছামতী, ভৈরব, নবগঙ্গা, খড়িয়া প্রভৃতি নদী বাহির হইয়াছিল। কোন সময়ে ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষা করতোয়া বড় নদী ছিল। বগুড়া জেলার মরিচা, সেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় দশকাহনিকা সেরপুর করতোয়ার দুই পারে ছিল, উহা পার হইতে দশ কাহণ কড়ি লাগিত। মহাস্থান গড়ে করতোয়ার মূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। পুরাণ তন্ত্রাদিতে ব্রহ্মপুত্র অপেক্ষা করতোয়ার উল্লেখ অধিক দৃষ্ট হয়। পদ্মা নবগঙ্গার একাংশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কৌশিকী নদী পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইত; উহা গঙ্গায় পতিত হইলে উহার স্রোত ঘুরিয়া পদ্মার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। গঙ্গার পূর্ব্বে হিরণ্য পর্ব্বত রাজ্য ছিল।

আত্রেয়ী নদী বর্ত্তমান পাবনা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার পরিচয় সিংহবংশের কাগজ পত্র হইতে পাওয়া যায়। ফরিদপুর জেলায় আত্রেয়ীর খাড়ী নামক স্থান বিদ্যমান আছে। দিনাজপুর ও রাজসাহীতে আত্রেয়ী * নদীরযে অংশ বর্ত্তমান আছে, তাহা স্থানীয় লোক কর্ত্তৃক বড় গঙ্গা বা বড়নদী ও সিংহনদী নামে অভিহিত।

* এই রাজসাহী জেলার পুণ্যতোয়া আত্রেয়ীর এক মহাশ্মশানে বঙ্গাব্দ ১২৯৬ সালের

মহানন্দার পূর্ব্বতীর হইতে করতোয়ার পশ্চিমতীর পর্য্যন্ত (বরেন্দ্রভূমি—দেবমাতৃক) নানাস্থানে এখনও অনেক রাজদুর্গের, অনেক রাজভবনের, অনেক দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বহু বিস্ময় বিজড়িত ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন খাতের ও শীতল লক্ষার তীরবর্ত্তী মহেশ্বরদি পরগণার অন্তঃপাতি বেলাব নামক গ্রামে ভোজবর্ম্মা দেবের তাম্রশাসন পাওয়া যায়। অক্ষরগুলি ১০০০ শতাব্দীর পুরাতন বঙ্গাক্ষর। "হরির জ্ঞাতিবর্গ (হরিশচন্দ্র সিংহ?) বর্ম্মাগণ, সিংহ-বিবর তুল্য সিংহপুর (সিঙ্গুর) নামক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।" বাঙ্গলার ইতিহাসে বর্ম্মরাজবংশের উৎপত্তি স্থান আঙ্গুলিয়া-সিঙ্গুর-মহানাদে, হুগলী জেলায়।

শ্যামল বর্ম্মার পরিচয় আমরা বেশ জানিতে পারিতেছি, তিনি ভারত বিখ্যাত প্রবল পরাক্রান্ত কায়স্থ নৃপতি। ইনি চেদিপতি কর্ণদেবের করাল কবল হইতে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। শ্যামল বর্ম্মার পাটরাণী অসামান্যা সুন্দরী মালবা দাসী জগৎ বিজয় মল্লের (বিজয়-সাগর মল্লের) কন্যা। ভোজের তাম্রশাসনে "সিংহ বর্ম্ম" বংশের অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী লিখিত আছে। তাঁহারা ১০৮০ হইতে ১১০৪ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শ্যামল বর্ম্মা নিজ বাহুবলে শত্রুকে নিহত করিয়া ১১৭২ খৃঃ গৌড় রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

চণ্ডেলরাজ ভোজ বর্ম্মার "কোষাধিকারাধিপতি" বাস্তব্য শাখার কায়স্থ বংশোদ্ভব সুভট কর্ত্তৃক একটি দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইবার কালে একখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহা অজয়গড় দুর্গের ফটকের সম্মুখে পাহাড়ের উপর আজিও খোদিত রহিয়াছে। লিপির দৈর্ঘ্য ৬ফুট ১০॥ ইঞ্চি, প্রস্থ ২ ফুট ৩ ইঞ্চি। লিপিটি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ

১০ই অগ্রহায়ণ আমার পরমারাধ্যা মাতৃদেবীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়াছিলাম।—
গ্রন্থকার।

হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় লিপিটি লিখিত। উহার কতিপয় শ্লোক এইরূপ—

" ওঁ নমঃ কেদারায়

পবিত্রীকৃত এবং অত্যন্ত বাসোপযোগী গুণ বিশিষ্ট ৩৬টি নগর ছিল, তাহাদিগের মধ্যে সুরনিবাস তুল্য শ্রেষ্ঠ নগর টকারিকা সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহনীয় ছিল ॥ ২ ॥

এই নগরকে বাস্তু স্বীয় নিবাস স্থান করিয়াছিলেন, যাহাতে সর্ব্বোপকার-করনৈক পাত্র গুণবান পাত্রযুক্ত দ্বিজহিতকারী তাঁহার বংশ তথায় কল্পান্ত পর্য্যন্ত বাস করিতে পারে ॥ ৩ ॥

জনসঙ্ঘ কর্ত্তৃক বেদধ্বনি মুখরিত এই নগরে বাস্তব্য বংশে সেই সকল কায়স্থদিগের জন্ম হইয়াছিল, যঁাহাদের যশে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল এবং যাহাদের কীর্ত্তি হংস পঙ্‌ক্তির ন্যায় পৃথিবীকে পূর্ণ এবং ধ্বলিত করিয়াছিল ॥ ৪ ॥

সজ্জন লোকপ্রিয় সেই মহান কুলে প্রিয় সচিব গঙ্গাধরের জন্ম হয় ॥ ১০ ॥.

বাশেকে জয় দুর্গের রক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি রাজা ভোজুককে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

ইহাকে নির্ভিক জানিয়া (আনন্দ) রাজা দুর্গাধিকারে নিযুক্ত করিয়াছিলেন (বাশেক) এবং আনন্দ পল্লী নিবাসী ভিল্ল, শবর এবং পুলিন্দ জাতিদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

মহীপাল নামক গোপতির অনুজ সৌন্দর্য্য এবং শৌর্য্যশালী বলিয়া শোভা পাইতেন ॥ ২৭ ॥

পরোপকারাকাঙ্ক্ষী ও আরব্ধ কার্য্যে সিদ্ধিমান, তিনি রাজা ভোজ বর্ম্মণের কোষাধিকারে স্থায়ীভাবে (সুভট) নিযুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

এই জগৎ দুঃখত্রয়ের মন্দির, শোক, ধন দোলান্দোলনের মত চঞ্চল, মনুষ্যের আয়ু স্বল্প, দেহান্তর হইলে কেবল ধর্ম্মই অপর দেহে অগত্যা সহগামী হয়, এই ভাবিয়া সুভট এই স্থানে (জয়পুর পর্ব্বতে) দেবালয় নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন ॥ ৩১ ॥

তাহার পর মহীপালের মহাপ্রাজ্ঞ তিনটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কীর্ত্তিপাল কীর্ত্তিমান যুবা এবং মদনসন্নিভ ছিল ॥ ৩২ ॥

২৩—২৫ শ্লোক। রুচির রণ-পণ্ডিত ছিলেন এবং নিজেই দুর্গার পূজা করিতেন।

চেদিরাজ জজ্জল্যদেবের ১১৬৭ খৃঃ উৎকীর্ণ মলহর-শিলালিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত সুন্দর লিপিটির সংস্কৃত রচনা বাস্তব্য বংশের রত্ন সিংহ * নামক কবি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই লিপির ১৩—২৪ শ্লোকে লিখিত আছে "এই সুশ্রাব্য প্রশস্তি মামীপুত্র রত্নসিংহ কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। তিনি কাশ্যপ ও অক্ষপাদ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁহাকে কেহ বিচারে হারাইতে পারিতেন না। তিনি বাস্তব্যবংশের সূর্য্যস্বরূপ ছিলেন।"

বৈশেষিক দর্শনের প্রবর্ত্তক কণাদের অপর নাম কাশ্যপ এবং ন্যায় দর্শনের প্রবর্ত্তক গৌতম মুনির অপর নাম অক্ষপাদ। রত্নসিংহ ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে বিশেষরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন।

ঐ লিপিতে করণ-বর্ম্মন বহুব্রীহি সমাসে কায়স্থ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বুন্দেলখণ্ড প্রদেশ এক সময় কায়স্থ রাজন্যবর্গের শাসনাধীনে ছিল। রাজা যশোবর্ম্ম দেব, রাজা জয় বর্ম্মদেব ইত্যাদি ইঁহারা প্রাচীন সিঙ্গুরের গঙ্গাবংশীয় ছিলেন। প্রায় ৯০০ খৃষ্টাব্দে রাঢ়দেশ পর্য্যন্ত ইহাদের অধিকার ভুক্ত হয়।

* খুলনা জেলাস্থ আমুলিয়া গ্রামের সিংহ বংশ বাস্তব্য গোত্রে বলিতেছেন। মৎপ্রণীত "মহানাদ" বা বাঙ্গালার গুপ্ত ইতিহাস প্রথম খণ্ড দেখুন।

গ্রহবর্ম্মা নিহন্তা মালব রাজ রাজ্যশ্রী দেবীকে "পায়ে বেড়ী পরাইয়া কাণ্যকুব্জের কারাগারে নিক্ষেপ করেন।"

কাণ্যকুব্জের দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গা, দক্ষিণ রাঢ় মণ্ডল গ্রাস করিয়াছিলেন। ফলে দ্বাদশ শতাব্দ (১১০০ খৃঃ) ভরিয়া এই রাঢ় লইয়া কলিঙ্গের গঙ্গাবংশীয় এবং গাহড়বাল রাজগণের মধ্যে অবিরত বিরোধ চলিতেছিল। কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ গৌড় রাজ্যের কেন্দ্র বরেন্দ্রের যে ক্ষতি করিয়াছিল, এই গোলযোগের মধ্যে তাহা পূরণের অবকাশ বোধ হয় কাহারও ঘটে নাই। তাই দ্বাদশ শতাব্দের শেষ ভাগে মুসলমান যখন বাঙ্গালা আক্রমণ করে, তখন পরিত্যক্ত রাজপুরী মহানাদ এবং প্রহরীশূন্য আহ্নিয়া অবাধে তাঁহার পদানত হইল। চম্পাও একটি নগরী, পুরাকালে কুমায়ুন বা কুর্ম্মাঞ্চলের হিন্দু রাজাদিগের ইহা রাজধানী ছিল।

চেদী সম্রাট গণের তাম্রশাসনে "যাদববংশ বা বর্ম্ম বংশ" বলিয়া উল্লেখ আছে। বর্ম্ম বা যাদববংশের সিংহপুরের সহিত চেদী রাজগণের দীর্ঘকাল সংঘর্ষ চলিয়াছিল। অন্যত্র এই যাদববংশকেই "কর্ণাটক ক্ষত্রিয়" বলিয়া উল্লেখ পাই।

হরিনাভী নিবাসী ৺মথুর মোহন বসু, ডেকরা পাড়া গ্রামটিকে উলঙ্গ জৈনদিগের নিবাস ছিল বলিয়াছেন। তিনি ১৮৬০ খৃঃ পোড়াহাট বা চক্রধরপুর, ঘরশুঁয়া ও সেরাইকুলীর রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহার লিখিত রামেশ্বর দুর্গের প্রাচীন কাহিনী পাওয়া যায়। মথুর মোহন বসুর দৌহিত্র শ্রীযুক্ত বটু কৃষ্ণ সিংহ।

৯৯৯ সংবতে ব্রাহ্মণ রাজ প্রজাপতি সপ্তগ্রাম বিজয় করেন। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষ আর এক প্রজাপতির সাহায্যে সিংহ বংশ রাঢ় দেশ জয় করেন।

ত্রিকলাঙ্গাধিপ মহারাজ জনমেজয়ের পুত্র খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাঢ়দেশ অধিকার করেন।

উজানি সহর বৰ্দ্ধমানের উত্তর সীমা, শীতলপুর বালিঘাটা গ্রামের সন্নিকট ছিল। উজানি নামে আর এক প্রাচীন গ্রাম বরিশাল জেলায় আছে। হুগলী জেলাতেও বসুচার নিকটে এক উজানি গ্রাম আছে।

হুগলী জেলায় "সরসুণো" বর্ত্তমান বড় সরসা ও ছোট সরসা খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে পাই। এই সুলসুনো বা সুংসুনো গ্রাম যে এক সময়ে অতি সমৃদ্ধ ছিল, তাহা টলেমীর মানচিত্রেও টের পাওয়া যায়। এতদিনের প্রাচীন স্থানের যে সকল অট্টালিকা ছিল—তাহা এখন ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হওয়ারই কথা।

চূড়ামনি দাস একখানি চৈতন্ত চরিত লিখিয়াছিলেন। জয়ানন্দ আর একখানি চৈতন্ত চরিত লেখেন—

"বুঢ়ণে হইলা অবতির্ণ হরিদাস।
সে ভাগ্যে সে সব দেশ কীর্ত্তন প্রকাশ॥"

এই বুঢ়ণ আধুনিক হুগলী জেলাস্থ বাড়োল গ্রাম। রাজহাটের নিকটে। আর এক বাড়োল গ্রাম এই জেলায় ছিনা আকনার নিকটে আছে।

যবদ্বীপের প্রচলিত জনশ্রুতিতে ইহা পাওয়া গিয়াছে যে, রাঢ়দেশের আথ্না বা আকনা নগর হইতে আদিশাক নামক একজন লোকনায়ক ৭৫ খৃষ্টাব্দে ঐ দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন। হুগলী জেলায়, ভুতো আকনা, ছিনা আকনা, মাহেশ আকনা, আকনা দেবানন্দপুর প্রভৃতি গ্রাম দৃষ্ট হয়।

মরা মহানন্দা নদী নয়গড় বা নাথরাই সহরের অল্প কিছু পশ্চিমে কালিন্দীতে পড়িয়াছে। কালিন্দী গঙ্গারই ধারা। এই স্থানে আন্দুলিয়া গড়ের রাজা গঙ্গাধর সিংহের ভগ্ন প্রাসাদ ও দুর্গের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই

নগরকে পিছলি গঙ্গারামপুর বলিত। বিয়াসপুর ও তাহার অন্তর্গত কুলবাড়ী দুর্গ গঙ্গার ভাঙ্গনে নষ্ট হয়। আমুলিয়ার রাজা, চেদিরাজ গাঙ্গেয় দেবের পুত্র কর্ণদেবের সহিত জীবন ব্যাপী সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিলেন—ভগ্ন দুর্গ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার অবসর তাঁহার ছিলনা। প্রাপ্ত মনহলি লিপি এ যাবৎ কেহই ভাল করিয়া পড়িতে না পারায় সিংহ রাজবংশের অনেক কথা এখনও অন্ধকারে রহিল। ৺নবীন চন্দ্র সিংহ বলিয়াছেন—"মনহলি-লিপিতে রাজা বিজয় রাম সিংহকে 'বজ্রত্যাগী' অর্থাৎ মহাবীর, ও 'কুবেরের ধনদানকারী' বলা হইয়াছে।"

রাজভটেরা শক বংশীয় না হইলে ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন সহজ হইতনা। প্রকৃত গোপাল পাল কে ছিল জানিবার উপায় নাই। ইতিহাস নিস্তব্ধ। তাঁহার বংশ প্রথমে মধ্য এসিয়ার অন্যান্য বর্ব্বর অশ্বারোহী ডাকাতদের সঙ্গে খাইবার গিরি শঙ্কট দিয়া ভারতে প্রবেশ করে। তমলুক ও মল্লভূমি অতিক্রম করিয়া বঙ্গদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন করে।

সমুদ্র দেবতার কুলে পালরাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করেন না। কিন্তু লম্পটদেব এবং প্রতারিতা রাজপত্নীর সন্তান এক নব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, এই জনশ্রুতি এত অধিক স্থানে প্রচলিত যে, ঐতিহাসিকেরা ইহাকে ঘৃণায় ত্যাগ করেন। হর গৌরী নামক আসামের প্রাচীন পুথিতে ব্রহ্মপুত্র নদের দেবতা ও এক রাজ পত্নীর মিলনে তথাকার রাজবংশের উদ্ভব লেখা আছে। ধর্ম্ম পালকে রাজ ভটাদি বংশ পতিত বলিয়া একজন সমসাময়িক লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। রাজভটকে রাজভৃত্য অর্থে সন্দেহ হয়। পরন্তু রাজা জয়ন্তের গোপাল নামে এক ভৃত্যও ছিল। কিন্তু রাজভট ভারতের একটি স্বতন্ত্র জাতি এই রাজাদের কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ গোরখপুর হইতে বুন্দেল খণ্ড পর্য্যন্ত

বিস্তৃত রহিয়াছে। তাহাদের এক শাখার নাম চোরো। এই চোরোবংশ বাঁকুড়ায় রাজত্ব করিত।*

তারানাথ প্রদত্ত পাল রাজ বংশ বৃক্ষ—

গোপাল, পুত্র—দেবপাল, পুত্র—রসোপাল, পুত্র—ধর্ম্মপাল, পুত্র—মসুরক্ষিত, পুত্র—বনপাল, পুত্র—মহীপাল, পুত্র—শামুপাল, পুত্র—শ্রেষ্ঠপাল, পুত্র—চনকপাল, পুত্র—বীরপাল, পুত্র—নীয়পাল, পুত্র—অমরপাল, পুত্র—হস্তিপাল, পুত্র—ক্ষান্তিপাল, পুত্র—রামপাল, পুত্র—যক্ষপাল।

"মনহলি তাম্রশাসনের পালবংশের বংশলতা"য় দয়িত বিষ্ণু, পুত্র—বপ্যাট, পুত্র—গোপাল, স্ত্রী—দেদ্দদেবী, পুত্র—অন্য একজন ধর্ম্মপাল ও বাক্‌পাল আছে।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে—নগেন্দ্র নাথ বসুর আর একখানি পালবংশের বংশলতা আছে এবং ঐ গ্রন্থে দুইজন বল্লাল সেনের বংশাবলীও আছে। নগেন্দ্র বাবুর কোনটিই বিশ্বাস যোগ্য নহে।

সিংহবংশের রক্ষিত কাগজ পত্রের সঙ্গে গোষ্ঠীপতি নবীন চন্দ্র সিংহের হস্ত লিখিত একখানি সূর্য্যবংশের বংশাবলী আছে, তাহা নিম্নে দিলাম। উহা "স্কন্দ পুরাণের আদি রহস্য সহ্যাদ্রিখণ্ডে—ঈশ্বর গণেশ সংবাদ" হইতে প্রাপ্ত ও ৺কাশীধাম নিবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ৺বালমুকুন্দ ভট্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

পিতামহ ব্রহ্মার মানস পুত্র

কাশ্যপ

|

(জুপিটর কাশ্যপিয়স)

|

* সারণ জেলায় চোরো রাজবংশের এক শাখা রাজত্ব করিতেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সূর্য্য বা সুরয়

বৈবস্বত মনু

(ইঁহার সন্তানগণ ক্রটদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন)

অংশুমান — নুমা বা মনেপটঃ

দিলীপ

[আর্য্য সম্রাট, কায়স্থ পাঠারিয় জাতির বীজপুরুষ]

রঘু

(গয়দিগের দমন করেন)

অজমিধি

(মিডিয়ার রাজা হন)

কাঠি দশরথ হিটাইট

[এসিয়া মাইনরে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

রাম

[মধ্য এশিয়ার জনপদ সমূহে মনুষ্য-ধর্ম্ম প্রচার করেন]

কুশ

[বর্ত্তমান সাহারা সাগরের চতুর্দ্দিকে উপনিবেশ স্থাপন করেন]

অতিথি বা ধোয়ী বা দূতী

নিশধ সিংহ

পুণ্ডরীক

(যবনদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন)

ক্ষেমধন্বা
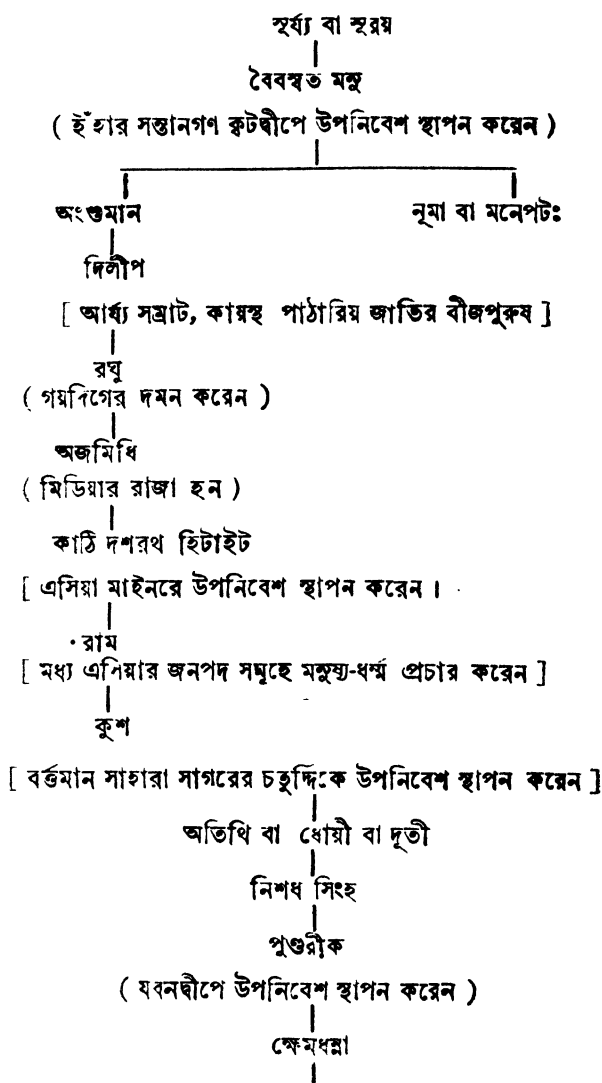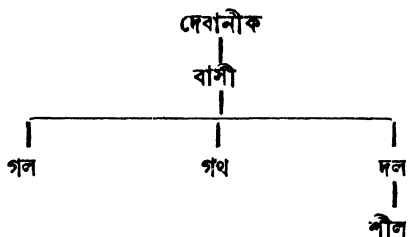
[ইঁহার সন্তানগণ সিসিলদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেন]

উমাভ, পুত্র—বজ্রনাভ, পুত্র—খণ্ডন, পুত্র—উষিত, পুত্র—বিশ্বসম, পুত্র—হিরণ্যনাভ, পুত্র—কৌশল্য, পুত্র—সোম বা হোম, পুত্র—প্রভু, পুত্র—ব্রহ্মষ্ঠ, পুত্র—পুষ্য, পুত্র—সুদর্শন, পুত্র—অনিবর্ণ, পুত্র—বক্ষ, পুত্র—অশ্বপতি। ইনি সিংহল পাটনের শেষ রাজা।

বাঙ্গলা দেশের হিন্দু রাজা (আইন-ই আকবরী হইতে—

ভগীরথের বংশ।

২৪ জন রাজা ২৪১৮ বৎসর রাজত্ব করেন।

ভগীরথ
অনঙ্গভীম
রণভীম
গজভীম
দেব দত্ত
জগৎ সিংহ
ব্রহ্ম সিংহ
মোহন দত্ত
বিনোদ সিংহ

সেলার সেন
সুত্যজি
ভূপতি
শূদ্রক
জীদ্রক
উদয় সিংহ
বিশ্ব সিংহ
বীর নাথ
রুক দেব
রুক নন্দ
ভোগ জীবন
কালু দত্ত

পাওয়া যায়।

কাম দেব
বিজয় কিরণ
সৎ সিংহ

ভোজগর্ব্ব রাজ বংশ।

ভোজ গর্ব্ব
লাগ সেন
রাজা মাধব
সুমন্ত
জগত
প্রতন্থ
গরুড়
লক্ষণ
নন্দ ভোজ

ভূপাল রাজ বংশ।

ভূপাল
ধীর পাল
দেব পাল
বৌপুত পাল
ধনপৎ পাল
বিজন পাল
জয় পাল
রাজ পাল
ভোগ পাল
যোগ পাল

আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের অনেক কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে। হিন্দুদে[র] বিষয়ে সত্য গোপন করা হইয়াছিল, তাহা স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

আদিশূরের বংশ!

আদিশূর
জমেনি ভান
অনিরুদ্ধ
প্রতাপরুদ্র
ভব দত্ত
বেক দেব
গিরিধর
পৃথ্বীধর
সৃষ্টিধর
গিরিবর
জয়ধর

সুখ সেন রাজার বংশ।

সুখ সেন
বল্লাল সেন
লক্ষ্মণ সেন
মধু সেন
কেশব সেন
শুদ্ধ সেন
নাওজে

শূর ও সেন বংশের ইতিহাস নাই। যে টুকু পাওয়া যায় তাহা বর্ত্তমান কালে রচিত হইয়াছে।

চক্‌মা জাতির রাজবংশ।

আদি পুরুষ—রাজা গুণাই ওয়াংঝা

(১৫৫০ খৃঃ)
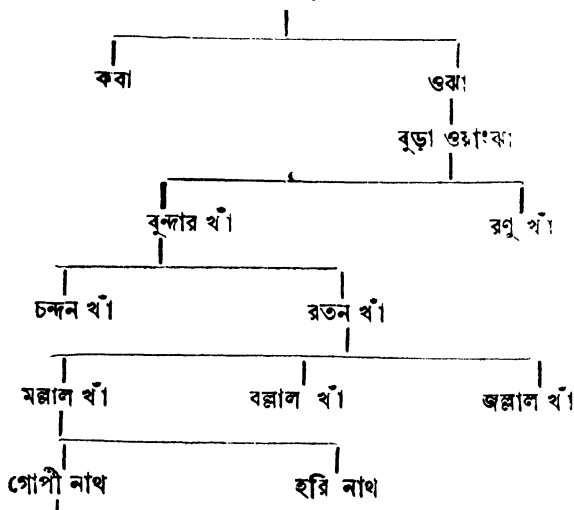
রাজা হরিশ্চন্দ্র | চন্দ্র কলা | শরচ্চন্দ্র

মগেরা বলে, ইহারা মোগল বা মঙ্গল বংশধর। চক্‌মা জাতির উৎপত্তিকাল এক সহস্র বৎসর মাত্র। ব্রহ্মদেশীয়রা ইহাদিগকে 'ছাক্' বা 'ছেক্' নামে নির্দ্দেশ করেন। মতান্তরে চাকিবংশীয়রা ও চক্‌মা জাতি একই। চম্পক নগরে উদয়গিরি নামে জনৈক রাজা ছিলেন, তাঁহার স্বজাতীয়রাই চক্‌মা জাতি। কায়স্থদের মধ্যে ৭২ ঘর কায়স্থের অন্তর্গত চাকীরাই কি চক্‌মা বংশীয় ?

প্রায় ৭০ বঙ্গাব্দে মেদিনীপুর ঘাটাল অঞ্চলে এক পহ্লব গোপ জাতি এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সিংহপুর বিধ্বস্ত করেন। তৎ সমসাময়িক ব্যক্তিগণ—

১। হরি পাল (ব্রাহ্মণী নদীর পার্শ্বে)।

২। বীর চাঁদ বার ভুঞা।

৩। গজপতি কোল।

৪। শাল্লিপুরা মল্ল বা আদিমল্ল বিষ্ণু।

৫। কর্পূর ধবল।

৬। কালিদাস—বর্দ্ধমানের রাজা।

৭। কুরঙ্গের কুশল কোঙর।

৮। রাজা হরি বাহাদুর।

৯। রাজা কামদল বাঘ—জগদানন্দগড়।

১০। রাজা জাল্লাল শিখর।

১১। রাজা ভীগরা রঘু।

১২। রাজা সেনাপতি রাম (জয় যদুপুর)। ঘাটালের যদুপুর গ্রাম ইহারই নির্ম্মিত।

১৩। রাজা জামাই রামাই।

১৪। পরাণ মণ্ডল—পুতনারাজ।

১৫। রমাপতি রায়—রজঃপুত বা রজক।

১৬। গোপভূমের ত্রিষষ্টীগড়ের রাজা ইছাই ঘোষ।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্চকোট, মহানাদ প্রভৃতি রাজ্য রাজস্বের দায়ে নিলাম হইয়া গেলে ভূমিজেরা ক্ষেপিয়া উঠিয়া ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল। ইংরাজি ১৮৩২ সালে বরাভূমে রাজ্যাধিকার লইয়া কেঙঝোরের ন্যায় অবস্থা করিয়াছিল। এই বিদ্রোহ "গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা" নামে খ্যাত। পঞ্চকোট, বরাভূম, ধলভূম এবং উড়িষ্যার দুই একটা রাজ্য ভূমিজের রাজ্য বলা চলে।

৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রাঘব দেব নেপালের রাজা ছিলেন। ঐ সময় নেপালে একটি অব্দের আরম্ভ হয়। সে অব্দ কিছুকাল রাঢ়ে ব্যবহৃত হয়। পল্লব বা পোলস্, কাকতেয়, পেলাসগীয়া, লিথুন প্রভৃতি জাতি রাঢ় হইতে এই সময় নেপালে ও অন্যান্য ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে বসতি স্থাপন করেন। ইহারা দ্রাবিড় ও মঙ্গল সংমিশ্রণের জাতি। কালক্রমে রাজ্য বর্দ্ধনের ভ্রাতা কুমার হর্ষবর্দ্ধনের ভারত সাম্রাজ্য হিন্দুর অবিবেকিতার জন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলেও সিংহল পাটন ধ্বংসের পর, ভারতবর্ষ ও দ্রাবিড় দেশ বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়। এই খণ্ড রাজ্যগুলি ব্রাহ্মণগণ একত্রিত করিয়া এক মহান্ ক্ষত্রিয় (অসিজীবী ও মসিজীবী) জাতির গঠন করেন। উহারা অনার্য্যদের মত আত্মকলহে ছিন্ন ভিন্ন হইলে পর, পারস্য হইতে সম্রাট আনুশর ওয়ার (সংস্কৃত উচ্চারণে অনুশূর, আইন-ই-আকবরী মতে অনুরুধ) ভারতবর্ষ বিজয় করেন। ইহার পর আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ সমূহ মুসলমান করতলগত হইলে, ব্রাহ্মণগণ স্বধর্ম্ম রক্ষাকল্পে পুনর্ব্বার বর্ত্তমান ছত্রিশ রাজকুল লইয়া রাজপুত জাতি উত্তোলন করিলেন।

ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভূরশুট রাজ্যের ব্রাহ্মণ নৃপতিগণের বংশাবলী—

মহারাজ নৃসিংহ, পুত্র—মহারাজ গর্ব্বেশ্বর, পু—মুরারী, সূর্য্য, গোবিন্দ। মুরারী পু—বনমালী, অনিরুদ্ধ, গৌরী, ভৈরব। বনমালী পু—কৃত্তিবাস। অনিরুদ্ধ পু—গোপাল, পু—মদন, পু—সদানন্দ ও বৈদ্যনাথ। সদানন্দ, ইনি চতুরানন রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। সদানন্দ পু—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজা শ্রীমন্ত। দুই ভ্রাতায় গড় ভবানীপুর ও পেঁড়োয় বাস করেন। ভৈরব—ছিনাআকনা গ্রামে "রায়" বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, এক্ষণে লুপ্ত। ব্যাজ্‌ড়ার ভট্টাচার্য্য বংশ দৌহিত্র সূত্রে সেই ভিটায় বাস করিতেছেন। রাজা শ্রীমন্ত পুত্র মহেন্দ্র ও শ্রীবল্লভ। মহেন্দ্র পু—যোগেন্দ্র।

নৃসিংহ—১২৩৯ খৃষ্টাব্দে দাসরাজ-বংশ ধ্বংস করিয়া ভূরশুট অধিকার করেন। তৎবংশে সুকবি ভারতচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেন, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্র লাল খাঁর পুত্র কুমার দেবেন্দ্র লাল খাঁ এক্ষণে এই স্থানের মালিক। বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র কর্পূরের দ্বারাই ভূরশুট পরগণার ব্রাহ্মণ রাজবংশের সমাপ্তি ঘটে। এই রাজ বংশোদ্ভব রাজা রুদ্র নারায়ণ রায়ের সহধর্ম্মিণী রণস্থলে অদ্ভুত বীরত্ব ও সমর কৌশল প্রদর্শন করেন, সেজন্য তাঁহাকে লোকে বঙ্গবীরাঙ্গনা "রায় বাঘিনী" বলে। ভূরশুটের ব্রাহ্মণরাজবংশীয় পাটনার উকিল শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায়ের নিকট তাঁহার বংশের একখানি বংশলতা আছে।

ভূরশুটের অন্তর্গত পাহাড়পুর গ্রামে রাজা মান সিংহের পুত্র পাহাড় সিংহ নির্ম্মিত। গড় ভবানীপুরের মণিনাথ মন্দিরে কায়স্থ রাজা পাণ্ডু দাসের বংশধর রাজা দেব নারায়ণ রায়ের নাম ও ১৩০৬ শকাব্দ এখনও খোদিত রহিয়াছে।

ভূরশুট, বরদা, বয়ড়া, আরামবাগ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য এ যাবৎ কেহই সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন নাই, অথচ এই সকল স্থানেই বাঙ্গালীর ইতিহাস আরম্ভ ও পতন হয়। "গৌড়ীয়" জাতি কখনও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবার নয়। এ জাতির স্থান বহু উর্দ্ধে।

চিংড়ে গ্রাম ভূরশুট পরগণায়*। নতিবপুর বয়ড়া পরগণায়। এই দুই পরগণা মহেন্দ্র খাঁ সিংহের অধিকারে ছিল। এই দুই গ্রামের মধ্যে দ্বারকেশ্বর নদ। ঐ দ্বারকেশ্বর নদী তীরে বড়খানতলা নামক স্থানে যে বড়খান পীরের আস্তানা আছে, তাহার ঠিক পূর্ব্ব গায়ে একটি কৃষ্ণ প্রস্তর প্রোথিত আছে। এই নতিবপুরের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে মগরা নামক এক স্থান আছে, তাহা দুর্জ্জয় মগরা নামে খ্যাত। উহা কাণানদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী নদীর ভরাট স্থান মাত্র। উহার পশ্চিমে সিংহচক (?) সুবোল বা সাবোল সিংহপুর গ্রাম। নতিবপুরের দশ মাইল দূরে জয়সিংহচক্ গ্রাম আছে। ইহা রণজিৎ সিংহ রায়ের দীঘির ৩।৪ মাইল নিকটবর্ত্তী। সাঁখরালের নিকট ও উলুবেড়িয়ার নিকট আরও দুইটি নতিবপুর গ্রাম অবস্থিত আছে। সিংহ মহাশয়দের বাড়ীতে যে "খাঁড়া" আছে, তাহা প্রায় ৮ পুরুষ হইতে রক্ষিত হইতেছে। ঐ খাঁড়ার ইস্পাতের ন্যায় ইস্পাৎ আজ কাল তৈয়ার হয়না। দোসতি গ্রামে শীতলেশ্বর নামক বহুকালের প্রাচীন শিব মন্দির আছে। এই স্থানে একটি পাথর পড়িয়া আছে। তাহারই আধ মাইল দক্ষিণে ধনপোঁতা নামক স্থান। চিংড়া গ্রামের সিংহের ভেড়ি ও সিংহপোঁতা আছে। চিংড়ের দক্ষিণে মোস্তাকাপুর গ্রামে সিংহের ভেড়ি নামে একটি বৃহৎ জমি আছে। ঐ স্থানে চূড়ামণি জলা বলিয়া প্রসিদ্ধ স্থান ও চূড়ামণি ঠাকুরের সমাধি আছে। চিংড়ের বিশেষতঃ এই স্থানে যে বাঁধ আছে তাহার দুই দিকে, পারালের বাঁধ নামক বাঁধের সন্নিকটে ১২।১৪ শত বর্গ ক্ষেত্রীর বা বাগদীর বাস আছে।

* ভূরশুট পরগণার প্রচলিত ইতিহাসে সিংহবংশীয়দিগের নাম দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পুরাতন সনন্দ বর্ত্তমান থাকায়, এক সময় সমস্ত ভূরশুট পরগণা সিংহবংশীয়দিগের হস্তগত হওয়ার প্রমাণ আছে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সিংহবংশীয়গণ এই অঞ্চলে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেন।

চিংড়ার উত্তর ভাগে দিক্‌বাঁধ নামক স্থান আছে, তাহা রণজিৎ বাটীর সীমানা। এই স্থানে "যোগীকুণ্ড" নামক স্থান আছে। চিংড়ে গ্রামের বিখ্যাত ঘোষালবংশ সিংহবংশের কুল পুরোহিত আছেন। ঘোষাল মহাশয়দের অনুমতি অনুসারে সুপ্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় পুরোহিত হন? পশ্চিমে চক্রপুর অবস্থিত। মোস্তাকাপুর, নতিবপুর, তেতুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে বাগ্দীরাই প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল ছিল।

পরগণা সলিমপুর বা সেন পাহাড়ির সন্নিকট সৎগোপ জাতির বাস ছিল। এই স্থানের রাজা মহেন্দ্র অমরার গড়ে বা মানকরে বাস করিতেন। "The long lines of fortification which enclosed his walled towns are still visible" রাজা মহেন্দ্র ৪০০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। এই রাজা মহেন্দ্রের কোন পরিচয় এ যাবৎ সঠিক পাওয়া যায় নাই।

এই রাজবংশের বংশধর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র রায় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে সেটেলমেণ্ট অফিসার (কাণুনগো) রূপে মহানাদে আগমন ও কয়েকমাস অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—তাঁহার বংশে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, প্রথম রাজা ভল্লুপাদের পিতামাতা ৺গঙ্গাসাগর গমন করেন ও পথিমধ্যে ভল্লুপাদের জন্ম হয়, কিন্তু জন্মের পরক্ষণে স্পন্দনাদি না থাকায় মৃত নিশ্চয় করিয়া শিশুকে তথায় ফেলিয়া দেন। কিছুক্ষণ পরে শিশুর জ্ঞান সঞ্চার হয় ও রোদন করিতে থাকে। শিবরাম স্বামী নামক একজন সাধু দৈবযোগে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ পরিত্যক্ত শিশুকে লইয়া গিয়া প্রতিপালন করেন। পরে তাহার অঙ্গে রাজচিহ্নাদি দেখিয়া ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দেন। অনন্তর তাঁহার পরিচয়াদি অবগত হইয়া পিতৃভূমিতে পাঠাইয়া দেন। ইঁহাকে ভল্লুকের দুগ্ধ খাওয়াইয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়া ভল্লুপাদ নাম রাখেন। ইনি পরে বাহুবলে রাজা হন এবং ইনিই এই বংশের প্রথম রাজা। তৎ পুত্র রাজা গোপাল।

গোপালের পুত্র রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ। এই বংশে ক্রমান্বয়ে ১৮জন রাজা হইয়াছিলেন, শেষ রাজার নাম বৈদ্যনাথ। সুবিস্তৃত গড় ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং তাহার উপর দিয়া ডিষ্টিক্ট বোর্ডের রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। কুলদেবী "শিবাক্ষা দেবীর মন্দির", গ্রামের মধ্যে "অমরার গড়ের দীঘি" (জলকর প্রায় ৫০ বিঘা) এবং এড়াল গ্রামে "যমুনা দীঘি" (জলকর প্রায় ২০০ বিঘা) ইঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। রাজা ভল্লুপাদের নামানুসারে আজ পর্য্যন্ত এই বংশ "ভালুকো ঘর" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন।

ভাগীরথীর দশ ক্রোশ পশ্চিমে, তারকেশ্বরের প্রায় চারি ক্রোশ দক্ষিণে এবং দামোদর নদের দেড় ক্রোশ পূর্ব্বদিকে দিলাকাশ নামক গ্রাম অবস্থিত। রোণ নামক দামোদরের এক শাখা দিলাকাশের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত। এই গ্রাম এক্ষণে কতকগুলি দুলে বাগ্দীর দ্বারা অধ্যুষিত। এখানে মাত্র ভৈরবী দেবীর মূর্ত্তি ইহার প্রাচীন স্মৃতি এখনও জাগাইয়া রাখিয়াছে। ভারতে মুসলমান আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে এই গ্রামে ক্ষত্রিয়েতর হিন্দুগণ রাজত্ব করিতেন। দিলাকাশের পূর্ব্বদিকে খুঁড়িগাছী নামক একখানি গ্রাম আছে। পূর্ব্বে এই গ্রামে বহু সংখ্যক ভীমদর্শন চণ্ডাল বাস করিত। এই গ্রামে একটি প্রাচীন ভীষণাকৃতি কালীমূর্ত্তি বিরাজিতা আছেন, এই কালী "ডাকাতে কালী" নামে বিখ্যাত। একজন কাপালিক এই ভৈরবী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন কালে দামোদর ও রোণের মধ্যস্থ স্থানে প্রাচীন হস্তিনাগড় রাজ্য ছিল। শনি ভাঙ্গড় নামক একজন বাগ্দী হস্তিনাগড় রাজ্য ধ্বংস করিয়া এক অনার্য্য রাজবংশ স্থাপন করেন। তাঁহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া এক ব্রাহ্মণ যুবক চতুরানন নিয়োগী এখানে রাজত্ব করেন।

তেলিঙ্গানার অন্ধ্রবংশীয় ককটী নামে এক বীরপুরুষ ওয়ারঙ্গলে ককটীয় নামে এক অতি পরাক্রান্ত রাজ্য সংস্থাপন করেন। মহানাদের

রাজা জয়চন্দ্র সিংহ ঐ রাজবংশীয় রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া দ্বারকেশ্বর নদ তীরে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ওয়ারঙ্গলের ককটী বা কাকতীয় বংশীয় রাজা মহাদেব পুত্র গণপতি রাঢ় আক্রমণ করেন। মহাদেব উগ্র সার্ব্বভৌম ১২৬০—৭২ খৃষ্টাব্দে ছিলেন, দেবগিরির যাদব বংশীয় জৈন পালের পুত্র। তিনি কোঙ্কণরাজ সোমেশ্বরকে পরাভূত করিয়া কোঙ্কণ রাজ্য জয় করেন। তিনি কর্ণাটরাজ ও গুর্জ্জরপতি বীশলদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। তৈলঙ্গের কাকতীয় বংশীয়া বীর নারী মহারাণী রুদ্রমা তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন। মহারাণী রুদ্রমা মহানাদের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। চাহমান বংশীয় নড়ুলার নরপতি মহেন্দ্র মহানাদ আক্রমণ করেন। পিষ্টপুরাধিপতি মহেন্দ্র ও কোশলাধিপতি মহেন্দ্র সমুদ্রগুপ্তের সময় মহানাদ আক্রমণ কালে পরাজিত হন। গুহাদিত্য বংশধর দুইজন গোয়ালিয়রপতি মহেন্দ্র মহানাদ আক্রমণ করেন। খৃঃ পূঃ ২৪১ অব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থে মহেন্দ্র মহানাদে আগমন করেন। ৯৫৮ খৃষ্টাব্দে মাধবরাজ গোয়ালিয়র হইতে মহানাদ আক্রমণ করেন। ১২১২ খৃষ্টাব্দে রাও শিবাজী মাড়বার হইতে মহানাদের বিজয়সিংহকে মুসলমান উচ্ছেদে সাহায্য করেন।

গড়বেতায় সর্ব্বমঙ্গলা ও কংসেশ্বর শিবের মন্দির অতি প্রাচীন। পূর্ব্বে এখানে বৃহৎ গড় ছিল। রাজা সৃষ্টিধরসিংহ এই গড় নির্ম্মাণ করেন। ১২২৮ খৃষ্টাব্দে বরঙ্গলের বা ওয়ারঙ্গলের রাজা (প্রতাপরুদ্র পুত্র ?) গণপতির হস্তে সৃষ্টিধর সিংহ নিহত হন।

"দিব্যাবদান" নামক প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থে জানা যায় যে রাজা পুষ্যমিত্র (পুশু) অশোক প্রতিষ্ঠিত ৮৪০০ ধর্ম্মরাজিকা ধ্বংস করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দে এই রাঢ় দেশের পশ্চিমাংশে চন্দ্র বর্ম্ম নামে এক পরাক্রান্ত ভাগবত মতাবলম্বী ক্ষত্রিয় নৃপতি বিষ্ণুচক্র প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণব

ধর্ম্ম স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পশ্চিম বঙ্গে কিছুদিনের জন্য পুষ্কর ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি দেখা গিয়াছিল। মিশ্র বা মিশর ব্রাহ্মণেরা এ দেশে তখন বসতি বিস্তার করিতেছিলেন।

গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ভারতে বৈদিক মার্গ পুনঃ প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। পাটলীপুত্র বা পাটনায় তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার আত্মীয় স্বজন বাঙ্গলার নানাস্থানে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। গুপ্তরাজগণের মুদ্রায় তান্ত্রিক দেব দেবীর মূর্ত্তি লক্ষিত হয়।

যে সকল সারস্বত ব্রাহ্মণ আসিয়া এদেশে "সপ্তশতী" নামক জনপদে বাস করেন, তাঁহারাই বাসভূমির নামানুসারে সপ্তশতী নামে প্রসিদ্ধ হন।

সিংহবংশের বংশাবলীতে কাটোয়ার অপর নাম কাটাদ্বীপ লিখিত আছে। কাটোয়া ও দাঁইহাটের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ও তৎসন্নিকট প্রাচীন পাইকপাড়া গ্রামে সিংহ রাজবংশের বহু কীর্ত্তির নিদর্শন বর্ত্তমান আছে।

মহেশ আকনা গ্রাম ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে কবি বিপ্রদাসের কবিতায় উল্লেখ আছে।

অগ্রদ্বীপে উজ্জৈনির রাজা বিক্রমাদিত্য স্নান করিতে আসিতেন। গোপীনাথ বিগ্রহ এই খানে অবস্থিত। এই রাজার রাজ সভায় মহাকবি কালিদাস ছিলেন বলিয়া প্রবাদ পাওয়া যায়।

সলিমপুর পরগণা কাকৃসা ও ভরতপুরের রাজার অধিকারে ছিল। মুসলমানেরা অধিকার করিয়া সলিমপুর নাম দিয়াছিল।

সেরগড় পরগণা, এখানে দুইটি পুরাতন দুর্গ আছে। চারুলিয়ার দুর্গ রাজা নরোত্তম নামে একজন রাজার দ্বারায় নির্ম্মিত হয়। পুরাতন প্রস্তরে তাহাই খোদিত আছে। কাকৃসা গ্রামেও পুরাতন দুর্গ আছে। পানচেৎ নামে রাজপুত জাতি কাকৃসা দুর্গের মালিক ছিলেন।

কেহ বলেন, কোন সময় কামরূপ ও রাক্ষেয়ার (বর্ত্তমান আরাকাণ) রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে সুহ্মদেশ বলিত।

সাঁওতাল পরগণার অন্তঃপাতী বৈদ্যনাথে যে শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই শিব রাবণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই শিবের পূজায় "রাবণেশ্বরায় শিবায়" পদ আছে।

"বড়চালা" নামক স্থানে গভীর অরণ্য মধ্যস্থিত মৃত্তিকাতলে প্রাপ্ত প্রস্তর নির্ম্মিত শিবলিঙ্গ এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের নিদর্শন।

চাপগড় রাজবংশের আদিপুরুষ দেবাদিদেব মহাদেবের পরম ভক্ত "নন্দী রুদ্র" হইতে সমুৎপন্ন।

গীতগ্রামের ঢিবী একটি স্থানের ভগ্নাবশেষ। এখানে যে সকল মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, এই শ্রেণীর মুদ্রা পূর্ব্বে ২৪ পরগণায় বেড়চাঁপায় (চন্দ্রকেতুর গড়ে) পাওয়া গিয়াছিল।

ভদ্রেশ্বরের প্রাচীনত্ব ও শিবের পরিচয় শ্রীমহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্রে শ্রীশিব পার্ব্বতী সংবাদে নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায়—

"ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকর নদীতটে।
ভাগীরথী নদীতীরে কপালেশ্বর ঈরিতঃ॥
ভদ্রেশ্বরশ্চ দেবেশি কল্যাণেশ্বর এব হি।
কালীঘট্টে নকুলেশঃ শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ॥"

বাঁশবেড়িয়ার ব্রজমোহন সিংহ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন,—"ভদ্রেশ্বর শিবের নামানুসারে এই স্থানের নাম ভদ্রেশ্বর হইয়াছে। এই শিব স্বয়ম্ভূ, অর্থাৎ স্বয়ং পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন, কোন মানব ইঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। তারকেশ্বর, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি যে সকল শিবের মস্তকে শূদ্রগণ হস্তার্পণ পূর্ব্বক পূজাদি করিতে পারে, ভদ্রেশ্বর শিব সেই সকল শিবের মধ্যে অন্যতম। যে কোন রকম বিপদে পড়িয়া ভদ্রেশ্বর শিবকে আরাধনা করিলে, সেই বিপদ হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। ইনি লক্ষ বিল্বপত্রে পূজিত হইলে বিশেষরূপে প্রসন্ন হন।"

১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে কবি বিপ্রদাস রচিত মনসার ভাসানে ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

"পশ্চিমে পাইকপাড়া রহে ভদ্রেশ্বর।
চাঁপদানি ডাহিনে বামে ইছাপুর॥"

দক্ষিণ রাঢ়ের কেলকিল নামক যবন রাজবংশ বিতাড়িত হইয়া বহুকাল পূর্ব্ববঙ্গে ও দক্ষিণ ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

রাজগৃহ, পঞ্চ পর্ব্বত বেষ্টিত তটিনী শোভিত যে সমতল ক্ষেত্র আছে, উহাই মগধ রাজ্যের বা পেলাসা রাজ্যের প্রাচীন স্থান। বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য পিতৃহন্তার (রাজা বিম্বিসারের) রাজধানী কুশাগারপুর ছিল। তাহার বহু পূর্ব্বে রামায়ণ মহাভারতের যুগে যখন এই স্থানে চেদী (বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড) ও মগধরাজ জরাসন্ধের রাজধানী ছিল, তখন ইহার নাম "গিরিব্রজ" অর্থাৎ পর্ব্বত বেষ্টিত নগর ছিল।

বিহার ও নালন্দার মধ্যে খনিত ও অখনিত বৌদ্ধ বিহারের স্তূপীকৃত ভগ্নাবশেষগুলি স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে কুয়াসাচ্ছন্ন রাজগৃহের পর্ব্বতমালা নয়ন পথে পতিত হয়।

শিবসমুদ্র, উষমতুর ও কদম্বরাজ মৃগেশ বর্ম্মার সময়ের খোদিত শিলাফলকে খৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মহানাদের রাজার সহিত ইহাদের যুদ্ধের কথা বর্ণিত আছে। দেবগিরির তাম্রশাসন পাঠে জানা যায় যে, রাজা কৃষ্ণ বর্ম্মা গাঙ্গেয় রাজা মাধব (২য়) কে নিজ ভগিনী সম্প্রদান করেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে পূর্ব্ব চালুক্যরাজ্যে অরাজক হওয়ায় মহানাদ ও গঙ্গাবংশীয় রাজগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। জয়বর্ম্ম ও তৎপুত্র অনন্ত বর্ম্ম, ৯৮৫ খৃষ্টাব্দে রাঢ়দেশ কিছুকালের জন্য অধিকার করেন। ১১৩২ খৃষ্টাব্দে কেশরীবংশের অবসান হয়। এই সময়

গঙ্গাবংশীয় চোরগঙ্গা উৎকলের প্রথম গঙ্গাবংশ স্থাপন করেন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে এই বংশের অবসান হয়।

খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চালুক্য রাজপুত বংশীয় রাজা জয়সিংহ দক্ষিণাপথে আপতিত হইয়া পল্লব জাতীয় রাজা ত্রিলোচন দ্বারা পরাজিত হইলে মহানাদের নিকটবর্ত্তী স্থানে আগমন করেন। জয় সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিষ্ণুবর্দ্ধন মহানাদের অদূরে "রসনা" (?)য় সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক কুন্তলরাজ্যের রাজধানী কল্যাণনগর অধিকার করিয়া দুষ্ট পল্লবদিগের উপর আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাতেও মহানাদের অতীত প্রাচীনত্বের প্রমাণ দিতেছে। এই রসনাই পরবর্ত্তী কালে রোসনা নামে অভিহিত হইয়াছে।

গৌরাঙ্গের সমসাময়িক গঙ্গাবংশীয় রাজা প্রতাপরুদ্র ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে স্বর্গগত হন। তাঁহার ৩২টি পুত্র ছিল। তাঁহারা খুরদায় রাজত্ব করিতেন। কিছুকাল পরে মুকুন্দ হরিচন্দন নামে একজন তৈলঙ্গী ও প্রধান মন্ত্রী দনাই বিশেষ বিখ্যাত হন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দ বুদ্ধিবলে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত দেশ অধিকার করেন।

[কোন অনিবার্য্য কারণে আমি এই গ্রন্থের ৮০ হইতে ৯৬ পৃষ্ঠার প্রুফ্ সংশোধন করিয়া দিবার অবসর পাই নাই, সেজন্য অনেক বর্ণাশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ ৮৭ পৃষ্ঠার ১২ পংক্তির পর এক পংক্তি মুদ্রিত না হওয়ায় ঐ স্থানের বর্ণিত বিষয়টি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে! উহা এইরূপ হইবে,—

গোস্বামীরা শ্রীশ্রীরাধাকান্ত, মদনগোপাল, মদনমোহন ও বল্লভচাঁদ বিগ্রহ স্থাপন করেন ও তদবধি এই স্থান গোস্বামী-মালিপাড়া নামে খ্যাত হয়। ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই স্থানকে বৃন্দাবনের ন্যায় তীর্থ স্বরূপ মনে করেন।]

গড় মণ্ডলের রাজা যাদব রায় খৃঃ পূঃ ৩৮২ অব্দে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পর রাজা মাধব সিংহ ৩৮৭ খৃঃ পূঃ অব্দে রাঢ়দেশ আক্রমণ করেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা সুমের সাহী নিহত হইলে এই রাজবংশের লোপ হয়। গড়মণ্ডলরাজ ত্রিভুবন রায়ের ১০৬৫ খৃষ্টাব্দে খোদিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহারা গোণ্ডহিন্দু ও ক্ষত্রিয় জাতির সহিত আদান প্রদান করিতেন।

ভগদত্তের পরলোকের পর অনঙ্গভীম, ব্রহ্মসিংহ প্রভৃতি ২৩ জন নরপতি রাজত্ব করিলেন, খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে উহাদের রাজত্ব লোপ হয়। নরক বংশের পর সুযজ্ঞ বংশীয় ভূপতিগণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। এই বংশীয় তৃতীয় নরপতি মাধব সিংহের* পুত্র বিজয় সিংহ ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। মাধব সিংহের পর ছয়জন নরপতি রাজত্ব করিলে পর এই বংশ তিরোহিত হয়, এবং গৌড়ে মগধের আধিপত্য (খৃঃ পূঃ ৪০০—৩০০) প্রতিষ্ঠিত হয়। মৌদ্গাল্য গোত্রীয় সিংহগণ "মাধব বংশ" বলিয়া পরিচিত।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভদ্রসেন নামক রাজা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রাজত্ব করিতেন। বিবর নামক জনৈক কুচিয়া গৃহস্থ ভদ্রসেনকে পরাস্ত করিয়া রত্নপুর নগর স্থাপন পূর্ব্বক রত্নধ্বজ নাম গ্রহণ করেন। এই বিবর বা রত্নধ্বজের পুত্র বিজয়ধ্বজ। রত্নধ্বজ বারেন্দ্রভূমির রাজা নরপালের কন্যা বা মহানাদের রাজা খড়্গরামের ভাগিনেয়ীর পাণিগ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মণ সমাজে প্রবাদ আছে,—"তিন শাণ্ডিল্যে বার্কাবাদ," অর্থাৎ—শাণ্ডিল্য গোত্রের তিনজন ব্রাহ্মণ একদা সরকার বার্ব্বকাবাদের জমিদার ছিলেন।

* মাধব সিংহ একাধিক ছিলেন কিনা, পরবর্ত্তী কালে তাহার বিচার হইবে। আমি এখানে ইতিহাসের চয়ন করিতেছি মাত্র।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মধ্যভারতের খাণ্ডেবালা ব্রাহ্মণকুলে মহেশ ঠাকুর নামক একটি অধ্যাপক ত্রিহুত রাজ্যের তদানীন্তন রাজা ভব সিংহের পৌরহিত্যে ব্রতী হইয়া ত্রিহুত রাজ্যে বাস করেন। তাঁহার অন্যতম ছাত্র রঘুনন্দন রায় হাতী পরগণার রাজবংশ ধ্বংস করিয়া বিশ্বাস ঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ আকবরের প্রদত্ত হাতীপরগণা জমিদারী ভোগ করেন। কোন প্রকারে উহা মহেশ ঠাকুরের হস্তগত হয় এবং ইনিই বর্ত্তমান দ্বারভাঙ্গার ব্রাহ্মণ রাজবংশের আদি পুরুষ। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ এই অঞ্চলের অনেক প্রাচীন রাজবংশের লুপ্ত কাহিনী ৺নবীন চন্দ্র সিংহকে দিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মহারাজা রামেশ্বর সিংহ সেই গুলি চাহিয়া লইয়া নবীন সিংহকে আর প্রত্যর্পণ করেন নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াও ঐগুলি ফেরৎ না পাওয়ায় নবীন সিংহ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন।

বীরসিংহ বিষ্ণুপুরের বর্ত্তমান দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বীরসিংহই বিষ্ণুপুরের সাতটী বাঁধ খনিত করিয়াছিলেন। ৯২৮ মল্লাব্দে বা ১৬২২ খৃঃ অব্দে বীর সিংহ মল্লেশ্বর শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাহার পর ১৬৫৮ খৃঃ অব্দে তিনি লালজীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মহিষী রাণী চূড়ামণি মুরলী মোহন ও মদনগোপালের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বীর সিংহ পুত্র দুর্জ্জন সিংহ ১৭০১ খৃঃ অব্দে মদন মোহনের বিচিত্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। শোভা সিংহ ও উড়িষ্যার পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁর বিদ্রোহের সময় দুর্জ্জন সিংহ মোগল রাজকে বিশেষ রূপে সাহায্য করেন। এই সাহায্যের জন্য বিষ্ণুপুর হইতে রাজস্ব সংগ্রহের সময় বিষ্ণুপুরের রাজা অব্যাহতি লাভ করেন। দুর্জ্জন সিংহের পৌত্র রাজা গোপালসিংহ বিষ্ণুপুর রাজবংশের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। গোপালসিংহের রাজত্বকালে বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তি চন্দ্র বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ করিয়া কতকাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুর রাজবংশের ইতিহাসে এই বংশ আদি মল্ল কর্ত্তৃক প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায় যে, পাঠানদিগের সময় এই বংশের প্রথম অভ্যুদয় হয়। প্রায় ১৯১১ খৃঃ অব্দে রাজা রামকৃষ্ণ সিংহের মৃত্যুতে বংশের শেষ হয়।

বর্দ্ধমান জেলার চকদীঘির সুপ্রসিদ্ধ রাজপুত জমিদারবংশ মোগল সম্রাট আরংজীবের রাজত্বকালে বাঙ্গলায় আসিয়া বসবাস করেন। ১৯৩০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার অন্যতম মন্ত্রী তাহিরপুরের কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় পদত্যাগ করার পর এই বংশীয় লেফটেনাণ্ট বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়, এম-এ, বি, এল, ঐ পদে নিযুক্ত হন। ইনি পরলোকগত মেজর ছগন লাল সিংহ রায়ের পৌত্র এবং চকদীঘির রাজা মণিলাল সিংহ রায়, সি-আই-ই,র কনিষ্ঠ ভ্রাতা রজনী লাল সিংহ রায়ের পুত্র। হুগলী জেলার মাথাল পুরেও সিংহরায় বংশে পরাক্রমশালী ধনাঢ্য রাজপুত জমিদার আছেন; ইঁহারাও বহুকাল হইতে বাঙ্গলায় বাস করিতেছেন।

বর্ত্তমান বর্দ্ধমানের কর্পূর-ক্ষেত্রী রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ সঙ্গম রায় লাহোর হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বৈকুণ্ঠপুর নামক স্থানে সামান্য দোকান করিয়া বাস করিতেন, এইরূপ ইতিহাসে পাওয়া যায়। তৎপুত্র বঙ্কুবিহারী রায় তথায় ছিলেন। তৎপুত্র আবু রায় ও তৎপুত্র বাবু রায় সম্ভবতঃ বর্দ্ধমানের প্রথম কোতওয়াল নিযুক্ত হন। বাবুরায় পুত্র ঘনশ্যাম রায়। ইনি চিতুয়া ও বরদা পরগণার রাজাদের রাজবাটী লুণ্ঠন করেন। এইরূপ 'বর্দ্ধমান ইতি কথায়' লিখিত হইয়াছে। তৎপুত্র কৃষ্ণরাম, কালু, ভুতি, রায় প্রভৃতি। কৃষ্ণরাম পুত্র জগৎরাম। এই সময় শোভাসিংহ বঙ্গদেশে পাঠানদের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহ করেন। কৃষ্ণরাম রায় রাজা শোভা সিংহের হস্তে নিহত হন এবং জগৎরাম রায় ঢাকার নবাব ইব্রাহিম খান ও কৃষ্ণনগরের রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের আশ্রয় লয়েন। বর্দ্ধমান,

কৃষ্ণনগর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি এবং আরও কয়েকটি জমিদারের চক্রান্তে শোভাসিংহ নিহত হন এবং বিদ্রোহ দমিত হয়। নিখিল নাথ রায় লিখিয়াছেন, এই সময়ে শোভাসিংহ 'ছত্রপতি শোভাসিংহ' নাম ধারণ করেন এবং তাঁহার অধিকৃত ভূভাগের বার্ষিক আয় ৬০ লক্ষ টাকা। ৩০ হাজার পদাতিক ও ৬০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। রাজা শোভাসিংহ প্রকৃত তিন বৎসর মোগলদের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ কাড়িয়া রাখিয়াছিলেন। হিন্দু জমিদার বর্গের অত্যাচারেই শোভা সিংহ নিহত হন। জগৎরাম রায় পুত্র রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র রায় ও মিত্রসেন। কীর্ত্তিচন্দ্র প্রথম রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন এবং মুরশিদকুলি খাঁ ইঁহার দ্বারায় হিন্দু জমিদারদের দমিত ও রাজবাটী লুন্ঠিত করিয়াছিলেন। কীর্ত্তিচন্দ্র রায় অম্বিকা-কালনার মৌদ্গল্য গোত্রীয় রাজা শম্ভুরাম সিংহের রাজবাটী লুণ্ঠন ও দখল করেন। কীর্ত্তিচন্দ্র পুত্র রাজা চিত্রসেন ও প্রতাপচাঁদ। ইঁহাকে জাল প্রতাপচাঁদ বলিত। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'জাল প্রতাপচাঁদ' গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হয়, ইনিই প্রকৃত প্রতাপচাঁদ হইবেন। মিত্র সেন পুত্র রাজা তিলকচন্দ্র রায়। তিলকচন্দ্র পুত্র মহারাজা তেজচন্দ্র পুত্র মহারাজাধিরাজ মহতাব্ চন্দ্। মহাভারতের অনুবাদ ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি, ইহাই রাজবাটীর মহাভারত নামে খ্যাত। মহতাব্ চন্দের পুত্র মহারাজাধিরাজ অব্ তাব্ চন্দ পুত্র মহারাজাধিরাজ স্যার বিজয়চন্দ বাহাদুর। কয়েক পুরুষ পোষ্যপুত্রে চলিয়াছে। এক্ষণে বিজয়চন্দের পুত্র ও কন্যা হইয়াছে।

মৌদ্গল্য গোত্রীয় সিংহ রাজবংশ বর্দ্ধমানে বহুকাল রাজত্ব করেন। এই রাজবংশের সম্বন্ধে প্রচলিত ইতিহাসে কোন কথাই পাওয়া যায় না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে প্রাচীন গ্রন্থের স্থানে স্থানে কিছু কিছু দৃষ্ট হইয়া থাকে। একথা সকলের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, যে সময় কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান, নাটোর প্রভৃতি বর্ত্তমান জমিদারগণের উদ্ভব হয় নাই, সেই সময় আমুলিয়া গড়ে, মহানাদ গড়ে, সাভার গড়ে, ঢাকুরিয়া গড়ে সিঙ্গুর গড়ে, চিংড়ে গড়ে,

বালাওা গড়ে, মৌদগল্য গোত্র সিংহ রাজবংশ স্বাধীনভাবে এই দেশ শাসন করিতেন। তখন বিষ্ণুপুর রাজ অপর দিকে রাজত্ব করিতেন।

নাটোরের প্রথম রাজা রামজীবনের দত্তক পৌত্র রাজা রামকান্তের ও রাণী ভবানীর দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ রায়, সাহ আলম কর্ত্তৃক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজা রামকান্ত চৌগ্রাম রাজবংশের আদি পুরুষ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ। রামকান্তের পিতামহ পাঁচু রায়ের সহোদর ভুবন রায়ের প্রপৌত্র রাজা বীরেশ্বর রায় তাহিরপুরের রাজা হন।

নবীনচন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন—খৃঃ ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা হরিশচন্দ্র সিংহের সময় শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ ভট্ট, কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ,বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম, সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর, এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ মিলিয়া বরেন্দ্র মণ্ডলে সমাজ শাসন করেন। খৃঃ ১৫শ শতাব্দীতে আমুলিয়া রাজ্যের ধ্বংস হইবার প্রাক্কালে কামদেব ভট্ট তাহিরপুরে বাস করিয়া তথাকার ব্রাহ্মণ জমিদার হন। পরবর্ত্তীকালে কাশ্যপ গোত্রীয় বীরেশ্বর রায় ঐ জমিদারী প্রাপ্ত হন। নাটোর, রাম-গোপালপুর, গৌরীপুর, গোলকপুর, ময়মনসিংহ, প্রভৃতি স্থানের জমিদারদের আদিপুরুষ ঐ সুষেণ। মৌনভট্ট নামে এক ব্যক্তি অমুলিয়া ঋক্‌পুরে বাস করিতেন। মনুসংহিতার টীকাকার সুপ্রসিদ্ধ কুল্লুক ভট্ট ত্রিবেণীবাসী ছিলেন। কামদেব ভট্ট গন্ধর্ব্ব খাঁ সিংহের সময় রাজ্য বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বারাহী বা বারানই নদীর ধারে কন্দর্প খাঁ সিংহের দুর্গ ক্রয় করেন। বোধ হয় রাজা রামরাম সিংহের* নাম স্মরণার্থে পরবর্ত্তী সময়ে এই স্থান "রাম রামা" নামে পরিচিত হয়।†

* আমুলিয়া—ভারলের রাজা রাম রাম সিংহ আকবরের সময়ে জীবিত ছিলেন।

† এই রামরামা এক্ষণে নাটোর ছোট তরফের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। এখানে নাটোরের মহারাজা সাধক রামকৃষ্ণের স্থাপিত ৺ লক্ষ্মীমায়ের মন্দির আছে। লক্ষ্মীমা

ঐ অঞ্চল তাহির খাঁ সিংহ নামক জায়গীরদারের অধীন ছিল, কামদেব সেই জায়গীর প্রাপ্ত হন। কামদেবের পুত্র বিজয় আমুলিয়া রাজার বিদ্রোহ দমনে সহায়তা করিয়া লস্করপুর পরগণা লাভ করেন। পুঁঠিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্করাক্ষ রাজা চন্দ্রবর সিংহের মন্ত্রী ছিলেন। আমুলিয়া হইতে রাজা ইন্দ্রজিৎ সিংহ রায় টোডরমল্ল মেহরীকে রাজস্ব বন্দোবস্ত কার্য্যে সহায়তা করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ ৫২ পরগণা প্রাপ্ত হন। ইন্দ্রজিৎ পুত্র রাজা ওমরাও সিংহ।

সাহ সুজা এই সময় আমুলিয়া-কায়েত পাড়া হইতে সূর্য্য সিংহকে বন্দী করিয়া দিল্লী প্রেরণ করেন এবং তথায় বন্দীদশায় তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই সুযোগে মনে হয় এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ তাহিরপুর পরগণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর বিষয় কার্য্য ত্যাগ করিয়া কাশিধামে ধর্ম্ম চর্চ্চায় কালাতিপাত করিতেছেন। নিম্নলিখিত গানটি রাজা শশিশেখরেশ্বরের রচিত বলিয়া শুনা যায়,—

নামে কথিত হইলেও তারামূর্ত্তি বিরাজিতা। এখানে সেবা পূজার যথেষ্ট বন্দোবস্ত আছে। ১২৯৬ বঙ্গাব্দে আমি একদিন দৈবযোগে এই স্থানে সন্ধ্যার প্রাক্কালে উপনীত হই। তখন আমার জ্বর ভোগ হইতেছে। পুরোহিত মহাশয় আমাকে সযত্নে স্থান দান করেন। আমার সঙ্গে তাহিরপুরের হাট হইতে খরিদ করা দুই পয়সার খাগড়াই (চিনির মুড়কী) ছিল, রাত্রে তাহাই খাইলাম। পরদিন প্রাতে জ্বর ছাড়িয়া যায়, এবং ৺রী মায়ের দীঘিতে স্নান করিয়া ভোগের প্রসাদ খাইবার ইচ্ছা বলবতী হয়। আমি তৈল মাখিতেছি, এমন সময় পুরোহিত মহাশয় সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি ? কা'ল তত জ্বর—আজ স্নানের আয়োজন ?" আমি বলিলাম—মায়ের নিকটে আসিয়া আমার ৩।৪ দিনের প্রবল জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে, এইবার তাঁহার দীঘিতে স্নান করিয়া ভোগের প্রসাদও খাইব, এবং দেখিব আর জ্বর হয় কি না। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "সেরূপ ভক্তিভাবে প্রসাদ খাইলে জ্বর আর হইবে না।" সেই প্রসাদের সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন অমৃতের স্থায় ভোজন করিয়াছিলাম, আমার আর জ্বর হয় নাই।

"আমার আয় বুঝিয়া ব্যয় রে ভাই
নিজের ওজন বুঝে চলি।
সিকি খাই, সিকি খাওয়াই,
আর সিকি রাখি শিকায় তুলি,—
আর সিকি খাটে হাটে—
পুরে উঠে তায় পয়সার থলী।"

কাশিমপুর রাজবংশের সহিত তাহিরপুর রাজবংশের আত্মীয়তা ছিল।

বৎসাচার্য্য নামক এক সাত্বিক প্রকৃতির ব্রাহ্মণ পুটিয়ার সন্নিহিত একটি বনমধ্যে আশ্রম করিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। বাঙ্গলার রাজস্ব সংগ্রাহকগণ দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ না করায় দিল্লীর মোগল বাদসাহ তাঁহাদের দমনার্থ সৈন্য সহ এক সৈন্যাধ্যক্ষ প্রেরণ করেন। মোগল সেনাপতি মহানাদ, বল্লঘরিয়া, আম্বুলিয়া প্রভৃতি ধ্বংস সাধন করিয়া পুটিয়ার রাজা চন্দ্রবর সিংহকে দমনার্থ গমন করিলে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ মোগল সৈন্যদের সহায়তা করিয়া রাজা চন্দ্রবর সিংহকে নিহত করেন। উহার পুরস্কার স্বরূপ ঐ ব্রাহ্মণ লস্করপুর পরগণা জমিদারী লাভ করেন। তদীয় পুত্র পীতাম্বর ও তৎপুত্র অথবা ভ্রাতা নীলাম্বর পুটিয়ার সিংহবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। নীলাম্বর পুত্র আনন্দ, সিংহবংশের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিয়া দিল্লী হইতে রাজা উপাধির সনন্দ প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশধর দর্পনারায়ণ ঠাকুর মুরশিদ কুলিখাঁর সময় বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া মহানাদের রাজা পূরণ খাঁকে ধরিয়া দেন। দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশধর শরৎ সুন্দরী দেবী ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী "মহারাণী" উপাধিতে ভূষিত হন।

অভিধানে বরেন্দ্র শব্দের কোন প্রকার ধাতুগত ব্যুৎপত্তি পাওয়া যায় না। অন্যদিকে বর্ত্তমান মহানাদকেও পূর্ব্বে "বারীন্দ্রী" বলিত। পশ্চিম বঙ্গের "ড়" কে পূর্ব্ববঙ্গে "র" বলে। ইহা হইতে মনে হয় কাণ্যকুব্জের রাজা ইন্দ্রায়ুধ হরিশ সিংহের রাজসভায় আগমন করায় হয়ত এই স্থান

"ইন্দ্র" হইতে "বড়-ইন্দ্র" বা বড়েন্দ্র নামকরণ হইয়াছিল। সিংহবংশের প্রাচীন কাগজে পাওয়া যায় যে, রাজসাহী জেলার পশ্চিমাংশে কোনও "সাহী" উপাধিকারী ভুঁইয়া ব্রাহ্মণদের "বারিন্দ্রা" নামে একটি জনপদ ছিল। ভুঁইয়া ব্রাহ্মণেরা এক্ষণে বিহার অঞ্চলে হাতুয়া, দ্বারভাঙ্গা রাজবংশ বলিয়া জানি। "বরিন্দ্রা" নামে এক প্রকার ধান এই দেশে জন্মিয়া থাকে, এই বরিন্দ্রা ধান্য হইতে বারেন্দ্র দেশ হওয়াও সম্ভব। ছিনা আকনা নিবাসী মতিলাল চট্টোপাধ্যায় প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক প্রাপ্ত হন, তিনি বলিতেন,—"মহানাদের সিংহনামধারী বারজন রাজবংশধর 'পৌষ নারায়ণী' যোগে করতোয়া স্নান মাহাত্ম্য শ্রুত হইয়া করতোয়ার পবিত্র সলিলে শুভক্ষণে অবগাহন পূর্ব্বক অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় মানসে বার দিক হইতে এতৎ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু মহাস্থানে পৌঁছিয়াই অবগত হইলেন যে, মহাযোগ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কাজেই বিফল মনোরথে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া তাঁহারা পুনর্ব্বার যোগাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় এতৎ প্রদেশেই অবস্থিতি করিলেন এবং তথায় বারজন রাজপুত্র যথাক্রমে বারটি রাজ্য স্থাপন করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাহাতেই ঐ অঞ্চল বারেন্দ্র নামে খ্যাত হইল।" কিন্তু এই গল্পটি অন্য লোকের মুখে পাল ও সেনবংশীয়দের নামেও শুনা যায়। "দিগ্বিজয় প্রকাশ" গ্রন্থে ও "ভবিষ্য খণ্ডম্" গ্রন্থে "বরেন্দ্র" শব্দ পাওয়া যায়। মহানন্দা পশ্চিম দেশে থাকায়, ইহার বিবরণ সঠিক বুঝা যায়না। গঙ্গানদীর "ব" দ্বীপ জলমগ্ন ছিল, এবং সমুদ্র সংলগ্ন ভূমি বলিয়াই বারীন্দ্রী নাম প্রদত্ত হয়, ইহাও প্রবাদ আছে। যখন একটি নাম আছে, তখন তাহার উৎপত্তির হেতু থাকিবেই।

মগধরাজ জরাসন্ধের বন্ধু পুণ্ড্র বা পাণ্ডুয়ার রাজা বাসুদেব দ্বিতীয় বাসুদেবের নাম পৃথিবী হইতে নিরাকরণ মানসে সুরসেনী শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী আক্রমণ পূর্ব্বক অবরোধ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে তাঁহাকে

নিহত করিয়াছিলেন। তাহার পরে পৌণ্ড্র রাজ্যের প্রভাব ও প্রতিপত্তির অবসান হইয়া মৎস্য বা কৈবর্ত্ত রাজ্যের অভ্যুদয় হয় এবং সেই জন্যই মহাভারতে রাজসূয় যজ্ঞের পরবর্ত্তী কালে আমরা বিরাট রাজার প্রসিদ্ধি দেখিতে পাই।

মহানাদের নিকটে বরাট,—বিরাটের কাল বিধ্বস্ত বিভবের নিদর্শন এবং সেই পুণ্যগতা মৎস্যরাজ্য মেদিনীপুর বলিয়াই মনে হয়। স্কন্দপুরাণে রাঢ়ে বা পৌণ্ড্রদেশে "মান্দারেশ্বর" নামে মহাদেব বিরাজ করেন (বর্ত্তমান মান্দারণ) উল্লেখ আছে। দেবী ভাগবতে এতৎ প্রদেশে পাটলা (পাটুলী ?) দেবীর মন্দির বর্ণিত হইয়াছে। ৺শ্রী পাটলা দেবী বিষ্ণুচক্রে কর্ত্তিত সতীদেহের ৫১ পীঠের মধ্যে গণিত হয়। ভবানীপুরে অপর্ণাদেবীও এতদ্দেশান্তর্গত। বর্ত্তমানে এই পৌণ্ড্রদেশ কোথায়? পাণিনি ইহাকে গৌড় পুরম্ বা গৌড় দেশের রাজধানী বলিয়াছেন, কিন্তু স্থান নির্দ্দেশ করেন নাই। পাবনা সহর নির্ম্মাণ কালে তৎসান্নিধ্যে নদীগর্ভ হইতে চারিটি প্রাচীন প্রস্তর স্তম্ভ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মালদহ জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া নগরে প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ও অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ আছে। মহানাদেও চন্দ্রকেতুর রাজবাটীর সন্নিকট পাণ্ডু রাজার বড় দীঘি (পাঁড়ুই) ও তৎপার্শ্বে ত্রসভীন নামক দীঘি আছে। মালদহ জেলায় পাণ্ডুয়া নগরে একটি প্রাচীন পুষ্করিণীকে এখনও লোকে "হোমকুণ্ড" বলে। হিন্দু রাজাগণের সময় ব্রাহ্মণেরা এই খানে হোম করিতেন। বৌদ্ধ প্রভাবের চিহ্নও এখানে দৃষ্ট হয়। কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য তাঁহার দিগ্বিজয় কালে গুপ্ত তত্ত্বানুসন্ধান ব্যপদেশে কমলা নাম্নী জনৈক নর্ত্তকীর গৃহে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করেন। পরে জয়াদিত্য পঞ্চ গৌড় জয় করিলে তাঁহার শ্বশুরই সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হয়েন। মুসলমান বিজয়ের পর ঐতিহাসিক গল্প লেখক মিনহাজ তাঁহার গৌড় রাজ্যের বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—"লক্ষণাবতী রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তর ও পূর্ব্বাংশের

নাম 'বারেন্দ্র', তাহার রাজধানী দেবকোট এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশের নাম 'রাঢ়ল বা রাঢ়' এবং তাহার রাজধানী লক্ষণনগর বা গৌড়।" এইরূপ বিভাগ সিংহলপাটন রাজগণ কর্ত্তৃক রাঢ়দেশ জয় করিবার পর হইতে প্রচলিত হইয়াছিল।

আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদিতে প্রাচীন ইতিহাস অতি অস্পষ্ট এবং উপযুক্ত প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিপন্ন নহে। সিংহল পাটন, মহানাদ, আমুর, আমুলিয়া প্রভৃতি নগরের ইতিহাস কেন লেখা হয় নাই, কুলাচার্য্য ও ঘটকদিগের গ্রন্থগুলি হঠাৎ লুপ্ত হইল কেন? ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজ এখনও বিদ্যমান থাকায়, এই সকল প্রাচীন গ্রন্থ লুপ্ত হইবার এক গুপ্ত কারণ আছে। সে কারণ—"প্রাচীন বংশের মর্য্যাদা নষ্ট করিবার চেষ্টা, নূতন বংশ স্থাপন এবং বৈদ্য ও কায়স্থের উপবীত গ্রহণ"।

সাম্রাজ্যের স্বামী সম্রাট, মহারাষ্ট্রের স্বামী মহারাজ, রাজ্যের স্বামী রাজা বা রাণা, পরগণার স্বামী জমিদার, মৌজার স্বামী তালুকদার। কিন্তু আজকাল সামান্য ভূমধ্যকারীও রাজা, মহারাজা উপাধি পাইতেছেন। ৺নবীন চন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন—

"বর্ত্তমান কালে হেতমপুরের রাজা, কাশিম বাজারের (তিলি) মহারাজা, ভাগ্যকুলের কুণ্ড রাজা, উত্তরপাড়ার রাজা, লালগোলার রাজা, গোয়াল পাড়ার রাজা, ভাওয়ালের রাজা, ঘুঘু ডাঙ্গার রাজা, কৃষ্ণনগরের (ব্রাহ্মণ) মহারাজা, পাথুরিয়া ঘাটার (পিরুলি) রাজা, শোভাবাজারের (দেব) রাজা, ভূ-কৈলাশের রাজা, শিয়ারশোলের রাজা, শোণবর্ষার রাজা, কাট্রাসগড়ের রাজা, দ্বারবঙ্গের রাজা, চাঁচড়ার রাজা, পাইকপাড়া-কান্দীর রাজা, নাটোরের মহারাজা, তাহিরপুরের রাজা, দিঘাপতিয়ার রাজা, মুক্তাগাছার রাজা, শ্রীহট্টের রাজা, প্রভৃতি জমিদার ও তালুকদারগণ সকলেই কোন ঐতিহাসিক যুগের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ সম্ভূত নহেন। রাজবংশ স্থাপন করিতে বাহুবলের প্রয়োজন দেখান নাই।

বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তি চন্দ্র রায় একমাত্র ক্ষত্রপ বলধারী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার উপযুক্ত বংশধর মহারাজাধিরাজ বিজয় চাঁদ মহাতাপ বাহাদুর বর্দ্ধমানের ময়ূরাসন অলঙ্কৃত করিতেছেন। বর্ত্তমান কালে বাঙ্গালীর জাতীয় নেতা হইবার উপযুক্ত তিনিই।" কিন্তু বিগত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাতে অবস্থান করিতে বাধ্য হওয়ায় এবং সম্পত্তি ঋণ গ্রস্ত বলিয়া তাঁহার বিশাল সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে সমর্পণ করিয়া তিনি এক্ষণে একরূপ নির্লিপ্ত ভাবেই অবস্থান করিতেছেন। ত্রিপুরার ও কুচবিহারের মহারাজাদ্বয় পাঠান রাজত্বের সময় যুদ্ধাদি করিতেন।

যে সময় বেঙ্গল ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স লিখিত হয়, সেই সময় পুরাতন রাজবংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল এবং আধুনিক রাজাগণ সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছামত সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন ও তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

মহাকবি কালিদাসের দুর্দ্দশার দিনে নদীয়া জেলাস্থ দেব গ্রামে একজন মহাত্মা আশ্রয় প্রাপ্ত হন। বঙ্গদেশে "উজানী নগর" ছিল, "বিক্রম কেশরী রাজা" ছিলেন, ইহা পুরাতন গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই উজানী, বাঙ্গালী কায়স্থের উজ্জয়িনী, একথা বস্তুতঃই সত্য, স্বপ্ন, না—উপন্যাস? স্বর্গীয় ব্রজমোহন সিংহ ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে "সংবাদ রত্নাকর" পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"এই বিক্রমাদিত্য একজন স্থানীয় সামন্তরাজ, ইনি উজ্জয়িনীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য নহেন। এই সামন্ত রাজের বিক্রমপুর নদীয়ার ধূলিতে লুটাইত।" দেবগ্রাম অর্থে রাজার বসতি স্থান। নদীয়া জেলায় বিক্রমজিতের সাম্রাজ্য এক নূতন ধরণের হইয়াছিল, তাহা অতি গৌরবের চিরন্তন মহা সাম্রাজ্য। বিক্রমাদিত্যের পুত্র মাধব সেন। আন্দুলিয়ার সিংহবংশ এই মাধবের বংশধারা। নদীয়া জেলার দেবগ্রাম ও বিক্রমপুর পাল রাজবংশের সময় প্রসিদ্ধ ছিল। বাঙ্গালীর পর্ণকুটীরে

যে সকল মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই।

কামরূপের বর্ম্মণ রাজগণ বড় প্রবল হইয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত অধিকার করেন এবং সমতট রাজ্য গ্রাস করিতে সচেষ্ট হন। এই সুযোগে বিক্রমজিৎ কোনও রাজার সেনাপতিত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক কামরূপ সৈন্যকে পরাভূত করিয়া দেশ নিষ্কণ্টক করেন।

অন্ধ্র রাজগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষ একাধিক বার ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছিল। যাহা হউক ইহাদের প্রতিষ্ঠিত দেব মন্দিরাদির প্রচুর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দাক্ষিণাত্যে দেখিতে পাওয়া যায়।

নন্দ রাজারা ক্ষত্রিয়দিগকে ধ্বংস করিয়া দেন। তাঁহাদের উত্তরাধিকারী 'মৌর্য্য' চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতির জাতি, গোত্র ও উৎপত্তির বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

একজন ক্ষত্রিয় (?) সরস্বতী নদীর তীরে পোকরণ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া বাহ্লীক হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

গুপ্তরাজগণের সহিত বর্ম্মরাজগণের ভয়ানক যুদ্ধের পর সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হয়। গুপ্তগণ বর্ম্মদের মধ্য-ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দিলে, ইহারা রাঢ়ের "সিঙ্গুর" নামক নগরে পৈত্রিক রাজ্যে ফিরিয়া আসেন। গুপ্তেরা বিষ্ণুর উপাসক এবং বর্ম্মরা শাক্ত ছিলেন।

মধ্য এসিয়ার আর এক নাম শাকদ্বীপ। অসভ্য গ্রীকরা স্কাইথিয়া বা কাইথিয়া বলিত। কাইথিয়া প্রাচীন ভারতেরই কায়া বা অঙ্গ ছিল। ইহারা ভারতে আসিয়া ব্রাহ্মণদের দাসত্ব স্বীকার করিয়া হিন্দু সমাজে প্রবেশ করেন।

৫০০ খৃষ্টাব্দে সমতল রাঢ়, বঙ্গের বাহিরেও রাজ্য বিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই যুগেই বাঙ্গালীর আদি গৌরব শীলভদ্র জীবিত

ছিলেন, তিনি "সমতটের এক কায়স্থ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন।" মতান্তরে শীলভদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।

"বৌদ্ধ বটু খাঁ মঙ্গল তুরস্ক দিয়া তিনবার ইউরোপ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন" ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। "East India Association Jaurnal, London.

৬০০ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার রাজা লোকনাথ করণ নামে এক রাজার সন্ধান পাই। তাঁহার শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে। লোকনাথের পুত্র লক্ষ্মীনাথ। কুলকারিকায় নাথবংশের পরাশর বা পাংশব, ভরদ্বাজ ও মৌদ্গল্য এই তিনটি গোত্র এবং করণ বংশ বলিয়াই বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

৭০০ খৃষ্টাব্দে মহানাদের রাজা ছত্রক সিংহের অধঃপতনের পর আর্য্যাবর্ত্তে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। এই অরাজকতার সময় রাঢ়ের জননায়কগণ আত্মসংযমের পরিচয় দিয়াছিলেন। সিংহবংশীয় নরপতিগণ রাঢ় দেশকে জনকভূ বা জন্মভূমি বলিতেন।

৭০৭ খৃষ্টাব্দে দেবশক্তির পুত্র বৎসরাজ তাঁহার সেনাপতি শম্ভু সিংহকে গৌড়ের বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী নরপতির উচ্ছেদ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করেন। গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দির নিকটস্থ সূর্য্যমন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলকে দেখিতে পাই, কমাদেশাধিপ পুরুষোত্তম সিংহ বৌদ্ধ ধর্ম্মের মলিন অবস্থা অবলোকন করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী সমাদ লক্ষপতি অশোককল্ল হিন্দুরাজের সাহায্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের পবিত্রতা আনয়ন করিয়াছিলেন। এই সময় লক্ষণাব্দ প্রচলিত ছিল। তাঁহার দৌহিত্র, রত্নশ্রীর গর্ভজাত সালুকের * রাজা মাণিকসিংহের মুক্তি

* মহানাদের নিকটে "সালুকগড়" নামক একটি গ্রাম আছে।

কামনায় গয়ায় ধর্ম্মকুটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পুরুষোত্তম সিংহের গুরু স্থবির ধর্ম্মরক্ষিতের তত্ত্বাবধানে ১৮১৩ নির্ব্বাণাব্দে উক্ত নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

"অনাদিবর সিংহ মৌদ্গল্য গোত্রের পদ্ধতি।
পুরষোত্তম সিংহ সিংহ সমাজের খ্যাতি॥"
(দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলকীর্ত্তন—নরহরি বসু প্রণীত)

ভাগীরথীর পশ্চিম তটে পাল ও সিংহ বংশ রাজত্ব করিতেন।

সম্রাট ধর্ম্মপাল নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে এই সিংহ বংশের সাহায্যে ইন্দ্রায়ুধ প্রভৃতি নরপতিগণকে পরাজিত এবং অনুগত কায়স্থ চক্রায়ুধ গুহকে কান্যকুব্জের ময়ুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল সিংহবংশীয় রাজকন্যা কল্যাণী দাসীর প্রাণিগ্রহণ করেন বলিয়া, রাষ্ট্রকূট নরপতির কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশের জন্য যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।* এই সময় কান্যকুব্জের পথে পথে রাষ্ট্রকূটগণ বলিয়া বেড়াইয়াছিল যে, ধর্ম্মপালের দর্প খর্ব্ব করিয়া রাঢ়ীর সিংহ সামন্ত রাজকন্যাকে পঞ্চগৌড় সিংহাসন হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। গৌড় হইতে পুরুষোত্তম যাইবার পথ রাজা মাধব সিংহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী কালে যে রাস্তা দিয়া পাঠানসৈন্য উড়িষ্যা আক্রমণ করিত। মহানাদের রণসিংহ বারাণসীভুক্তি জয় করিয়া ধর্ম্মপালকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

ভারতে যখন বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছিল, তখন অসভ্য নানা জাতীয় লোকেরা এই দেশে বসতি স্থাপন করে। এই সময় প্রাচীন রাজবংশ সমূহ অনেকেই জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের

* ঐতিহাসিক প্রবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "ধর্ম্মপাল" নামক গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত আছে।

প্রভাবে কৃপাণ হস্তে স্বদেশ রক্ষার পরিবর্ত্তে কাপুরুষের ন্যায় অহিংস ব্রতধারী ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল।

চন্দ্রবংশীয় রাজা অমূর্ত্তরজা কামরূপে ধর্ম্মারণ্য সমীপে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে এক রাজ্য স্থাপনা করেন। তদীয় বংশধরগণ রাঢ় দেশকে জন্মভূমি বলিয়া পূজা করিতেন। লাউড়ের অধীশ্বর রাঢ় দেশ লুণ্ঠন করেন।

ময়মনসিংহ জেলায় বোকাইনগর নামে একটি প্রাচীন গ্রাম আছে। সহর হইতে ১৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। প্রাচীর, গৃহভিত্তি, সেতু, বুরজ প্রভৃতি দুর্গের কঙ্কাল চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কোন্ সময় বোকাইনগর স্থাপিত হয়, তাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইক্তার উদ্দিন উজবেগ তুগ্রল খাঁকে কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠাইলে কামরূপরাজ পলায়ন করেন। এই সময় কামরূপরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গারোপাহাড়ের দক্ষিণ ভাগে সুসঙ্গ (দুর্গাপুর), মদনপুর, বোকাইনগর প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হয়। পলায়নপর কামরূপাধিপতি পরে তুগ্রল খাঁকে হত্যা করিয়া রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু গোরোপাহাড়ের দক্ষিণ ভাগে আর শাসন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইলেন না। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কায়স্থ রাজ্যগুলি তখন ভূঞা নামে অভিহিত হইল। কোচ, গারো, হাজং, কাত্রত (কায়স্থ ?) প্রভৃতি এই সমস্ত স্থানের অধীশ্বর ছিলেন। বোকাইনগরের প্রতাপশালী অধীশ্বরের নাম বোকা কাত্রত্ কুম্বঞ্চ ছিল। সেই জ্ঞানালোক শূন্য অসভ্য বোকার হৃদয়ে যে মহত্ব বিরাজিত ছিল, বর্ত্তমান কালে I. C. S. জ্ঞানগর্ব্বিত সভ্যতাভিমানীর মধ্যেও তাহা দেখা যায় না। খিজিরপুরের একজন কায়স্থ রাজা ময়মনসিংহ নিজ অধিকার ভুক্ত করিয়া লন। দিল্লীর মোগল জাহাঙ্গীরের সময় বঙ্গীয় কায়স্থ ভূঞাগণের বিদ্রোহানল প্রবল হইয়া উঠে। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে বিখ্যাত ব্রহ্মপুত্র নদ বোকাই নগরের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। এখনও

এমন পল্লীবৃদ্ধ আছেন, যাঁহারা ময়মনসিংহ নগরের ছয় মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত রাজগঞ্জ গ্রামের পার্শ্ব দিয়া ব্রহ্মপুত্রকে প্রবাহিত দেখিয়াছেন। সেই কায়স্থদের রাজত্ব সময়ে ব্রহ্মপুত্রের এক ক্ষুদ্র শাখা কেল্লার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহা এখন 'বড়বিল' নামে পরিচিত। ইহার উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে দুইটি করিয়া চারিটি মাটীর স্তম্ভ বিদ্যমান আছে, ঐ গুলিকে 'বুরজ' বলে। পূর্ব্বে ঐ বুরজের উপর কামানশ্রেণীর মধ্যে কালু ও ফতু নামক অতি বৃহৎ দুইটি তোপ ছিল। কেল্লার প্রাচীন দেওয়ালগুলি অতীব দৃঢ়। দেওয়ালের বহির্দ্দেশে ইষ্টকগুলির গাত্রে এক প্রকার প্রলেপ আছে, ইহা ঠিক চিনামাটীর প্রলেপের মত দেখা যায়, বোধহয় ইহাই কোনস্থানের আস্তর ছিল। এই স্থানে একটি ক্ষুদ্র মঠ কালের কঠোর হস্ত হইতে অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। চাঁদের তালাও নামে একটি পুষ্করিণী এই মন্দির পার্শ্বে রহিয়াছে। চাঁদ রায় নামে কোন এক হিন্দু সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক এই মঠ স্থাপিত হয়। আবার কাহারও মতে * প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর পুত্র চাঁদ রায় এই মঠ স্থাপিত করেন। কেহ বলেন এখানে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। একজন † ব্রাহ্মণ মুসলমান হইয়া কায়স্থ রাজার রাজ্য ধ্বংস করেন। ইহাতে কোন বিগ্রহ ছিল কিনা প্রমাণ পাওয়া যায়না। রামগোপালপুর, গৌরীপুর, গোলকপুর, ভবানীপুর, বাসাবাড়ী ও কালীপুর প্রভৃতি গ্রামের জমিদারবংশ প্রসিদ্ধ ছিল।

---

* শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর ৬ পুত্র। তৃতীয় পুত্র চাঁদ রায়। ইনি মুরশিদাবাদ নবাব সরকারে দক্ষতার সহিত রাজস্ব সচিবের কার্য্য করিয়া "রায় রায়ান" এই সম্মান সূচক উপাধি প্রাপ্ত হন। চাঁদ রায় পিতার বর্ত্তমানেই পরলোক গমন করেন। ইনি অপুত্রক ছিলেন।

† রাজা গণেশ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইহাও ইতিহাস ও কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় এবং তাহাই সত্য বলিয়া বোধ হয়।

বাঙ্গলার কায়স্থরাজগণ যে অতি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কায়স্থ গৌড়েশ্বর গণেশ বা কংসের চেষ্টায় সতাপীর হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজে মাঙ্গাম্পদ হইয়াছিলেন। গোয়াল পাড়ার নিকট কৃষ্ণাই নদী ছিল, এই স্থানে কায়স্থদিগের বাহুবলে গৌরীপুর রাজ্য স্থাপিত হয় এবং ইহা বাঙ্গালী কায়স্থদিগেরই কীর্ত্তি। রঙ্গপুরের অন্তর্গত চিলমারীর নিকট পাগলা নদীর তীরে যেখানে কায়স্থ ভূপতিরা মুসলমানদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ঐ স্থান হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন, সে স্থানে প্রতি বৎসর একটি মেলা হয়। ইহার নিকট একটি মির্জ্জার কোট নামে দুর্গের চিহ্ন আছে। ১৭শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই স্থানে মোগল পক্ষের সহিত কায়স্থ জমিদারদিগের যুদ্ধ হইয়াছিল। নসরত শাহ কাটাদুয়ারের অধিবাসী মৌদ্গল্য গোত্রীয় নীলাম্বর সিংহ নামক কোন স্থানীয় রাজার রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে হোসেন সাহের উড়িষ্যা আক্রমণের কালে ইসমাইল গাজী সেনাপতি ছিলেন, সেই সময়ে কোন কারণে তাঁহার প্রতি সন্দেহ হওয়ায় হোসেন সাহের আদেশে গাজী হত এবং দক্ষিণ গড় মান্দারণে তাঁহার সমাধি হয়। খৃঃ ১৬৯৫ রাজা শোভা সিংহ ঐ সমাধির উপর সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

ময়মনসিংহ জেলায় বৈষ্ণব পাড়া একখানি পুরাতন গ্রাম। "নিমাই চরিত সন্ন্যাস" নামক যাত্রার পুথি প্রণেতা যাদবেন্দ্র দাস রায় (?) শ্যামরায় বিগ্রহ লইয়া রাঢ়ের মহানাদ হইতে এই গ্রামে আসেন। পরে আটিয়া পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া ভাদগ্রামে বাস করেন।

তিস্তা নদীর বিশ্বাসঘাতকতায় গঙ্গার যে পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে, ব্রহ্মপুত্রের সেই পরিমাণ শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে তিস্তা নদীর জল, গঙ্গা-বক্ষ প্রবাহিত না করিয়া সহসা ব্রহ্মপুত্রে আসিয়া পড়ে, আর সেই অবধি ব্রহ্মপুত্রের শক্তি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে।

বাখরগঞ্জ জেলায় রত্নদি কালিকাপুর পরগণার জমিদার উজিরপুর নিবাসী রত্নেশ্বর রায় চৌধুরীর পূর্ব্ব পুরুষ রাজা কৃষ্ণ জীবন সিংহ মীরবহর মহানাদ হইতে তথায় বাস করেন। তাঁহারা মহানাদের সিংহবংশীয় তাহা ঈশান ঘটকের কারিকায় প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহার দুই ভ্রাতা যাদবেন্দ্র সিংহ ও প্রাণ বল্লভ সিংহ চন্দ্রদ্বীপ বা চন্দ্রদহের রাজা রামচন্দ্র সিংহের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। ঐ সময় অজ্ঞাত দায়ুবংশীয় কায়স্থ জানকী দায়ু মহানাদে এক লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া রাজা রামচন্দ্রের নিকট প্রশংসিত হন।

পূর্ব্ববঙ্গে উত্তর গোগৃহ ও নিমগাছি নামক স্থান দক্ষিণ গোগৃহ নামে অদ্যাপি পরিচিত। করতোয়া নদ যে সময় প্রবল তরঙ্গে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত ছিল, তৎকালে করতোয়ার সুবিস্তৃতির জন্য পূর্ব্ব ভাগে বসতি করা সঙ্গত মনে করেন নাই। প্রকৃত পক্ষে পাণ্ডবগণ উক্তস্থানে আগমন না করিয়া থাকিলেও তন্মূলে যে নিগূঢ় রহস্য নিহিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সময় পাণ্ডব বর্জ্জিত অসভ্য জাতিদের বাসস্থান বিক্রমপুরে চন্দ্র ও বর্ম্মবংশ রাজধানী সংস্থাপিত করেন, তৎকালে মহানাদ, গৌড়, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অনেক পুরাতন হইয়াছিল। বর্ত্তমান ঢাকা বিভাগের অধিকাংশ স্থান তৎকালে বালুকারাশি সঞ্চয় দ্বারা উন্নত, উর্ব্বরতা সম্পন্ন ও বাসের উপযুক্ত হইতেছিল। উক্ত ভূভাগ প্রকৃত ১২০০ খৃষ্টাব্দে বা পাঠান অভ্যুদয়ের কিছু পূর্ব্বে নব নব জনপদে শোভমান হইতেছিল। মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা নগরীতে "ঢাকেশ্বরী" বিগ্রহ ছিলনা, বিক্রমপুর নামে কোন নগরীই ছিলনা। মুসলমানেরাই পূর্ব্ব বঙ্গটি মনুষ্য বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল।

যোগিনীতন্ত্রে চট্টগ্রামকে "বিষ্ণুক্রান্ত ভূমি" বলে। চট্টগ্রামকে "রোমাঙ্গ"ও বলিত। "সতী ময়না" পুস্তিকাতেও তাহাই আছে। সপ্তগ্রাম

বা সাতগাঁও * তদপভ্রংশে চাটগাঁ নামে কথিত হইত। ঘটক কারিকায় চরন্তল নাম দৃষ্ট হয়।

অতি প্রাচীনকালে ভোগধূর্ত্ত রাজা মহানাদ আক্রমণ করেন; আদিপাল, পুত্র—বিজয় পাল, পুত্র—লোক পাল, পুত্র—ধর্ম্ম পাল মহানাদের নিকটে পাণ্ডুয়ায় রাজত্ব করিতেন। খৃষ্ট জন্মের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত "কল্পসূত্র" নামক সুপরিচিত জৈন গ্রন্থে পাণ্ডুয়ার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। মহাভারত ও হরিবংশ মতে এখানে বাসুদেব নামা জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজা রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শৈলবংশীয় জনৈক রাজা পাণ্ডুয়া অধিকার করিয়া মহানাদ ধ্বংস করেন। মহেন্দ্র দেব ১৪১৫—১৪১৭ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ায় রাজা হন। এই রাজবংশের বিষয় ইতিহাসে কিছুমাত্র পরিচয় নাই।

অতি প্রাচীনকালে হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা আর্য্যদিগের করতলগত হয়। প্রাচীন পুরাণাদির দেশ বিবরণ (ভূগোল) স্থানে দক্ষিণ বাঙ্গলায় সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত অরণ্যানিপূর্ণ তাবৎ ভূভাগকে সমতট প্রদেশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মহাভারত হইতে জানিতে পারি—মহারাজ বলি বেদোক্ত বিখ্যাত ঋষির ঔরসে স্বীয় পত্নী সুভদ্রার গর্ভে পঞ্চ পুত্র লাভ করেন। উহাদের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নাম ছিল। সতী দেবীর বরে কুলপাল ও দেশপাল ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কুলপালের দুই পুত্র হরিপাল ও অহিপাল। হরিপাল সিঙ্গুরের পশ্চিমে নিজনামে হট্টবাপীযুক্ত একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় ব্রাহ্মণ, তাঁতি, সদ্গোপ, যুগী, কৈবর্ত্ত ও আঙ্গাই দিগের রাজা হন। ইহাঁর রাজ্যতে বেদেজাতি (Medicine man) রাঢ়ে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে

* শ্রীহট্টেও আর একটি সাতগাঁ আছে। কথিত আছে হুগলী জেলা হইতে চক্রপাণি দেবের বংশধরগণ শ্রীহট্ট জেলায় আসিয়া তাঁহাদের নূতন বাস স্থানের নাম সাতগাঁ রাখিয়াছিলেন।

বিখ্যাত হইয়াছিল। রাজা অহিপাল মাহেশ আকনা হইতে ত্রিবেণী ও ছিন্ন আকনা পর্য্যন্ত জয় করেন। চক্রদ্বীপ (হাওড়া জেলায়) ও ডুমুরদহ গ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল। কেশীধ্বজ রাজা হইয়া সপ্তগ্রামে লুপ্ত বেঘ জাতিকে পালন করিয়াছিলেন। বগড়ী অঞ্চল হইতে বাগদী রাজা সপ্তগ্রাম আক্রমণ করিয়া এই স্থানে বসতি বিস্তার করেন। মহাবল বিরলি গুহ সুগন্ধি বা সুগন্ধা নামক গ্রামে বসবাস করেন। চান্দোল এক্ষণে চন্দনপুর নামে খ্যাত। খলিসানী গ্রামে এক ধীবর রাজা রাজত্ব করিতেন। রাঢ়ের রাজা নিত্যানন্দ—বল্লাল সেনের দৌহিত্র ছিলেন। এই বল্লাল কে ? কুল গ্রন্থে আছে এই নিত্যানন্দ হইতে দে, দাস, সিংহ বংশের উৎপত্তি হইয়াছে !!!

নীলভূধর একটি ছোট পাহাড়ের নাম। ঠিক পাহাড় নয়, বালুকা রচিত একটি জাঙ্গাল। নীলাদ্রী মহোদয় নামক সংস্কৃত পুস্তকে তাহাকেই নীলভূধর বলে। এই নীলভূধরোপরি জগন্নাথের মহামন্দির আকাশ স্পর্শ করিতে উঠিয়াছে। রাজা অনঙ্গ ভীমদেব কর্ত্তৃক এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। জগন্নাথের রত্নবেদীর পশ্চাদ্ভাগে একটি খোদিত লিপি আছে। ১১১৯ শকাব্দে অনঙ্গভীম এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ব্রহ্মহত্যার পাপ মোচনের জন্য তৎকর্ত্তৃক ৬০টি মন্দির, এক কোটি পুষ্করিণী ও ৮০টি বাপী নির্ম্মিত ও খাত হইয়াছিল। পুরীর মন্দির ভীমদেবের পূর্ব্ব পুরুষ অনন্ত বর্ম্মণ চোড়গঙ্গা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত (১১৮৫—১১৯০ খৃঃ)।

উৎকলপতি গঙ্গাবংশীয় অনঙ্গভীমদেব তুঘন খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। উৎকলপতির ২য় পুত্র নরসিংহদেব সৈন্য লইয়া গৌড় পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে তুঘনখাঁ পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসায় হিন্দুদের মধ্যে মহা উৎসব হয়। এই সমর বিজয়ের গৌরব গাথা অনঙ্গভীমের চাটেশ্বরের শিলালিপিতে এবং নরসিংহের তাম্রফলকে উৎকীর্ণ হইয়াছে। উক্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, তুঘন খাঁর

পক্ষীয় রাঢ় ও বরেন্দ্রবাসী অসংখ্য মুসলমান নিহত হইয়াছিল। এই সময় (১২৩৩ খৃঃ) রাঢ় ভূভাগ কিছুদিন উৎকলরাজের শাসনাধীন হইয়াছিল। তৎকালে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় গোপাল সিংহ তলে তলে তুঘন খাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করায় রাজ্য নিরাপদ হইলে, গৌড়াধিপ তাঁহাকে রাঢ়ের রাজ প্রতিনিধি পদ দিয়াছিলেন।

হাচেঙ্গনাবংশজ শ্রীশ্রীযশোনারায়ণ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক রাজগণের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মেঘনারায়ণের মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। মাইবঙ্গের নিকট মেঘনারায়ণের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তারিখ ১৪৯৮ শক। মুদ্রাবর্ণিত যশোনারায়ণ ভূপাল শিলালিপির মেঘনারায়ণ দেবের ২১০ বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কাছাড়ীদিগের মধ্যে স্ত্রীলোক বিবাহিত হইয়াও স্বামীর গোত্র গ্রহণ করে না, পুত্র সন্তানই পিতৃগোত্রের উত্তরাধিকারী। স্ত্রীলোকের গোত্রকে জুলু ও পুরুষের গোত্রকে সেময়ং বলে। কাছাড়ের নৃপতিগণ আপনাদিগকে হিড়িম্বেশ্বর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। তাঁহাদের ধারণা যে হিড়িম্বাসুরের ভগিনী হিড়িম্বার গর্ভে মধ্যম পাণ্ডব ভীমের ঔরসে ঘটোৎকচের জন্ম হয়। এই ঘটোৎকচ মহাবীর কর্ণের বাণে বিদ্ধ হইয়া ভারত প্রসিদ্ধ কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ইহারই বংশে কাছাড়ের নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহারা সকলেই নারায়ণ উপাধিভূষিত।

কাছাড়ী রাজমালায় দৃষ্ট হয় যে, ঘটোৎকচ হইতে শেষ রাজা গোবিন্দ চন্দ্র পর্য্যন্ত ১০৩ জন নরপতি রাজত্ব করেন। অরণ্যগর্ভ হইতে যে সকল নরপতির নাম, শিলালিপি ও মুদ্রাদি প্রাপ্ত হইতেছি, তাহাতে কাছাড়ী রাজগণ পাণ্ডব বংশধর হইতে পারেন। বডবা বৌদ্ধ প্রথম রাজবংশ, তৎপরে হুপাছেংথাও, হুপাপারাইন, ঠাণ্ডছেন, ছিঙ্গুইয়ং, হাচেঙ্গ প্রভৃতি গোত্রাধিকারীরাও রাজবংশী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ১২২৯ খৃঃ সৌমার দেশের রাজা চুকাফা প্রথম সৈন্য লইয়া কামতিভূপতি রাজ্য স্থাপন

করেন। এই কামতি প্রাচীন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও কামরূপ। তৎপূর্ব্বে দ্বাদশ শতাব্দীতে ভদ্রসেন নামক জনৈক রাজা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় রাজত্ব করিতেন এবং গৌড়ে তখন হিন্দুরাজত্ব স্থাপিত ছিল। সেই সময় স্থানগিরি পর্ব্বতে বিবর নামে একজন কুচীয়া গৃহস্থ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আহোম জাতি বুরঞ্জী রচনা-বিদ্যায় অতীব পারদর্শী ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কীর্ত্তিচন্দ্র বড়বড়ুয়া নামক কর্ম্মচারী স্বীয় বংশগত নীচতার প্রকাশ পাইবার ভয়ে রাজ্যের সমস্ত বুরঞ্জী দগ্ধ করিবার আদেশ প্রচার করেন। কিন্তু অসমীয়া "খাকি-খাঁ" তাঁহার হস্ত হইতে অনেক বুরঞ্জী রক্ষা করেন। যদিও ব্রহ্মদেশীয়দের অত্যাচারের সময় অনেক বুরঞ্জী নষ্ট হয়, তথাপি এখনও আসামে বিস্তর বুরঞ্জী পাওয়া যায়।

কামরূপ জেলার বেটনার নিকট বৈদড়গড় নামে এক গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই গড়টি কায়স্থ বীর বৈদ্যদেবের নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। আসাম-বুরঞ্জীর মতে এই স্থানে আরিমত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন তিনি পশ্চিমাগত (রাঢ়) ছত্রী জিতারি রাজার পৌত্র ও রামচন্দ্রের পুত্র বলিয়া খ্যাত। এই রামচন্দ্র—রাজা বলচন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক পশ্চিম বঙ্গ হইতে তাড়িত হন। রামচন্দ্র কমলকুমারী বা চন্দ্রপ্রভা নামে এক কলিতা কায়েত কাজকন্যার পানিগ্রহণ করেন। আসাম-বুরঞ্জী মতে এই রাজকন্যা নাগাখ্য বংশীয়া। আধুনিক মতে আরিমত্ত ১০০০ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে রাজত্ব করিতেন।

রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরে একটি উচ্চ স্তূপ বর্ত্তমান ছিল। মূল মন্দিরটির প্রত্যেক ধারে এক একটি করিয়া পাগ আছে। উত্তরের পাগটিই সর্ব্বোপেক্ষা দীর্ঘ। মন্দিরটির নক্সা নিতান্ত সরল। ইহা একটি ত্রিতল-বিশিষ্ট মন্দির, নিম্নতল একটি ক্রুশের আকৃতি। এই ক্রুশের দীর্ঘতম বাহু ছিল উত্তর দিকে এবং উহার উপর দিয়াই সিঁড়ি ছিল। দ্বিতীয় তলটি প্রথম তলের মতই নিরেট, ইহার উপরে মূল মন্দিরটি

অবস্থিত ছিল। ইহা নিরেট ছিলনা এবং ইহার উপরে ছাদ ছিল। এই মূল মন্দিরের প্রত্যেক কোণে এক একটি মণ্ডপ ছিল। এই মন্দির খৃঃ পূঃ ১৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল।

পাহাড়পুর গড় খনন করিয়া ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যে একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ যে, "রাজা মহেন্দ্র কর্ত্তৃক পাহাড়পুর মন্দিরটি সংস্কৃত হইল"। এই মহেন্দ্র মহানাদের রাজা মহেন্দ্র খাঁ সিংহ। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রতিহার রাজবংশীয় রাজা মহেন্দ্র উত্তর বঙ্গভূমে আসিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না।

হিমালয় প্রদেশে মড়া নামে গ্রাম আছে, সেই গ্রামে 'লক্‌থা মণ্ডল' নামে একটি প্রাচীন মন্দির আছে; তাহার মধ্যে একখানি শিলালিপির সংবাদ পাইয়া ৺নবীন চন্দ্র সিংহ তথায় গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পড়িতে পারেন নাই।

যে সিংহল পাটনের সিংহরাজবংশ, সেই রাষ্ট্র বিপ্লবের দিনে একটা হিন্দুরাজশক্তি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর যে সকল মনীষী এ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, যে মুক্ত পুরুষ বিজয় সিংহ বা সাগরমল্ল শক্তি-সঞ্চয় করিয়াছিলেন, হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের সেই আসন্ন বিপদের দিনে যে মহাত্মা ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের ব্রত লইয়া বাঙ্গলার কোটি কোটি সন্তানকে মুক্ত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন, রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু তাঁহার "বিশ্ব কোষে" ও "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে" তাহা উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন!

কৃত্তিবাসী রামায়ণে লিখিত আছে যে, সুমিত্রা সিংহলরাজ সুমিত্রের কন্যা। এই সিংহল বর্ত্তমান মহানাদ ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ রাঢ় সিংহল পাটন, বিজয় সিংহের জন্মস্থান।

প্রাচীনকালে ঘেয়া নদী বিশাল জলভাগে পরিণত ছিল। ঐ জলভাগ সিংহল পাটনের বার জন ইন্দ্রের রণতরীতে সুসজ্জিত থাকিত। সিংহল

পাটনে "জয় দুর্গা"র মন্দিরটি বাইস কাঠা জমির উপর নির্ম্মিত ছিল। মন্দির ও নাটমন্দিরের সম্মুখে বিস্তৃত স্থান ছিল। মন্দিরটি পূর্ব্বদ্বারী, ত্রিতল ও নয় ভাগে বিভক্ত ছিল। সমস্তই খিলানের কাজ। মধ্যের বিস্তৃত কুঠরীর গায়ে নানাবর্ণের চিত্র ছিল। নয়টি কুঠরীর নয়টি চূড়া। মন্দিরের প্রথম তলায় উঠিবার জন্য ২২টি সিঁড়ি ছিল। প্রবাদ আছে—মগেরা উক্ত মন্দির ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য মহানাদের রাজবংশের সহিত মগদের যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধেই পশ্চিম বঙ্গ হইতে মগেরা লুপ্ত হইল, কিন্তু তাহাদের ছাউনি যেখানে যেখানে ছিল, পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে "মগরা" নাম ঐ দস্যুদের ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে। ত্রিপুরা জেলাতেও মগরা নামক স্থান আছে। আশাকরি, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে মগরা শব্দ "মুগের ডাইল" হইতে হইয়াছে, একথা রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু লিখিবেন না।

ছিনা আকনার উত্তরে 'ডালিম্ব' নামে এক প্রাচীন নগরের স্মৃতি আছে। কথিত আছে তথায় বলির পুত্রগণ ধর্ম্ম বিপ্লবের প্রধান রঙ্গস্থল 'ডালিম্বে' ব্রাহ্মণগণকে লইয়া অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মন্ত্র প্রভাবে অগ্নি হইতে এই বীরগণ উত্থিত হইয়াছিলেন ও তাঁহাদের সাহায্যেই সনাতন হিন্দু-ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছিল।

চৌহান রাজপুতেরা বঙ্গদেশে অনলরাজ্য স্থাপন করেন। "অনহল" হইতে অনল নাম করা হয়। বশিষ্ঠ দেবের আরাধনায় দেবী সিংহবাহিনী আবির্ভূতা হইয়া চৌহানকে আশীর্ব্বাদ করতঃ দৈত্যসমরে প্রেরণ করিলেন, দৈত্যগণ আনহলের প্রচণ্ড বিক্রমে পরাস্ত হইল। অনল সহর সমরে অমর কীর্ত্তি রাখিয়াও কীর্ত্তিধ্বংস করিয়াছেন।

বল্লভীরাজগণের সময় মুসলমানেরা পারস্য রাজ্য ধ্বংস করিয়া দেয়। রাজত্ব ধ্বংস হইলেও পারস্যের মগেরা প্রায় একশত বর্ষ ধরিয়া মুসলমানদের গতি রোধ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরে তাঁহারা যখন দেখিলেন—

পারস্যের সকল লোকেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহারা ভারতবর্ষে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। এই মগেদের দ্বারাই রাঢ়দেশ বিধ্বস্ত হয়, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

বাঙ্গলার রাজা ও শাসনকর্ত্তাগণ বহুবার উড়িষ্যা আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। দিল্লীর রিজিয়ার অত্যাচার কালে তোঘন খাঁ বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করে এবং ত্রিহুত কোরামাণিকপুর রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক অধিকার করে। হিজরী ৬৪০ অব্দে উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরের রাজা সহসা তোঘন খাঁর বিদ্বেষ ভাজন হন। এই সময় যাজপুরের সীমান্তবর্ত্তী কোমায়ুন নামক স্থানে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। পাঠান সৈন্য হিন্দুরাজার দুইটি পরিখা পার হইয়া তৃতীয় পরিখা পার হইবার সময় মহানাদের রাজা পাণ্ডবসিংহ একদল উড়িয়া ও বাঙ্গালী অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সীমান্তের অরণ্য ভেদ করিয়া ঝঞ্ঝার মত পাঠান দস্যুদলের পৃষ্ঠদেশে আপতিত হইয়া তাহাদের হস্তিযুথ অধিকার করিয়া লইলেন এবং পাণ্ডবসিংহ তাহাদের শিবির আক্রমণ করিলেন। পাঠান দস্যুদলের মধ্যে এমন এক আতঙ্কের সৃষ্টি হইল যে, তাহারা বিশৃঙ্খলভাবে পলাইতে আরম্ভ করিল। ফলে পাঠানদের বিপুল যুদ্ধ সম্ভার, শিবির ও হস্তীদল উড়িয়ারাজের হস্তগত হইল। তোঘন খাঁ অর্দ্ধেকের উপর সৈন্য হারাইয়া অতিকষ্টে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পর বৎসর হিজরী ৬৪১ অব্দে উড়িয়াগণ রাঢ়দেশের বার জন রাজার সহিত গৌড়ের সিংহদ্বারে আসিয়া সিংহনাদ করিল। অবিলম্বে উড়িয়া সৈন্যগণ কর্ত্তৃক রাজধানী সমৃদ্ধ গৌড় নগরী অবরুদ্ধ হইল। এই সময় মহানাদের সুবল সিংহ বীরভূমের উপর আপতিত হইয়া তথাকার পাঠান ফৌজদার দস্যু করিমউদ্দীনকে আক্রমণ করিলেন। সমস্তদিন বীরভূমের সমতল ক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ চলিল। করিম উদ্দিন এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। পাঠান দস্যু তাইমুর খাঁ কেরাদ

মহানাদ আক্রমণ করিলে বহু লোক ক্ষয়ের পর রাঢ়দেশ হইতে বিতাড়িত হয়। কয়েক বৎসর পরে তোঘরীল খাঁ মহানাদ ভেদ করিয়া উড়িষ্যা লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়। মহানাদের রাজা পাণ্ডবসিংহ যে সকল হাতী পাঠান রাজের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এমন এক শ্বেত হাতী ছিল, পরাজিত গৌড়রাজের পক্ষে তাহার লুণ্ঠন জনিত বিরহ বড়ই মর্ম্মন্তুদ হইয়াছিল।

বৈতরণী নদীর দক্ষিণ কূলে যাজপুর নগর অবস্থিত। উড়িষ্যার সোমবংশীয় মহাশিব গুপ্ত যযাতি নামক নরপতি কর্ত্তৃক এই স্থানে উড়িষ্যার রাজধানী স্থাপিত হয়। পৌরাণিক কিম্বদন্তী যে, প্রাচীনকালে প্রয়াগের দক্ষিণ তটে ব্রহ্মা অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেইজন্য ইহার অপর নাম যজ্ঞপুর হয়। যযাতি কেশরী ৪৭৫ খৃষ্টাব্দে যাজপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

ঢেকুরের রাজা সোম ঘোষের * সহিত মহানাদের রাজার যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে মহানাদের রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গলে এই রাজাকে সরিৎপতি সুত কাশ্যপি কান্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ৺নবীন চন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন—"তিনি সাগর বংশজ বা সূর্য্যবংশীয় ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল—রাজা রায় গৌড়েশ্বর সিংহ। জালন্দায় বাঘ রাজার সহিত যুদ্ধ হয়।"

কামরূপ জয়ের পর লাউসিংহ প্রত্যাবর্ত্তন কালে বর্দ্ধমানের রাজা কালিদাস তাঁহার দুই কন্যা সুয়াগা ও বিমলাকে লাউসিংহের সহিত বিবাহ দেন। ইহাকে কালী—কেলো বা কালু ঘোষ বলিত। বর্দ্ধমান—নীলপুরের রাজা ছিলেন।

* সৎগোপ সম্প্রদায় ঢেকুরের সোমঘোষকে তাঁহাদের সমাজ ভুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। ঘোষ উপাধি থাকায় পল্লব গোপেরাও বলেন সোমঘোষ পল্লব গোপ। কায়স্থরা বলেন সোম ঘোষ সৌকালীন গোত্র কায়স্থ।

এই সময় ছিনা আকনায় রাজা মহেন্দ্র সিংহ নামে একব্যক্তি ছিলেন, ময়নার রাজার সহিত যুদ্ধে নিহত হন এবং এই সময় কুরঙ্গ দেশের রাজা কুশল কোঙর অত্যন্ত বলশালী ছিলেন (৭৩ শকাব্দায়)।

সরস্বতী ও গঙ্গার মহা কলহ হইয়াছিল। সরস্বতী গঙ্গাকে শাপ দিলেন—"তুমি নদীরূপ ধারণ করিয়া পাপীর আবাস মর্ত্ত্যলোকে গমন কর।" দেবী ভাগবতের মতে, কলির পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইলে গঙ্গা, সরস্বতী ও পদ্মাবতীর শাপ মোচন হইবে, ইঁহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিষ্ণুলোকে চলিয়া যাইবেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের মতে, সরস্বতীর শাপে গঙ্গার বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আসা নিশ্চয় হইলে, তিনি বৈকুণ্ঠপতির নিকট কাঁদিয়াছিলেন। বরাহপুরাণের বচনের সহিত অপর পুরাণের বচনের একবাক্যতা করিয়া অন্তিম কলিতে গঙ্গা চলিয়া যাইবেন, এইরূপ মীমাংসা হয়। দার্শনিকেরাও বলেন যে, প্রলয়ের পূর্ব্বে ভয়ানক একটি সূর্য্য উঠিবে, তাহার তেজে পৃথিবীর সমস্ত জল শুকাইয়া যাইবে।

বশিষ্ঠ গঙ্গার একটি নাম বিষ্ণুপদী। এই নাম হইতে হউক অথবা অপর কোন কারণেই হউক, অনেকের বিশ্বাস যে, গঙ্গা বৈকুণ্ঠবাসী ভগবান বিষ্ণুর চরণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। আকাশ মণ্ডলে ধ্রুবকে অবলম্বন করিয়া সমস্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডল অবস্থান করে, সেই জ্যোতিষ্ক মণ্ডলে মেঘ অবস্থিত, পৌরাণিকগণ ইহাকে বিষ্ণুর তৃতীয় পদ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় এবং তাহাতেই গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে।

কপিল সংহিতার মতে রুদ্রের জটাকলাপ মধ্যে ভ্রমমানা ত্রিকোটি কুল-তারিণী গঙ্গা হইতে হিমালয় আদিগঙ্গাকে নিঃসারিত করেন, মুনিগণ সেই আদিগঙ্গাকেই গন্ধবতী বলিয়া থাকেন। সেই গন্ধবতী স্বর্ণকূটাচলে প্রবাহিত হইতেছেন। শিব পুরাণের মতে দক্ষিণ সমুদ্রের নিকট বিন্ধ্যপাদ হইতে গন্ধবতী নদী নিঃসৃত।

মন্দর গিরির সবিশেষ মাহাত্ম্য বরাহ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে গুর্জ্জর দেশ যদুবংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু তাঁহারা কিরূপে গুর্জ্জর দেশ হইতে তাড়িত হইলেন, তাহা আমরা অবগত নহি।

সূর্য্য, চন্দ্র উভয় বংশের মধ্যে দ্বাপর যুগের অবসানে সূর্য্যবংশের অবসান হইল. চন্দ্রবংশেরও ঔরস সন্তানের উপরতি হইল; কিন্তু চন্দ্রবংশের ক্ষেত্রজ সন্তানদের রাজত্ব হইল। দ্বাপর যুগের শেষভাগে বিচিত্রবীর্য্য নামে চন্দ্রবংশীয় রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহার সন্তান ছিল না। আর্য্য—বুদ্‌বুদ্, রাক্ষস, দ্রাবিড় ও নরবানর সমুদ্রে মাথা লুকাইয়াছে।

যমুনা নদী কর্ত্তৃক বরেন্দ্র ও বঙ্গ বিভাগ হইয়াছে। গড়াই নদী দ্বারা দক্ষিণ রাঢ় ও বঙ্গ চিহ্নিত।

বক্‌সী খাল, হুগলী জেলার অন্তর্গত রূপনারায়ণ নদের একটি খাল, দামোদরের ও রূপনারায়ণের মধ্যভাগে অবস্থিত। এই খাল, ত্রিবেণীর অন্তর্গত জয়পুর গ্রামের ঘোষ বক্‌সী বংশের পূর্ব্ব পুরুষ খনন করাইয়াছিলেন। পদ্মপুরাণে গঙ্গাসাগর সঙ্গম প্রদেশে চন্দ্র বংশীয় সুষেণ নামক এক রাজার নাম উক্ত হইয়াছে।

তুঙ্গভদ্রা নদী তীরে শ্রীরাম চন্দ্রের মন্দির এবং নিকটেই সেতু। কেবল মাত্র প্রস্তরের ধার কাটিয়া পরস্পর সংলগ্ন করিয়া এই সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। ২০′—১০ × ১০ + ১৪′—৭″ অপর তিনখানি গ্রেনাইট নির্ম্মিত একটি তুলাদণ্ড আছে। বল্লাল রাজবংশ এইস্থান প্রসিদ্ধ করেন। বুক ও হরিহর নামে ভ্রাতৃদ্বয় বিজয় নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই স্থান আরও প্রসিদ্ধ করেন।

গঙ্গার দক্ষিণে হুগলী ও ব্রহ্মপুত্র নদীদ্বয়ের মধ্যে "সমতট" রাজ্য ছিল। আর উত্তরে "ডবাক" রাজ্য ছিল। ইহার সময়েই অনল রাজ্য, পূর্ব্বে

কৌশিকী রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সমতটের একাংশেই গঙ্গানগর ছিল। চিত্রবীর্য্য প্রহ্লাদের পৌত্র বলি নূতন আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত স্বদল সহ, ভারতের কায়া হইতে উৎপন্ন আর্য্যসঙ্গ, "পাতালে" প্রবেশ করেন। পাতাল তখন ভারতের পূর্ব্বস্থ নিম্নদেশ ছিল। তিনি এই গঙ্গানগরে রাজধানী স্থাপন করেন। বঙ্গদেশ বলির রাজ্য। বলির পাঁচ পুত্র বঙ্গের পাঁচটি বিভাগে রাজত্ব করে। গ্রীকরা এই গঙ্গানগরের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। ইহার নিকটে প্রকাণ্ড মেলা হইত। হাতী, ঘোড়া, নানারত্ন অলঙ্কার, মসৃণ বস্ত্র, গন্ধ দ্রব্য, প্রস্তর কার্য্য, তেজপাত প্রভৃতি এখান হইতে বিদেশে যাইত। সর্ব্বদা আরও চীনেরা এখানে জাহাজ লইয়া আসিত। ইহার বর্ত্তমান নাম সিংহল পাটন বা সিংএর ভেড়ী। অত্রত্য হিন্দু রাজাদের নাম এখনও উদ্ধার হয় নাই। সিংহল পাটন রাজ্য প্রথম অনঙ্গপালের "মিত্ররাজ্য" ছিল। সিংহল পাটন সহরে অনেক যোগী ও তাপসগণ সাধন ভজন করিতেন। তখন অনেক দৈত্য দানবের উৎপাত ছিল।

কোরিয়া অতি প্রাচীন দেশ, চিন অপেক্ষাও প্রাচীন। সিংহল পাটন হইতে আর্য্যগণ কোরিয়ায় বাণিজ্য করিতে যাইতেন। খৃঃ পূঃ দুই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে ধারাবাহিকরূপে কোরিয়ার ইতিহাস পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ৩০০ বর্ষে কোরিয়ায় সিরাগি, কুদারা ও কোকোলি নামে তিনটি রাজ্য সিংহল পাটনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল। সিংহল পাটনের দ্বারা মলয়, কাম্বোজ, অন্নাম, শ্যাম, যবদ্বীপ প্রভৃতি বহির্ভারতের সহিত অবাধে বাণিজ্য চলিতে থাকে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে মালাইটার নিকটবর্ত্তী ফেরাসিকেরা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপটিতে কেবল মাত্র স্ত্রীলোক বসবাস করে, কোন পুরুষকে তাহারা তথায় বাস করিতে দেয় না। কোন পুরুষ ঐ দ্বীপে পদার্পণ করিবা মাত্র ইহারা বর্শা ও তীর লইয়া আক্রমণ পূর্ব্বক হত্যা করে। তাহারা উলঙ্গ অবস্থায় থাকে।

হুন জাতির কঠিন হস্তে সিংহল পাটন বিলুপ্ত হয়। সমগ্রদেশটিকে উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক শক, হুন প্রভৃতি (কায়থিয়গণ) স্কাইথিয় উপনিবেশে পরিণত করে।

সিংহল পাটন পূর্ব্বকালে সিংতাই এবং প্রশান্ত মহাসাগর স্থিত পালোও, ইয়াপ, অঙ্গর, উয়োলিয়া, ত্রুক, মর্ত্তলক, পানাপে, কুসাই, জালুইত প্রভৃতি দ্বীপে বাণিজ্য করিত। মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ শাসন করিবার জন্য মালয় উপদ্বীপে সিংহপুর বন্দর (সিঙ্গাপুর নামে অভিহিত হইতেছে) হিন্দুরা নৌবাহিনীর কেন্দ্র করিয়াছিল।

বাকলা রাজ্য এই বঙ্গদেশের নিম্নভাগে অবস্থিত, ইহাও পৌরাণিক দেশ। মেঘনা নদী পূর্ব্বসীমা, বালেশ্বর নদ পশ্চিমে, উত্তরে ইদিলপুর, দক্ষিণে সুন্দরবন। আজ আর সেই বাকলা নাই এবং কায়স্থ কন্দর্প নারায়ণের অতুল কীর্ত্তি ও দীর্ঘিতিও নাই; যাহা আছে তাহা অনন্ত কালসাগর হৃদয়স্থ একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ মাত্র।

বাকলার দক্ষিণ সীমাবর্ত্তী যে সুন্দরবন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তথায় এক চণ্ডভণ্ড জাতি ছিল। প্রবাদ যে ইহারা উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। চণ্ডভণ্ড জাতি অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিল। অবশ্য দেবীসিংহ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অত্যাচার স্মরণ করিলে তাঁহাদিগকে এই কুলোদ্ভব বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু তাহার প্রমাণ নাই।

বাকলার কায়স্থ রাজগণের মধ্যে অনেকের বীরত্ব কাহিনী শুনা যায়। বাকলার রাজা ও শ্রীপুরের রাজা উভয়েই মগদস্যুগণকে দূরীভূত করিয়াছিলেন। শ্রীপুরের চাঁদরায় ও কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, আম্বুলের রাজা ঈশ্বরী প্রভৃতি ভৌমিকগণ বিদ্রোহী হন। ফলে ভৌমিকগণ মানসিংহ দ্বারা সমূলে নির্মূল হইলেন। আম্বুলের আসমান সিংহ বাকলায় পলায়ন করেন।

১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাকলায় এক ভীষণ জলপ্লাবন হয়। উক্ত ভীষণ জলপ্লাবনে যে রাজা মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। উক্ত দুর্ঘটনা কালে সাহাবাজ খান কুদ্ধ আন্দুলিয়া গড় হইতে রাজপুত্র পরমানন্দ রায়কে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশ সংক্রান্ত ঘটনানিচয় সম্বন্ধে সত্য সংবাদ অবগত হইবার পক্ষে আবুল ফজলের সুবিধা ছিল না। এই খণ্ড প্রলয়ে দুই লক্ষাধিক জীবের ভবলীলা সাঙ্গ হইয়াছিল।

প্রাচীন বাকলা সমুদ্রতীরে অবস্থিত ছিল। সাহাবাজপুরের 'সংগ্রামের কেল্লা'—এই প্রাচীন হিন্দু কীর্ত্তি মেঘনার বিশাল গর্ভে বিলীন হইয়াছে। ঔরঙ্গজেবের দৈনন্দিন স্মৃতিলিপিতে সংগ্রামের এই গড়ের বিষয় উল্লেখ আছে। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে এই প্রাচীন্ দুর্গ মেরামত হইয়াছিল।

গাজীপুরের রাজা কার্কিশ ও রাজা গুজাটী আন্দুলিয়ার দুর্য্যোধন সিংহের পরম বন্ধু ছিলেন। হাজীপুরের জমিদার পূরণ (পূর্ণ) মল্ল খেদুর্জ্জি বঙ্গে আন্দুলিয়ার রাজা পৃথিধর সিংহের বিদ্রোহে দলভুক্ত হইয়াছিলেন। আন্দুলিয়ার দুর্জ্জন সিংহ, মোহন সিংহ, কিঙ্কর সিংহ, ও প্রতাপ সিংহ, চাকদার মধ্যস্থলে ওসমান খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন।

১২২৮ সংবতে চান্দেলরাজ পারমর্দ্দিদেবের অনুশাসনে "পৃথ্বীধর কায়স্থ অখিল বিদ্যাবিদ" বলিয়া উল্লেখ আছে, ইহা আন্দুলিয়ার সিংহবংশের কম গৌরবের কথা নহে।

ঝালকাটী থানার অন্তর্গত রূপসিয়ার নিকট দুইটি দুর্গের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। গৌরীপাশা ও কুমারখালী হাটের মধ্যে আরও একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত দুর্গের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অনেক অংশ এখন নদীগর্ভে বিলীন, যাহা আছে তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, এই দুর্গ নিতান্ত সাধারণ ছিল না। স্থানীয় প্রবাদ যে, ঐ স্থানে একজন প্রতাপ-শালী হিন্দু ভূস্বামী বাস করিতেন, মগদস্যুগণ ধ্বংস করেন। মাগুরা

মহকুমার মধ্যে সাতটি পুরাতন রাজবাটী দৃষ্ট হয়। উহার ইতিহাস সম্বন্ধে জানা গিয়াছে যে, মুসলমানদের সময় সেই সেই বাটীর রাজা সপরিবারে জলমগ্ন হইয়াছিলেন।

তেতুলিয়া নদীর সাগর সঙ্গমস্থলে পরম ধর্ম্মজ্ঞ রাজা কায়স্থ বংশোদ্ভব জগদানন্দ রায়ের রাজধানী ছিল। কেহ বলেন বর্ত্তমান কচুয়াই ঐ রাজধানী। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রলয় সংঘটিত হইয়াছিল। প্রায় যাবতীয় লোক এবং রাজা জগদানন্দ এই জলপ্লাবনে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার বংশ প্রকৃত নির্ব্বংশ হইয়া যায়। বঙ্গীয় ১১৭৬ সালে যে জলপ্লাবন হয়, তখন স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গভূমি ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইয়া পিশাচগণের তাণ্ডবক্ষেত্র হইয়াছিল।

হুগলী জেলায় ধরমপুর বা ধর্ম্মপুর একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। এই গ্রামেই ধর্ম্মপূজার প্রবর্ত্তন হয়। ধর্ম্ম পূজা ধর্ম্মপুরের মধুকুল্য গোত্রীয় দেববংশীয়েরই কীর্ত্তি বলিয়া এই অঞ্চলে ঘোষিত। এই দেববংশের আদি, শিবনাথ দেব হইতে বর্ত্তমান বংশধর পর্য্যন্ত ৩৪ পুরুষের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইলে শিবনাথদেব অন্ততঃ পক্ষে ১০৪২ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ধরমপুরে কোন দেববংশ নাই, কিন্তু তাঁহাদের ভগ্ন অট্টালিকা, পুকুর প্রভৃতি সেকালের ঐশ্বর্য্যের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান আছে। এই ধরমপুরের একটি ক্ষুদ্র মাঠে অতিপ্রাচীন কালে বরফ পড়িত (রাত্রে ঐ মাঠে মাটীর সরায় জল রাখিয়া আসিলেই জমিয়া যাইত), সেজন্য ঐ মাঠকে এখনও 'বরফ পড়ার মাঠ' বলে।

হুগলী জেলার কুমারহট্ট গ্রাম প্রাচীন রাঢ়ের রত্নাকর নামক নদের উপর স্থাপিত। এক্ষণে স্থানে স্থানে রত্নাকর নদের খাল দৃষ্ট হয়। পুরাণে এই নদীর নাম উল্লেখ আছে।

কুশন সাম্রাজ্য পতনের পর চন্দ্র নামে এক রাজা বঙ্গ হইতে সিন্ধু পর্যান্ত বিজয় করেন। ইনি কে, তাহা কোন ইতিহাসে আমরা দেখি

না। যদিও মতান্তরে ইঁহার আবির্ভাব গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্ব্বে বলিয়া অনেকে মনে করেন, কিন্তু ইনিই মহানাদের চন্দ্রকেতু, অথবা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য নামধারী একই বংশসম্ভূত নৃপতি।

১১৯৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ বক্তিয়ার খিলিজি তাতার সর্দ্দারের নেতৃত্বে গোবিন্দ পালকে নিহত করিয়া মগধ ও পঞ্চগৌড় অধিকার পূর্ব্বক প্রাচীন অট্টালিকা, মূল্যবান দেব মন্দির, নগর প্রভৃতি মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি ধ্বংস করিয়া বর্ব্বরতার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছে। বিধাতার অভিশাপ ইহার জন্য যথেষ্ট নয়।

কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্র ১১৪৬ খৃষ্টাব্দে মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে মগধ পালবংশীয় রাজা গোবিন্দ পালের অধিকারে ছিল। কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্র গোবিন্দ পালকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। মুসলমান দস্যু সিহাবুদ্দিন ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে জয়চন্দ্রকে নিহত করিয়া বারাণসী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। এই সময় মগধ ও বরেন্দ্রের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের স্থান সমূহ রাজা হরিশ্চন্দ্র সিংহের অধিকারে অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। ইহাই বখ্‌তিয়ারের তথাকথিত বঙ্গ বিজয়ের গুপ্ত রহস্য। দক্ষিণ বঙ্গ বখ্‌তিয়ারের অভিযানের ২২০ বৎসর পরেও হিন্দুর অধিকারে ছিল।

ত্রিকলিঙ্গাধিপতি কৌরব বংশীয় মহারাণক কুমার পাল দেবের ১২৪০ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত তাম্রলিপিতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মহারাণক বাহিল্ল 'দেব-দ্বিজ-গুরু শুশ্রুষানুরক্ত' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন রচয়িতা মৌদগল্য গোত্রীয় কায়স্থ মুক্ত সিংহ ছিলেন।

১১২৪ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত উক্ত সত্যনগরের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের তাম্রশাসনের দ্বারা 'কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণায়' ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। ১১২৮ বিক্রম সংবতে মহানায়ক হরিরাজ প্রদত্ত তাম্রশাসনের লেখক ঠক্কুর শ্রীউদয় সিংহ।

মুসলমানের বঙ্গ বিজয়ের ইতিহাস মিথ্যা কথা দিয়া আরম্ভ হইয়াছিল। বিনা কারণে হিন্দুকে কাপুরুষ প্রতিপন্ন করিয়াছে। আইন-ই-আকবরী দিনকে রাত করিয়া রাজা মহেন্দ্র সিংহকে উড়াইয়া দিয়াছে। মুসলমান বিজয়ের প্রকৃত ইতিহাসে বাঙ্গালীর লজ্জিত হইবার কারণ নাই, বরং বাঙ্গালীর অনির্ব্বচনীয় গৌরবই জগতে প্রকাশ পায়। মহানাদের নরনারী অকাতরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, ইহা গৌরবের কথা, বীরত্বের পরিচয়। মুসলমানের প্রকৃত বঙ্গবিজয়ের তারিখ ১৬১০ খৃষ্টাব্দে। মহানাদের সিংহ রাজবংশের শক্তি বৈদেশিকের আক্রমণের সম্মুখে ৪১০ বৎসর পর্য্যন্ত গৌরবের সহিত দণ্ডায়মান ছিল। রাজা মহেন্দ্র সিংহ যে সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। তাঁহার নামের পরিবর্ত্তে এতদিন তাঁহার শূন্য সিংহাসনে প্রতাপাদিত্যকে বসাইতেছিলাম।

সাগর দ্বীপের প্রধান নগর চাটী গ্রাম এককালে দক্ষিণ বঙ্গের প্রধান বন্দর ও রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় ১৫৭০ বর্ষে এক বিপুল ঝঞ্ঝাবর্ত্ত (Cyclone) সংঘটিত হয় এবং তজ্জনিত প্রবল তরঙ্গাঘাতে (Tidal Wave) সাগর দ্বীপের বন্দর বিলোপ সাধন করে। সেই সময়কার বৈদেশিকগণ পশ্চিম বঙ্গের সম্রাট মহেন্দ্র সিংহকে King of Chandecon বলিতেন।

মহানাদের রাজা গোবিন্দ সিংহ কর্ত্তৃক নিগৃহীত জাঠমল ওরফে যদুমল প্রতিশোধ লইতে গিয়া গড়বেতা ধ্বংস করেন। যদুর (জালালুদ্দিন) পূর্ব্বেকার কোন সময়ের মুসলমানের শিলালিপি পূর্ব্ববঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায় নাই। তাহার পরবর্ত্তী ১৪৪২ খৃষ্টাব্দের নাসিরুদ্দিন মহম্মদের শিলালিপিই অদ্যাবধি প্রাপ্ত মুসলমান শিলালিপির মধ্যে প্রথম।

১৫৩২ খৃষ্টাব্দে হোসেন সাহের পুত্র গিয়াসুদ্দিন মাহমুদ গৌড়ে রাজা হন। বাঙ্গালার ইতিহাসে গিয়াসুদ্দিন নামে অনেকগুলি নবাবের নাম পাই।

মোগল কুলতিলক আকবর সাহ পাঠান ও আম্বুলিয়ার সিংহবংশীয়দের সম্পূর্ণরূপ নির্জ্জিত করিয়া বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন। ১৫৮২ খৃঃ আকবরের নিদেশানুসারে রাজা টোডরমল্ল বাঙ্গলা দেশের রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন। পাঠান শের সাহ যেমন বঙ্গদেশকে বহু অংশে (তন্মধ্যে মহানাদ রাঢ়দেশে) বিভক্ত করিয়া শাসন কার্য্যের সুবিধা করিয়াছিলেন এবং রাজস্ব আদায় ও প্রজার স্বত্ব রক্ষার জন্য আমিন, শিকদার, কারকুণ, কাণুনগো, চৌধুরী (গৌদগল্য সিংহবংশীয়) ও ক্রোড়ী প্রভৃতি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। টোডরমল্ল মেহরী তদ্রূপ বঙ্গদেশকে ১৯ সরকার এবং ৬৮২ পরগণায় বিভক্ত করিয়া রাজস্ব আদায় ও বন্দোবস্তের জন্য উক্ত প্রকার কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। রাজকর্ম্মচারীগণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যে জমি দেওয়া হইত, তাহাই জায়গীর নামে এবং অবশিষ্ট যে জমির আয় রাজকোষে আসিত, তাহা খালসা নামে পরিচিত ছিল। সিংহ বংশীয়দের হস্তে যে সকল সরকার ছিল, তাহা নিম্নে লিখিত হইল,—

সরকার তাড়া—৫২ পরগণা, জমা ৬,০১, ৯৮৫ টাকা। সরকার শরীফাবাদ—রাজমহলের দক্ষিণ হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত। ২৬ পরগণা, জমা —৫, ৬২, ২১৮ টাকা।

সরকার ভূষণা—নদীয়া ও যশোর জেলায় অবস্থিত। ৮৮ পরগণা, জমা—১, ৯০, ২৫৬ টাকা।

সরকার বাবলা—৪ পরগণায় বিভক্ত। জমা—১, ৭৮, ২৬৩ টাকা।

সরকার সেলিমাবাদ—ভাগীরথীর পশ্চিমতীর, সমুদ্র পর্য্যন্ত। ৩১ পরগণায় বিভক্ত। জমা—৪,৪০, ৭৪৯ টাকা।

সরকার মান্দারণ—দামোদর ও রূপনারায়ণের মধ্যবর্ত্তী। ১৬ পরগণায় বিভক্ত! জমা—২, ৩৫, ৮৮৫ টাকা।

সরকার সাতগাঁ—সপ্তগ্রাম ভাগীরথীর উভয় তীরে অবস্থিত। ৫৩

পরগণায় বিভক্ত। জমা—৪, ১৮, ১১৮ টাকা। ঐ টাকা অর্থে 'দাম' বুঝিতে হইবে।

রাজা মানসিংহ রাজকার্য্য ব্যপদেশে বঙ্গে ছিলেন। যে সময়ে বর্দ্ধমানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি মাতৃবিয়োগ সংবাদ প্রাপ্ত হন এবং বর্দ্ধমানে মহা সমারোহের সহিত মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করেন। তিনি আকবরের সহিত সম্বন্ধ জন্য পতিত হইয়াছেন বলিয়া বাঙ্গলার কায়স্থ জমিদারগণ তাঁহার কার্য্যে বাধা প্রদানে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে যোগদান করেন। সেইজন্য মানসিংহ কায়স্থ জমিদারদের ধ্বংস সাধন করিয়া ব্রাহ্মণ রাজবংশ গঠন করিতে মনোযোগী হন। প্রবাদ এইরূপ যে, এই সময় বহুতর ব্রাহ্মণ জমিদারের অভ্যুদয় হইল, তন্মধ্যে কৃষ্ণনগরের রাজবংশ, তাহিরপুরের রাজবংশ, সাতৈলের রাজবংশ ও রাজসাহী জেলার এক ব্রাহ্মণ বিশীবংশের নাম উল্লেখ যোগ্য। ইদরকপুরের জমিদারদিগের হস্ত হইতে কুন্তী পরগণা পরিগৃহীত হইয়া মানসিংহ পুরোহিতকে দান করিলেন। এই সময় কায়স্থ রাজবংশের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল।

ইবাবদ খাঁ একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া যে সময় ঐ চাকলা অধিকার করিয়া ঘোড়াঘাট কাছারীর অন্তর্গত করেন, তৎপূর্ব্বে রঘুরাম নামক এক ব্যক্তি বর্ত্তমান কাকিনা রাজবাটীর ৫ ক্রোশ উত্তরে "কায়েতের বাটী" নামক গ্রামে বাস করেন। সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের মাতা সত্যবতী, ভবানী মাতার দর্শনের সুবিধার নিমিত্ত করতোয়া নদতীর হইতে একটী প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করেন, তাহা রাণী সত্যবতীর জাঙ্গাল নামে পরিচিত। সাতৈলের রাজগণ ভাতুরিয়ার জমিদার বলিয়া পরিচিত হন। বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নাটোর সহরে জেলা সংস্থাপিত হয়। তৎপূর্ব্বে উক্ত জেলা রাজসাহী ভাতুরিয়া নামে কথিত হইত।

মুসলমান আক্রমণ কালে ভুলুয়ার অধিপতি কৈবর্ত্ত জাতির রাজা

বিশ্বস্ত শূরের পরিচয় পাওয়া যায়। পরে দেবী বারাহীর আদেশে নোয়াখালী জেলায় স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। "শূর" উপাধি থাকিলেই কায়স্থ কিম্বা সদ্গোপ হইলনা, একথা অনেকেই ভুলিয়া যান। "পাল" নামেই পালরাজবংশীয় হয়না, "সেন" নামেই সেনবংশ হয়না, যেমন—রাবণের পুত্র তরণীসেন, যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ভীমসেন, বর্দ্ধমানের রাজা চিত্র সেন—সেনবংশ নহেন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত লক্ষ্মীকুণ্ড গ্রাম জাহাঙ্গীরের সময় বিদ্রোহের নেতা রাজা লক্ষ্মী কান্ত সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। তাঁহার কৃত সুসমৃদ্ধ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্না লক্ষ্মীকুণ্ড গ্রাম আজ সর্ব্ব বিষয়ে অন্ধকারা কালিমাময়ী, আজ সমস্তই হৃত সর্ব্বস্ব।

গঙ্গাতীরের ধামসার গ্রাম গঙ্গাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। কান্যকুব্জাধিপতি নাগরাজ-পুত্র রামভদ্র পালবংশীয় ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর এই ধামসার গ্রামে সিংহবংশের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কমল সিংহ ও দেবপাল বহুসৈন্য লইয়া কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন এবং রামভদ্রকে পরাজিত করিয়া পশ্চিম সীমান্ত কম্বোজ পর্য্যন্ত করায়ত্ত করিলেন। উৎকলরাজ সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। এই সুবর্ণযুগে মহানাদের সিংহরাজবংশ গৌড়বঙ্গবাসীকে এক বিরাট মহাজাতিতে পরিণত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু হতভাগ্য রাঢ়দেশ বাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত তখনও শেষ না হওয়ায় তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। উৎকল, হুন, শক, দ্রাবিড়, চৌহান, পরিহার, অনহল, গুর্জ্জর প্রভৃতি অধিপতিগণ রাঢ়দেশ বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ করেন।

রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে রাঢ়দেশবাসী তিলক সিংহ নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। বর্ত্তমান কুলগ্রন্থের মতে তখন বাৎস্য গোত্রীয় সিংহ বঙ্গদেশে না থাকায় এই তিলক সিংহকে সিংহল পাটন বা মহানাদবাসী বলিয়া মনে করি।

ময়না কোটের রাজার সহিত মহানাদের রাজার যুদ্ধ হইত। ৯২০ খৃষ্টাব্দে রাজাধারী চন্দ্র রাজা ছিলেন।

মতান্তরে কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্রের পুত্র হরিশ্চন্দ্র গাড়হবাল রাজ্যের কিয়দংশও যে অন্ততঃ ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকারভুক্ত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ১২৫৩ বিক্রমাব্দে হরিশ্চন্দ্র যে তাম্রশাসন দ্বারা পমহৈ নামক গ্রাম একজন ব্রাহ্মণকে দান করেন, সেই তাম্রশাসন খানি ১২৫৭ বিক্রমাব্দে বা ১২০০ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত হয়। ইহার পর রাজপুতানার ইতিহাসে হরিশ্চন্দ্র দেবের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। হরিশ্চন্দ্রই যে কান্যকুব্জরাজ জয়চন্দ্রের পুত্র ছিলেন, তাহাও কয়েকখানি তাম্রশাসন দ্বারা প্রমাণিত হয়। একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, রাজপুত্র হরিশ্চন্দ্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে রাজ-পুরোহিত প্রহরাজ শর্ম্মা একখানি গ্রাম প্রাপ্ত হন। আর একখানি তাম্রশাসন দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্রের বয়ঃক্রম প্রায় অষ্টাদশ বর্ষ হইয়াছিল। এই অল্প বয়স্ক যুবক কিরূপে বিজয়োন্মত্ত রাজ্য লোলুপ দুর্দ্দান্ত মুসলমান বাহিনীর কবল হইতে কান্যকুব্জ রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই বালক বীরের সেই অদ্ভূত বীরত্ব কাহিনী কোন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না।

মহানাদের সিংহবংশে যে চন্দ্রকেতুর পুত্র তাড়িত হইয়াছিলেন, তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নাই, সেইজন্য এই হরিশ্চন্দ্রকে, জয়চন্দ্রের পুত্র না বলিয়া দৌহিত্র বলিয়া মনে হয়।

আমাদের দেশে ইতিহাসের এত গোলমাল যে, বাবর সাহ যে কোন্ তারিখে আগ্রার নিকটে বেয়ানার যুদ্ধে চিতোরের মহারাণা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি স্থির হয় নাই। বঙ্গে

কতগুলি গিয়াসউদ্দীন নামীয় নবাব এই দেশ লুণ্ঠন ও মন্দিরাদি ভগ্ন করিয়াছিল; তাহার সঠিক তালিকাও নাই।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বাঙ্গলার রাষ্টীয় ইতিহাসকে অত্যাচার, উৎপীড়ন, নরহত্যা, লুণ্ঠন, ষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যার অধ্যায় বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, পরাধীনতার চাপেও ভারতের মনন শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া যায় নাই। মহানাদকে কেন্দ্র করিয়া যে দর্শন বিদ্যার আলোক চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার কথা স্মরণ করিলে আজিও গৌরব অনুভব হয়।

সকল দেশের পুরাতন কথা জানিতে পারা যায় না, জানিতে পারার উপায় নাই। মদ্র, কেকয়, গান্ধারাদি দেশ ঠিক চিনিতে পারা যায় না।

যে রাজ্য যখন যাহার হস্তগত হয়, তখন সে কেবল ধন ঐশ্বর্য্য লইয়াই ক্ষান্ত থাকে না, সমুদয় কীর্ত্তিও নিজস্ব করিয়া লইতে চেষ্টা করে। এইরূপে অনেকের অনেক পুরাতন কীর্ত্তি অচিহ্নিত ও অপরের নামে প্রচারিত হইয়াছে।

বেনগঙ্গা নদী তীরে বহু সংখ্যক মন্দির শৈলভূমিতে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান আছে। এই সমস্ত মন্দির এক রাত্রির মধ্যে হেমাড়পন্থ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল (নবীনচন্দ্র সিংহ একটি মন্দিরের শিলাফলকে "মহানাদ" দেখিয়াছিলেন)। প্রবাদ,—ভাণ্ডক হইতে কাশি পর্য্যন্ত যাবতীয় মন্দিরই তাঁহার দ্বারা নির্ম্মিত হয়। হেমাড়পন্থ একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণের তনয়। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত এই যে, প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে হেমাড়-পন্থের জননী দেখিলেন যে, সে সময় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে অতি অশুভ যোগ হইবে। এজন্য তিনি পরিচারিকাদিগকে যাহাতে প্রসবের বিলম্ব হয়, তদ্বিষয়ে অদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ অনুসারে ধাত্রীরা তাঁহার পদদ্বয়ে রজ্জুবদ্ধ করিয়া নিম্নাভিমুখে মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে ঝুলাইয়া রাখিল শুভলগ্ন উপস্থিত হইলে, অবিলম্বে তাঁহাকে ভূমিতে

নামান হইল। হেমাড় বা হেমাদ্রি চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বিভীষণ পীড়িত হইলে, হেমাড় তাঁহাকে নীরোগ করেন এবং পুরস্কার স্বরূপ এক বর প্রাপ্ত হন। সেই বরেই রাক্ষসদিগের সাহায্যে গোদাবরীর মধ্যস্থ যাবতীয় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরাভ্যন্তরে ১২টি বিভিন্ন প্রকারের শিবলিঙ্গ, তদ্ব্যতিত দশাবতার প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি আছে। মার্কণ্ড ঋষির মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং নানাপ্রকার কারুকার্য্য খচিত। শিবলিঙ্গের মস্তকে পিত্তলময় মুকুট। মুকুটের চতুর্দ্দিকে পাঁচটী নৃমুণ্ড এবং উপরিভাগে পঞ্চ নাগের ফণা নির্ম্মিত চন্দ্রাতপ। খোদিত মনুষ্য মূর্ত্তি মন্দিরের চারিদিকে বিরাজিত। কি সমরাঙ্গনের রৌদ্র রসের অভিব্যক্তিতে, কি বসন্ত-পুষ্পাভরণা বিলোল নয়না গৌরীর সহিত প্রেমালাপের কমনীয় ভাবে—সর্ব্বত্রই শিবের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইয়াছে। এই মন্দিরগুলি অন্ততঃ পক্ষে দ্বাপর যুগের নির্ম্মিত।

বিন্ধ্যগিরির পাদমূলে যেখানে গঙ্গার স্রোত আসিয়া সঙ্কীর্ণ পথের সৃষ্টি করিয়াছে, মগধ ও অঙ্গদেশ হইতে গৌড় প্রবেশ করিবার সেই সঙ্কীর্ণ পথের পার্শ্বে গিরিগাত্রে প্রাচীন মণ্ডল দুর্গের ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান, ইহা বাঙ্গলার ইতিহাসে নাই। এক সময় এই মণ্ডল দুর্গ অজেয় ছিল। গৌড়ীয় সম্রাট গোপাল সমগ্র উত্তরাপথের সম্রাট হইয়াছিলেন। তৎপৌত্র অমিত বিক্রমে শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী পার হইয়া সৈন্য পরিচালনা করিয়াছেন, এমন সময় দুষ্ট রাষ্ট্রকূটাধিপতি অসংখ্য সৈন্য সহ মণ্ডল দুর্গ আক্রমণ করিলেন। সেই ভীষণ যুদ্ধে দশ সহস্র গৌড়ীয় সেনার চৌদ্দ জন মাত্র জীবিত ছিলেন। ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূট কন্যার পাণিগ্রহণে অসম্মত হইয়াছিলেন বলিয়া সেই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্যই গৌড় মগধ রাজ্যে অভিযান হইয়াছিল। বাঙ্গলার ইতিহাসে ইহার বিস্তৃত বিবরণ না থাকিলেও এই বিন্ধ্যগিরির পাদদেশে এখনও কৃষকের কঠোর হলকর্ষণে সেই বাঙ্গালী সেনার চিতাভস্ম উত্থিত হইয়া থাকে।

এই সকল ইতিহাস থাকিতেও আমাদের দেশের ইতিহাস ছিলনা, এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায়। এ দেশের লোকের প্রাণে জাতীয় একতা (Nationalism) কখন ছিলনা। বাঙ্গালী চিন্তা করিতে শিখিয়াছে, সে বাঙ্গলা দেশে বিদেশী; সেই জন্য বাঙ্গালী রাজপুত, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, কনোজ প্রভৃতি দেশের ইতিহাস পাঠ করে এবং গর্ব্ব করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর নরনারীর প্রাণে একতা, জাতীয়তা আনয়ন করিতে চাই; বিশ্বকে সে আপনার বলিয়া আলিঙ্গন করুক, ইহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু বাঙ্গালী নিজের পিতৃপিতামহের পরিচয় বিস্মৃত ও অনাদৃত করিয়া পরের ইতিহাস সে আপনার বলিয়া কণ্ঠস্থ করে কেন? বাঙ্গালীর ইতিহাস ছিলনা, ইহা মিথ্যা কথা। দণ্ডায়মান মসজিদের পার্শ্বে যখন শত শত হিন্দুর দেবমন্দির ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে দেখি, তখন যে বাঙ্গালীর ইতিহাস ছিলনা, ইহা বিরূপাক্ষের প্রিয় শিষ্যের গল্প বলিয়াই মনে হয়।

——:•:——

ব্রাহ্মণ।

আজিকার দিনেও যে সকল মনীষীকে লইয়া আমরা গৌরব করিয়া থাকি, তাহাদের মধ্যে বিশ্ববিশ্রুত ব্রাহ্মণ জাতিই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, অধঃপতিত জাতির সুপ্ত প্রাণে যে বিপুল স্পন্দন জাগাইয়া তুলিয়াছেন, মরণ-অন্ধকারে যে জীবনের সন্ধান দিয়াছেন, চক্ষে যে সত্যদৃষ্টি দান করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিতে গেলে ব্রাহ্মণকে সত্য সত্যই দেবতা বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা তাঁহার বৈদিক বাঁশীর সুরে সাহানার করুণ মূর্চ্ছনা না জাগাইয়া দীপক-রাগে জাতির মুক্তির গান গাহিয়া ফিরিতেছেন, যাঁহারা হিন্দুজাতিকে এক অপূর্ব্ব মহিমা দান করিয়া যাইতেছেন, তাঁহাদের আমরা সমাদর করিতে শিখিলাম না। যে সুরে মর্ত্তের ব্রাহ্মণ তাঁহার বীণা বাজাইয়া গেলেন, যে আকুল আহ্বান আকাশে-বাতাসে তিনি রাখিয়া গেলেন, তাহা শুনিবার মত কাণ এবং বুঝিবার মত প্রাণ হয়ত আজ ভারতীয় শূদ্র বাবুদের মধ্যে নাই। তাই অনাগত দিনের প্রতীক্ষায় ব্রাহ্মণগণ বসিয়া আছেন। দাশরথি রায় ব্রাহ্মণ হইয়াও গাহিয়াছেন,—

"মন মানস সদা ভজ, দ্বিজ চরণ পঙ্কজ।
দ্বিজরাজ করিলে দয়া, বামনে ধরে দ্বিজরাজ॥
হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্যে যার না পান বিধি,
সে রোগের ঔষধি কেবল, ব্রাহ্মণের ঐ পদরজ॥

* * * *

হেন দ্বিজের অভয় পদে ভ্রান্ত হ'য়ে পদে পদে,
দাস না হ'য়ে দাশরথি, দুঃখ পায় সে দোষ নিজ॥"

আমাদের সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার সমস্তই বেদ পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রমূলক, বর্ত্তমান সভ্যতা আমাদের সর্ব্ব বিষয়েই

বিরোধী। বর্ত্তমান সভ্যতার তীব্র আলোকে কেহ যেন ঝাঁপ না দেন, যাঁহারা ঝাঁপ দিয়াছেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিবেন। বেদ, তন্ত্র, মন্ত্র, পুরাণ আবার ঘরে ঘরে অনুশীলিত হউক, নচেৎ এ দেশের মঙ্গলের আশা নাই।

বেদের ধর্ম্ম যাহা মন্ত্রে নিহিত, তাহাই যেন রক্ত মাংসে পুষ্টিলাভ করিয়া পুরাণে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। বেদ পুরাণে প্রতিষ্ঠিত, পুরাণ বেদ ছাড়া নহে। বৈদিক দেবতার রূপহীন মন্ত্র শব্দে প্রকাশিত, পুরাণের বিগ্রহবাদ বৈদিক দেবতারই প্রতিমূর্ত্তি; উহা পৌত্তলিকতার বিকাশ নহে। কলিতে তন্ত্র শাস্ত্রের প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্র আগম ও নিগমরূপ ভাগদ্বয়ে বিভক্ত।

আজকাল বেদের অনুবাদ পাঠ করিয়া শূদ্রবাবুদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণকে উপেক্ষা করিয়া নিজেরাই তত্ত্বজ্ঞানী হইতে চেষ্টা করিতেছেন। সত্য বটে, অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য, গুরুগৃহে বাস, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, ধ্যান, ধারণা, সমাধি, তত্ত্বজ্ঞান লাভের এ সকল উপায় বৈদিক পথে রহিয়াছে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের পক্ষে কখন সম্ভব হয় নাই, হইবেও না। ব্রাহ্মণেতর জাতির মস্তিষ্কে তত্ত্বজ্ঞান স্থান পাইতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব তাঁহার "তন্ত্রতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"দ্বাপরের উপান্ত কলির প্রারম্ভ, এই যুগসন্ধ্যায় দণ্ডায়মান হইয়া সাক্ষাৎ নর-নারায়ণের অবতার অর্জ্জুনকে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া যে তত্ত্ব বুঝাইতে পারেন নাই, ক্ষত্রিয় বলিয়া, যে ব্রাহ্মণের সম্পত্তি তত্ত্বজ্ঞান, অর্জ্জুনের হৃদয়াধিকৃত করিতে পারে নাই, আজ তুমি আমি সেই কলিযুগের পূর্ণাধিকারে ঘোরান্ধকারে ডুবিয়া যোগবাশিষ্ঠ গীতা পড়িয়া সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিব, ইহা যদি তোমার জাগ্রতাবস্থা হয়, তবে স্বপ্ন কাহার নাম তাহাত জানি না।"

বিজেতা খৃষ্টান ইউরোপ সর্ব্বপ্রযত্নে আমাদিগকে শিখাইতেছিল, ভারতের ব্রাহ্মণের সব কিছু অসার—তুচ্ছ। কিন্তু ইউরোপে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। জার্ম্মাণীতে প্রুসিয়ার পশ্চিমাংশে রাইন নদের উভয় তীরবর্ত্তী সমগ্র প্রদেশটির নাম রাইনল্যাণ্ড বা রাবণ (রাওন) দ্বীপ। তাহার পশ্চিম সীমায় হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম (বালাজী), লুক্সেমবর্গ প্রভৃতি আর্য্য বাসস্থানটির আয়তন প্রায় এগার হাজার বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা প্রায় ৮০ লক্ষ। ইহারা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিগণিত হইলেও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরনারীও প্রচুর আছেন। ইহারা মগীয়ার (পারসীক মগ), মঙ্গল ও আর্য্য টিউটনিক জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি। ইলিরিয়ান (ইলাপুত্র) বা আলবেরিয়ান, এট্রাস্কাণ, প্রভৃতি জাতি যাদব কুল সমুদ্ভূত। শক, স্কাইথিয়েন বা কায়েত্ (কাহেত) জাতি সমগ্র এসিয়া ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়া আর্য্যদের পাদমূলে দাসত্ব স্বীকার করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিয়াছিল। রাইনল্যাণ্ড নদী-মাতৃক প্রদেশটি চিরদিনই ধনধান্য পুষ্পভরা। রাইন নদ, সুর নদ, রুর নদ প্রভৃতি তাহার শাখা নদীগুলি প্রদেশটিকে উর্ব্বর করিয়া তুলিয়াছে। ঐ সুর নদের অপর নাম আমাদের সরস্বতী নদের অনুরূপ। রাইন প্রদেশে লুপ্ত আর্য্য-ব্রাহ্মণ সভ্যতার যুগের প্রাচীন দুর্গ, প্রাসাদাবলী নদের উভয় পার্শ্বে দেখা যায়। ইহাদের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ "এড্ডাস" (Eddas)। এই গ্রন্থ লুপ্ত হইলেও, আইসল্যাণ্ড হইতে ইহার কতক অংশ পাওয়া গিয়াছে এবং ইহা হইতে শ্বেতদ্বীপ ইউরোপে ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন বাহির হওয়ায়, খ্রীষ্টান পাদ্রীদিগকে ব্যাকুল করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতা লুকাইয়া ফেলিবার জন্য প্রায় শত বৎসরাধিক প্রবল ষড়যন্ত্র চলিতেছে। এসিয়া মাইনরে অর্জ্জুনের নাম ও স্মৃতি আছে। এসিয়া মাইনরে অবস্থিত এজিয়ান সমুদ্রকে (Agean Sea) তুর্কী ভাষায় "অজয়" বলে,—ইহা অর্জ্জুনের নাম ঘোষণা

করিতেছে এবং Agean বা অজয় সমুদ্রে "ফাল্গুনিয়" দ্বীপও অর্জ্জুনের অপর নাম "ফাল্গুন" বহন করিতেছে। এশিয়া মাইনরে হিটাইট জাতি (Hittite Nations) ২০০০ খৃঃ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল এবং উহাদের রাজাদের উপাধি বা নাম "দশরথ" (Dessaratta) ছিল? ইটালী দেশে ভারতের অতীত গৌরব স্মৃতি সুস্পষ্ট রহিয়াছে। "Wars of Roma & Ravena"—যাহা আমাদের রাম রাবণের যুদ্ধ—তাহা সেখানে Christian Italy আজিও গীত করিয়া শুনায়। উহারা (Italians) বলে "রাম রাবণের যুদ্ধ" ইটালীতে হইয়াছিল। রোমা (Roma) অর্থে রোম (Rome) এবং রাভেনা অর্থে রাভেনা রাজ্য ইটালীর দক্ষিণ অংশে ভগ্ন ইষ্টকরাশি ব্যাপী প্রকাণ্ড দ্বীপকে কহে। আমেরিকায় পেরু (পৌরভ)—ব্রেজিলে "রামি-সিতুয়া" (রাম-সীতা) উৎসব সেই সেই দেশে আর্য্যগণের সভ্যতা বিস্তারের নিদর্শন দেখাইয়া দেয়।

"ঝিল্লি আসি বাঁধলে ঝুমুর ঝিনিকি রিণিকি রিণি—
এস্রাজে ঐ ছড় বুলালে মুগ্ধা স্রোতস্বিনী।"

ব্রাহ্মণ্য শক্তির অপ্রতিহত প্রসার ও প্রতিষ্ঠা আজ বিশ্বের মুকুটধারী নরপতি ও অভিজাতবর্গের অন্তরে গভীর আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

বহু শতাব্দী ধরিয়া এই ব্রাহ্মণ্য শক্তির উচ্ছেদ জন্য ভারতের বিজেতারা বহু কৌশল করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুস-জাপান যুদ্ধের যবনিকা পতন হয়। কিন্তু এই সময় ব্রাহ্মণ্য শক্তি পুনঃ জাগ্রত হইয়া উঠিল। ক্ষুদ্র জাপানের নিকট বিরাট রুসিয়া যেদিন নতশির হইল, সেই দিনই ব্রাহ্মণের সুপ্ত রাজনীতিক অঙ্গ যেন সহসা আলোড়িত হইয়া উঠিল। য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধ হয় ১৯১৪ অব্দে। আর রুসিয়ার সৈন্যদল বিপ্লব উপস্থিত করে ১৯১৭ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ। ব্রাহ্মণের মন্ত্র

এই সময় আরও উদাত্ত স্বরে ধ্বনিত হইল,—শান্তি, রুটি, ভূমি। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে চীন-জাপান যুদ্ধে, চীনের দুর্ব্বলতার পরিচয় পাইয়া দলে দলে ইউরোপীয় জাতিরা স্বার্থ সিদ্ধির আশায় চীনে আসিয়া উপস্থিত হয়। চীন দেশের প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায়, হোয়াং তাই (সিংহ তাই) নামক একজন বিখ্যাত বীর পুরুষ খৃষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে অর্দ্ধ সভ্য মিয়াও (মায়া) জাতিকে তাড়াইয়া একটি বৃহৎ সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মোগল বৌদ্ধ চেঙ্গিজ খাঁ ইউরোপে ভল্গা নদীর তীর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া চীন দেশের নাম "ইউয়ান" রাখেন। মোগলদের পর "সিং" ও পরে "তৎসিং" বংশ রাজত্ব করেন। অবশেষে ডাক্তার সান-ইয়াৎ-সেনের অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে চীন সাধারণ তন্ত্রে পরিণত হয়।

মানব সভ্যতার প্রথম প্রভাতে হিমাদ্রি শিখরে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ গাহিয়াছিলেন—"মানুষের মতও যত, পক্ষও তত। সব মানুষ এক মতাবলম্বী হইবে এবং একই পক্ষে যাইবে, ইহা আশা করা বাতুলতা মাত্র। মত বিরোধ থাকুক, পন্থা বিভিন্ন হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু ক্ষমতা লইয়া কাড়াকাড়ির দলাদলি থাকাত উচিত নহে।" এখন অন্তর্ব্বিবাদই ভারতের প্রধান ব্যাধি।

প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণগণ বলিতেছেন—"দেশকাল পাত্র বিবেচনা করিয়া মঙ্গলের পথ নির্দ্দেশ করিতে হয়।" পরাধীন জাতির আপৎকাল সঙ্গের সাথী, উহা স্বাধীন জাতির ন্যায় নৈমিত্তিক নহে। কার্য্যক্ষেত্রে গ্রীস ও রোম রাজ্য আমরা যতই বড় মনে করিনা কেন, ইতিহাসে তাহারা ক্ষুদ্রত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইংলণ্ডে জাতি বিদ্বেষের নমুনা দেখুন। লণ্ডনে অধিকাংশ হোটেলে অশ্বেত জাতীয় লোককে লওয়া হয় না, ঐ সকল হোটেলে পয়সা দিলেও কালা আদমীর প্রবেশের

হুকুম নাই! চমৎকার ব্যবস্থা নহে কি? কোন অশ্বেত নারীকেও লণ্ডনের হাসপাতাল সমূহে নার্শরূপে শিক্ষিত হওয়ার জন্য লওয়া হয় না। ইহাই খৃষ্টানী সভ্যতা। ইঁহারাই ভারতে আসিয়া শূদ্রদের গালি পাড়িতে শিখায়। চমৎকার সভ্যতা! মনুষ্য ও নর-বানরে তফাৎ কেন, ইউরোপ তাহার ব্যাখ্যা করিতে শিখুক। ব্রাহ্মণদের কুৎসা প্রচার করিতে কেহই বাকী পড়েন নাই। তাঁহারা শূদ্রদের নাকি শূদ্রত্বে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এখন খৃষ্টানি-শূদ্রদের অবস্থা কিরূপ তাহা সকলেই দেখিতেছেন।

হুলুধ্বনি দেলো তোরা,
হুলুধ্বনি দে—
যুগল মিলন,—এই বারেতে
বাইরে এসেছে!

ব্রাহ্মণগণ হয়ত বলিবেন—

"নীচ যদি উচ্চ ভাষে,
সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।"

হিন্দু সমাজকে পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন করিতে হইলে চাতুর্ব্বর্ণ সমাজের আবশ্যক। নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদেরই নিকট যুক্তি ও পরামর্শ লইয়া সমাজকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিবার আয়োজন করিতে হইবে।

অতীতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, হিন্দু রাজত্বের সময়ে রাজগণ ব্রাহ্মণ প্রণীত বিধিদ্বারা পরিচালিত হইতেন। রাজাই সমাজের শাসক ছিলেন, সামাজিক মর্য্যাদা ও সামাজিক নিয়ম ভঙ্গের অপরাধের দণ্ড রাজাই প্রদান করিতেন। ব্রাহ্মণের যুক্তিবল ও ক্ষত্রিয়ের শাসন বল, ব্রাহ্মণের বিধি ও ক্ষত্রিয়ের শক্তি উভয়ে উভয়ের অনুপূরক রূপে

হিন্দুর সমাজ ও ধর্ম্ম এতকাল রক্ষা করিয়াছে, এবং ধর্ম্মহীন ইংরাজী শিক্ষার কুফলেও হিন্দুসমাজ রক্ষা পাইবে। বৌদ্ধযুগাবসানে হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুত্থান ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বুদ্ধি ও শক্তি—মস্তিষ্ক ও বাহু রূপে (ব্রহ্মার কায়া ছায়ার ন্যায়) ভারত জাগিয়া উঠিয়াছিল। কর্ম্মকাণ্ড দ্বারা ব্রাহ্মণ হিন্দুত্বের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাঁহার দাসানুদাস ক্ষত্রিয় বীর কায়মনোবাক্যে হিন্দুত্বের ধ্বজা সযত্নে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কুক্ষণে মদ গর্ব্বিত মোহান্ধ ব্রাহ্মণ পরশুরাম ক্ষত্রিয়শক্তি স্বহস্তে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার পরিণাম কি, পুরাণ পাঠক অবগত আছেন। অরাজকতায় দেশ উৎসন্ন হইল। ক্ষত্রিয় কুমার বালক রামচন্দ্রকে বৃদ্ধ বিশ্বামিত্র সঙ্গে ধনুর্ব্বাণ হস্তে লইয়া সে অবিমৃষ্যকারিতার জন্য জীবনব্যাপী প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিতে হইয়াছিল, ইহা সত্য ইতিহাস—ঠাকুরমার গল্প নহে। আর কি কুক্ষণে কাল সর্পসত্র আরম্ভ হইয়াছিল, সেই যে পূজিত বহ্নি অপূজিত হইয়া ভারতের প্রতি বিরূপ হইলেন, তক্ষক সহিত দেবরাজকে দগ্ধ করিতে না পারিয়া সেই যে মন্ত্র-শক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি বিমুখ হইলেন, আজও হইলেন, কালও হইলেন। জন্মের মত যাজ্ঞিক জগতের শেষ যবনিকাপাত হইল, আর উঠিলনা।

ভারতের যুগান্তরে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মই আবার জয়ধ্বজা উড়াইবে। হে ভারতের ব্রাহ্মণ, নবজাতি সংগঠনের তপস্যায় তোমার কণ্ঠে এখনও উদাত্ত ঋক্ কেন ঝঙ্কার তুলে নাই ?

হে ব্রাহ্মণ—মঙ্গলকামী বীর! হিন্দু সমাজের সুপ্তকর্ণে আশার বাণী জীমূত মন্দ্রে ধ্বনিত করিয়া তাহাদের মোহতন্দ্রা ছুটাইয়া দাও। আর সেবার অগ্নিমন্ত্রে তাহাদিগকে দীক্ষিত কর। হে অগ্নিমন্ত্রের উপাসক—ব্রাহ্মণ! তোমার সেই প্রাণসঞ্চারী আত্মবিস্মৃতি অপনোদনকারী—মোহ বিনাশী উদ্বোধন সঙ্গীত গাও। তোমার সেই সঙ্গীতের মৃত সঞ্জীবনী

সুরের সংস্পর্শে মানুষ ত দূরের কথা, স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠুক। নৈরাশ্য ধ্বংস-লীলার সাথী, বিসর্জ্জনের বিদায় বাদ্য; আশা প্রতিষ্ঠার—গঠনের নিত্য সহচরী ও আগমনী।

তোমার কণ্ঠে যেন নৈরাশ্যের সুর কখনও না বাজে।

—:০:—

বেদ।

বেদই সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। জ্ঞান বিকাশের যত প্রকার প্রণালী এ পর্য্যন্ত আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহার সকল গুলিই কোন না কোন আকারে বৈদিক উপদেশ মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। পারসিক ধর্ম্মগ্রন্থের নাম 'আবেস্তা'। ইহার সংস্কৃত 'অবস্থা'। ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত অবস্থা। পারসিক আবেস্তার অর্থ—জ্ঞান, বিদ্যা, বেদ-গ্রন্থ। পল্হুবি ভাষায় (পার্থিয়ার) ইহার টীকা প্রচলিত আছে, তাহার নাম 'জেন্দ'। জন্ ধাতু হইতে জেন্দ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সংস্কৃত ছন্দের ন্যায় গাথাও সুমধুর ছন্দে বিরচিত। গাথা স্পেণ্টামৈণ্যু যে ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ পার্শি ধর্ম্ম মধ্যে আহুর মজ্দা তিনিই পরমাত্মা। তিনিই জ্ঞান স্বরূপ। তিনিই ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পালন কর্ত্তা। যাহা কিছু সৎজ্ঞান স্বরূপ, সকলই তিনি। তাঁহার নেতৃত্বে অন্যান্য দেবগণ আধিকারিক ভাবে জগতের সমস্ত কর্ম্ম সমাধা করিতেছেন। বৈদিক ও পার্শি-ধর্ম্মের পার্থক্য এই। বেদ অপৌরুষেয়—কোন পুরুষের কৃত নহে।

ঋষিগণের ভিতর ভগবৎ জ্ঞানের যে প্রেরণা, তাহাই গুরু পরম্পরা ক্রমে শ্রুতি নামে অভিহিত জ্ঞানরাশিই বেদ। আর ইরাণে জোরাষ্টার বা জরত্তুস্থ নামক ঋষির হৃদয়ে যে জ্ঞান প্রেরণা দ্বারা লাভ করিয়াছেন, তাহাই এক করিয়া "আবেস্তা" নামে অভিহিত হইয়াছে।

পার্শি ধর্ম্মে প্রথম হোমের প্রতিষ্ঠাতা "বিবনৃহবট্" তাঁহার পুত্র যিম্, তিনি জ্যোতিষ্মান্। ইহা সেই বৈদিক বিবস্বান্ ও তাঁহার পুত্র যমের সহিত একত্ব বলিয়া সকল পণ্ডিতই স্বীকার করিয়াছেন।

ঋগ্‌বেদের দেবীসুক্তের ঋষি এক বিদুষী, তাঁহার নাম বাক্। এই ব্রহ্ম বিদুষীর পিতার নাম মহর্ষি অম্ভৃণ।

বেদ যে কত প্রাচীন তাহা এখনও কেহ ঠিক করিয়া বলিতে পারেনা। বৈদেশীক পণ্ডিতগণের মতে ঋগ্বেদ খৃঃ পূঃ ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বের লেখা। মতান্তরে ঋগ্বেদ অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ১৮০০০ আঠার হাজার বৎসরের প্রাচীন। ব্যাসদেব যে বেদ সঙ্কলন করেন তাহা প্রবাদ মাত্র। যদি সত্যই হয়, তাহা হইলে তাঁহার দ্বারা বেদ বিভাগ হইয়াছিল ধরিতে হইবে। হিন্দু জাতির ইতিহাস পৃথিবীর সকল জাতি অপেক্ষা প্রাচীন। এই প্রাচীনতার পূর্ণ পরিচয় সংস্কৃত ভাষায়, প্রস্তর ফলকে বা উইপোকার কেল্লার দেওয়ালে হিন্দুকে ইতিহাস অন্বেষণ করিতে হয় না; ভক্তহিন্দু তাহার গুরুর চরণ ধূলি-রেণুতে যুগ যুগান্তরের ইতিহাস দেখিয়া থাকে। বেদের 'দশম মণ্ডল' সমগ্র মানব জাতির প্রথম ধর্ম্মগ্রন্থ।

ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে পূর্ব্বতম ঋষির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহাদের নামের কোন উল্লেখ নাই। যে বেদগুলি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বেও অন্য বেদের অস্তিত্ব ছিল।

বেদ সকল মায়াবী ব্যক্তিকে উদ্ধার করেনা। সকল বেদেই পুরুষ শতায়ু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইতিহাস, দর্শন ও মানবতার ধর্ম্ম

সম্পর্কে ভারতবর্ষ যে চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া গিয়াছে, পৃথিবীর আর কোন জাতিই তাহা পারে নাই।

কেহ কেহ মনে করেন যে, বেদান্ত আমাদিগকে স্বার্থপর হইতে শিক্ষা দেয়। জড়বাদীরা বলিয়া থাকেন যে, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু রাজ্যস্থ শক্তি-কেন্দ্র সমূহের স্পন্দনের ফলেই অহংজ্ঞান বা আত্মচৈতন্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু বেদান্ত ইহাদের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, স্নায়বিক শক্তিকেন্দ্র সমূহ বা মস্তিষ্ক-প্রসূত শক্তিরাশি এই আত্মাকে স্পর্শই করিতে পারেনা।

পুরাণ মতে মধ্য এসিয়ার মেরু পর্ব্বতে ভগবান পিতামহ ব্রহ্মা হইতে বেদের আবির্ভাব। মেরু পর্ব্বত ও কাশ্যপ সমুদ্রের তীরে বসিয়া আর্য্য ঋষিগণ নানা ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন। তান্ত্রিক ধর্ম্মও তিব্বত দেশের কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেব এবং কিরাতরূপী শিব হইতে উৎপন্ন। তুরস্ক ও তাতার দেশে অদ্যাপি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে তন্ত্র প্রচলিত আছে।

দেশে যে অতি প্রাচীন "ইতিহাস পুরাণ" বা "পঞ্চম বেদ" রহিয়াছে, এবং যাহা প্রকৃতই মহাসাগর সদৃশ অসীম এবং অনন্ত,—তাহা কেহই এই খনির ভিতর প্রবেশ মাত্রও করেন নাই। ব্যাসদেব বলিয়াছেন,—"ইতিহাস পুরাণের সাহায্যে বেদের মর্ম্ম বুঝিতে হয়।" শ্রীশঙ্করাচার্য্যও তাহাই বলিয়াছেন।

"বেদান্ত, পুরাণ ও ইতিহাস" এই সমুদয় বিষয়ে পরশুরাম ব্যতিত দ্রোণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই।" ভীষ্ম বলিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ ও খৃষ্ট।

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সিংহ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছিলেন—"যখন মিশনরীরা আমাদের কৃষ্ণের জীবন চরিত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া দিল, তখন একশত বৎসরের মধ্যেও একজন হিন্দু দেখি নাই, যে সাহস করিয়া সত্য কথা বলে; অ।চ দেশে লেখকের, পণ্ডিতের, তর্করত্নের অভাব নাই।" ইহা আজিও সত্য।

পৌষ মাসে Palestine বা পালিস্থানে বর্ষাকাল হইয়া থাকে। আইরিস (Irish) জাতি সেকালে সূর্য্য পূজা করিবার সময় কৃষ্ণপূজা করিত। বাইবেলে খৃষ্টের জন্মকালের যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, তখন বসন্তকাল। আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসেই প্যালেষ্টাইনে বসন্ত বিরাজ করে। এই জন্য আগষ্ট বা সেপ্টেম্বর মাসেই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া খৃষ্টীয় জগতের বিশ্বাস। অন্যপক্ষে কৃষ্ণের জন্মও আগষ্ট (ভাদ্র) মাসে হইয়াছিল বলিয়া ভারতবর্ষের লোকের বিশ্বাস।

শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির (Yerestheres of the Greeks) প্রভৃতি কাহারও জন্মকালের সংবাদ পাওয়া যায় না। রামচন্দ্রের জন্মপত্র রামায়ণে আছে, তথাপি ইউরোপীয়ান লেখকেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কাল্পনিক কথা প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে। বর্ত্তমান মহাভারত খানি বর্ত্তমান আকারে প্রণীত হইয়াছিল নৈমিষারণ্যে ঋষিদের হস্তে।

কৃষ্ণ ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমীতে (X'mas) জন্মিয়াছিলেন। মূল বাইবেল নষ্ট করার একটা ভীষণ দুরভিসন্ধি ছিল। কৃষ্ণ ও খৃষ্টের (Christ এর) সাদৃশ্যগুলি আদরের ও ভয়ানক।

কৃষ্ণ ও খৃষ্ট নামের সাদৃশ্য। কৃষ্ণ সংস্কৃত শব্দ ইহা হস্তিমূর্খও স্বীকার করিবে। ল্যাটিন ও গ্রীক শব্দ ঈষৎ বিশুদ্ধভাবে সংস্কৃতে দেখা যায়। যথা—গ্রীক কেন্দ্রে (centre)—সংস্কৃতে—কেন্দ্র, ইংলিশে—সেণ্টার। সংস্কৃতে কেন্দ্র এবং জ্যামিত্র হইয়াছে। গ্রীক হোরাস্—সংস্কৃত হোরা হইয়াছে। Projinitor আমাদের প্রজিনিতা।

হিব্রু বা ইহুদীয় ধর্ম্মগ্রন্থে সয়তানকে সর্পরূপধারী বলা হইয়াছে, ইহা রূপক মাত্র। খৃষ্ট সেই সর্পকে দমন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও কালীয় দমন করিয়াছিলেন।

উভয়েরই জন্মের পর পলায়ন, কৃষ্ণ মথুরায়, খৃষ্ট মেটেরায়। উভয়েরই জন্মকালে রাজশক্তি কর্ত্তৃক (কংস) বা ইংলিশ "কীংস-লী পাওয়ার" কর্ত্তৃক শিশুহত্যা। উভয়েরই শোচনীয় মৃত্যু বৃক্ষের উপরে। ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া যিশুর মৃত্যু পরের (৩০০ শত বর্ষ পর—at council of Nice) কল্পনা।

কৃষ্ণের বিশ্বরূপ ধারণ এবং খৃষ্টের দিব্যরূপ পিতরের (Peter in English) সাক্ষাতে ধারণ।

প্রত্যেক হিন্দু নরনারী ভাবেন যে, কৃষ্ণ তাহার পতি এবং তিনিই কৃষ্ণের পত্নী। এই জন্যই বৈষ্ণবেরা নারী বেশ ধারণ করেন; কাছা দেননা এবং অলঙ্কার ও তিলক ধারণ করেন। প্রভু বলিলে ঈশ্বরের সহিত মানুষের পতিপত্নীর সম্বন্ধ বুঝায়। বহু পরবর্ত্তী কালের বাইবেলটি (Bibliography) ও ইহুদী ধর্ম্মের (Hebrew) আদৌ নাই। প্রাচীন গীতা এক অতীত যুগের গ্রন্থ, তাহা অনেকে ভুলিয়া যান, ইহাই দুঃখ।

ভারতের শ্রীকৃষ্ণ ও Bibliography বর্ণিত খৃষ্টের এইরূপ সাদৃশ্য হইতে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে?

"পাথর চিরে গান গেয়ে বয়
আনমনে ওই নির্ঝরে—
উঠ্‌ছে মধুর ছন্দে গীতি
কানন পাতায় মর্ম্মরে।"

পাঠ করুন—

Krishna and Christ by J. M. Robertson.

Bible in India :—or the Hindu origin of the Hebrew & Christian Revelation by L. Jacoliott.

The great Initiates by Edward Schure.

The celtic Druids colonised in Great Britain from India by Godfray Higgines.

The Secret Doctrine by Madam Blavatsky.

India in Greece by Edward Pocock.

Buddhism in Early Christianity by A. Lilie.

"খৃষ্ট জন্মের ২।৩ শতাব্দী পূর্ব্বে একদল হিন্দু—আসিয়া মাইনরে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা সিরিয়া ও আরণা দেশীয় ইতিহাস লেখকগণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের সন্তান সন্ততির নিকট যে যিশুখৃষ্ট গীতার উপদেশ প্রাপ্ত না হইয়াছিলেন, তাহাই বা কিরূপে বলিব?" (কৈলাস সিংহের শ্রীমদ্ভাগবত গীতার ফুটনোট)।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র সিংহ কাশীধামে থাকিয়া প্রচার করিয়াছিলেন—"আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে ইউরোপীয় খৃষ্টানেরা তাহাদের বাইবেল যাচাই করিয়া উহাতে সার পায় নাই—পাইয়াছে প্রচুর গলদ, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন, জাল ও মেকী উপকথা।" গত মহাযুদ্ধে ঐ বাণী ইউরোপ উপভোগ করিয়াছে। মহাযুদ্ধের প্রবল সজ্ঘাতে সে

মোহও অনেকের ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহারা সহসা আবিস্কার করিয়াছে—তাহাদের বুকের তল শূন্য, তথায় শান্তি নাই, আছে শুধু হাহাকার।” তিনি আরও প্রচার করিয়াছিলেন,—“ঐ ইউরোপকে বাঁচাইতে হইলে চাই একদল ব্রাহ্মণ, যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মটি তাহার সত্য সনাতনরূপে তাহাদের সম্মুখে ধরে।”

—:*:—

শাক্য সিংহ।

যে ধর্ম্মনিষ্ঠ সম্রাট অশোক পাটুলিপুত্র নগরে বসিয়া শাক্যসিংহের পদচিহ্নযুক্ত উজ্জ্বল পাষাণখণ্ড পূজা করিতেন, যে ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধগণ সেই পাষাণখণ্ডকে উপাস্য দেবতা বলিয়া চিরদিন উপাসনা করিয়া আসিয়াছিলেন, কর্ণসুবর্ণপতি শশাঙ্ক * ব্রাহ্মণদিগের আদেশে সেই বুদ্ধদেবের পদচিহ্নযুক্ত পাষাণখণ্ড গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। বুদ্ধদেব গয়ায় যে বোধিদ্রুমমূলে বোধিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের আদেশে সেই বোধিদ্রুমের মূল পর্য্যন্ত পোড়াইয়া দিলেন। † সেই স্থানে ১৬০ ফিট উচ্চ একটি বৃহৎ বুদ্ধ মন্দির ছিল, তাহা হইতে বুদ্ধমূর্ত্তি দূরে ফেলিয়া দিয়া নিজ আরাধ্য শিবমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন।

* কেহ কেহ অনুমান করেন হুগলী জেলার সোণাটিকরী গ্রামই কর্ণসুবর্ণ বা কাণাসোনা, কারণ এই গ্রামের প্রায় দেড় মাইল দূরে কোণাগ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে। মহানাদ হইতে সোণাটিকরী গ্রাম ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বিস্তর শিবমন্দির বর্ত্তমান কালেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। গ্রাম্য ভাষায় এই অঞ্চলকে “শিবের কাছারী বাড়ী” বলে।

† ৫৫২ শকাব্দ বা ৬৩০ খৃষ্টাব্দে গৌড়াধিপ নরেন্দ্র গুপ্ত মহানাদের রাজা শশাঙ্ক সিংহের সহিত গয়ার বোধিদ্রুম ছিন্ন করিবার অনুমতি প্রদান করেন।

বৌদ্ধ গয়ায় এক বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বার দেশস্থ যে প্রস্তরলিপি আছে, তাহাতে বঙ্গদেশীয় সিংহবংশীয় রাজা অশোক চন্দ্র সিংহের নাম অঙ্কিত দেখা যায়। প্রায় বাঙ্গলা অক্ষরের ন্যায় অক্ষরে এই লিপি অশোক চন্দ্র সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার দশরথ সিংহের কোষাধ্যক্ষ সহস্রপাদ ভট্টাচার্য্যের আদেশে "লসং" অব্দে ত্রিসপ্ততিতম বর্ষের ১২ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার লিখিত হয়।

বুদ্ধদন্ত বুদ্ধদেবের মহানির্ব্বাণের পর তাঁহার প্রাণাধিক কায়স্থ শিষ্য "ক্ষেম" কর্ত্তৃক উৎকলে আনীত হয়।

দশরথ গুহ কোটদেশের রাজকুমার ছিলেন। তিনি গুহ শিব বংশীয় কলিঙ্গাধিপ গুহশিব বা শিব গুহ। চতুর্থ শতাব্দীতে সিংহল পাটনের অন্তর্গত ওদন্তপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বংশধর দন্তকুমার ছদ্মবেশে সেই পবিত্র বুদ্ধদন্ত লইয়া তাম্রলিপ্ত নগরে প্রস্থান করেন। তথা হইতে জাহাজে উঠিয়া সিংহল পাটনে আগমন করেন। ৩২০ খৃষ্টাব্দে সিংহল পাটন বিধ্বস্ত হইলে, তিনি মহানাদের অনতিদূরে বরাটে গুহবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। সিংহল পাটন ধ্বংসের পর বুদ্ধদন্ত তাম্রপর্ণি দ্বীপে প্রেরিত হয়। শৈবদিগের অত্যাচারে বৌদ্ধগণ প্রপীড়িত হইয়া সিংহল পাটনের ঘেয়ানদীর দুই তীরে সুসজ্জিত গ্রাম নগর পরিত্যাগ করিয়া হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গলাবৃত ভূমিতে অতি দীনহীন ভাবে কালাতিপাত করিতেন।

হিন্দু, দেবতা উপাসনা করেন, বৌদ্ধ গুরুর উপাসনা করেন। আমাদের শূন্য তমোভূত; বৌদ্ধদের শূন্য প্রভাস্বর, স্বয়ং প্রকাশ, স্বয়ং জ্যোতিঃ। আমাদের আদিতে সৃষ্টি আছে। বৌদ্ধদের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনাদি প্রবাহ। বুদ্ধকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন—"তোমার আপনার চরকায় তেল দাও, পৃথিবীর কথা ভাবায় তোমার দরকার নাই"।

ভদ্রবাহু খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে সিংহপুরে বাস করিতেন। প্রায় সমুদয় ত্রিপিটক বৌদ্ধগ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪১ বৎসরের পূর্ব্বেই সঙ্কলিত হইয়া গিয়াছিল। মাণিক্য নন্দী রচিত "পরীক্ষা-মুখসূত্র" (অনুমানিক ২০০ খৃঃ পূঃ), প্রভাচন্দ্র কবি রচিত পরীক্ষা-মুখ সূত্রের টীকা "প্রমেয় কমল মার্ত্তণ্ড" নামক গ্রন্থ (আনুমানিক ১০০ খৃঃ পূঃ), হরিভদ্র রচিত "ষড়্দর্শন সমুচ্চয়" (১১৬৮ খৃঃ), মল্লিকেন কৃত "স্যাদবাদ মঞ্জরী" (১২১৪ শকাব্দ বা ১২৯২ খৃঃ) প্রভৃতি গ্রন্থ স্যাদ্‌বাদের পরিপোষণের কথা ছাড়িয়া দিলেও খৃষ্টীয় প্রথম হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে স্যাদবাদের চিন্তা প্রণালীর উপর বৌদ্ধ ও ঔপনিষদিক প্রভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনই (৪০১ খৃঃ) প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার শূন্যবাদ স্থাপন প্রসঙ্গে অস্তি, নাস্তি এবং অবক্তব্যরূপ ত্রিকোটিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন।

বৌদ্ধদের ভিক্ষুধর্ম্ম ও জৈনদের যতিধর্ম্ম উভয়ই আর্য্যদের। এককালে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ অনার্য্য দেশ ছিল সত্য, কিন্তু চিরকালই ছিল না। বেদপন্থীদের এক বৈদিক ধর্ম্মই ঘুরিতে ঘুরিতে ফিরিতে ফিরিতে নানা পৌরাণিক মতে ফুটিয়া উঠিয়া নানা নাম ধারণ করিয়াছে। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মও বৈদিক ধর্ম্মের ঐ নানা মতের এক একটি।

১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশিলার দীপঙ্কর ভিক্ষু দুর্গম হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের "লামা" পদে অর্ঘ্য দিতে গিয়াছিলেন।

নাগার্জ্জুনের একজন শিষ্য আর্য্যদেব, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কোন ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া মহানাদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি শত সমাধি এবং চতুঃশতী গাথা রচনা করেন। একজন তীর্থক দাক্ষিণাত্যে তাঁহার উদর বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলেন। তৎপুত্র—কাণাদেব।

বুদ্ধদেব স্বয়ং কোনও গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই। তাঁহার উপদেশ সকল তাঁহার শিষ্যগণের কণ্ঠে কণ্ঠে শ্রুতির ন্যায় সংরক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় আপন ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় হয় নাই। বুদ্ধদেবের লোকান্তর গমনের বহুকাল পরে তাঁহার উপদেশ সমূহ লিপিবদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়। পালি, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা প্রধানতঃ এই ত্রিবিধ ভাষাতেই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, এক্ষণে নানা ভাষায় অনুবাদিত ও বহুসংখ্যক গ্রন্থ আবিস্কৃত হইয়াছে। প্রথম বৌদ্ধ সঙ্ঘে যে ধর্ম্মমতের আবৃত্তি হইয়াছিল, তাহা "থেরাবেদ" নামে প্রসিদ্ধ। সকল সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণের নিকটে "থেরাবেদের" সম্মান দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন,—বুদ্ধদেব বেদোক্ত জ্ঞানমার্গের অনুসরণকারী ছিলেন এবং বুদ্ধদেব 'বেদ বিরুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচার করেন নাই' বলিয়াই হিন্দুর অবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন; পরে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যগণ কর্ত্তৃক সে ধর্ম্মমত রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। "থেরাবেদ" এক্ষণে পাওয়া যায় না, কেহ কেহ বলেন "ত্রিপিটক (তেপেটক)" নামক সুবৃহৎ বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে "থেরাবেদ" মিশিয়া গিয়াছে। "থেরা" শব্দের অর্থ—ভিক্ষু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী এবং "বেদ" শব্দে জ্ঞান বুঝায়; সুতরাং "থেরাবেদ বলিতে বুদ্ধদেবের নিকটে ভিক্ষুগণ যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই বুঝা যায়। পালি ভাষায় লিখিত "দ্বীপবংশ" ও "মহাবংশ" বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। দ্বীপবংশ মতে "থেরাবেদ" নয় ভাগে বিভক্ত, যথা—সুত্ত, গেয়, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইত্যুক্ত বা ইতিবুত্তক, জাতক, অভুত বা অদ্ভুত ধম্ম ও বেদল্ল। "ত্রিপিটক" শব্দের অর্থ—তিনটি আধার বা রত্নভাণ্ডার। বৌদ্ধগণের সেই পবিত্র পুস্তক ত্রিপিটক বা তিনটি রত্ন ভাণ্ডারের নাম—(১) সুত্ত-পিটক, (২) বিনয়-পিটক ও (৩) অভিধম্ম-পিটক। "সুত্ত-পিটক" পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা—দীঘ্ঘ-নিকায়, মজ্ঝিম-নিকায়, সমুত্ত-নিকায়, অঙ্গুত্তর-নিকায় ও খুদ্দক-

নিকায়। "খুদ্দক-নিকায়" মধ্যে ১৫ খানি গ্রন্থ আছে, যথা— খুদ্দকপাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইত্যুক্ত, সুত্তনিপাত, বিমানবত্থু, থেরাগাথা, থেরিগাথা, জাতক, নিদ্দেশ, পতিসম্ভিধা, অবদান, বুদ্ধবংশ ও কারিয়-পিটক। উল্লিখিত বুদ্ধবংশ পুস্তকে গৌতমবুদ্ধ সহ বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্ব্বিংশ বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। "বিনয়-পিটকে"—সুত্তবিভঙ্গ, খণ্ডকসমূহ, ও পরিবার পাঠ নামক তিনখানি গ্রন্থ আছে। "অভিধম্ম-পিটকে"—ধম্মসঙ্গনি, বিভঙ্গ, কথাবত্থু, পুগ্‌গল-পন্নতি, ধাতুকথা, যমক ও পঠন নামক সাতখানি গ্রন্থ আছে। "ললিত বিস্তর" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে গৌতমের জন্ম হইতে নির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। বুদ্ধের পরবর্ত্তী দ্বাদশ সংখ্যক বৌদ্ধাচার্য্য বোধিসত্ত্ব অশ্বঘোষ বিরচিত "বুদ্ধ চরিত" সংস্কৃত ভাষায় লিখিত গ্রন্থ। অশ্বঘোষ কণিষ্কের সমসাময়িক বলিয়া কথিত হন। দক্ষিণ দেশীয় (সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপ, দাক্ষিণাত্য, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি) বৌদ্ধগণ ত্রিপিটকান্তর্গত গ্রন্থের এবং উত্তর দেশীয় (নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান, প্রভৃতি) বৌদ্ধগণ "মহাবৈপুল্য" ও "নবধম্ম" গ্রন্থের সমাদর করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ। মার্সম্যান সাহেব ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়া তাহাতে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে মিসরের আমদানী বলিয়া ঘোষণা করেন। রাজ চক্রবর্ত্তী অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থাদি সিংহলে প্রেরিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃতির আতিশয্যেই প্রায় পনের শত বৎসর পরে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছে।

শাক্যসিংহের মত কিরূপ ছিল, তাহা এখন সহজে বোধগম্য করা যায় না। বুদ্ধ এক স্থানে বলিয়াছিলেন,—"আমার বাক্য সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিও না।" একস্থলে লিখিত হইয়াছে, "বুদ্ধ কোন সময়ে সংস্কৃত ভাষায় উপদেশ দেন নাই।"

বৌদ্ধধর্ম্ম সুদূর সুইডেন দ্বীপের নিকটবর্ত্তী 'ল্যাপল্যাণ্ড' দ্বীপে আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া প্রাচীন ভারতের উপনিবেশ স্থাপনের সুস্পষ্ট প্রমাণ দিতেছে। আরব দেশের কতকাংশ এক সময় বৌদ্ধ ছিল।

ভরতের সঙ্গে জাবালী আসিয়া যখন রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্ম অনুরোধ করিতেছেন, সেখানেও বৌদ্ধধর্ম্মের নিন্দা করিয়া অনেকগুলি শ্লোক দেওয়া আছে। এই শ্লোকগুলি কেবল বৌদ্ধধর্ম্মের নিন্দা করিয়া নিরস্ত হয় নাই, শাক্যসিংহের নামও উল্লেখ করিয়াছে। সুতরাং খৃঃ পূঃ ৭০০ বৎসরের পরে বর্ত্তমান রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও বুদ্ধদেবের উল্লেখ আছে,—

"বুদ্ধ নামা জীনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।"

মহাকবি বিশাখ দত্ত একজন সামন্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি রাজনীতি বিষয়ক "মুদ্রারাক্ষস" নাটকখানি রচনা করেন। বৌদ্ধ নীতি অনুসারে অকুণ্ঠভাবে জীবনোৎসর্গের মহিমার দৃষ্টান্ত—সেই নাটকের প্রতি অঙ্গে বিকসিত।

———:০:———

নাথ পন্থী।

নাথধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলার মহানাদেই সংস্থাপিত হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন। দমদমার গোরক্ষনাথের মঠ ও মেদিনীপুরের সিদ্ধনাথ শিবের মঠ মহানাদের জটেশ্বরনাথ শিবের মঠের মোহান্তর অধীনে ছিল, ইহাই তাহার প্রমাণ। সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রুতিতে যাহা লিখিত আছে, নাথধর্ম্ম ইহার চেয়ে অধিক কিছু বলে নাই! প্রথমে শুধু 'নৈরাকার রাত্রি' ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। তখন—

"নাই আগু অনাস্ত না ছিল ধর্ম্মেশ্বর।
না ছিল বর্ম্মা বিষ্ণু শিব গঙ্গেশ্বর॥
না ছিল চন্দ্র সূর্য্য শর্গে ইন্দ্রেশর।
না ছিল আকাশ পাতাল ধরণী পবন॥
না ছিল অগ্নি পানি না ছিল হুর্ত্তাসন।
না ছিল দরিয়া সাগর কুলাকুল॥"

মহানাদে নাথধর্ম্ম শৈবধর্ম্মের প্রাবল্যের যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সিংহল পাটনের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। মহানাদে নাথপন্থীরা অনন্ত জ্যোতিঃ প্রজ্জ্বলিত রাখে নাই। পশ্চিম ভারতের নাথপন্থীরা বলেন যে, উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্ত্তৃহরি নাথ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং নাথধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম অপেক্ষা প্রাচীন। মীননাথ বোধহয় বীরেন্দ্র সিংহ মীনকেতন। মৎস্যেন্দ্র নাথ একেবারে রাঢ়ের লোক। প্রাচীন "কৌলজ্ঞান বিনির্ণয়" গ্রন্থ হইতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, মৎস্যেন্দ্রনাথ হুগলী জেলাস্থ চেঁদোর বা চন্দনপুরের লোক, জাতিতে কৈবর্ত্ত। এই নাথপন্থিগণের বিশ্বাস যে, কর্ণে কুণ্ডল ধারণ করিলে মুক্তি বা শিব সাযুজ্য লাভ হইয়া থাকে।

নাথধর্ম্ম বা নাথপন্থী পরিচালিত মঠ বাংলার বহু স্থানে এমন কি শ্রীহট্টে ও আসামে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

——:০:——

বাঙ্গলায় মুসলমান।

হিঃ ৫৯৯ সালে বা ১২০২ খৃঃ মোহম্মদ বখ্‌তিয়ার দিল্লীশ্বর কুতব-উদ্দীনের নিকট হইতে খেলাত ও মগধের শাসন কর্ত্তৃত্বের সনন্দ পাইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দ্দিকে তাঁহার রাজ্য বৃদ্ধি করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। বখ্‌তিয়ার বিহারের রাশিকৃত পুস্তক সমূহে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিলেন।

প্রচলিত ইতিহাস মতে বাঙ্গলার মসনদে সেই সময় নবদ্বীপস্থ দীর্ঘংগার রাজা লক্ষণসেন উপবিষ্ট ছিলেন। রাজা লক্ষণসেন ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নবদ্বীপের সিংহাসনে বসিয়া সমস্ত বাঙ্গলা দেশ শাসন করেন। তাঁহার পিতৃদেবের মৃত্যুকালে তদীয় মাতা গর্ভবতী ছিলেন; এবং তাঁহার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায়, রাজ সভাসদগণ গর্ভবতী রাণীকে সিংহাসনে বসাইয়া, তাঁহার ক্রোড়ে রাজমুকুট রক্ষা করিয়া, তাঁহাকেই রাজ সম্মান প্রদান করিলেন। পুত্র প্রসবের সঙ্গে সঙ্গেই পুত্র মাতৃহারা হইল। দারুণ যন্ত্রণায় রাণীর প্রাণবায়ু প্রসবের সঙ্গেই বহির্গত হইয়া গেল!

লক্ষণ একজন [illegible] ও ন্যায় বিচারক ছিলেন। তাঁহাকে অত্রি গোত্রীয় রাজা লক্ষণ সিংহ বলিয়াই মনে হয়। এই সময় চৌলার অত্রি গোত্রীয় সিংহ, আমুলের মৌদ্গল্য সিংহ, দীর্ঘংগার সেন, প্রভৃতি কায়স্থ ভূম্যধিকারীগণ প্রবল ছিলেন। দার্ঘংগা তখন বুড়ীগঙ্গার উপকুলে স্থাপিত রাজ্য।

রাজ্যের বহুতর ব্রাহ্মণ নবদ্বীপ, তথা বঙ্গদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরীতে গিয়া জগন্নাথের মন্দিরের নিকট আশ্রয় লইলেন। রাজা লক্ষণ সকলের পরিত্যক্ত হইয়াও তাঁহার রাজ্য ও রাজধানীর মমতা সহজে পরিত্যাগ করিলেন না।

পর বৎসর ১২০৩ খৃঃ বখ্‌তিয়ার খিলজী বেহার হইতে পূর্ব্বাভিমুখে বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রাজধানী জনশূন্য দেখিয়া বখ্‌তিয়ার এই সময় কাহারও প্রতি কোনরূপ অত্যাচার না করিয়া নীরবে বিনা বাধা বিঘ্নে বরাবর অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

নদীয়া জেলার প্রাচীন বিক্রমপুর প্রভৃতি নগর আজিও জনশূন্য অবস্থায় রহিয়াছে। এই সকল স্থানের প্রাচীন পুরাকীর্ত্তি অতীব বিস্ময়কর, কিন্তু অদ্যাপি আলোচিত হয় নাই। *

বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ গঙ্গাগর্ভ দিয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিয়া উড়িষ্যাভিমুখে চলিয়া গেলেন, এবং তথায় জগন্নাথ ধামে অল্পকাল মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

গৌড়নগর গঙ্গার পূর্ব্ব পার্শ্বে রাজমহল হইতে প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে মালদহ জেলায় অবস্থিত। "লক্ষণাবতী" নগর প্রাচীন গৌড় নগর হইতে পারেনা। বরং লক্ষ্ণৌ হওয়া সম্ভব। ১৫৩০ খৃঃ এই গৌড় 'জেন্নাত-আবাদ' নামে বিখ্যাত হয়। তৎকালে গৌড় গঙ্গার তীরে ছিল, এক্ষণে উহা ভয়ানক জঙ্গলময় হইয়া, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। নদীয়া জেলান্তর্গত বিক্রমপুরেরও সেই অবস্থা। এখনও নিবিড় অরণ্য মধ্যে কৃষ্ণ মর্ম্মর নির্ম্মিত কারুকার্য্য খচিত প্রস্তরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। বঙ্গ বিহার একত্রিত হওয়ায় লক্ষ্ণৌ নগরীই রাজধানী লক্ষণাবতী এই যুক্ত প্রদেশের কেন্দ্রস্থান হইয়া থাকিবে। "তবকত-নসিরী" গ্রন্থ হইতে কতক জানিতে পারা যায়। কোচ ও মিক জাতীয়রা বখ্‌তিয়ারের শরণাপন্ন হইয়া ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। এই অভিযানে কোচ রাজা মুসলমান হইয়া আলি নাম

* ঐতিহাসিক লেখক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় পরলোক গমনের কিছু পূর্ব্বে নদীয়া বিক্রমপুর সম্বন্ধে কতক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

গ্রহণ পূর্ব্বক বখ্তিয়ারের পথ প্রদর্শক হইয়া তাঁহাকে বর্দ্ধননগর (বর্দ্ধমান ?) পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া দিয়াছিলেন।

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে একটি বর্দ্ধন নগর ছিল, তথায় দ্বাবিংশতি খিলানযুক্ত একটি বহু পুরাতন প্রস্তরময় সেতু দেখিতে পাইয়া, বখ্তিয়ার তৎসাহায্যে ব্রহ্মপুত্র পার হইয়াছিলেন। কুরম পত্তন নগর বখ্তিয়ার কর্ত্তৃক ধ্বংস হয়। বখ্তিয়ার ক্রোধান্ধ হইয়া বর্দ্ধন নগরের নিকটবর্ত্তী একটি প্রকাণ্ড দেবালয় ধ্বংস করিলেন ও তন্মধ্যস্থ বিগ্রহ সকল ভূমিসাৎ করিয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক হিন্দুর রক্তে মন্দির প্রাঙ্গণ রঞ্জিত হইল।

হিন্দুরক্তে ব্রহ্মপুত্র তীর রঞ্জিত করিয়া ফিরিবার কালে হঠাৎ ভীষণ স্রোতে নদীগর্ভস্থ বালুকারাশি অপসারিত হওয়ায় বিস্তর মুসলমান সৈন্যকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইল।

শেষে অল্প সংখ্যক সৈন্য সহ বখ্তিয়ার ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া আসিয়া মোসলেম ধর্ম্মে নব দীক্ষিত কুচবিহারের রাজা আলি মিকের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। কুনি দেশের শাসনকর্ত্তা আলি মরদানের ছুরিকাঘাতে নর পিশাচ বখ্তিয়ার ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। এই মহাপাপী নরকে কতই যন্ত্রণা পাইতেছে।

বখ্তিয়ার যখন রাজা লক্ষণের রাজ্য অধিকার করেন, তন্মধ্যে এই মহাবীর মরদান অন্যতম একজন। মরদানের রাজধানী ছিল নারকোটি নগরে।

কুতবুদ্দিন মরদানের সিংহাসনারোহণে অতিমাত্র বিরক্ত হইয়া সমস্ত বাঙ্গলা দেশটিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শাসন কর্ত্তার অধীনে অর্পণ করিবার জন্য অযোধ্যার নবাবের নিকট লিখিত পরওয়ানা পাঠাইলেন।

বঙ্গের নবাব গিয়াসউদ্দিন বঙ্গে কয়েকটি বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত থাকায়, তাঁহার সিংহাসন নাসিরউদ্দিনের হস্তগত হইল।

নাসিরউদ্দিনের মৃত্যুর পর বঙ্গে বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। ৬২৭ হিজরীতে আল্লা বিদ্রোহ দমন করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে বসিলেন। সামসুদ্দীন আলতামাস ৬০৭ হিঃ বা ১২১০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

১২২৫ খৃষ্টাব্দে আনুলিয়ার রাজাকে দমনের পর নবাব মধ্যভারতের প্রসিদ্ধ দুর্গ রণতম্বর জয় করিতে বহির্গত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে সপ্ততিতম বারেরও অধিক এই দুর্ভেদ্য দুর্গ বিভিন্ন রাজশক্তি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন শক্তিই ইহা জয় করিতে পারে নাই। পর বৎসর হিঃ ৬২৪ সালে নবাব, সওয়া-লোকের পার্ব্বতীয় দুর্গ-মন্দির আক্রমণ করিলেন। এই দুর্গজয়ে অনেক ধনরত্ন সেনাগণের হস্তে পড়িল। ৬২৯ হিজরীতে নবাব গোয়ালিয়রে অভিযান করেন। রাজা দেব বলদেব আত্মসমর্পণ পরিবর্ত্তে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পরে রাজা দেব বলদেব রাত্রিযোগে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিলেন।

১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে ভিলসা নগরে তিন শতাব্দী পূর্ব্বে নির্ম্মিত দুই শত হস্ত পরিমাণ উচ্চ একটি দেবমন্দির ছিল। ভিলসা ধ্বংস করিয়া, মুসলমান সেনাগণ উজ্জয়িনী নগরে অভিযান করিয়া ও তথাকার মহাকালের মন্দির ধ্বংস করিয়া, মহাকালের প্রতিমূর্ত্তি এবং ১৩১৬ বৎসর পূর্ব্বের উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রতিমূর্ত্তি দিল্লীতে লইয়া আসিল।

উলুগ খাঁ নন্দননগর রসাতলে দিয়া, রাজা দলকী মাল্কীকে বন্দী করিয়া দিল্লী প্রস্থান করিলেন। নন্দননগর কনোজের নিকটবর্ত্তী চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত ছিল।

৬৪৯ হিজরীর ২৫ সাবান তারিখে বাল্ওয়ারের রাজা জাহির দেবকে বিতাড়িত করিয়া বাল্ওয়ার দুর্গ অধিকার করিলেন। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত

বেষ্টিত আমুর উপত্যকায় সামুর দুর্গ ধ্বংস করিলেন, এই যুদ্ধে দিল্লীর মুসলমান সেনাগণ এত অধিক হিন্দু নরনারী বধ করিয়াছিল যে, তাহা বর্ণনার বাহিরে ও গণনার বহির্ভূত।

১২৭৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে কায়স্থ ভূঞাদের ভীষণ বিদ্রোহ হয়াছিল।

১২৯৯ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলজী বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, পশ্চিম বঙ্গ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল লইয়া রাজধানী গৌড়নগর নাসিরউদ্দিনের শাসনাধীনে এবং পূর্ব্ববঙ্গে সোনারগাঁ রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহা বাহাদুর খানের শাসনাধীনে দিলেন।

এই সময় সেন উপাধিধারী কোন ব্যক্তি পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করে নাই।

১৩১৭ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর খাঁ সমস্ত বাঙ্গলা দেশের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং নিজনামে বাহাদুর খানের পরিবর্ত্তে বাহাদুর সাহ নাম দিয়া মুদ্রাঙ্কন করিলেন।

বিরাম খান বঙ্গের নবাব হইলেন, সোণার গাঁয়ের উপর চতুর্দ্দশ বৎসর কাল নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৩৩৮ খৃঃ দিল্লী হইতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া রাজা রাজারাম দেবের পুরাতন রাজধানী দেবগিরি তৎকালীন দৌলতাবাদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম ব্যস্ত ছিলেন। এই সময় সোণারগাঁয়ে মুসলমানদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং মালদহের একদালী দুর্গ ধ্বংস হয়। সামসুউদ্দিন অশ্বপৃষ্ঠে যাইয়া পাণ্ডুয়া আক্রমণ করিলেন। ইহার রাজত্বকালে বাঙ্গলার সীমা সমস্ত বিহার প্রদেশ ও গণ্ডক নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

গাজী বারবাক সাহ ১৪৬০ খৃষ্টাব্দে কামতাপুরের সেনরাজাকে পরাস্ত করিয়া সেনরাজবংশের শেষ স্মৃতি লুপ্ত করিলেন।

আবুনসর্ মোজাফ্ফর সাহ ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ করেন। গৌড়নগর প্রান্তর রুধির সিক্ত কর্দ্দমে ও অন্যূন ২৬০০০ সহস্র যোদ্ধার মৃতদেহে এক অতি বীভৎস আকার ধারণ করিল।

ভ্রাতৃহন্তা আওরঙ্গজেব বা আলমগীর কত গৃহস্থের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া ৯১ বৎসর বয়সে দাক্ষিণাত্যে লুণ্ঠন পরিচালন কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহারই মত ভ্রাতৃশোণিতে হস্ত রঞ্জিত করিয়া যিনি সিংহাসন অধিকার করেন, তাঁহার নাম—বাহাদুর সাহ। ইহার পুর্ব্ব নাম ছিল—সাহজাদা শাহ আলম। বাহাদুর শাহের পুত্রের নাম—আজিম উশান। রাজা শোভাসিংহের গুপ্তহত্যা করিয়া ইনি বাঙ্গলার ইতিহাসে সুপরিচিত হন। বিদ্রোহ দমন করিয়া প্রায় তিন বৎসর কাল বঙ্গদেশ লুণ্ঠন ও জর্জ্জরিত করেন। এই সাহজাদার পরিণামও সুজার মত শোচনীয় হইয়াছিল। বঙ্গদেশ পরিত্যাগ কালে তিনি পুত্র ফিরোক সায়ারকে প্রতিনিধি রূপে রাখিয়া গিয়াছিলেন। এই সময় সৈয়দ আবদুল্লা ও সৈয়দ হোসেন আলি মহানাদ লুণ্ঠন করিয়া বিহার চলিয়া যান। ইঁহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, হজরৎ মহম্মদের বংশধর বলিয়া গৌরব করিতেন। সর্ব্ব বিষয়ে দক্ষ, নির্ব্বাচিত বিচক্ষণ দেওয়ান মুরশিদ কুলি বঙ্গদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফিরোক সায়ার রাজ্য পরিচালনার ভার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেওয়ান কুলিখাঁর হস্তে অর্পণ করিয়া স্বয়ং সপরিবারে মুরশিদাবাদের লালবাগ প্রাসাদে নিশ্চিন্ত আরামে অবস্থান করিতেন। বাহাদুর সাহ লাহোরে লোকান্তরিত হইলে, তাঁহার সকল সৈন্য, যাবতীয় রণসম্ভার ও কোষাগার করায়ত্ত হওয়া সত্ত্বেও অবিমৃষ্যকারিতার ফলে অঙ্কগত ভাগ্যলক্ষ্মী ও জয়লক্ষ্মীর করুণালাভে তিনি সহসা বঞ্চিত হইলেন। আওরঙ্গজেবের অভিশপ্ত ময়ুর সিংহাসন গ্রহণ করা কোনও উত্তরাধিকারীর পক্ষে এখন আর অনায়াসসাধ্য নহে,—ভ্রাতৃরক্তে হস্তপদ প্রক্ষালিত না করিয়া তাহার সান্নিধ্যে উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। পাঁচদিন ভ্রাতৃযুদ্ধে লিপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ পরাজয় হইল। আজিম উশানের ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পাওয়া গেল। তাঁহার দুই পুত্র ধৃত হইয়া বিজয়ী পিতৃব্যের আদেশে নিহত হইলেন।

মুরশিদাবাদ লালবাগ প্রাসাদে বসিয়া যখন সাহজাদা ফিরোক সায়ার এই ভয়াবহ সংবাদ অবগত হইলেন, তখন তাঁহার বিলাসের মোহ ভঙ্গ হইল। তিনি বিদ্রোহী হইলেন। কুলি খাঁ তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে জানাইলেন যে, তিনি নূতন বাদশাহ জেহান্দর সাহেরই এখন কর্ম্মচারী, কোন ক্রমেই তিনি বাদসাহের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না। তখন ফিরোক সায়ারের চৈতন্য হইল। তিনি পরিবার সহ মহানাদে আগমন করিলেন, তখন রাজা পূরণ খাঁ বা পূর্ণচন্দ্র সিংহ তাঁহাকে সানন্দে গ্রহণ করিলেন।

জেহেন্দর সাহ বাদশাহ হইয়াই মুখোস খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কুৎসিত মুর্ত্তি দেখিয়া আমীর উল-উমরাহ ও অন্যান্য রাজ কর্ম্মচারিগণ শিহরিয়া উঠিলেন! দায়ীত্ব জ্ঞানহীন বাদসাহ লালকুমারী নাম্নী এক নর্ত্তকীর প্রেমের আবর্ত্তে পড়িয়া মসনদকে বিলাস মজলিস করিয়া তুলিলেন। কাজেই কূটবুদ্ধি সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মন্ত্রণা পরিচালিত সাহজাদা ফিরোক সায়ারের পক্ষে বাদসাহ জেহান্দর সাহাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করা কঠিন হয় নাই। জেহান্দর সাহের পরিণামও শোচনীয় হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবন-সহচরী নর্ত্তকী লালকুমারীর সহিত ছদ্মবেশে সপ্তগ্রামে পলায়ন করিয়াও নিষ্কৃতি পান নাই,—ধৃত হইয়া নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিলেন। তখনও মোগল রাজবংশের ধন-ভাণ্ডার ঐশ্বর্য্য সম্পদে অতুলনীয় ছিল।

মুসলমানের তরবারি ও কোরাণ অনেককেই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিল। প্রায় পাঁচ শত বর্ষ পূর্ব্বে—যশোহরে বেড়ুটিয়া পরগণার জমিদার কামদেব ও জয়দেব রায় চৌধুরী জীবিত ছিলেন। এই সময় জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মহম্মদ তাহের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নবাব খাঞ্জে আলির সহিত মিলিত হয়। কামদেব ও জয়দেব মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কামাল উদ্দিন ও জামালুদ্দীন খাঁ

চৌধুরী নাম লইয়া সিংহীয়া গ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া তথায় বাস করিলেন। আওরঙ্গজেব আইন করিয়া বেশ্যার বিবাহ প্রথা প্রচলন করিয়াছিলেন। এই সময় সহস্র সহস্র বেশ্যা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের সন্তানেরা হিন্দু-সমাজ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, ইহার পরিণামে মোগল সাম্রাজ্য চূর্ণ হইল। মোগলের ভাগ্যলক্ষ্মী ইংলণ্ডের দিকে মুখ ফিরাইলেন।

ভারতবর্ষে মধ্যযুগের আরম্ভ হইতেই নানাস্থানে ভিন্ন ভিন্ন বংশ কর্ত্তৃক বিভিন্ন রাজ্য সংস্থাপিত হয়। ইঁহাদের রাজ্য, প্রতাপ ও পরাক্রম, পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে নাই এই সকল রাজবংশের মধ্যে একতার সম্পূর্ণ অভাব ও পরস্পরের ঘোরতর ঈর্ষা বিদ্বেষ বিরাজিত ছিল। ইঁহারা স্বদেশের কল্যাণের নিমিত্ত স্ব স্ব ক্ষুদ্রতর স্বার্থ ও পরস্পর বিদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমবেত ভাবে একতার মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতে পারিলে, ভারতবর্ষে মুসলমান লুণ্ঠন, অত্যাচার, নরহত্যা, রমণী ধর্ষণ, ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত ও প্রভুত্ব কোন কালেও সংস্থাপিত হইতে পারিত কি না, সন্দেহ স্থল।

রাজনৈতিক কারণে মানুষ মানুষের প্রতি কত বর্ব্বর ব্যবহার করে, তাহার ইতিহাস মোগল পাঠানের কাহিনী ভারতেতিহাসের পৃষ্ঠায় অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

কাবুলে হিন্দুরাজা।

৮৭০—৯৫ খৃষ্টাব্দে আফগানিস্থানে হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন। মামুদের ভারত আক্রমণের পূর্ব্বে দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে কাবুলে যে সকল ব্রাহ্মণ রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিষয় "তওয়া রিখল হিন্দ"

হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুর্কী কনকের পরে অনেক রাজা হইবার পর, শেষে তুর্কীরাজ লখত-জামান বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়া পড়ায়, তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী সুমন্দ তাঁহাকে বন্দী করিয়া, স্বয়ং কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ রাজবংশে ভীম পাল, জয় পাল, আনন্দ পাল, নরভঞ্জন পাল প্রভৃতি রাজা হইয়াছিলেন। নরভঞ্জন পালের পুত্র দ্বিতীয় ভীমপালই কাবুলের শেষ হিন্দুরাজা।

মহানাদ হইতে সিংহলাপুত্র আর্য্য সিংহ কাবুলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে যান, কাবুলের ব্রাহ্মণ রাজা তাহার প্রাণ বধ করিতে আদেশ দেন।

বর্গীর হাঙ্গামা।

পর্টুগীজ ও মগদিগের উৎপীড়নে সমগ্র বঙ্গ যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তদপেক্ষা আরও এক দুর্দ্ধর্ষ জাতি কর্ত্তৃক বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা যারপর নাই উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। ইহারা মহারাষ্ট্র জাতি; ইহাদের অত্যাচার বাঙ্গলায় "বর্গীর হাঙ্গামা" বলিয়া অভিহিত। আজও ঘরে ঘরে বর্গীর হাঙ্গামার কথা শুনা যায়। জননী, ক্রোড়স্থিত শিশুকে ঘুম পাড়াইবার সময় বর্গীর হাঙ্গামার ছড়া আবৃত্তি করেন—

"ছেলে ঘুমাল পাড়া জুড়াল, বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়ে যায়, খাজনা দিব কিসে॥"

পারস্যাধিপতি নাদির সাহ কর্ত্তৃক ভারতাক্রমণ ও দিল্লীনগরী লুণ্ঠন এবং অধিবাসিগণকে নৃশংসরূপে হত্যা করার পর হইতে মোগলগণের ক্ষমতা যারপর নাই হ্রাস হইয়াছিল। এই সময়ে দাক্ষিণাত্য বাসী (Latin Dextan) মহারাষ্ট্রীয়গণ যারপর নাই পরাক্রমশালী এবং দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা দলে দলে ভারতবর্ষের নানাস্থানে আক্রমণ করিয়া

যারপর নাই অত্যাচার ও লুণ্ঠনাদি করিতে লাগিল। এই দুরাচারগণ এই দেশে আরও কিছুকাল অত্যাচার করিতে পারিলে দেশবাসীর ভাগ্যে যে কি হইত, তাহা কে বলিতে পারে? বঙ্গদেশ হইতে চৌথ আদায় করিবার জন্য রঘুজী পণ্ডিত নামা জনৈক সেনাপতির অধীনে বহু সহস্র সৈন্য সহ বঙ্গদেশে আগমন করেন। ভাস্তাড়া, নতিবপুর ও বংশবাটীর সহস্ররাম সিংহ বহুদিন ব্যাপিয়া, নানাস্থানে বর্গীদের সহিত যুদ্ধ করিতেন বটে, কিন্তু পরে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। সহস্ররাম সিংহের মৃত্যুর পরবৎসর দ্বিগুণ সৈন্য সহ পুনরায় বর্গীরা বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ এবার অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে নিরীহ প্রজাপুঞ্জের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে লাগিল। হুগলী হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত তাহাদের দৌরাত্ম্যে অনেক গৃহস্থের যথা সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়াছিল।

"Less than a hundred years ago it was thought necessary to fortify Calcutta against the horsemen of Behar and the name of the Mahratta Ditch still preserves the memory of the Danger."

সিংহ বংশের তখন যে অবস্থা, তাহাতে তাঁহাদের আত্মরক্ষা করাই কষ্টসাধ্য, সুতরাং সমগ্র হুগলী জেলা রক্ষা অসম্ভব। স্থানীয় ভূম্যধিকারী-গণের মধ্যে কেবল ভাস্তাড়ার সুন্দর সিংহ মহারাষ্ট্রগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া ঐ অঞ্চল হইতে দূরীভূত করিয়াছিলেন, কিন্তু এই যুদ্ধে সুন্দর সিংহ নিহত হন।

বর্গীরা কোন কোন গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছিল, হারাণ গুহের "বর্গীর-পুরাণ" গ্রন্থে আছে,—

"চন্দ্রকোণা মহানাদ আর দিগলনগর।
খিরপাই পোড়ায় আর ত্রিপিনি সহর॥"

কনোজের রাজবংশ।

রাজা হরিচাঁদ ... ৬৩৭ শকাব্দ

|

" যশোব্রহ্ম ... ৬৫২ "

|

" শ্রীদেবশক্তিদেব ... ৬৭৯ "

|

" শ্রীবৎসরাজ দেব ... ৭০২ "

|

" শ্রীনাগভট্ট দেব ... ৭২৭ "

|

" শ্রীরামভদ্র দেব ... ৭৫২ "

|

" শ্রীভোজ দেব ... ৭৭৭ মতান্তরে ৮৩০ শঃ

|

" শ্রীমহেন্দ্র পাল দেব ... ৮০০ "

|

" শ্রীবিনায়ক পাল ... ৮৭৯ "

তৎপরে রাষ্ট্র বিপ্লবের পর রাজা শুক্ল পাল, গোপাল, শশাঙ্ক পাল, জয় পাল, কুমার পাল। ৯৭২ শকাব্দ চন্দ্রদেব। ১০১৯ শকাব্দ গোবিন্দ চন্দ্র। ১০৯০ শকাব্দ বিজয়চন্দ্র পরলোক গমন করেন। ১১১৬ শকাব্দে জয়চন্দ্রকে হত্যা করিয়া মুসলমানরা কনোজ কলুষিত করেন।

কনোজের গুপ্ত সম্রাটগণের অধঃপতন ও মহানাদে গুপ্ত সম্রাটদিগের আত্মীয় রাজা মহেন্দ্র সিংহের অভ্যুদয়ের মধ্যভাগে বাঙ্গলায় কাহারা কি ভাবে রাজত্ব করেন, প্রাচীন পাণ্ড্যক নগর (বর্দ্ধমান জেলায়) কিরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, পাল ও কল্পিত সেনবংশের সহিত সিংহরাজ বংশের কি সম্বন্ধ ছিল, গুহ রাজবংশ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়, অতীত সাক্ষী ইতিহাস আজ পর্য্যন্তও তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। পরস্পর বৈষম্যবাদে জর্জ্জরিত ও প্রপীড়িত হইয়া একতার অভাবে ভারতবর্ষ বিজয়ী মুসলমান জাতির দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপের নিকট মস্তক অবনত করে এবং স্বাধীনতা হারাইয়া চির দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়। সাম্যবাদের মহামন্ত্র বিস্মৃত হইয়া বর্ষভারত জাতীয় অধোগতির চরম সীমায় উপনীত হয়। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দুজাতির স্বাধীনতা অন্তর্হিত হইয়া বিদেশী মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

——:০:——

লুপ্ত পাল রাজবংশ।

মহারাজ রামপাল কতকগুলি ভাড়াটিয়া যোদ্ধা লইয়া, কৈবর্ত্ত জাতীয় রাজদ্রোহী ভীম ও হরির সহিত যুদ্ধ করিয়া বারেন্দ্র (বার + ইন্দ্র) স্থ কৈবর্ত্তরাজ ভীম প্রতিষ্ঠিত ডমরপুরী বিধ্বস্ত এবং মশানে ভীম ও হরির শিরশ্ছেদন করেন।

মহীপাল গৌড়পতি হইয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামপাল ও শূর পালকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে আবদ্ধ করেন।

কাশ্মীরপতি দূরদেশে আছেন, এই সুযোগে প্রভুহত্যা জনিত ক্রোধে অন্ধ হইয়া গৌড়বাসীরা পরিহাসকেশবকে কাড়িয়া লইতে যাইতেছে দেখিতে পাইয়া, তখনকার পূজকেরা পরিহাসকেশবের স্বর্ণমন্দিরের লৌহদ্বার বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন বিক্রমশালী গৌড়ীয়েরা রজতময় রামস্বামী বিগ্রহকেই পরিহাসকেশব ভ্রমে আক্রমণ করিল, এবং তাঁহাকে উৎপাটন পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া ফেলিল। এই সময়ে কাশ্মীর সৈন্যেরা নগর হইতে বাহির হইয়া উহাদিগকে নানাবিধ কঠিন প্রহারে বধ করতঃ চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিল। সেই কৃষ্ণকায় গৌড়বাসীরা কাশ্মীর সেনার হস্তে নিহত হইয়া যখন রক্তাক্ত কলেবরে ভূপতিত হইতে লাগিল, তখন বোধ হইতেছিল—যেন গৈরিকাদি ধাতুর রসে রঞ্জিত অঞ্জন গিরির সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডগুলি খসিয়া পড়িতেছে। তাহাদিগের দেহ নিঃসৃত শোণিত প্রবাহ তাহাদিগের অতুলনীয় রাজভক্তিকে অধিকতর সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। ভাবিয়া দেখদেখি, গৌড় হইতে কাশ্মীর কত সুদীর্ঘকালের পথ!

১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে সহদেব পাল নামে একজন বাঙ্গালী বীর বঙ্গাধিপের সেনাপতি হইয়া দিল্লীর ফিরোজসাহের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। ফিরোজ সসৈন্যে রাঢ় দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের বহু হিন্দু জমিদার ফিরোজসাহের পক্ষাবলম্বন করেন। সহদেব, অবশেষে এক লক্ষ আশী হাজার বাঙ্গালীর সহিত দ্বারবাসিনীর প্রান্তরের রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

দ্রাবিড় ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, দাক্ষিণাত্য রাজ—রাজেন্দ্র চোড় তাঁহার রাজ্যের দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বে চালুক্যপতি জয়সিংহকে পরাজিত করিয়া ইড়টুপাড়ি, বিক্রমপুরের অধিকার ভুক্ত শককর কোট্টম, চন্দ্রবংশীয় ধীরতরকে পরাজয় করিয়া মাণ্ডনি দেশ, ধর্ম্ম পালকে পরাজয় করিয়া দণ্ডভুক্তি (দাঁতন), রণশূরকে পরাজয় করিয়া

দক্ষিণ রাঢ় (?—নগরের নাম নাই!) গোবিন্দ চন্দ্রকে পরাজয় করিয়া বঙ্গালদেশ (বাঙ্গালপুর, হাবড়া জেলা), শঙ্খকোট্টের রাজা মহীপালকে পরাজয় করিয়া উত্তর রাঢ় (নগরের নাম নাই!) এবং নানাতীর্থ পরিশোভিত (বশিষ্ঠ) গঙ্গা পর্য্যন্ত দিগ্বিজয় করেন !!! এই গোবিন্দ চন্দ্র কে?

গোপাল কবে কি সূত্রে রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাও নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায় না। ঐতিহাসিকগণ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গোপাল পালের কাল নির্ণয় করিয়া আসিতেছেন। মুঙ্গেরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে দেব পালের তাম্রলিপি পাওয়া গিয়াছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন—তিনি এই তাম্রশাসনে কোন আদর্শ দেখিতে পান নাই। দেবপাল কোন্ সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন? শত বৎসরের গবেষণা নিষ্ফল হইয়া গিয়াছে,—অদ্যাপি তাহা নির্ণয় হয় নাই।

মদন পালের তাম্রশাসনে "বটেশ্বর স্বামী শর্ম্মণ" লেখা আছে। এই বটেশ্বর কে? কেহই তাঁহার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

কিরূপে পাল রাজগণের রাজত্বের লোপ হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সনাতন হিন্দুধর্ম্মে প্রকৃতি পুঞ্জের সমধিক আস্থা স্থাপনই অনেকে মনে করেন, বৌদ্ধ পালবংশের রাজত্ব বিলোপের প্রধান কারণ। দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত পাল বংশের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল। ইহাতে দক্ষিণাপথের রাজা যথেষ্ট অপমান বোধ করেন।

পাল রাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের দারুণ শত্রু ছিলেন। এদেশে সিংহ রাজবংশ ছিলনা, এই সকল সংস্কারের সৃষ্টিকর্ত্তা কেবল সেই মিথ্যাবাদী ঘটক চূড়ামণিগণই বটেন। প্রকৃত পক্ষে এই সকল কথার কোন মূল্য নাই। পাল রাজবংশের ইতিহাস, সিংহ রাজবংশের সহিত

বাঙ্গলার ইতিহাসের দুইটি উজ্জ্বল অধ্যায়। ভারত বিজয়ী দেবপাল বিজয় কার্য্য সমাধা পূর্ব্বক মুদ্গ গিরিতে স্কন্ধাবার সংস্থাপন করেন। দেবপালের শাসন কালে যশোবর্ম্মা নামক এক রাজা বিহারের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। নারায়ণ পাল—কলসপোত নামক গ্রামে সহস্র দেব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া "ভাগবত শিব ভট্টারক" ও "পাশুপত আচার্য্য" কে স্থাপন করিয়াছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরের দ্বারদেশে রাজা মহীপালের নাম লিখিত আছে। বারানসী ও বিহার প্রদেশে অনেকগুলি পাল নামীয় নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

রাজা মহীপালের সময় মথুরাপুরে (?) রাজা সোমেশ্বর সিংহ (মৌদ্গল্য গোত্রীয়) রাজত্ব করিতেন। তিনি সিংহ দেবের পৌত্র ছিলেন।

পাল রাজগণ কে কোন্ বৎসরে সিংহাসন আরোহণ করেন, তাহা স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই।

পাল রাজগণের কোনও শাসন পত্র পূর্ব্ববঙ্গে এপর্য্যন্ত আবিস্কৃত হয় নাই। বুড়ীগঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে কোনও কালে পালবংশের আধিপত্য বিস্তারিত হয় বলিয়া জানা যায় নাই।

শাসনপত্র হইতে জানা গিয়াছে যে, গোপাল ৭৩৭ শকাব্দের বহু পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। মুঙ্গেরের শাসনপত্রে দেবপাল আপনাকে ধর্ম্মপালের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ভাগলপুরের তাম্রশাসনে দেবপালকে ধর্ম্মপালের ভ্রাতা বাক্‌পালের পুত্র বলা হইয়াছে। ভাগলপুরের তাম্রশাসন দেবপালের পিতৃব্য জয়পালের পৌত্র নারায়ণ পাল প্রদত্ত। ভাগলপুরের তাম্রশাসনে আছে যে,—
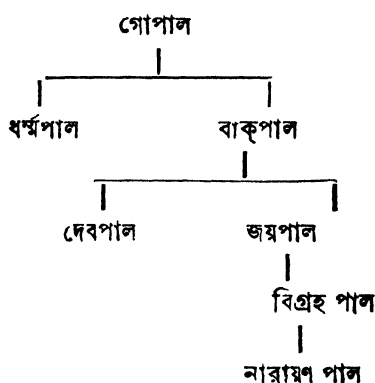
জয়পাল তাঁহার অগ্রজ দেবপালের আদেশে উড়িষ্যা ও কামরূপ প্রভৃতি দেশাধিপতিকে জয় করিয়াছিলেন। মুঙ্গেরের শাসনপত্রে দেবপাল পুত্র রাজ্য পাল। মঙ্গলবাড়ীর স্তম্ভের নিকটে হর গৌরীর একটি মন্দির আছে। প্রাচীনকালে সকল দেবমন্দিরের নিকটেই এক একটি গরুড়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ছিন্নশীর্ষ তাল তরুর ন্যায় কেবল স্তম্ভটি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্তম্ভগাত্রে রাজা সুরপাল ও শ্রীকণ্ঠ সিংহের নাম আছে। রাজ্য পালকে আমগাছীর তাম্রশাসনে স্পষ্টাক্ষরে নারায়ণ পালের পুত্র লেখা রহিয়াছে। বিগ্রহ পালের পুত্র মহীপাল। মহীপালের পুত্র ন্যায় পাল। সর্ব্বশেষে বিগ্রহ পালের নাম অঙ্কিত রহিয়াছে। মনে হয়, মহী পালের পর পালবংশের অধিকার লোপ পাইয়াছিল, কিন্তু আমগাছীর তাম্রশাসনে মহীপালের পর ন্যায় পাল ও বিগ্রহ পাল নরপতি দ্বয়কে বঙ্গদেশের সুবর্ণ রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাই। সুতরাং মহীপালকে ন্যায় পালের পুত্র বিগ্রহ পালের পরবর্ত্তী রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ন্যায় পালের শাসন কলে শূদ্রকের পৌত্র বিশ্বাদিত্যের পুত্র সোম সিংহ নামক জনৈক সামান্য ভূম্যধিকারী গয়ায় বিষ্ণুপদ মন্দিরের অনতিদূরে হরিহর মূর্ত্তি স্থাপনার্থে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া-

ছিলেন। একজন মহীপালের সময় ক্ষেমীশ্বর রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ও সম্রাট হরিশ্চন্দ্রের পৌরাণিক উপন্যাস অবলম্বন করিয়া "চণ্ডকৌশিক নাটক" রচনা করিয়াছিলেন। শারনাথ নগরে আর এক মহীপাল ও বসন্ত পাল এবং তাঁহার ভ্রাতা স্থির পালের নামাঙ্কিত একখণ্ড প্রস্তর লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ১৩৬২ শকাব্দের বা ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের পর আর বিহার প্রদেশে পাল বংশের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

বারাণসী ও মগধে যে সকল পাল নরপতি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের তালিকা—১। বসন্ত পাল, ২। স্থির পাল, ৩। মদন পাল, ৪। রাম পাল, ৫। গোবিন্দ পাল, ৬। ভূমি পাল, ৭। কুমার পাল। ৮। লক্ষণ পাল, ৯। চন্দ্র পাল, ১০। নয়ন পাল, ১১। সিন্ধু পাল, ১২। অভয় দেব, ১৩। মল্লদেব, ১৪। কাশীরাজ, ১৫। সিংহ দেব, ১৬। ভানুদেব, ১৭। সোমেশ্বর, ১৮। ভৈরব চন্দ্র, ১৯। দেববাম (১৩৬৭ শকাব্দ)। শাসনপত্র হইতে এই বংশাবলী প্রস্তুত করা হইল—১। বিগ্রহ, ২। মহীপাল, ৩। চন্দ্রদেব, ৪। মদন পাল,, ৫। গোবিন্দ চন্দ্র, ৬। বিজয় চন্দ্র, ৭। জয়চন্দ্র। সেই সকল শাসনপত্রে ইঁহারা গাহড়বাল রাজবংশ বলিয়া লিখিত হইয়াছে।
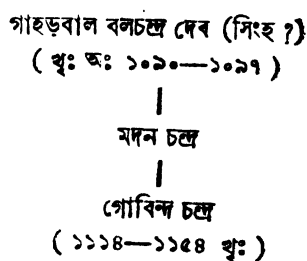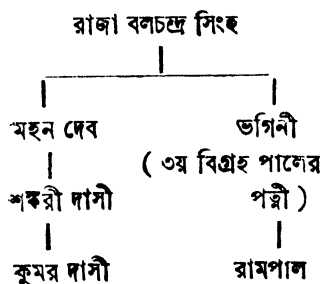
মহন দেব (মথন) পরলোক গমন করিয়াছেন শুনিয়া মুদ্গগিরিতে অবস্থিত রাজা রামপাল গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করতঃ অনুতাপ করিয়াছিলেন।

কুমার পাল বৈদ্য দেবকে ১১১২ খৃষ্টাব্দে কামরূপের রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আবার আজকালকার ঐতিহাসিকগণের আদৃত বিজয় সেনের তাম্রশাসনের অক্ষরের সহিত মিলাইলে কথাটা ঠিক বলিয়া মনে হয় না।

মগধে (বিহারে বা প্রাচীন পেলাসা গয়ায়) আবিস্কৃত শিলালিপিতে মহেন্দ্র পাল এবং গোবিন্দ পাল নামক আরও দুইজন নরপালের পরিচয় পাওয়া যায়। শিলালিপিতে এবং তাম্রশাসনে প্রত্যেক পাল-নরপালের নামের অন্তে "দেব" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'দেব' শব্দ দেখিয়া দক্ষিণ রাঢ়ীয় 'মূর্খ ও দরিদ্র কুলীন কায়স্থগণ' মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবকে শোভাবাজারের রাজবাটীতে গোপালের বংশ বলিয়া খোসামোদ করিতেন।* যাহাহউক যে দুইখানি শিলালিপিতে মহেন্দ্র পালের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার কোনখানিতেই মহেন্দ্র পালকে 'মহেন্দ্র পাল দেব' বলা হয় নাই। সুতরাং ইহাতে মনে হয়, মহেন্দ্র পাল অন্য কোন বংশীয় হইবেন।

আমাদের ইতিহাসে এই পর্য্যন্ত আবিস্কৃত হইয়াছে যে, পালরাজ বংশীয় নরপতিগণ কে কোন্ বৎসর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই। কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, ৭৩০ শকাব্দে কিম্বা নিকটবর্ত্তী সময়ে পালদিগের শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। অনুমান দশগড় বা বর্ত্তমান দশঘরায় তাঁহাদের প্রথম অভ্যুদয় হয়। শকাব্দের দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলাদেশে পালদের শাসন বিলুপ্ত হইয়াছিল। দীপঙ্করের নরপালের সময় সম্বন্ধে গণ্ডগোল হইতেছে।

* এইরূপ উক্তির আপত্তি করায় ঘটক বাঞ্ছারাম ঘোষকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া লাথি মারিয়া মহারাজ নব কৃষ্ণ দেব সভাস্থল হইতে বাহির করিয়া দেন।

রাজা বীরভুজ

বৰ্দ্ধমান জেলার গাঙ্গুর গ্রামে রাজা বীরভুজ রাজত্ব করিতেন। মৌদ্গল্য গোত্রীয় সিংহবংশের কুলজী মতে তিনি ৮০০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ভগ্ন রাজ প্রাসাদের নানারূপ চিহ্ন বিদ্যমান আছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এইখানে পালবংশের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মন্দির ছিল। এখানে আসিয়া নবীনচন্দ্র সিংহ একটি প্রাজ্ঞ পারমিতা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। দেবী বিকশিত শতদলে আসীনা। যুবতী নারী বিশ্বমাতৃ রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন। গাঙ্গুর গ্রামের এই বিগ্রহ কোন্ রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া কতকাল পূজা পাইয়াছিলেন, কে বলিতে পারে? স্বাধীন বঙ্গ নৃপতির শিরস্থিত মণি মুকুটের জ্যোতিতে কতবার ইঁহার চরণ নখর উজ্জ্বল হইয়াছে, কে বলিতে পারে? কত নর নারীর আনন্দ কোলাহলে কত পুরোহিতের করধৃত দীপাবলীতে ইঁহার আরতি হইয়াছে, কে বলিবে? নির্ম্মল কুসুম যেরূপ ছিন্নদল হইয়াও তাহার স্বর্গীয় সুষমাটুকু রক্ষা করে, উন্মত্ত মুসলমানের কৃপাণে বিক্ষত হইয়াও সেইরূপ এই মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব দেব হাস্যটুকু এখনও সম্যক্ লোপ পায় নাই।

সেন বংশ।

দনুজ মাধব বা দনৌজা মাধবকে সেন বংশ বলিয়া যে একটা কথা শুনা গিয়া থাকে, তাহা আর মানিয়া লওয়া যায় না।

ধোয়ী মেঘদূতের অনুকরণে পবনদূত রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যের নায়িকা কুবলয়বতী নবম গন্ধর্ব্বকন্যা চন্দনাদ্রি বা মলয় পর্ব্বত হইতে

মেঘদূতের মেঘের ন্যায় মলয় পবনকে গৌড় রাজ্যের রাজধানী বিজয়পুর বা নবদ্বীপে তাঁহার প্রণয়ী রাজা লক্ষণ সেনের নিকট পাঠাইয়াছেন। তাহাতে পবন যে যে স্থান দিয়া যাইবে, তাহার কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে।

"সময় প্রকাশ" নামক গ্রন্থোল্লিখিত এই শ্লোক হইতে রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র ১০১৯ শক=১০৯৭ খৃষ্টাব্দে "দান সাগর" রচনার কাল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

"নিখিল চক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লাল সেনেন পূর্ণে
শশিনব দশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ॥"

"গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্বে" আছে যে, বল্লাল সেনের পিতা সুখ সেন ৯০৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারম্ভ করেন।

ডাক্তার হর্ণলি বল্লালের পিতা বিজয় সেনকেই আদিশূর বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বীর সেনকে আদিশূরের নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বল্লাল আদিশূর হইতে একাদশ পুরুষের নিকটবর্ত্তী হইলে তৎপিতা বিজয় সেন অথবা বীর সেন ইঁহাদের কেহই আদিশূর হইতে পারেন না। আদিশূর কে?

রাঢ়ীয় ঘটকরাজ হরি মিশ্রের কারিকা লুপ্ত হইয়াছে। লাক্ষণেয় নাম তাম্রশাসনে নাই। লাক্ষণেয় নাম কুলশাস্ত্র গ্রন্থে নাই। লাক্ষণেয় নাম বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে না থাকিলে, এ দেশের লোকে কদাপি তাহা শিখিত না।

প্রেম এমনই পদার্থ যে, উহার একটু আঁচ গায়ে লাগিলেই, বৃদ্ধ বাল্মীকির ধ্রুপদের বীণাও বাঁশীর সুরে খেয়ালে তান ধরিতে ভালবাসে।

"ঘটকদিগের গ্রন্থে ক্রমে ক্রমে এত অধিক পরিমাণে মিথ্যাকথা প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, তন্মধ্য হইতে খাঁটী সত্য বাহির করিয়া লওয়া নিতান্ত দুরূহ।"

"কুলাচার্য্যগণ প্রায় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে,

গৌড়েশ্বর আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতি রাজা বীর সিংহের নিকট প্রার্থনা করিয়া ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। এই বীর সিংহের অনুসন্ধান জন্য আমরা প্রতাপশীল প্রভাকর বর্দ্ধনের রাজ্যারম্ভ কাল ৪৯৭ শকাব্দ হইতে মুসলমানদিগের পবিত্র কনোজ অধিকার পর্য্যন্ত (১১১৬ শকাব্দ) কনোজ রাজবংশাবলী প্রস্তুত করিয়াছি। কিন্তু এই দীর্ঘকাল মধ্যে আমরা বীর সিংহ নামে একজন রাজাকেও কনোজের সিংহাসনে বা সিংহাসনের পার্শ্বে দেখিতে পাইতেছি না।"

"অদ্যাপিও ক্রিয়া কলাপ উপলক্ষে ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। কিন্তু তৎসহ ভৃত্যের নিমন্ত্রণের প্রয়োজন দেখা যায় না। এই কথা দ্বারাই অনুমিত হইতেছে যে, কুলজী গ্রন্থের এই সকল বর্ণনা নিতান্ত অস্বাভাবিক ও কাল্পনিক।"

"আদিশূর বৌদ্ধদিগকে জয় করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন।" কিন্তু কোথা হইতে কিরূপে আসিয়া গৌড়াধিকার করিয়াছিলেন, তাহা কেহই বলেন নাই!

"ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাস যাহা সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অপ্রামাণ্য, অযৌক্তিক ও বিশ্বাসের অনুপযুক্ত।"

—ঐতিহাসিক প্রবর ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ।

(ত্রিপুরার 'রাজমালা' প্রণেতা)

"বৈদ্যগণ আপনাদিগের কুলজীগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, আর কায়স্থ-দিগের কুল-বিবরণ লিখিবার ভার ব্রাহ্মণ ও ঘটকদিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল।" নব্য ভারত।

ঘটক চূড়ামণি দেবীবরের মতানুসারে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভট্ট নারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, শ্রীহর্ষ ও ছান্দড় আদিশূরের সময় কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে আসেন নাই, তাঁহাদের পিতৃপুরুষ আসিয়াছিলেন। অথচ কায়স্থ-কুলজী লেখকগণ তাঁহাদের সহিতই পঞ্চ কায়স্থের আগমন

লিখিয়াছেন, সুতারাং এই সকল বর্ণনা সঙ্গত হইতেছে না। "গুহ" শব্দ শ্রবণে আদিশূরের সভাসদ্‌বর্গ ত্রপাটী দন্ত বাহির করিয়া হাসিয়াছিলেন! ইহা লিখিতেও কি মিথ্যাবাদী ঘটকদিগের লজ্জা বোধ হয় নাই!! গুহ নাম কি তাঁহার সভাসদগণ কখনও শুনেন নাই?

পুরন্দর খাঁ বসু ১৩ পর্য্যার সময় গুহ ও সিংহবংশের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে কুল নষ্ট হয়। ঘটকগণ তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যজ্ঞার্থে কান্যকুব্জ হইতে গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও তৎসহ পঞ্চ শূদ্র কায়স্থের (বৈদ্য কোথায় ছিল?) আগমন ঘটকদিগের কল্পনা প্রসূত মিথ্যা বাক্য।

সেন ও শূরবংশের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে গিয়া, কায়স্থ ও বৈদ্যদের অর্থলোভে অনেক ব্রাহ্মণ সন্তানও বাঙ্গলার ইতিহাসে প্রচুর উপকরণ নষ্ট ও গোপন করিয়াছেন। আর এক দিকে নূতন রাজা, মহারাজ, জমিদার বংশীয়েরা নিজেদের প্রাচীনত্ব দেখাইতে পুরাতন ঘটক গ্রন্থাদি নষ্ট করিয়া ফেলিয়া সহস্র সহস্র জাল কথায় ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব বলিয়াছেন,—"বৌদ্ধ পালবর্গকে পরাজয় করিয়া খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ আদিশূরের অভ্যুদয় হইয়াছিল।"

৺ নবীনচন্দ্র সিংহ বলিয়াছেন,—"বঙ্গজ সমাজভুক্ত মিত্রবংশধর তৃতীয় পুরুষে বল্লালী নিয়মের অধীন হন। আর দক্ষিণ রাঢ়ীয় মিত্রবংশধর অষ্টম পুরুষে বল্লালী কুল স্বীকার করেন। একব্যক্তির তৃতীয় এবং অষ্টম বংশধর এককালে জীবিত থাকা কখনও সম্ভবপর নহে। ১১৭২ শকাব্দে হিন্দুরাজত্বের অবসান হইয়া মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। বঙ্গজগণ বলেন কৌলীন্য বিধি বল্লাল সেন রামপালে থাকিয়া সংস্থাপন করেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয়গণ অনেক দূরে থাকিতেন।"

৺ ব্রজমোহন সিংহ ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন,—

"মহারাজ হরিশ্চন্দ্র করিয়া যতন।
পঞ্চশাখি বঙ্গদেশে করিলা স্থাপন॥
পঞ্চ জনের উনষাটি হইল নন্দন।
গাঁই আখ্যা দিয়া নৃপ লোকান্তর হন।
শাখায় শাখায় তার বেড়ে গেল ডাল।
অনবস্থা দেখি তার বিজয় ভূপাল॥
তিন অংশে সবাকারে বিভাগ করিয়া।
অর্পিলা মর্য্যাদা রাজা গুণ বিচারিয়া॥"

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ও নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব প্রভৃতির ঐতিহাসিক রাজা বিজয় সেন, চোলরাজ কুলতুঙ্গের সেনাপতি বা আত্মীয়রূপে বাঙ্গলার রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। স্বমতের পরিপোষক প্রমাণ যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ না করিয়া চোলরাজগণের বিজয় কাহিনী শাস্ত্রী মহাশয়ও কেন বর্ণনা করিতে গেলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ত্রিপুরার রাজমালা প্রণেতা সুপণ্ডিত কৈলাসচন্দ্র সিংহও সেনবংশের সম্বন্ধে অপ্রমাণিত, অবিশ্বাস্য ও অতিরঞ্জিত কথার অবতারণা দ্বারা কিরূপে যে আপনার মত কবিকল্পনার সাহায্যে ঐতিহাসিক তত্ত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিনা।

রমাপ্রসাদ চন্দ একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁহার একখানি বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিবার উপকরণ বা মাল মসলা না থাকুক, তথাপি তিনি বলিয়াছেন,—"কুলপঞ্জিকা বা ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন, আর কোথায়ও আদিশূরের সময়ের কোন চিহ্নই এখনও পাওয়া যায় নাই।"

একজন ঐতিহাসিক লেখক সেনবংশের ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করিতে যাইয়া বলিয়াছেন যে, "সেনবংশীয়েরা সিংহ উপাধি ব্যবহার করিতেন।" কিন্তু গুপ্তরাজবংশীয় কুমারগুপ্ত—মহেন্দ্র সিংহ বলিয়া মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে না কি?

ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গলার ইতিহাস" ও পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "ভারতবর্ষের ইতিহাস"—বাঙ্গালীকে বড় করিতে পারে নাই।

"কল্পনা গাহিল কাণে কোন্ পুরাকালে।
ফুটিল বিরল ডালে, অতি অন্তরালে॥"

——:o:——

বল্লাল চরিতম্।

১৩০০ শকাব্দে বা ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে কিম্বা ৭৮০ হিজরী অব্দে পাঠান সামসউদ্দীনের পুত্র সেকেন্দর সাহ বাঙ্গলা দেশ লুণ্ঠন করিতেন; সুতরাং ১৩০০ শকাব্দে বল্লাল সেনের গুরু গোপাল ভট্ট দ্বারা মূলগ্রন্থ রচিত হওয়ার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কলিকাতার (ও মহানাদের) যুঙ্গী বা যুগী কুলতিলক পদ্মচন্দ্র নাথের পুত্র "বাবু চন্দ্রকুমার নাথ" (১২৭৯ বঙ্গাব্দে) এই গ্রন্থের সত্ত্বাধিকারী। যুঙ্গী হিতৈষী অর্থ পিশাচ—ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তত্ত্বানভিজ্ঞ কোন আধুনিক ভট্ট দ্বারা এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগরের রাজবংশের স্থাপনকর্ত্তা ভবানন্দ মজুমদার (সমাদ্দার) হুগলীর কানুনগুই দপ্তরে কার্য্য করিয়া মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং তৎসঙ্গে সমাদ্দার উপাধি ত্যাগ করেন।

ব্রাহ্মণ ভবানন্দের দ্বারায় কত পুরাতন বংশের সর্ব্বনাশ সাধন (সম্পত্তি হস্তগত) হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস লিখিত হয় নাই। বর্দ্ধমানের কর্পূরবংশও অনেক বনিয়াদি বংশের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। ১৫২৮ শকাব্দে ভবানন্দ ১৪টি পরগণা জমিদারী সত্ব ও চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহা ক্ষিতীশ বংশাবলী ছাড়া, এই ছেঁড়া কথাটাও অন্যত্রে পাওয়া যায় না। এই ভবানন্দের প্রায় এক শতাব্দী পর তাঁহার উত্তর পুরুষগণ "রাজা" (পরবর্ত্তীকালে মহারাজা) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং ১৫০০ শকাব্দে "নবদ্বীপাধিপতির অনুমত্যানুসারে 'বল্লাল চরিতম্' গ্রন্থের "পরিশিষ্ট রচিত" হওয়ার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা। সমালোচকের বিচারে উহা জাল বলিয়াই বিবেচিত হইবে। মূলগ্রন্থ পাঠ করিয়া নবীনচন্দ্র সিংহ বলিয়াছেন—"ইহাতে বল্লাল চরিত্র বর্ণনা কিছুই নাই।" প্রথম খণ্ড মহানাদ গ্রন্থে ৪৬ পৃষ্ঠায় বল্লাল চরিত সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিয়াছিলাম।

"যে সময়ে রাজনগরের রাজা রাজবল্লভ সেন (নবাব সিরাজ-উ-দৌলার কর্ম্মচারী) দশ লক্ষটাকা দ্বারা ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদিগকে বাধ্য করিয়া সেন রাজগণকে বৈদ্য বা বদ্দী ও আপনাকে তদ্বংশধর অবধারণ করিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই বঙ্গীয় বৈদ্যগণ উপবীত ধারণ পূর্ব্বক অম্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন।"　　　—কৈলাস চন্দ্র সিংহ।

"বৈদ্য জাতির স্বপক্ষে স্বজাতির কুলজী গ্রন্থ ভিন্ন আর কি (যে বৈদ্য জাতির মতে সেন রাজবংশ বৈদ্য ছিলেন) বক্তব্য আছে, জানিনা।"

—ত্রৈলোক্য নাথ ভট্টাচার্য্য।

অনেকে সুষেণ, সুরসেনকে লক্ষণ সেনের উত্তর পুরুষ বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহাদের লেখনীতে উল্লেখ ব্যতিত ইঁহাদের কোন প্রামাণিক ঐতিহাসিক বিবরণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

শাণ্ডিল্য গোত্র ক্ষিতীশ হইতে অধস্তন চতুর্দ্দশ পুরুষ * সঙ্কেত, সঙ্কেতের বৃদ্ধ প্রপৌত্র সর্ব্বানন্দের পুত্র মেল প্রবর্ত্তক ঘটক দেবীবর বিশারদ। দেবীবরের পুত্র বল্লভ ও চন্দ্রকেতু।

"দেবীবর সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে॥
সেই ছোঁড়া মনে করে কুল করে দাগ।
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥
দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় সার॥"

মেলমালা গ্রন্থ।

"দেবীবরের দ্বারায় সর্ব্বদ্বারী বিবাহ রহিত হয়। এই বিবাহ প্রচলিত থাকিলে, কন্যাদায়ে কাহাকেও এত ব্যতিব্যস্ত ও বিপদগ্রস্ত হইতে হইতনা!!"—আর্য্য বংশাবলী।

ভরদ্বাজ গোত্র তিমিমেধার বংশে উৎসাহ মুখোপাধ্যায় হইতে অধস্তন ৮ম পুরুষ হরির পুত্র কামদেব ও যোগেশ্বর। কামদেবের শ্রীধর, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি ১০ পুত্র। যোগেশ্বরের পুত্র জানকী নাথ, তৎপুত্র রামভদ্র ইত্যাদি। পণ্ডিত যোগেশ্বর ৩৩৮ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা।

দেবীবর ঘটক বলিয়াছেন,—"শশকের শৃঙ্গ যেরূপ, আকাশের কুসুম যেরূপ, বন্ধ্যার সন্তান যেরূপ, যোগেশ্বরের কুলও সেইরূপ।" যোগেশ্বর খড়দহ মেলের প্রকৃতি। দেবীবর পুনরায় তাহাকে কুলমর্য্যাদা প্রদান করেন, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত।

---

* পুরোহিত ও অনুশীলন নামক মাসিক পত্রে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশাবলীর মধ্যে ভট্ট নারায়ণের প্রপৌত্রের নাম "সৌভীম" দেখিতে পাই। সুবুদ্ধি যদি সৌভীম হন, তাহা হইলে এক পুরুষ বাড়িয়া যায়। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের বংশাবলীতে ভট্টনারায়ণের প্রপৌত্রের নাম বিবুধেয়। ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র জন্মে।

দেবীবর কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মর্য্যাদা শ্রেণীবদ্ধ করেন। দেবীবরের মতে পঞ্চদশ শকের শেষে কৌলিন্য মর্য্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়। বর্ত্তমান রাণাঘাটের নিকটে দেবীবরের বাসস্থান ছিল। ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে দুইজন দেবীবর ঘটক ছিলেন।

রাজা শালিবাহন।

পূর্ব্বকালে মল্লভূমিতে শালিবাহন নামক রাজা দ্বারকেশ্বর নদতীরে বাস করিতেন। কিন্তু সে কতকালের কথা তাহা কেহ বলিতে পারে না। শালিবাহনের ভগ্নস্তূপ খনন করিলে প্রাচীন বঙ্গের অনেক তথ্য আবিস্কৃত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ইহাতে কে হস্তক্ষেপ করিবে? কেবল প্রতিধ্বনি বনভাগ বিকম্পিত করিয়া উত্তর দিতেছে—"কে হস্তক্ষেপ করিবে?" শকাব্দের প্রচলনকারী দাক্ষিণাত্যের রাজা শালিবাহন, অথবা বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্ত্তী প্রতিষ্ঠান (মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন রাজধানী) নগরীর প্রবল পরাক্রান্ত রাজা সাতবাহন (সিংহ বহনকারী), যিনি কলাপ ব্যাকরণ রচয়িতা গুরু শর্ব্ব বর্ম্মাকে দাক্ষিণাত্যের নর্ম্মদা তীরস্থ বরুকচ্ছ (বর্ত্তমান বরোচ) নামক গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত ইঁহার কোন সংস্রব নাই। মল্লভূমির শালিবাহন যে সমৃদ্ধশালী নরপতি ছিলেন, তাহা তাঁহার মন্দির ও ভগ্নস্তূপময় প্রাচীন রাজপ্রাসাদ প্রমাণ করিতেছে।

শ্রীহর্ষ।

তিথিমেধার পুত্র শ্রীহর্ষ ও নৈষধকার শ্রীহর্ষ স্বতন্ত্র বক্তি। হর্ষদেব নামে একজন কনোজের রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কাশ্মীরেরও একজন শ্রীহর্ষ রাজা ছিলেন। কনোজের শ্রীহর্ষ ১০৩২ খৃষ্টাব্দে ছিলেন। থানেশ্বরের রাজা শ্রীহর্ষ (বর্দ্ধন) ও হর্ষ দুইজন ছিলেন, ৬৫০ খৃষ্টাব্দ। ভারতের ইতিহাসে হর্ষ ও শ্রীহর্ষ নামে এগার জন রাজার নাম পাই।

দক্ষিণ রায়।

নবাব হোসেন সাহের সময়ে দক্ষিণ রায় যশোহরের ব্রাহ্মণনগরে স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। হোসেন সাহ তাঁহার বীরত্ব-প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিবার মানসে একদল পাঠান ও হিন্দু জমিদারবর্গ বাহিনী প্রেরণ করেন। তাঁহাকে নষ্ট করিতে ব্রাহ্মণ বিষ্ণুদাস যে বিশ্বাস ঘাতকতা করিলেন, তাহার কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত না থাকিলেও তাহাতেই দক্ষিণ রায়ের বীরত্ব গরিমা চিরতরে বিলীন হইয়া যায়। সেই যুদ্ধে দক্ষিণ রায়ের শোণিতে বঙ্গমাতার বক্ষ রঞ্জিত হইয়া গিয়াছিল।

রাজা মধু সিংহ।

১৫৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে পালাম দুর্গ অবরোধ করিলে রাজা মধু সিংহ মোগলরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদ হইলেন। তিনি একদল সৈন্য লইয়া মহারাজ মানসিংহের সহিত উড়িষ্যার বিদ্রোহ দমনে ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অধীনে এক হাজারী মনসবদার রূপে খুব সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন।

সেনাপতি সহদেব সিংহ।

১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে সহদেব নামে একজন বাঙ্গালী বীর বঙ্গাধিপের সেনাপতি হইয়া দিল্লীর ফিরোজ সাহের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন। ফিরোজ সসৈন্যে রাঢ়দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু জমিদার ফিরোজ সাহের পক্ষাবলম্বন করেন। সহদেব অবশেষে একলক্ষ আশী হাজার বাঙ্গালীর সহিত রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করেন। ইনি আমুলিয়া—সিংহগড়ের রাজা বসুদেব সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। ১৩২০ খৃঃ লক্ষণাবতী, সপ্তগ্রাম, সলিমাবাদ, সুবর্ণগ্রাম

মান্দারণ লইয়া রাজা বসুদেব সিংহ বাঙ্গলাদেশ গঠিত করেন। জৈন প্রস্তাপনায় এই মিলনের সূচনা দেখা যায়। বৈদেশিক মুসলমানগণ ও বিশ্বাসঘাতক স্বদেশবাসীর বিশ্বাস ঘাতকায় লক্ষণাবতী (বর্ত্তমান বীরভূম জেলা বলিয়া মনে হয়) জয়ের ফলে এই মিলন সুদৃঢ় হইতে পারে নাই।

রাজা গঙ্গাধর সিংহ।

রাজবাড়ী নামক জঙ্গলাবৃত স্থানে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ ও তত্তুল্য প্রশস্ত পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া প্রাচীন কীর্ত্তি সমূহের বহু নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া দর্শকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। তন্মধ্যে আবার কোন কোন অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিখা দ্বারা বিভক্ত। আমুলিয়ার সিংহীপোঁতা প্রায় এইরূপ। রাজা গঙ্গাধর সিংহ প্রায় ১২৩০ খৃষ্টাব্দে করতোয়া তটস্থ মহাপীঠ ক্ষেত্রের উত্তরাংশে বৃহৎ রাজপুরী সম্বলিত কমলাপুরী নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার দক্ষিণাংশের পূর্ব্বভাগে দুর্গ ও পশ্চিমাংশে অপর্ণা দেবীর গুল্‌কাপুরী মনোরম সৌধরাজিতে সুশোভিত করেন। মহানাদের নিকটে লুপ্ত নির্ঝরপুর নামে এক প্রাচীন নগরীতে রাজা গঙ্গাধর সিংহ স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার বংশধরগণ বগুড়া জেলার অনেকগুলি গ্রামে গড়খাত বাটীতে বাস করিতেন, এইরূপ শুনা যায়। মেলকারী নামক একটি স্থানে সুবৃহৎ জলাশয় ও দুর্গের পরিচিহ্ন এখনও নয়ন গোচর হয়। নিকটস্থ 'গগণাবুড়ী' নামক বৌদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের অধিকৃত স্থান বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজা গঙ্গাধর সিংহের প্রতিষ্ঠিত একটি মঠ আছে। মেলকারীর পশ্চিমে পদুমপুরের গড়। এই স্থান জঙ্গলময়। গড়ের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। পদুমপুরের দক্ষিণে প্রায় একক্রোশ দূরবর্ত্তী সলদা গোকুলনগর গ্রামে পুষ্করিণী খনন কালে কারুকার্য্য-খচিত প্রস্তর নির্ম্মিত অট্টালিকা, সুবৃহৎ ইন্দারা প্রভৃতি ধ্বংসপ্রাপ্ত মহানগরীর অতীত গৌরবের

চিহ্ন সকল দৃষ্টি গোচর হয়। মুসলমানদের দ্বারায় এই সকল পবিত্র স্থান নষ্ট হয়। মল্লভূমির মধ্যে, গড়বেতার গড়, ডোমনীর গড়, ও লাউগ্রামের গড় আছে। টেঙ্গার তলার দুর্গের যে সকল ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান, তাহাতে তাহা অতি ক্ষুদ্র দুর্গ ছিল বলিয়া বোধ হয়। নদীয়া জেলাস্থ বগুলা গ্রামের সিংহগণ তাঁহার বংশধর বলিয়া থাকেন।

রাজা বীরসিংহ।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গিয়াসউদ্দিন ইয়ুজ লখ্‌নোর লুণ্ঠন করে। তখন মল্লভূমির অধীশ্বর ছিলেন—রাজা বীরসিংহ। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সামলাবাদ ধ্বংসের পর দিনমণি সিংহের কোন বংশধর পশ্চিমাঞ্চলের সুরক্ষিত দুর্গ লখ্‌নোরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন (১৩২৪-৫১ খৃঃ)।

রাজা বীর সিংহের স্ত্রীকে কবিশেখর "কালিকা মঙ্গলে"—কুন্তী নামে অভিহিত করিয়াছেন। বররুচি ও কাশীনাথ ইঁহার শীলাবতী নাম দিয়াছেন।

"লোক লাজে বীর সিংহ বলে মার মার।
দক্ষিণ মশানে মাথা হানরে চোরার॥"

* * *

"মাণিকা নগরে রাজা শ্রীগুণ সাগর।
স্মরণ করয়ে তার কুমার সুন্দর॥
বীরসিংহ নৃপতির কন্যা বিদ্যামতী।
লোকমুখে শুনিলেক বড় রূপবতী॥
বিদ্যারে করিতে বিভা তাহার কারণ।
তেঞি সে সুন্দর করে তোমারে স্মরণ॥"

মধুকুল্য গোত্রীয় সিংহবংশ কতকাল বর্দ্ধমানে রাজত্ব করেন, এবং কি কারণে তাঁহাদের রাজত্বের অবসান হয়, ইহা এখনও জানা যায় নাই।

পাঠকেরা মনে রাখিবেন, খৃঃ ৮ম শতাব্দীর শেষাংশ, ৯ম শতাব্দী ও ১০ম শতাব্দীর প্রথমাংশ, অথবা ৬ষ্ঠ হইতে ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছয়শত বৎসর 'তিমির যুগ' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের লোপাপত্তির প্রবল আরম্ভ। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই সিংহপুর রাজ্য বাঙ্গলার পলি মৃত্তিকায় অদৃশ্য হইলে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে কাল্পনিক ইতিহাসের অবতারণা হয়।

বাঙ্গলার মাটীতে মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র রায়ের সভায় বিদ্যা সুন্দরের ন্যায় অশ্লীল পুস্তক সমাদৃত হইয়াছিল!

রাজা গোবিন্দ দত্ত।

গঙ্গার পূর্ব্ব পারে চরভূমিতে কালীদেবীর সন্নিকটে চারি সহস্র কল্যব্দে গোবিন্দ দত্ত (ভরদ্বাজ গোত্রীয়) নামক একজন রাজা, প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাসাগর তীর্থ যাত্রা উদ্দেশে আগমন করেন। এই কায়স্থ রাজা দেবীর আদেশ অবগত হইয়া পারীন্দ্র গ্রাম হইতে নানাবিধ ধন রত্ন আনয়ন করিয়া সুরধুনীতটে বসতি করিলেন। এই রাজা যে স্থানে বসতি করিয়াছিলেন, তাহার নাম গোবিন্দপুর। গোবিন্দপুরাদি গ্রাম ভট্টপল্লী, কালীদেবীর নিকটস্থ শৃগালদহ বা শিয়ালদহ ইত্যাদি পরস্পর সংলগ্ন মৌজা। কবিরাম দিগ্বিজয় প্রকাশে কিলকিলা বিবরণ মধ্যে লিখিয়াছেন—

"গোবিন্দ পুরংবৈ সর্ব্বং তথাহি ভট্টপল্লিকম্।
কালীদেব্যা সমীপে চ শৃগালদাদিকং নৃপঃ॥"

৪০০০—৩১০১=৮৯৯ খৃষ্টাব্দ পাওয়া যায়। অথবা কবিরাম ১৬০০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ছয়শত বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দপুর স্থাপিত হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলায় একটি গোবিন্দপুর, ভুরশূট পরগণায় গড় গোবিন্দপুর ও অন্যান্য জেলায় ঐ নামে গ্রাম দৃষ্ট হয়।

ময়ুরভঞ্জ রাজা।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এই ময়ুরভঞ্জ রাজ্যে ময়ুরধ্বজ উপাধি-ধারী এক আদিম জাতীয় রাজার অধিকারে ছিল। ৫৯৩ খৃঃ অব্দ হইতে বর্ত্তমান ভঞ্জবংশ ইহাতে রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। জয়পুর রাজবংশের জয়সিংহ নামক জনৈক ক্ষত্রিয় (ইঁহাদের বংশে গোত্র নাই, অথবা বলিতে চাহেন না) আদি সিংহ ও জ্যোতি সিংহ নামক স্বীয় তনয়দ্বয় সমভিব্যাহারে জগন্নাথদেবের দর্শন উপলক্ষে পুরীধামে আসিয়াছিলেন। উড়িষ্যার সেই সময়ের রাজা, জয়সিংহকে সদবংশজাত জানিয়া আপন তনয়ার (বিশ্বাস যোগ্য নহে) সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র আদি সিংহের পরিণয় সম্পাদন করিলেন। পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন যে, ময়ুরধ্বজ রাজার উৎপীড়নে প্রজাবর্গ বিদ্রোহী হইয়াছে। জয়সিংহ ময়ুরধ্বজকে পরাস্ত এবং নিহত করিয়া এই রাজ্যে আধিপত্য সংস্থাপন পূর্ব্বক বাওনঘাটী নামক স্থানের গড় দখল করিলেন।

আদিভঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া এই রাজ্যে ৪৩ জন ভঞ্জবংশীয় জমিদার জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ১৬০০ খৃষ্টাব্দেও ময়ূরভঞ্জ রাজ্য অপরিচিত থাকায়, ইতিহাসে ইঁহাদের জমিদার বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছি। ময়ুরভঞ্জে ভূমিজ, ভূঁইয়া, বাথুরি, পুরাণ প্রভৃতি জাতীয় লোকেরা উপবীত ধারণ করে, এবং চাষবাস করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ময়ূরভঞ্জের নদী সমূহে স্বর্ণ এবং পর্ব্বত সমূহে লৌহ পাওয়া যায়।

উড়িষ্যার কেশরী রাজবংশের সঙ্গে সঙ্গে ময়ুরভঞ্জের জমিদার বংশের অভ্যুদয়, ইহা বিশ্বাস হয় না।

কেশরী রাজবংশের আদরের পুরীর (শ্রীক্ষেত্র) মন্দির সন্নিকট সাগরের শোভা অতুল। এইজন্যই বুঝি, কণারকের সূর্য্যমন্দির বহু অর্থব্যয়ে সাগরতীরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরীর মন্দিরও বুঝিবা এই জন্যই।

সসীমে অসীম—সীমায় অসীমা মিলিয়া পুরীতে যে অপূর্ব্ব জীবন্ত ভাগবত রচনা করিয়াছে, তাহা মানুষ ব্যক্ত করিতে পারে না।

রাজা কেদার রায় ভুঞা।

বাহনা হইতে কেদার রায়ের রাজধানী একশত মাইলের কম হইবেনা। পথে বহু সংখ্যক ছোট বড় নদী বিল ও খাল বিদ্যমান। এখানে "বিবি চিরা" নামক একটি ক্ষুদ্র খাল আছে। খালের অপর পাড়ে ফুলবাড়ীর নিকট ভিটাবাড়ী গ্রাম আছে। সেখানে প্রাচীন বিশাল ইষ্টকালয়ের ভগ্নস্তূপ পরিদৃষ্ট হয়। কেদার রায় (ইনি বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে কুলীন কি মৌলিক ছিলেন, তাহা জানা নাই, প্রবাদ যে দেববংশ সম্ভূত নহেন) ও চাঁদরায় নিতান্ত অত্যাচারী ও নৃশংসচিত্ত হইলেও, তাঁহাদের গুরুদেব ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে বড় ভয় করিয়া চলিতেন। কেদার রায় তাঁহার এক যবনী উপপত্নীর জন্য এক রমণীয় বিলাস-ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কেদার রায় কখনও সপ্তাহ অন্তে, কখনও মাসান্তে ভিটাবাড়ীতে আগমন করিতেন। তিনি কদাচ দিবাভাগে অবস্থিতি করিতেন না। হতভাগিনী যবনী জনৈক 'সুদর্শন' ভৃত্যের প্রেমে আত্মবিসর্জ্জন করেন। একদা গভীর নিশীথে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত সময়ে, সহসা কেদার রায় বিলাস-ভবনে পদার্পণ পূর্ব্বক যবনীর গুপ্ত প্রেমলীলা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন।

কেদার রায়ের আদেশ অনুযায়ী নগ্না যবনীর দুই চরণ দুই তরণীতে স্থাপনান্তে সুদৃঢ় রজ্জু সহযোগে আবদ্ধ করা হইল। কেদার রায়ের সঙ্কেত মাত্র প্রত্যেক তরণী ছয়জন বলবান ভৃত্য কর্ত্তৃক দুই বিভিন্ন মুখে পরিচালিত হইল। অভাগিনী যবনীর দ্বিধা ভিন্ন দেহ (জরাসন্ধের ন্যায়) নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। সেই দিন হইতে এই ক্ষুদ্র খালটি "বিবি চিরার

খাল" এই বিসদৃশ আখ্যা প্রাপ্ত হইল। পৈশাচিক উপায়ে জঘন্ত অত্যাচারে একটা নারীর জীবন নাশ—সম্মুখে দাঁড়াইয়া—হুকুম দিয়া যে করিতে পারে, সে এদেশের বারভূঞার অন্যতম ছিল না, ইহা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি। যাহার হৃদয় তেমন পিশাচের রঙ্গভূমি, তাহার পতাকা তলে একটা জাতির প্রতিনিধি সম্মিলিত হয় না। তাহা হইলে সিরাজের রাজত্বের অবসান হইতে আরও বিলম্ব হইত। ১৫৯২—৯৩ খৃষ্টাব্দে চাঁদরায় ভূষণা দুর্গের অধিপতি ছিলেন এবং ঐ সনে চাঁদরায়ের মৃত্যুর পরও তাঁহার পিতা কেদার রায় ভূষণা দুর্গে আধিপত্য করিতেছিলেন। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহের সহিত যুদ্ধে কেদার রায় নিহত হন। সপ্তগ্রামের রাজা শক্রজিৎ সিংহ মোগল পক্ষে যোগদান করায় ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে ভূষণা দুর্গ ও পরগণা জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। রাজা মুকুন্দ পুত্র রাজা শক্রজিৎ সিংহ।

নবাব ঈশাখাঁ সিংহ।

১৬০৪ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুর—ঢাকার বীর সন্তান দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম প্রধান ভৌমিক (?) কেদার রায় স্বাধীনতা সমরে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। কেদার রায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল জমিদারীর অধিকাংশ ঈশা খাঁ মসনদ আলীর সন্তানগণ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। যে ইষ্টদেবী শিলামাতাকে মানসিংহ নিজের দেশে লইয়া যান, উহা কাহার ছিল সঠিক বলা যায় না। জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বর নগরে আজিও শিলাদেবী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন।

মধুকূল্য গোত্রীয় রাজা কালাদাস সিংহ গজদানী, জঙ্গলবাড়ীতে বাস করেন। ইনি প্রত্যহ এক একটি স্বর্ণ গজ দান করিতেন বলিয়াই গজদানী নামে পরিচিত। দেওয়ান রাজা কালীদাস সিংহ গৌড়ের শাসনকর্ত্তা

বাহাদুর সাহের দেওয়ান ছিলেন। কালীদাস সিংহের আদি বাসস্থান ভূরশুট পরগণান্তর্গত অযোধ্যা নগরে ছিল। কালীদাস সিংহ—সৈয়দ ইব্রাহিমের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ক তর্কে পরাভূত হইয়াই ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ধর্ম্মান্তর গ্রহণের পর কালীদাস সিংহ—সোলেমান খাঁ নাম গ্রহণ করিয়া নবাব জেলালুদ্দিনের পরমা সুন্দরী কনিষ্ঠ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কালিদাস সিংহ গৌড়ের শূন্য সিংহাসন অধিকার পূর্ব্বক তদানীন্তন দিল্লীশ্বর আকবরের প্রীতি সম্পাদনার্থ বহুতর মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। বাঙ্গলা, উড়িষ্যা ও ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ইঁহার অধিকারে ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। কালিদাস সিংহ দেওয়ান ইসমাইল খাঁ ও দেওয়ান ঈশা খাঁ * নামক দুইটি পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। আকবর কর্ত্তৃক আন্দুলিয়া আক্রান্ত হইলে নবাব কালিদাস সিংহের পুত্রগণ অস্ত্র ধারণ করায়, তাঁহারা গৌড়ের সিংহাসন হইতে তাড়িত হন। আকবরের সেনানীর সহিত আন্দুলিয়া সিংহ বংশের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে আন্দুলিয়ার সিংহগণ পরাভূত হইয়া নানা দিকে পলাইয়া যান।

আন্দুলিয়ার একটি দীর্ঘিকা খনন করিয়া কালিদাস সিংহের পত্নী (জেলালুদ্দিনের কন্যা) তাহাতে বার তীর্থের জল নিক্ষেপ করিয়া "গঙ্গাসাগর" নাম প্রদান করেন।

আন্দুলিয়ার সিংহী পোঁতা মোগল সেনানী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, ক্রমাগত তিন দিবস অবিরাম যুদ্ধের পর সূর্য্যাস্তের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে সিদ্ধহস্ত সমর পটু রাজা বনমালী সিংহের তরবারির আঘাতে মোগল সেনাপতি অমিত বল রাজা মানসিংহের হস্তস্থ তলোয়ার খানা ভগ্ন হইয়া

* অন্য একজন ঈশাখাঁর নাম পাওয়া যায়, তিনি ব্রাহ্মণ নারায়ণ সিংহের পুত্র। নারায়ণ সিংহ যুদ্ধে প্রাণ হারাইলে তাঁহার চারি পুত্র বন্দী হন এবং তাঁহারা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়া পরে জালাল খাঁ, কামাল খাঁ, হাজী খাঁ, ও ঈশা খাঁ নামে পরিচিত হন। শ্রীহট্টে তাঁহাদের বাসস্থান ছিল।

গেল। রাজা বনমালী সিংহ তৎক্ষণাৎ অপর একখানা তরবারি কোষ হইতে বাহির করিয়া মানসিংহকে অর্পণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মানসিংহ তৎপ্রদত্ত তলোয়ার গ্রহণ না করিয়া, অবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। তন্মুহূর্ত্তে অস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া বনমালী সিংহের সহিত মল্লযুদ্ধের জন্য সম্যক প্রস্তুত হইলেন। মানসিংহের জামাতা রণকুশল হইলেও বহুক্ষণ যুদ্ধের পর ঈশাখাঁর সুশাণিত তরবারির আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। মানসিংহ যুদ্ধ করিতে বিরত রহিলেন এবং আন্দুলিয়া কায়েত পাড়ার রাজা বনমালী সিংহের করগ্রহণ পূর্ব্বক সখ্যতার অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। আন্দুলিয়ার প্রান্তর হইতে মঙ্গল বাদ্য গভীর আরাবে বাজিয়া রজনীর তন্দ্রাময়ী প্রাথমিক নিস্তব্ধতা ভগ্ন করিয়া জগতের কাণে কাণে বলিয়া দিল—"আজ এক শুভদিন ;—আন্দুলিয়ার সিংহগণ মোগল সেনানী মানসিংহের সখ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন।"

মানসিংহের মহিষীর অনুরোধে ঈশাখাঁ ও বনমালী সিংহ দিল্লীতে গমন করেন। আকবরের সমীপে সমুপস্থিত হইলে, দিল্লীশ্বর ঈশাখাঁকে অন্যায়রূপে কারারুদ্ধ করিলেন। বন্দী ঈশাখাঁ রাজ সহোদরা (মানসিংহের ভাগিনী) সম্রাট সীমন্তিনী দ্বারা স্বীয় সিংহ কুলের বংশ মর্য্যাদা ইত্যাদি আকবরের নিকট জ্ঞাপন করতঃ কারামুক্ত হইয়া বনমালী সিংহের সহিত মিলিত হইলেন। ঈশাখাঁ বাইশ পরগণার ও বনমালী সিংহ সরকার সপ্তগ্রাম জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। দুইটি পুত্র ও পত্নী রাখিয়া পরিণত বয়সেই দেওয়ান ঈশাখাঁ তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের বাসভূমি আন্দুলিয়া গড়ে দেহত্যাগ করেন।

ঈশাখাঁ সিংহ মুসলমান হইয়াও, আন্দুলিয়া সিংহবংশের অর্থাৎ পিতৃ কুলের সম্মানার্থ 'সিংহ' উপাধি ব্যবহার করিতেন। কখন হিন্দু দেব মন্দিরে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ঈশাখাঁ সিংহ অর্থবলে চাঁদ রায়ের অন্যতম প্রবীন কর্ম্মচারী শ্রীমন্ত খাঁকে হস্তগত করিয়া তাঁহার সহায়তায়

চাঁদ রায়ের পরমা সুন্দরী যুবতী ষোড়শ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা সোণামণিকে করতলগত করতঃ তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। ঈশাখার মৃত্যুর পর 'সোণাবিবি' নিজ হস্তে আম্বুলিয়া পরগণার রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সোণামণির অপহরণ ঘটিত অপমানের তীব্র জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া চাঁদরায় অত্যল্প সময়ের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। কেদার রায়ের হৃদয় হইতে অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক কালিমার সঞ্চার হেতু প্রজ্বলিত প্রতিহিংসা-বহ্নি কিছুতেই নির্ব্বাপিত হইলনা। ত্রিপুরার রাজা ও বঙ্গজ কায়স্থ সন্তান রাজা কেদার রায় সসৈন্যে আম্বুলিয়ার চতুর্ব্বেষ্টিত দুর্গে উপস্থিত হইয়াই সোণা বিবিকে আত্ম সমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া দূত প্রেরণ করেন। তদুত্তরে সোণাবিবি বলিয়াছিলেন,—"আমার শরীরে এক বিন্দু শোণিত থাকিতে বিনা যুদ্ধে আমার স্বামীর পরিত্যক্ত, শ্বশুর কুলের একখণ্ড সামান্য ভূমিও কাহারও হস্তে সমর্পণ করিবনা।" বীরাঙ্গনা রাণী সোণামণির এই অপূর্ব্ব বীরবাণীতে ভ্রাতা কেদার রায় বিস্মিত হইলেন। একি তাঁহাদের স্নেহ পালিত আদরিণী সেই স্বর্ণময়ী ভগিনী! উভয় পক্ষে বহুদিন যুদ্ধ চলিল। অবশেষে যখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কোন রূপেই আর রক্ষা নাই,—তখন তিনি স্বামীর প্রিয়তম দুর্গ শত্রু হস্তে সমর্পিত হওয়া অপেক্ষা ধ্বংস হওয়াই সঙ্গত বোধে সৈন্যগণকে চুর্ণিনদ তীরবর্ত্তী "বিজয় সিংহ বংশের আম্বুলিয়া গড়ে" * অগ্নি সংযোগ করিতে আদেশ করিলেন। রাণীর আদেশে উহাতে অগ্নি সংযুক্ত হইল, দেখিতে দেখিতে বহ্নির বিকট গ্রাসে ঈশাখাঁ সিংহের পূর্ব্ব পুরুষের দুর্গ ভস্ম স্তূপে পরিণত হইতে চলিল,—আর সেই প্রবল অগ্নিরাশিতে প্রকৃত বীরাঙ্গনার ন্যায় সোণামণি আত্মবিসর্জ্জন করিলেন। আজিও

* বর্ত্তমান কালে আম্বুলিয়ার অধিবাসীগণ বলিয়া থাকেন যে, মধ্য রাত্রে আম্বুলিয়ার সিংহী পোঁতা হইতে একটি, কখন তিনটী রমণীর ক্রন্দন ধ্বনি দূর হইতে শুনা যায়।

আমুলিয়ার অধিবাসীগণ 'সিংহীপোতা'য় দাঁড়াইয়া এই সকল কাহিনী গল্প করিয়া থাকেন। বিগত ৩রা এপ্রিল ১৯৩১ খৃঃ রায় জলধর সেন বাহাদুরের সভাপতিত্বে এই স্থানে এক মহতি সভা হয়।

আমুলিয়া বিধ্বস্ত হওয়ার পর রাজা বনমালী সিংহের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। কথিত আছে যে, তিনি হস্তী পৃষ্ঠে নব গঙ্গাপার হইবার সময় মোগল সৈন্যের গুলি দ্বারা বামহস্তে আহত হন। বনমালী সিংহ সেই হস্ত কাটিয়া 'গঙ্গামাতাকে' উপহার প্রদান করেন। তাহার পর পবিত্র সলিলা জাহ্নবী তাঁহাকে নিজবক্ষে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে নব গঙ্গার কুল 'মহাশ্মশান' নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে।

আমুলিয়ার সিংহগণের স্বদেশ বাৎসল্যের পুণ্যকাহিনী সত্যব্রত ইতিহাস অমর অক্ষরে বক্ষে ধারণ করিয়া, অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এবং চিরদিনই করিবে।
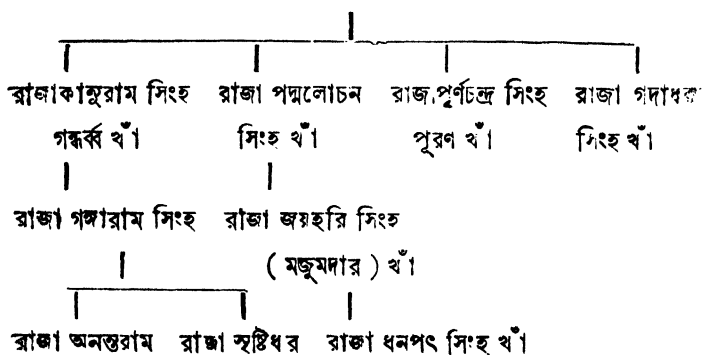
ঈশা খাঁর বংশাবলী—

রাজা ধনপৎ সিংহ, পুত্র—রাজা নৃসিংহ সিংহখাঁ, পুত্র—রাজা অমর

পুত্র—রাজা রামদাস, পুত্র—রাজা বিশ্বনাথ, পুত্র—রাজা ঈশ্বর সিংহ, পুত্র—রাজা শ্রীধর সিংহ, পুত্র—রাজা (দেওয়ান) কালিদাস সিংহ গজদানী, নামান্তর সোলেমান খাঁ, পুত্র—দেওয়ান ইসমাইল খাঁ ও দেওয়ান ঈশাখাঁ মসনদ আলি। ঈশা খাঁ, পুত্র—মুসা খাঁ ও মহম্মদ খাঁ! ঈশা খাঁর বংশধরগণ ময়মনসিংহ জেলায় অদ্যাপি জমিদার বংশ বলিয়া খ্যাত আছেন।

রাজা মটুক রায়।

রাজা মটুক রায় ও গাজী সাহেব সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান মধ্যে নানারূপ কিম্বদন্তী এদেশে প্রচলিত আছে। "কড়ি জাঙ্গাল" মটুক রাজার হরিহর নদীর বাঁধ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মটুক রাজার পক্ষে এই বাঁধ বাঁধাইবার কোন প্রয়োজন দেখা যায়না। মেঘলা গ্রামে গাজী সাহেবের দরগার পার্শ্বেই মটুক রাজার "জীবৎ কুণ্ড" দৃষ্ট হয়। কূপের নিকটে যে শিমুল গাছের কথা প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার স্থানে একটি বিল্ববৃক্ষ জন্মিয়াছে। গাজী সাহেব এই জীবৎ কূপের জল অপবিত্র করিয়াই মটুক রাজার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। গাজী সাহেবের দরগার পার্শ্বেই ঘোড়াপুকুর দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, গাজী সাহেব মটুক রাজার পুত্র ঠাকুর দাস ও কন্যা চম্পাবতীকে বা সুভদ্রাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থ এই ঘোড়াপুকুর খনন করিয়াছিলেন। ঝিনাইদহ গ্রামের দক্ষিণে গয়েশপুর গ্রামে এক প্রকাণ্ড দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ ঢোল সমুদ্রও কহিয়া থাকে, কেহ মটুক রাজার দীঘিও কহিয়া থাকে।

পুরাতন স্থান ও পুরাতন কথা অতীত স্মৃতির উদ্বোধন করিয়া থাকে।

ভগ্নস্তূপে অতীতের মনোমুগ্ধকর ছবি দেখিতে পাই। সে ছবি অস্পষ্ট হইলেও মধুতাময়।

মুকুট বা মটুক রায়ের কন্যা পীর স্থর মল্লিকের হস্তগত হইল। মটুক রায়ের কন্যা সুশীলা সুন্দরী আত্মহত্যা করেন। সুশীলার উপর অত্যাচারে সমস্ত হিন্দু উন্মত্ত প্রায় হইল। গাজী সুশীলার মৃতদেহ লইয়া উড়ানী গ্রামে কবরস্থ করিলেন। গাজী আঠার ভাটীর দূরে গিয়া "বলী রাজা"কে নিহত করিলেন। আর এক মুকুট রায় ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের রাজা ছিলেন। মুকুট রায়ের ষোড়শ হল্কা হাতী ছিল। তাঁহার ঢালী সৈন্যও ৫২০০০ হাজারের কম ছিলনা। এই রাজার নামে একটি ছড়া,—

"খুনিয়া নগরে ধন্ধে
মুকুট রাজার কন্যে
বিয়ে কল্লে সুশীলা সুন্দরী।

সুশীলারে বিয়ে করে
বিবি চম্পা নাম রেখে
রেখে গেলেন আপনার সাক্ষাতে॥

তথায় উড়ানি যেয়ে
বিবি চম্পায় গোর দিয়ে
ত্রিভূবনে হলেন উদাসীন।

আঠার ভাটির দূরে
পীর দর্প নামে ধরে
সেই দেশে ছিল বলিরাজ॥

রাজা মুকুট রায় চারি জন ছিলেন। বাড়ী বাথানে আর এক মুকুট রায় পাঠানদিগের প্রভুত্বের প্রারম্ভে রাজা হন। ইনি বৈদিক ব্রাহ্মণ

ছিলেন। বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত জাহাঙ্গীরাবাদ পরগণার পূর্ব্বস্থলী গ্রামে তাঁহার পূর্ব্ব বাস ছিল। নদীয়া জেলার পূর্ব্বস্থলী গ্রামে তাঁহার বংশধর আছেন।

আর এক মুকুট রায়ের বিদ্রোহে .বর্গীয় হাঙ্গামার সময় বস্তুয়ার সিংহ বংশের বাটী লুণ্ঠিত হয়।

রাজা রাম চন্দ্র খাঁ।

মোগল রাজত্বের সময় রাজা রাম চন্দ্র খাঁ নামে রাজা মানসিংহের একজন অনুচর বারবাজারে বাড়ী করিয়া ছিলেন। বাড়ীবাথানে পীর সুর মল্লিকের দরগা আছে। যুদ্ধ করিয়াই হউক, বা যুদ্ধ না করিয়াই হউক, খুনিয়া নগর গাজী সাহেব হস্তগত করিলেন।

রাজা ভরত চন্দ্র সিংহ।

মুসলমানদিগের প্রতি ঝিকিরা গড়ের রাজা ভরত চন্দ্র সিংহের আন্তরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল। একদা রাও আদম নামে কোন ফকীর ভরত চন্দ্রের রাজবাটীর বহির্ভাগে একাকী উপস্থিত হইয়া রাজাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করেন। রাজার পরিবার ও অনুচরবর্গের সমক্ষে একটি কপোত অঙ্গের বস্ত্র মধ্যে লুকাইত করিয়া রাও আদমের আহ্বান অনুসারে একাকী তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্থান করেন। কপোত উড়িয়া আসিলে রাজার মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া পরিবারবর্গ যেন মুসলমানের হস্তে কলঙ্কিত হওয়ার পূর্ব্বেই সুসজ্জিত অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করে, যাওয়ার সময়ে সকলের প্রতি এই আদেশ দিয়া যান। রাজবাটীর অনতিদূরে এক সুবিস্তীর্ণ জনহীন উদ্যানে (মণ্ডলঘাট পরগণায়) প্রত্যূষকাল হইতে বেলা তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়, তাহার অন্তে ফকীর

পরাজিত ও নিহত হন। রাজা শত্রু বিজয়ের পর গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পথিমধ্যে পিপাসার্ত্ত রাজার তৃষ্ণা নিবারণের প্রয়োজন হয়। জলপানের সময় বন্ধনমুক্ত হইয়া রাজার বস্ত্রস্থিত কপোত অকস্মাৎ রাজবাটীর অভিমুখে দ্রুত গতিতে উড্ডীন হয়। কপোত দৃষ্টে রাজার আত্মীয় পরিজন রাজাদেশ স্মরণ করিয়া সমীপস্থ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করেন। তৎপর আত্মীয় পরিজনের শোকে বিহ্বল রাজাও অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন!

অদুনা ও পদুনা।

সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে হরি চন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র সিংহ রাজার কাহিনী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। মাণিক গাঙ্গুলীর ও ঘনরামের ধর্ম্ম মঙ্গলে ও ধর্ম্মের জন্য হরিশ্চন্দ্রের পুত্র বলিদানের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু শূন্য পুরাণে এই সকল বৃত্তান্ত না থাকায়, আধুনিক কালের ঐ সকল ধর্ম্মমঙ্গলের কথা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়।

কথিত আছে, পাটিকা নগরাধিপতি মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্র অদুনা ও পদুনা নাম্নী হরিশ্চন্দ্রের কন্যাদ্বয়ের পাণি গ্রহণ করেন। সপ্তগ্রামের নিকট ইদুনা ও পদুনাপুর গ্রামদ্বয় বর্ত্তমান আছে।

"করিবে আমারে যোগি যদি ছিল মনে।
উদুনা পুদুনা তবে বিভা দিলে কেনে॥
উদুনা করিয়া বিভা পুদুনা পাইলাম দান।
হস্তী ঘোড়া পাইনু আর খেতুয়া গোলাম॥

মাণিকচন্দ্র রাজার গানে আছে,—"অদুনকে বিয়া দিল পদুনকে দিল দানে।"

অদুনা ও পদুনার রূপের খ্যাতি ছিল। দুর্ল্লভ মল্লিক কৃত গোবিন্দচন্দ্র গীতে লিখিত হইয়াছে—

"উদুনা পুদুনা রূপে জ্বলন্ত আগুনী।
মেঘের আড়েতে যেন শোভে সৌদামিনী॥
অন্ধকারে শোভা যেন মাণিক উজ্জ্বল।
উদুনা পুদুনা রূপে লর্জ্জিত কোমল॥"

রমাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণে হরি চন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র নামক একজন রাজার নাম পুনঃপুনঃ উল্লিখিত রহিয়াছে।

"কার্ত্তিকেয় সদৃশ সংগ্রাম জয়ী প্রবীর ধীমন্ত রণবীরসেন হিমালয় ব্যাপ্ত দেশ জয় করিয়া, সম্ভার পুরীতে বাস করিতেন। চন্দ্রবংশতুল্য শ্রেষ্ঠবংশ হইতে এবং বীরশ্রেষ্ঠগণের শিরোভূষণ স্বরূপ বীরবর পূজিত নৃপেন্দ্র ভীমসেন হইতে ধীমন্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র রণবীরের পুত্র, তিনি ধার্ম্মিক, এবং তিনি কুবের তুল্য সমৃদ্ধবান ছিলেন। রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র যমুনা নদী তীরে বুদ্ধ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে নির্জ্জনে বসিয়া ধর্ম্ম পরিচর্য্যা করিতেন।" সিংহবংশের বংশাবলীতে ঐ সকল নামের সহিত মিল না হইলেও, বংশাবলীতে দুইটি করিয়া প্রত্যেকের নাম লিখিত ছিল, এইরূপ প্রবাদ কথা আছে। হরেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রভৃতি কোন্ পুথি অবলম্বনে হরিশ্চন্দ্রের বিষয় লিখিয়াছেন, উল্লেখ করেন নাই। উহার প্রামাণিকতাই বা কি, তাহার বিচার না করিয়া "হরিশ্চন্দ্র দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহ করিয়াও পুত্র মুখ সন্দর্শন লাভে বঞ্চিত ছিলেন"—একথাও বলা চলেনা।

"হোথা রাজা গোবিন্দচন্দের হয়্যাছে মরণ।
উদুনা পুদুনা ডাকে নাহিক চেতন॥
কত নিদ্রা যাও রাজা নাদেহ উত্তর।
উদুনা পদুনা কান্দে হইয়া কাতর॥

রাজারে দেখিয়া রাণি ভয়ে চমোকিত।
প্রাণ ছ্যাড়া গেছে রাজার কায়া বিচলিত ॥
ঘন ঘন দুই রাণী কর্ণমূলে ডাকে।
অঙ্গে হাত দিয়া দেখে কাষ্ঠ পারা ঠেকে ॥
নাকে হাত দিয়া দেখে নাহি রহে শ্বাস।
উদুনা পুদুনা কান্দে হইয়া নৈরাস ॥
ভুমে গড়াগড়ি যায় নাহি বান্ধে চুলি।
ফুকরি ফুকরি কান্দে অভরণ পেলি ॥
ছিঁড়িয়া পেলিল গলার গজমতি হার।
ধুলায় ধুসর রূপ হল্য ছারখার ॥
কোপ করি নাহি কহে ময়না মন্ত্রি মায়।
এখন আসি জুগা করুক আপন বেটায় ॥
রাক্ষসী রাজার মাতা ময়নামন্ত্রি রাণি।
সাঁপ গালি দিল নাই পোহাল্য রজনী ॥
রজনী প্রভাত শুনি ধাই সব্বলোক।
ইষ্ট বন্ধু অচেতন নৃপতির সোক ॥
পাত্র মিত্র কান্দে প্রজা কলিঙ্গ কোটাল।
অন্তঃপুরে বধু কান্দে কলিঙ্গ কোটাল ॥
রাজা মৈল হায় হায় নগরে ঘোষণা।
ধৈরজ ধরিতে নারে উদুনা পুদুনা ॥
কপালে আঘাত হানে মৃতপতি কোলে।
প্রাণ তেজীবারে কেহ বিস চায়্যা বোলে ॥
বিনাইয়া বিনাইয়া রাণী কান্দে উচ্চৈস্বরে।
নারির ক্রন্দনে দারু পাষাণ বিদরে ॥

পশু পক্ষ আদি কান্দে কুঃকুর শৃগাল।
অগ্নি খাইতে উতুনা ভাঙ্গিল আত্রডাল॥
পতিব্রতা জত নারি অগ্নি খেতে যায়।
কুন্তলে চিরনি দোলে সিন্দুর মাথায়॥

*　　*　　*

অগ্নি খায় নারী সব নগরে ঘোষনা।
মৃদঙ্গ মন্দিরা ঢাক বিবিধ বাজনা॥
অগোর চন্দন কাষ্ঠে চিতা সাজাইল।
শত শত কলসি তাহে ঘ্রত ঢালি দিল॥
সঙ্গেতে বসিল রাণি পতি করি কোলে।
উচ্চস্বরে সব লোক হরি হরি বলে॥

ইত্যাদি—

সমস্ত কবিতাটি পাওয়া যায় নাই।

মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর ধর্ম্মপাল তদীয় রাজ্য হস্তগত করেন। জামাতার সাহায্যার্থ হরিশ্চন্দ্র "হয়ত" ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। "সম্ভবতঃ" হরিশ্চন্দ্র এই রণাহবে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এই জন্যই যুদ্ধস্থলের অনতিদূরে হরিশ্চন্দ্রের সমাধিস্থান বিদ্যমান রহিয়াছে।

রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত রামগঞ্জ নামক স্থানের পূর্ব্বদিকস্থ চড়চড়া গ্রামে "হরিশ্চন্দ্র পাঠ" নামে খ্যাত একটি স্তূপ বিদ্যমান আছে। গ্রামের নাম এবং স্থানীয় প্রবাদ ও ধ্বংসাবশেষ হরিশ্চন্দ্রের অতীত মহিমার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই স্তূপ বিপর্য্যস্ত ও ইহার উপকরণ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, কিন্তু এক সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড এখনও উপরিভাগে বিদ্যমান থাকিয়া বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে আপনার একমাত্র অবস্থান-জনিত গৌরব উপভোগ করিতেছে।

প্রায় ১১০০ খৃষ্টাব্দে আমরা হরিশ্চন্দ্রকে গড়মন্ডেতা, মহানাদ, চিংড়ে, আন্দুলিয়া ও কখন সাভারের নিকটে দেখিতে পাই। সাভারে প্রাপ্ত ইষ্টক জাল হইতেও পারে। তাহার কারণ এই ইষ্টকের লিপির "প" "র" "জ" কিছু পুরাতন ঢঙ্গের হইলেও বর্ত্তমান বঙ্গাক্ষরের সহিত সাভারের লিখিত লিপির অক্ষরগুলির সাদৃশ্য যথেষ্ট রহিয়াছে। বজ্র-যোগিনী গ্রামের উত্তর পূর্ব্ব কোণে রঘুরামপুরের দীর্ঘিকা রাজা হরিশ্চন্দ্রের দীঘি বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তথায় অদ্যাপি হরিশ্চন্দ্রের বাটীর ভিটা দৃষ্ট হয়। ঢাকার ইতিহাসে হরিশ্চন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে সেই হরিশ্চন্দ্রের সঙ্গে "মৌদ্গল্য গোত্রীয় হরিশ্চন্দ্র যিনি সিংহ বিক্রমশালী ছিলেন বলিয়া সিংহ উপাধি হইল"—যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরিচয় আমরা সিংহ বংশের কুর্শীনামা হইতে পাইতেছি,—উভয়ে এক কি দুইব্যক্তি তাহার আলোচনা আবশ্যক।

কথিত আছে, রাজা হরিশ্চন্দ্র তদীয় রাজধানীতে কুড়িবুড়ি (৪০০) দীর্ঘিকা খনন করেন, তন্মধ্যে রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে ১২॥০ গণ্ডা (৫০), রাণী কর্ণাবতীর ভবনে (কর্ণপাড়ায়) ৭॥০ গণ্ডা (৩০) দীর্ঘিকা খনিত হয়।

ঢাকার ইতিহাসে আছে যে.—"পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে নদী-মেখলা-বেষ্টিত সাভার, ধামরাই এবং অরণ্য-সঙ্কুল ভাওয়াল অঞ্চল যে নিরাশ্রয় ব্যক্তি-দিগের আশ্রয়স্থান হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কথিত আছে যে, রাজা হরিশ্চন্দ্র রাঢ় দেশ হইতে এতদঞ্চলে আগমন পূর্ব্বক বংশাবতী নদীর তীরে তদীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।"

"বংশাবতী পূর্ব্বতীরে সর্ব্বেশ্বর নগরী।
বৈসে রাজা হরিশ্চন্দ্র জিনি সুরপুরী॥"

সর্ব্বেশ্বরের বর্ত্তমান নাম সাভার। সাভারকে সম্ভার বলে। বোধ হয় শম্ভু, সিংহের স্থাপিত নগর ছিল।

প্রাপ্ত ইষ্টকের খোদিত লিপি—

শ্রীশ্রী মদ্রাজ্য

০ রিশ্চন্দ্র সিংহ দ ০ ০ ০ সং ০

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আশমরাজ হর্ষদেব কর্ত্তৃক গৌড়, উৎকল, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশ বিজয়ের বার্ত্তা পাইয়া থাকি। সম্ভবতঃ ঐ সময়েই কোচ ও আহোম সৈন্য সর্ব্বেশ্বর ধ্বংস করিয়াছিল। তাহা হইলে উক্ত ঘটনার ৩।৪ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা হরিশ্চন্দ্র সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

রাজা হরিশ্চন্দ্র (সিংহের) মহিষী কর্ণাবতী ও ফুলেশ্বরী ছিলেন। তিনি স্বীয় রাজ্য মধ্যে ৫০টি জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর সাভারের রাজধানী তদীয় সহোদরা রাজেশ্বরীর গর্ভজাত পুত্র দামোদর মাতুলের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইনি দামুরাজা বলিয়া পরিচিত। যশোপাল রাজা হরিশ্চন্দ্রের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন। সর্ব্বেশ্বর নগরের পূর্ব্বাংশে বলীমেহির নামক স্থান হরিশ্চন্দ্রের পরিখা বেষ্টিত অন্তঃপুরের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রাচীন সম্ভোগ রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে সিংহ বংশীয় রাজা হরিশ্চন্দ্র সিংহল পাটন অঞ্চল হইতে আগমন করিয়া এই স্থানে স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রাচীন রাজধানীর অট্টালিকা সমূহের অধিকাংশ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে, এখনও মৃত্তিকা খনন করিলে নানা বর্ণের প্রস্তর ও বিবিধ আকারের ইষ্টকাদি নয়ন গোচর হইয়া থাকে। মহানাদের দুর্গের পরিখার মত কাটাগাঙ্গ দুর্গের পরিখা বর্ত্তমান সময়ে ৩০।৩৫ হাত হইবে।

রাবণ নামে এক ভূপতি হরিশ্চন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। তদীয় প্রাসাদে সঙ্গীতজ্ঞের আশ্রয় স্থল ছিল। তৌর্য্য ত্রিকি সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা স্থল বলিয়া হরিশ্চন্দ্রের সভা দেশবিখ্যাত ছিল। নদীয়া আমুলিয়ার নিকট রাবণ বোড় গ্রাম আছে।

বিখ্যাত অমরার গড়ের বর্ণনায় এক রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিবরণ পাওয়া যায়,—

"হরিশমুখে শুনি হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।
অমরা নগরে ঘর অতি পুণ্যবান॥ *
প্রতিদিন আচার পূত পরম বৈষ্ণব।
বাসব কুবের জিনি বিস্তর বৈভব॥
রাজার ভার্য্যার নাম রাণী মদনাবতী।"

পুত্র না হওয়ায় দুঃখে হরিশ্চন্দ্র বনে প্রবেশ করিয়া বল্লুকা নদীর তীরে, যেখানে মার্কণ্ডেয় মুনি ধর্ম্ম পূজা করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হন।

কবি কৃত্তিবাস

কবি কৃত্তিবাসের জন্মভূমি ফুলিয়া গ্রামে তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন জন্য ১৩৩৮ সালের ৩১শে বৈশাখ রাণাঘাট মিউনিসিপ্যাল আফিসে একটি সভা হয়। সব্-ডিবিশনাল আফিসার শ্রীযুক্ত মুরলীধর রায় চৌধুরী M. A. মহাশয়ের প্রস্তাবে স্থানীয় জমিদার ও মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত রায় নগেন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ঐ সভায় কবিবরের স্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন, তাঁহার ভিটার নিকটস্থ কূপটির সংস্কার, যেখানে তাঁহার দোলমঞ্চ ছিল, তথায় একটি মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রাম সীতার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও চিরস্থায়ী সেবার ব্যবস্থা এবং কবির স্মরণার্থ একটি বার্ষিক মেলার অনুষ্ঠান করা স্থির হয়। অর্থ সংগ্রহ কার্য্যও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

* এই হরিশ্চন্দ্র ও অমরা নগর ই, আই, রেলের মানকর ষ্টেশনের অদূরে সদ্গোপ জাতীয় প্রাচীন রাজবংশের রাজা হরিশ্চন্দ্র ও অমরার গড় (১০৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

অনন্তর ১৩২২ সালের ২৭ শে চৈত্র কবির জন্মভূমিতে বঙ্গের কৃতি সন্তান স্বনাম খ্যাত স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। এই সভায় দেশমান্য কবি সাহিত্যিক, রাজা মহারাজা জমিদার ও অন্যান্য বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি শুভাগমন করিয়াছিলেন। নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্র নাথ রায়, কাশিমবাজারের মহারাজা মুনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, নদীয়ার মহারাজা ক্ষৌণীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর প্রভৃতির শুভাগমনে ফুলিয়া পল্লী ফুলময়ী হইয়া উঠে। এইদিন সভাপতি মহাশয় স্মৃতিস্তম্ভ ও স্কুল গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন। সভাপতির অভিভাষণ অতি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল এবং সমাগত কবিগণ বহু কবিতা পাঠ ও বিতরণ করিয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশের স্থানাভাব, তথাপি শান্তিপুরের সুবিখ্যাত কবি মোজাম্মেল হক্ মহাশয়ের রচিত একটি কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম,—

"এই কি ফুলিয়া? এই সেই ভূমি
মহত্ত্ব-মহিমা-ভরা?
এস এস তবে এর পূত ধূলি
সাদরে হরষে শিরে লই তুলি,—
একি ধূলি? এ যে চন্দন চুয়া
ভবজন-মনোহরা!

এই সে ফুলিয়া! এই সেই ভূমি
মহত্ত্ব-মহিমা-ভরা।
একদা যেখানে সাধনার বলে
কুঞ্জ কুটীর পরে
কবি কৃত্তিবাস—কীর্ত্তি নিবাস
হৃদয়ে ধরিয়া উৎসাহ উল্লাস

ছুটাইয়াছিলা কবিত্ব-উচ্ছ্বাস
দেবী ভারতীর বরে!
একি সেই ভিটা? চুমি শতবার
অশেষ ভকতি ভরে।"

কৃত্তিবাস-স্মৃতির বার্ষিক উৎসবে নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণ সভাপতি হইয়াছেন—

সাল তারিখ		সভাপতির নাম
১৩২২। ২৭শে চৈত্র	...	স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় M.A., D.L., D.Sc., &c.
১২২৩ ও ১২২৪ সাল	...	উৎসব হয় নাই।
১৩২৫। ৯ই চৈত্র	...	রায় দীননাথ সান্ন্যাল বাহাদুর।
১৩২৬ সাল	...	নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ফুলিয়া—বেলগড়িয়া।
১৩২৭ সাল	...	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বার্গাচড়া।
১৩২৮, ১৩২৯ ও ১৩৩০	...	উৎসব হয় নাই।
১৩৩১ সাল, ২৪শে মাঘ	...	হরি নাথ ভট্টাচার্য্য। শান্তিপুর।
১৩৩২ ও ১৩৩৩ সালে	...	সভা হইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই।
১৩৩৪। ২৯শে মাঘ	...	প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মহানাদ—হুগলী।
১৩৩৫ সালে	...	নগেন্দ্র নাথ সোম—কলিকাতা
১৩৩৬। ২৭শে মাঘ	...	নলিনী মোহন সান্ন্যাল M.A.—শান্তিপুর।
১৩৩৭। ২৫শে মাঘ	...	সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (কৃত্তিবাসের বংশধর)।

স্থানটিতে উপস্থিত হইলে মনে হয়, যেন কোন ঋষির তপোবনে আসিয়াছি। কোন সময়ে এই স্থানের তলদেশ দিয়া সুরধুনী প্রবাহিতা ছিলেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। চতুর্দ্দিকে অরণ্য বেষ্টিত,

মধ্যস্থলে তৃণাচ্ছাদিত সুবিস্তৃত সমতল পরিষ্কৃত ভূমি, উহার একদিকে স্মৃতি-স্তম্ভ, অন্যদিকে মনোরম স্কুল গৃহ। সম্প্রতি ছাত্রাভাবে স্কুলটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে ঐ অট্টালিকার রুদ্ধ দ্বার, স্থানটি জনমানব শূন্য। স্তম্ভগাত্রে লিখিত আছে—

"হেথা দ্বিজোত্তম,
আদি কবি বাঙ্গলার, ভাষা রামায়ণকার,
কৃত্তিবাস লভিলা জনম।
সুরভিত সুকবিত্বে, ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে,
হে পথিক! সম্ভ্রমে প্রণম।
জন্ম—১৪৪০ খৃঃ অঃ।"

বাবু দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" লিখিয়াছেন—"১৪৪০ কিম্বা তৎসন্নিহিত কোন সময়ে ফুলিয়া গ্রামে শ্রীপঞ্চমীর দিন রবিবারে তিনি (কৃত্তিবাস) জন্মগ্রহণ করেন।" স্তম্ভে লিখিত এই জন্ম সাল ঠিক নহে বলিয়া বাগাঁচড়া নিবাসী বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপত্তি করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাসের স্বরচিত রামায়ণ পাওয়া যায় নাই। কৃত্তিবাসের জন্ম তারিখে ঐতিহাসিকের সন্দেহ হইতেছে। ১৪০২ শকের এক প্রতিলিপিতে "আত্মবিবরণ" নামক একটি পয়ার ছিল, ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ ১৩৫৪ শকে কৃত্তিবাসের জন্ম হইলে ইহার ২৫।৩০ বৎসর পরে গৌড়ের হিন্দু রাজা থাকা চাই। দেখা উচিত—আত্মবিবরণটি অকৃত্রিম কি না।

আজকাল ইতিহাসে মিথ্যাকথার সৃষ্টি হইতেছে। কবি কৃত্তিবাস নিজে বলিতেছেন যে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরসিংহ ওঝা দনুজ মহারাজার পাত্র ছিলেন। ১৪৯০ সালে রচিত ঈশান নাগরের অদ্বৈত প্রকাশে আছে—

"সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরুওঝার বংশজাত॥
সেই নরসিংহের যশ ঘোষে ত্রিভূবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহ মারি গৌড়ে হৈলা রাজা॥
যার কন্যা বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি।
লাউর প্রদেশ হয় যাহার বসতি॥"

গণেশকে ৮১৭ হিজরার আগে গৌড় সিংহাসনে চড়ানো যায় না, এবং ৮২১ হিজরার পর আর সিংহাসনে রাখা যায় না। ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকাব্দায় প্রস্তুত গণেশের দনুজমর্দ্দন নামাঙ্কিত বহু মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কোথায় মিঃ, এইচ, ষ্ট্যাপল্টন সাহেবের সহিত রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন, ডি, লিট এর বাদানুবাদের পর ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে গণেশের রাজত্ব, আর কোথায় ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে প্রস্তুত তাঁহার মুদ্রা! দীনেশ সেন না জানিলেও বাঙ্গলার গ্রাম্য কৃষকরা এখনও জানেন যে, সামসুদ্দীন—সিহাবুদ্দীন বায়াজিদ সাহের পর মহারাজ গণেশ গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। হাবসী বিদ্রোহ তিনি জানেন কি? এই বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করিয়া খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাহিরপুরে কংসনারায়ণ, মহানাদ—আমুলিয়ার গন্ধর্ব্ব খাঁ সিংহ কিছুদিন স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কৃত্তিবাস ইঁহারই দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং ইঁহারই আদেশ ও উৎসাহে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন।

"নয় দেউড়ি পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে॥"

—:০:—

ইতিহাসে ব্যভিচার।

ইতিহাস কি? কেবল সাময়িক ঘটনা ও প্রকৃতির অনুকরণই ইতিহাস নয়, তাহার সঙ্গে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি চাই। সৌন্দর্য্য সৃষ্টির জন্য সংযম চাই। যেমন তেমন করিয়া হাত পা ছোড়ায় নাম নৃত্য নয়, তাহার জন্যও চাই একটা সংযম। সাহিত্যের উৎপত্তি ভাবের অভিব্যক্তিতে। সাহিত্য বিকশিত মনের বিকাশ। করুণ হৃদয় মুনি বাল্মীকি তমসার তীরে ক্রৌঞ্চযুগলের মধ্যে একে শিকারীর তীরে হত হইতে দেখিয়া সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"রে ব্যাধ, চিরকাল যেন তোর প্রতিষ্ঠালাভ না হয়, কেননা তুই কামমোহিত ক্রৌঞ্চ যুগলের মধ্যে এককে হত্যা করিয়াছিস্।" এইরূপেই নাকি শ্লোকের উৎপত্তি হইয়াছিল।

ইতিহাসের মালমসলা সব ঘরেই—সব গ্রামেই আছে, কিন্তু সব গ্রামে ইতিহাস লেখক নাই, এই-ই দুঃখ। অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই ভারত খণ্ডের পুরাতন ভূগোল তত্ত্ব এবং ইতিহাস অবগত আছেন।

বর্ত্তমান কালে ঐতিহাসিকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যে সংস্কৃত ভাষা বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয়, এবং এই সময় দাক্ষিণাত্য হইতে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মগ্রন্থ সকল আনয়ন করিয়া পুনঃ লিখিত ও প্রচারিত হয়। আমরাও বর্ত্তমান রামায়ণ প্রভৃতি মহাকাব্যে দাক্ষিণাত্যের ভৌগোলিক সীমার ইতিহাস পাইতেছি, ভারতের দক্ষিণ দিকের বিশেষরূপ বর্ণনা পাইতেছি। এরূপ অবস্থায় আমাদের দেশে প্রত্যেক পুরাতন বংশের এবং প্রাচীন গ্রাম ও নগরের পুরাতন প্রবাদ কথার সংগ্রহ ছাড়া ইতিহাস লেখার অন্য উপায় নাই।

বঙ্গদেশে হাণ্টার সাহেব ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাঁহার পর আর কেহ ঐরূপ ভাবে ইতিহাস লিখিতে কষ্ট স্বীকার করেন নাই। *

বৈষ্ণব-সাহিত্য সমস্তই ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে বলিতে হইবে। যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা সমস্তই বটতলার প্রকাশিত। প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের নামে অনেক অলীক গল্পকথা, লুপ্ত পুথির নাম দিয়া নূতন পুস্তক লিখিত হইয়াছে কি না তাহার আলোচনা হয় নাই। সেকালে যে সকল জমিদার বংশ, রাজবংশ ছিলেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ পাওয়া যায় না বলিয়া বর্ত্তমান বৈষ্ণব ও কুলজী গ্রন্থগুলি কতদূর সত্য, তাহার বিচার আবশ্যক।

খৃষ্টীয় ৭০০ হইতে ১০৭৭ অব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০০ বৎসর কাল আদিশূরকে লইয়া বাচস্পতি মিশ্র ও ক্ষিতীশ বংশাবলী টানাটানি করিয়াছেন। আদিশূর যে গৌড়বঙ্গে কোন সময় এবং কোথায় রাজত্ব করিতেন, তাহা লইয়াও বিস্তর মতভেদ আছে। ইহার বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছুই নাই।

সন ১৩৩০ বঙ্গাব্দে প্রচারিত "কায়স্থ পরিচয়" গ্রন্থে আছে যে,—

"আদিশূরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুমন্ত সেন এবং তাঁহার পর হেমন্ত সেন পূর্ব্ব দক্ষিণ বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন। তৎপরে হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন রাজা হন। তাঁহার রাজত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বেই অথবা অনতিপরে পালবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ রাজা মহীপালের মৃত্যু হয়। বিজয় সেনের অপর নাম সুখ সেন।" কায়স্থ পরিচয় গ্রন্থ প্রণয়ন কালে এই

* স্যর উইলিয়ম্ হাণ্টার ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন। ১৮৬৮ খৃঃ হইতে ১৮৭৭ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি বাঙ্গলার ইতিহাস সংগ্রহ কালে পুরাতন বনিয়াদি বংশ ধ্বংস সাধনের প্রায় শতবর্ষ পরে নূতন জমিদার বংশ সকল যাহা দিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরাতন জমিদারবর্গ ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসন সময়ে নষ্ট হইয়া যায়।

সকল কথা কোন্ পুস্তক বা কাহার সংগৃহীত প্রবাদ কথা হইতে এইরূপ সংকল্পে উপনীত হইয়া রচনা সমাপ্তি হয় তাহার উল্লেখ নাই; সেইজন্য সন্দেহ হয়। জজ সারদাচরণ মিত্র 'পুরন্দর খাঁ' নামক পুস্তকে অলীক গল্পকথা বলিয়া ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত ওৎকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে,—"অনুমান ১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে সেনবংশীয় রাজারা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন। এই বংশের প্রথম রাজা আদিশূর (তাঁহার প্রকৃত নাম বীরসেন মতান্তরে বীরসিংহ বা শূরসেন) তাঁহার উত্তরাধিকারী বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।"

আইন-ই-আকবরী মতে বল্লাল ৯৮৭ শকাব্দে বা ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন।

বল্লাল সেনের রচিত "দান সাগর" গ্রন্থ ১২৯৭ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হয়, যে সময়ে জাল গ্রন্থ প্রণয়ন চলিতেছিল। এই সময়েই বল্লাল সেনকে কেহ আদিশূর রাজার দৌহিত্র ও শ্রীধরের পুত্র বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন,—

"আদিশূর মহারাজা জগতে বিখ্যাত।
তাঁহার দৌহিত্র বল্লাল শ্রীধরের সুত॥"

এখন বল্লাল সেন সম্বন্ধে কি কথা বলা যাইতে পারে, ইতিহাস পাঠক তাহা বিবেচনা করুন।

"কায়স্থ পুরাণ" নামক একখানি নূতন পুস্তকে বল্লাল সেনকে জন্ম সেনের পুত্র বলা হইয়াছে। কোন কোন কায়স্থ কুলগ্রন্থে ও কায়স্থ পুরাণে বিজয় (সেন) কে "আদিশূর" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

যে ব্রাহ্মণ দেবীবর ঘটক কৌলিন্য মর্য্যাদা শ্রেণীবদ্ধ করেন, তাঁহাকেই

অনেক উপবীতধারী নব্য কায়স্থ (ক্ষত্রপ কায়স্থ * নয়ত !) মণ্ডলী বল্লাল সেনের পুত্র বলিতেছেন !

"কল্পদ্রুম" গ্রন্থে আছে—"কায়স্থ পুরাণকার কায়স্থ দিগের বঙ্গদেশে আগমন সম্বন্ধে যে বৃত্তান্তটি (আদিশূর ও বীরসিংহের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় বিবরণ) বর্ণন করিয়াছেন, আহা পাঠ করিলে আপাততঃ কল্পিত উপন্যাস বলিয়া মনে হয় না কি ?" রামপাল আদিশূরের রাজধানী ছিল ! রাঢ়ে নয় ? কিন্তু রামপালের নিকটে কুকী, লুসাই, ভীল, কলিতা প্রভৃতি নীচ জাতীয় হিন্দুদের বসবাস আছে।

পাইক পাড়ার রাজবাটী হইতে প্রাপ্ত কুল কারিকায় আছে,—বাৎস্য গোত্রীয় ব্যাস সিংহ বল্লাল সেনের মন্ত্রী ছিলেন ! অবশ্য যেমন "বৈদ্য রাজমালা" গ্রন্থে ধীসেন দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, নয় কি ? এইরূপ জালকথার বর্ণনায় কুলগ্রন্থ কায়স্থকুল নষ্ট করিতেছে। ঐ ব্যাস সিংহের বাস করাতীয়া গ্রামে ছিল। বল্লাল সেনের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ ছিলনা।

বঙ্গের অর্দ্ধ কল্পিত সেন রাজগণ কেহ কেহ 'সোমবংশ প্রদীপ' বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়াছেন। মণ্ডি রাজবংশে রূপসেন নামে কোন রাজার নাম দেখা যায়না। তবে তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় সেন এবং সিংহ তাঁহাদের উপাধি। প্রবাদ যে ইহারা 'চামার গৌড়' রাজপুত বংশীয়।

বন বিষ্ণুপুর মুসলমানগণের নিকট হইতে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল, অথচ জাল-ইতিহাসের বল্লাল সেনের বেটা লক্ষণ সেনের রাজ্য সতর জন ছোঁড়ায় বিনাযুদ্ধে ছিনাইয়া লইল, আর তাহার সেনাপতি ছিল বাৎস্য গোত্রীয় রাণা লক্ষ্মীধর সিংহ। এ যেন স্বপ্নরাজ্যের কথা।

---

* "ক্ষত্রপ কায়স্থ" শব্দ আজকাল কায়স্থ লেখকদিগের কল্পনা প্রসূত। পুরাকালে "সৎশূদ্র" উপাধি দক্ষিণ রাঢ়ীর কায়স্থগণ সগর্ব্বে ধারণ করিতেন।

আদিশূর, বল্লাল সেন ও মেরুতন্ত্র নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ লইয়া অনেক জালকথা ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। এই মেরুতন্ত্রে "হিন্দু" শব্দের এক ব্যুৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে, যথা—"হীনং দূষয়ত্যেব হিন্দু রিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।" বোধহয় এই পুস্তক ১৩০০ বঙ্গাব্দে বা কিছুপূর্ব্বে লিখিত হয়। মেরুতন্ত্রে লণ্ডন (LONDON) নগরের উল্লেখ আছে! সাবাস !!!

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইদিলপুর পরগণায় লক্ষণ সেনের পুত্র কেশব সেনের যে একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহা সত্য নহে, ইহাও শুনিয়াছি।

সুবিখ্যাত পাদ্রী Marshman সাহেব আবিস্কৃত বহুতর শিলালিপি আছে, তাহার একটিরও পাঠোদ্ধার হয় নাই।

শেখ শুভোদয়া গ্রন্থখানি বর্ত্তমান কালের কাল্পনিক গ্রন্থ। কোনও একটি সম্পত্তি লইয়া বিবাদের সময় এই গ্রন্থ লিখিত হয়।

ভূরশুট ব্রাহ্মণ রাজবংশের ইতিহাসে বা শিলালিপিতে বল্লাল সেনের কৌলিন্য "চচ্চড়ী"র বিষয় কিছুই নাই, আদিশূর সম্বন্ধীয় "চাট্নী" ও নাই।

বঙ্গাব্দ ১২২৮ সালে কলিকাতার ক্রোড়পতি রামদুলাল দেব সরকার যখন কায়স্থ সমাজ সমীকরণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহার অব্যবহিত পরেই যে সকল বনিয়াদি কুলীন বংশ নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের বংশধর বলিয়া কতকগুলি অজ্ঞাত নামা ব্যক্তির নাম কায়স্থ কারিকায় লেখা হইতে লাগিল, এইরূপ কথাও প্রচলিত আছে।

দুই শত কি আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে কুল গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছে। এই সকল কোষাদি গ্রন্থ সংগ্রহ করত উহার সার "শব্দ কল্পদ্রুম" নামক বৃহৎ গ্রন্থ প্রচার করেন, রাজা রাধাকান্ত দেব, যিনি স্বগোত্রে (সিংহবংশে) বিবাহ করিয়া গোষ্ঠীপতি হইতে নিষ্ফল চেষ্টা করেন।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্য কাণ্ডে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু জয়ন্তকে আদিশূর, বীরসিংহকে যশো বর্ম্মা প্রভৃতি বলিয়া যে সকল সিদ্ধান্ত

করিয়াছেন, তাঁহার ঐ সকল প্রিয় সিদ্ধান্তের প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার রাজন্য কাণ্ডে পঞ্চাননের কারিকা হইতে সকল বচন উদ্ধৃত করিলেন না কেন? আর পঞ্চাননের কারিকায় যদি (১) ৬৭৭ শকে কোলঞ্চ বা কুবঞ্চ হইতে পঞ্চ বিপ্র ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন (২) আদিশূরের নাম জয়ন্ত এবং পিতার নাম মাধবশূর ছিল (৩) কান্যকুব্জ রাজ যশোবর্ম্মা ও বীর সিংহ একই ব্যক্তি (৪) অনাদিবর সিংহ যশোবর্ম্মার মন্ত্রী ইত্যাদি—এই সকলের পরিপোষক বচন না থাকে, তবে তাহার (অথবা অপর কোন কারিকা) নকলে অর্থাৎ আলোচ্য ঘটক কেশরীর কুল পঞ্জিকায় ঐ সকল বিষয় কোথা হইতে আসিল? এই অনাদিবর সিংহকে বাৎস্য বা বাৎসগ্য গোত্রীয় সাজাইয়া তিনি যে উদ্দেশ্যই সাধন করুন না কেন, একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই মনে হইবে যে, নগেন্দ্র বাবু তাঁহার ইতিহাসে আদিশূর ও বীর সিংহ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল অন্যায় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সমর্থন করিবার জন্যই কতিপয় উত্তর সাধক এই কারিকা খানির উদ্ভাবনা করিয়াছেন। পঞ্চাননের কারিকার সৃষ্টি সম্বন্ধেও অনেক গুজব শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' নগেন্দ্র নাথ বসু, রাজন্য কাণ্ডে, ইতিহাসের নামে এক অদ্ভুত রাজাদের নাম আবিষ্কৃত করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজা ও হিন্দু শাসন কর্ত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

"রাজা পদ্মলোচন সিংহ চৌধুরী।
সপ্তগ্রাম মুলুকের সেইত চৌধুরী॥
হিরণ্য দাস মুলুক নিয়া মোক্তা করিয়া।
তার অধিকারে গেল মরে সে দেখিয়া॥
বার লক্ষ দেয় রাজার সাধে বিশ লক্ষ।
সে তুড়ুক কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ॥"

শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্ত খেতুড়ীর রাজা ছিলেন, তিনি আন্দুলিয়ার রাজাকে কর দিতেন। চাঁদ রায় রাজমহলের জমিদার ছিলেন। চাঁদ রায় স্বাধীন হইয়া রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই,—ঢাকেশ্বরী স্থাপন করিয়া, দস্যুবৃত্তি করিয়া দেশের উৎপাড়ন করিয়াছিলেন মাত্র।

যেমন তালকাণা গায়ক আছে, তদ্রূপ তালকাণা লেখক আছে। তালকাণা লেখকেরা তালের ধার ধারে না, সামঞ্জস্য বুদ্ধি রাখেনা, যাহা মনে আসে তাহাই কলমের মুখে প্রকাশ করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর লেখকের জ্বালায় সমাজ জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে।

১২ পুরুষের যজ্ঞাগত ব্রাহ্মণ সহ ১ম পুরুষের গুহ কায়স্থের বর্ত্তমান থাকা মতিচ্ছন্ন ভিন্ন কেহ কি বিশ্বাস করিতে পারে? কালীদাস মিত্রের প্রথম পুরুষে তারাপতি মিত্র কি সেই কালীদাসের ৮ম পুরুষের ধুই গুই মিত্রের সহ এক বৈঠকে বসিয়া বল্লালের সহিত তাস খেলিতে পারেন? কান্যকুব্জে ইহাদের কোন দয়াদের উল্লেখ নাই।

কুলীন গ্রামের মালাধর বসু, বসুবংশীয় দশরথ হইতে ২৪ পুরুষে জন্ম গ্রহণ করেন। মালাধর বসু নিজেই এইরূপ কুলগ্রন্থে লিখিয়াছেন, এক্ষণে নগেন্দ্র বাবুর মনোমত বসুবংশের বংশলতা কায়স্থ সমাজ লইতে বাধ্য হইবেন কি? ঘটক মালাধর বসু, পুরন্দর খাঁকে ১২ পর্য্যায় বলিয়াছেন, কিন্তু নগেন্দ্র বসু পুরন্দর খাঁকে ১৩ পর্য্যায় বলিয়া প্রচার করিতেছেন!

বাঙ্গলার ইতিহাসে শুধু মহানাদ কেন, সকল পল্লীবাসী উন্নতচেতা নীরব কর্ম্মী অনেক আদর্শ পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই। নিভৃতে ফুটন্ত বনজ গোলাপের সৌরভের স্থায় ইঁহাদের যশোগৌরবও অজ্ঞাত, অনাদৃত, উপেক্ষিত ও অন্তর্হিত, কয়জন ইঁহাদের সন্ধান লয়?

যে চণ্ডীদাসের কবিতা পড়িয়া রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে আবোল তাবোল বকিয়াছেন, সেই চণ্ডীদাসের জন্মভূমি শাকুলীপুর অধুনা নান্নুর গ্রামে তিনি কখন একবারও শুভাগমন করিয়াছেন

কি? তিনি বলিয়াছেন, "একদিন যখন নান্নুরের নাট্যশালা চণ্ডীদাসের কীর্ত্তনানন্দে মুখরিত হইতে লাগিল, তখন সহসা সেই প্রেম-স্নিগ্ধ নিকেতন নবাব সৈন্যের কামানের শব্দে কাঁপিয়া উঠিল। কামানের গোলায় নাট্য-শালা পড়িয়া গেল। পাঠক,—বাঙ্গলার ইতিহাস লক্ষ্মী যদি এই সুলতানের নামটা একবার বলিয়া দেন, তবে আমরা তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা পঙ্কবাব্যে শোধন করিয়া গৃহে স্থান দিব।" ইতিহাসের কি মাল মসলা! একটা কথা সকলেই জানেন, কৃত্তিবাস চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কবি। আচ্ছা, পূর্ব্ববর্ত্তী কবি চণ্ডীদাস যদি দীনেশ বাবুর গবেষণার ফলে পুত্র যদু বা জালাল উদ্দিনের সমকালবর্ত্তী হন, তবে পরবর্ত্তী কবি কৃত্তিবাস কিরূপে পিতা গণেশের সম সাময়িক হইবেন? অথচ একখানি পুথির মধ্যে দীনেশ সেন—১৩৩ পৃষ্ঠায় ও ২১৩ পৃষ্ঠায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে এই কাণ্ড ঘটাইয়াছেন! চণ্ডীদাস সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা এই,—নান্নুরের নিকটবর্ত্তী কীর্ণাহারে কিঙ্কিণ নামে এক রাজা ছিলেন। কিলগির খাঁ নামে এক পাঠান দস্যু (নিখিল নাথ রায়ের মতে "জগৎপতি পাঠান" হইতেও পারে) রাজাকে হত্যা করিয়া কীর্ণাহার ও নান্নুর অঞ্চল অধিকার করিয়া হিন্দু মন্দির সমস্ত বিধ্বস্ত করে। কিঙ্কিণের রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ কীর্ণাহার আজিও আছে, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কখনও এই স্থানের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছে কিনা শুনা যায় নাই। কিঙ্কিণের শস্যশালার নাম ছিল লাজডিহি, ও দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মথুরাবাটী নামে পরিচিত। কুলগ্রন্থে আছে,—"মথুরায় ঘর কৈল মৌদগল্য নন্দন।" সভাপণ্ডিতের আবাসবাটীর নাম ছিল,—জ্ঞান-চন্দ্রিকা। কিঙ্কিণের রাণী দুর্গাবতী যেখানে বাস করিতেন, সেই স্থান এখনও রাণীপাড়া নামে খ্যাত। পাঠানরা যেখানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন, সেই স্থান এখন পাঠান ডাঙ্গা নামে পরিচিত। সাহিত্য-পরিষদে চণ্ডীদাসের মৃত্যু বিষয়ক কবিতার একখানা পুথি আছে। পুথির লেখক চণ্ডীদাসের হত্যাকারীকে

গৌড়েশ্বর বলিয়াছেন। আর যাইবে কোথায়? অমনি গবেষণা চলিল এই সম্রাট কে? অবশ্য গবেষণা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে নয়। মিঃ ক্যানিংহাম, ষ্টাপেলটন ইত্যাদির সহিত! কৃত্তিবাসের কবিতায় হিন্দু রাজাকে গৌড়েশ্বর সম্বোধন দেখিয়া রায় বাহাদুর ও ডি, লিট,—ডাক্তার এমনই গবেষণা করিয়া গোবর গণেশকে বাহির করিয়া দেন। কিন্তু রায় বাহাদুর ডাক্তার, রায় সাহেব এম, আর, এ, এস,—বন্ধুর মত জানেননা যে, সেকালের লেখকদের অন্যান্য বাতিকের মধ্যে গৌড়েশ্বরও একটা বাতিক ছিল? অনেক বাতিকগ্রস্তের আবার এক গৌড়েশ্বরে শানাইতনা, পঞ্চ গৌড়েশ্বর না বলিলে তাহাদের তৃপ্তি হইতনা। আদিশূর, বল্লাল সেন, বজ্রবর্ম্মা প্রভৃতির ন্যায় আশ্রয় দাতা অনেক গ্রাম্য ভূস্বামী এইরূপে রঙ্গভরা বাঙ্গালী কবির হাতে পড়িয়া গৌড়েশ্বর বনিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি মুকুন্দরাম বলিয়াছেন,—

> "ধন্য রাজা মানসিংহ
> গৌড়, বঙ্গ, উৎকল অধিপ।"

এই মানসিংহ অম্বরের রাজা, দিল্লীর আকবরের শ্যালক, হিন্দু রাজাদের ঘাতক, ১৫০টি রমণীর পাণিপীড়ন করিয়া প্রসিদ্ধ হন।

মানুষ বিধাতার দেনাদার,—সে দেনা তাহাকে শোধ করিতেই হইবে, এই দেনার দুর্ব্বিসহ দুঃখের 'ফিলজফিই' কবিতার প্রাণ।

মহারাজ চন্দ্রকেতু সিংহের ভগলপুর হইতে খুলনা পর্য্যন্ত একটি প্রাচীন খাল ছিল। এই খাল স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। খাল মজিয়া গেলেও কলিকাতায় যে স্থানে "ক্রীক রো" আছে, সেই স্থান দিয়া ঐ খাল প্রবাহিত হইত। ধাপার মাঠ হইতে যশোহরের কতকাংশে সেই খাল কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে। এই সকল প্রাচীন তত্ত্ব বহুল কথা না প্রচার করিয়া রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় "বাঙ্গলার ইতিহাস" লিখিতেছিলেন!

১৯০৯ খৃঃ ঐতিহাসিক রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার পার্শী শিক্ষক মৌলবী খয়র উল্ আনাম ও শ্রীযুক্ত হেম চন্দ্র দাস গুপ্তের সহিত ২৪ পরগণা বারাসত-বসিরহাট রেলের বেড়াচাঁপা ষ্টেশনের এক মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে চন্দ্রকেতুর গড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে আসিয়া ১৩১৩ সালের "বার্ষিক বসুমতী"তে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়—"দুই একটি পুরাতন পুষ্করিণী এবং কতকগুলি মাটীর ঢিবি ব্যতিত চন্দ্রকেতুর গড়ে দেখিবার জিনিষ কিছুই নাই।" কিন্তু মহানাদে রাজা চন্দ্রকেতুর অসংখ্য স্মৃতি নিদর্শন রহিয়াছে, এদিকে ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি নাই কেন?

অনেকে ২৪ পরগণার বালাণ্ডায় চন্দ্রকেতুর রাজধানী ছিল বলিয়া থাকেন, কিন্তু নবীন চন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন, এই বালাণ্ডা প্রাচীন বলবল্লভী রাজার রাজধানী ছিল। এই বলবল্লভীর সহিত চন্দ্রকেতুর কি সম্পর্ক ছিল, রাজা বলবল্লভী—মহানাদ রাজবংশের সন্তান ছিলেন কি না অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। হিন্দু—অতুল ঐশ্বর্য্য, তাহার শোভা ও গৌরব বৰ্দ্ধন করিতে কখনও কাতরতা প্রকাশ করে নাই, প্রাচীন গ্রাম নগরের ইতিহাস তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

দেবীবর ঘটকের সমকালীন চট্টোপাধ্যায় মুলোপঞ্চানন আপন গোষ্ঠীকথায় লিখিয়া গিয়াছেন বলিয়া, একটি শ্লোক প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু শ্লোকটির ভাষা ও বানান বর্ত্তমান কালের; সুতরাং জাল। একটু নমুনা দিতেছি—

"রাজা হলে রাজন্য সেনা ভাবে অন্যথা।
পতিত কাম্বোজাদি গৌড়ে ক্ষত্র যথা॥

*   *   *

বৈদ্য রাজা আদিশূর ক্ষত্রিয় আচার।
বেদে ব্রহ্মবৎ কার্য্যে মাতৃ ব্যবহার॥"

দেশ প্রসিদ্ধ "বার ভূইয়া" দিগের নাম অন্যত্র এইরূপ পাওয়া গিয়াছে—

১।	চাঁদ রায়	...	... শ্রীপুর
২।	প্রতাপাদিত্য	...	... যশোহর
৩।	লক্ষণ সিংহ	...	... কর্ণগড়
৪।	ঈশা খাঁ *	...	... খিজিরপুর
৫।	মুকুন্দ রায়	...	... ভূষণা
৬।	কাশীনাথ বা সমর সিংহ		... আন্দুলিয়া (নদীয়া)
৭।	গৌরবর সিংহ	...	... ঐ কায়েতপাড়া গড়
৮।	হাম্বির মল্ল	...	... বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া
৯।	অনুমল্ল	...	... বল্লঘরিয়া
১০।	মহেন্দ্র খাঁ	...	... মহানাদ
১১।	পীতাম্বর	...	... পুঁটিয়া
১২।	রামকৃষ্ণ	...	... সাতৈল

বার ভূইয়াদের প্রকৃত নাম বিলুপ্ত। কাল্পনিক কতকগুলি নাম অন্যান্য পুস্তকে পাওয়া যায়। তবে আকবর যে রাজা কাশীনাথকে হত্যা করিয়া বঙ্গরাজ্য জয় করেন, তাহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। তথাপি আধুনিক লেখকেরা কাশীনাথের নামোল্লেখ করেন না। ৺রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গ বিজেতা'য় ও কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের 'নদীয়া কাহিনী'তে ইহার আভাস পাওয়া যায়।

মোগল সৈন্য লইয়া আকবরের সভাসদ প্রতাপাদিত্যের † আগমন

* প্রবল পরাক্রান্ত ১২ ভূঞার অন্যতম জমিদার ঈশা খাঁর পিতা হিন্দু ছিলেন, নাম কালিদাস সিংহ, আন্দুলিয়ার সুবর্ণপুরে বাস করিতেন। (২১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

† যশোহরের প্রতাপাদিত্য হইতে এই গুহ বংশীয় প্রতাপাদিত্য স্বতন্ত্র ব্যক্তি কিনা সন্দেহ হয়।

সংবাদ পাইয়া সুবুদ্ধি খাঁ সিংহের বংশধরেরা স্ব স্ব গৃহস্থ দেবমূর্ত্তি সকল লইয়া পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থানে পলায়ন করেন। বর্ত্তমান ঐতিহাসিক নাট্যকারদের যশোহর গৌরব রবি প্রতাপাদিত্যের পতনের পর তাঁহার বাসস্থান লুপ্ত হইবার কারণ এ যাবৎ কেহ উল্লেখ করেন নাই। আম্লু-লিয়ার সিংহবংশ ধ্বংসের স্পৃহা প্রতাপাদিত্যের মনে কেন জাগিয়াছিল এবং কেন তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজা কাশীনাথ সিংহকে হত্যা করেন, তাহার আলোচনা কেহ করেন নাই কেন? মেদিনীপুর চেতোয়া দাসপুর গ্রামে সিংহ বংশীয়দের নিকট অনেক প্রাচীন কাগজে প্রতাপাদিত্যের মোগল পক্ষ অবলম্বনের কাহিনী লেখা আছে।

১৬২৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীবৎসের পৌত্র সুবুদ্ধি খাঁ—লক্ষ্মী নারায়ণ সিংহ যে বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মাণ করান, তাহা অদ্যাপি ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের এক জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন স্বরূপ হিন্দুর শিল্পকুশলতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সুবুদ্ধি খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মান্তারার উত্থান শেষ হয়। মুরশিদাবাদের নবাব, সুবুদ্ধি খাঁ কর না দেওয়ায় মান্তারার সিংহ বংশীয় ভূম্যধিকারী সকলকেই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ রাখিতে আদেশ দেন। আম্লুলিয়ার সুবুদ্ধি খাঁর বংশধরদের সবিস্তার ইতিহাস, একমাত্র কন্যা সরস্বতী ব্যতিরেকে অদ্যাপি গভীর তমসাচ্ছন্ন।

১২৮০ খৃষ্টাব্দে আম্লুলিয়া গড়ের রাজা দনুজামাধব সিংহের সহিত দিল্লীর মুসলমান সর্দ্দার বালিন বা বুলবনের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে আম্লুলিয়ার আর এক রাজা দনুজমর্দ্দন ছিলেন, আবার এই নামে অন্যত্র আর এক রাজার নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়।

১৩১০ খৃষ্টাব্দে বগুড়া-সেরপুর রাজা অচ্যুত সিংহের অধিকারে ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ঐ স্থানে মুসলমান দল যুদ্ধ করিয়া হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে। সিংহ বংশের বংশাবলী হইতে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানরা ইঞ্চি ইঞ্চি করিয়া বঙ্গদেশে মুসলমান রাজ্যের বিস্তার

করিয়াছিল। মেজর ফ্রাঙ্কলিন Major Franklin পাণ্ডুয়াতে একখানি ফারসী ঐতিহাসিক গ্রন্থের হস্তলিখিত কাগজ (Manuscript) পাইয়াছিলেন। ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়ার এক নাম ছিল—ফিরোজাবাদ। দনুজমর্দ্দন, গণেশের পুত্রকে পাণ্ডুয়া বা পেঁড়ো হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তথায় "পাণ্ডু নগর" নাম দিয়া মুদ্রা প্রচার করেন।

রাজা রামনাথ দনুজমর্দ্দন
|
রাজা রমাবল্লভ
|
রাজা কৃষ্ণবল্লভ
|
রাজা হরিবল্লভ

এই রামনাথ—রাজা রাঘবানন্দ সিংহ খাঁর পুত্র ছিলেন। বোধ হয়, রাজা হরিবল্লভের পর এই বংশ নির্ব্বংশ হয়। ইহাদের বিষয় কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই রাজবংশের নামে অনেক জালকথা ইতিহাসে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বাঙ্গলার কায়স্থ-সমাজগুলির মধ্যে কোনটারই বয়স ৩।৪ শত বৎসরের অধিক নহে। চন্দ্রদ্বীপের রাজা দনুজমর্দ্দন কি দনুজমাধব, এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ কিছুমাত্র আমাদের নাই।

মেদিনীপুরের অন্তর্গত তমলুক, সুজামুঠা, ময়নাগড়, তুর্কা, বালীসীতা প্রভৃতি রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস কোনও কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় না। লাট ও কঙ্কদ্বীপের মাহিষ্য রাজাদের নাম কোনও পুস্তকে পাওয়া যায় না। পাঠান রাজত্বের কিছু পূর্ব্বে হুগলী জেলার দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত যে জলে প্লাবিত ছিল, তাহার নিদর্শন এখনও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। এই সকল কথা আধুনিক ইতিহাসে বা কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় না।

যে কালে সুদূর বরেন্দ্র ভূমিতে কৈবর্ত্তপতি দিব্যক অরাজকতা

উপস্থিত করিয়াছিলেন,সেই সময় মহানাদে সিংহ কুলচূড়ামণি অদ্বিতীয় বীর কায়স্থদিগের শিরোমুকুট মহারাজ প্রতাপ সিংহ ধীরে ধীরে শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় দিয়া কীর্ত্তিমান স্বাধীন নৃপতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। আধুনিক ইতিহাসে পাওয়া যায়—"সামন্ত সেন শূরবংশীয় নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া সিংহপুরে রাজত্ব করিতে থাকেন, তৎপুত্রই বিজয় সেন।" এই বিজয় সেনকে কায়স্থ কুলগ্রন্থে আদিশূর তুল্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন!!! ইহা যদি জালকথা না হয়, তাহা হইলে 'জালকথা' শব্দ অভিধান হইতে উঠিয়া যাওয়াই উচিত।

প্রাচীন ঘটকদিগের গ্রন্থ বিলুপ্ত। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এই সকল কুলগ্রন্থ নষ্ট হইবার নিশ্চয় একটা ভীষণ দুরভিসন্ধি ছিল।

বিশ্বকোষ প্রেস হইতে অজ্ঞাত বংশাবলী বাহির করিয়া চৌলার রাজা লক্ষণ সিংহকে চিতোরের "রাণা" বলিয়া অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ডে গল্পকথা ও এক বৈদ্য বল্লাল সেনের বংশাবলী প্রকাশিত করিয়া এক অভিনব রচনা গরজের বাহাদুরী দেখান হইয়াছে।

বর্ত্তমানে কলিকাতায় উপবীতধারী নব্য কায়স্থেরা প্রাচীন ঘটকদের গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য ও লুপ্ত দেখিয়া স্বইচ্ছায় নূতন কায়স্থ সমাজ গঠন করিতেছেন বলিয়া সকল বনিয়াদি কায়স্থেরা মর্ম্মাহত হইয়াছেন। জাল পুস্তক রচিত হওয়ায় ইতিহাস লেখার পথও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে।

ফেরিস্তা নামক মুসলমান ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে, শাকল দ্বীপ বা শাকলাদ্বীপ পারস্য হইতে আসিয়া পূর্ব্বভারত জয় করিয়া খৃঃ পূঃ ৬০০ বর্ষেরও পূর্ব্বে এখানে গৌড় নগর প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে এদেশে সিংহল পাটন বলিয়া বর্ণিত হইত, বিজয় সিংহের নাম হইতেই প্রমাণিত হইবে। আর সেন রাজবংশের বাসুকী গোত্র ছিল কিনা আলোচনা করিয়া দেখা হয় নাই, যদিও ভরদ্বাজ গোত্রের সেনবংশ দীর্ঘংগা সমাজেরই বলিয়া থাকেন। নদীয়া জেলায় যখন সেনবংশ ছিলেন বলিয়া

কথিত হইতেছে, তখন দীর্ঘংগার সেনবংশের ইতিহাস না আলোচনা করিয়া লুপ্ত ও অজ্ঞাত সেন রাজবংশের ইতিহাস লেখা কি ধৃষ্টতা নহে?

মনে করুন, যখন মুসলমানেরা বঙ্গ বিজয় করিতে আসিয়াছিল, তখন ঐ সময়ে দীর্ঘংগার সেন, মহানাদ—আম্লুলিয়ার সিংহ, দশঘরার পাল, বরাটের গুহ, বাশি-থানার দত্ত, আকনার ঘোষ প্রভৃতি কি শুধু লাঙ্গল কাঁধে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল? আকবরের সময় ১৮ বৎসর বিদ্রোহ করিয়াছিল কাহারা?

বঙ্গীয় শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে "দেবগ্রামী সমাজ" নামে একটি সমাজ আছে। এই দেবগ্রাম আম্লুলিয়া হইতে বেশী দূর নয়। নদীয়া জেলার বিক্রমপুর, দেবগ্রাম প্রভৃতি প্রাচীন নগর ও সমাজ স্থানের ইতিবৃত্ত লেখা হয় নাই। যাহা ইতিহাস বলিয়া লেখা প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক গল্প মাত্র।

কলিকাতার নিকটে পাইকপাড়া গ্রাম অদ্যাপি অবস্থিত আছে। বৃটীশ রাজত্বের প্রারম্ভে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এই স্থানে বসতি স্থাপন করেন। ইনি মুরশিদাবাদ জেলাস্থ কান্দি হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু এই স্থানের নিকটে মোগলমারী নামক স্থানে একজন সিংহবংশীয় রাজা ঐস্থানে মোগলদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। প্রবাদ যে এই রাজা লক্ষ্মীকান্ত সিংহ ছিলেন। ইনি বঙ্গদেশে ভয়ানক বিদ্রোহ করেন। "বাঙ্গলার নবাবী আমল" গ্রন্থে একবার উল্লেখ থাকিলেও বাঙ্গলা সাহিত্যে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী লেখকেরা রাজপুতনা ও মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক ব্যক্তি লইয়াই বাঙ্গালীর কাব্য, নাট্য ও উপন্যাস লিখিয়া থাকেন, ইহাই বাঙ্গালী লেখকের বিশেষত্ব।

পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ক্রৌঞ্চশ্বভ্র, গোপিপ্পলী, মাঠাশাল্মলী ও পলিতক গ্রাম কোথায় ছিল তাহার ইতিহাস নাই, তথাপি অজ্ঞব্যক্তিগণ বর্ত্তমান কুলগ্রন্থগুলি সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া কেহ রাজা গণেশকে

ব্রাহ্মণ, কেহ কায়স্থ বলিয়া প্রমাণ করিতে ব্যস্ত !!! অজয় নদের তীরে ঢেকুর বা ত্রিষষ্টীগড় কোথায় ছিল ? পশ্চিম রাঢ়ের সদ্গোপ রাজ্যের ইতিহাস এদেশে বিলুপ্ত কেন ?

ভাগীরথী তটে যে প্রাচীন গ্রাম "সিঙ্গা" নামে খ্যাত আছে, বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ বলেন—"তথায় আদিত্যশূর রাজত্ব করিতেন।" "সেই আদিত্যশূরের রাজধানীকে সিংহগড় বলিত।" ইহাও কি সম্ভব ? ইহা কোন্ শিলালিপি বা তাম্রশাসন মতে ধার্য্য হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিবার কাহারও সাহস হয় নাই। আবার রাঢ়ের "সিংহপুর অঞ্চলে পালরাজবংশ স্বাধীন নৃপতি ভাবে রাজত্ব করিতে পারেন।" তথাপি এই সকল লেখকেরা সিংহরাজবংশটি বাদ দিয়া মনগড়া কথা কহিতেছেন না কি ?

বঙ্গেশ্বর সোমশূর অপুত্রক ছিলেন বলিয়া একজন অজ্ঞাত নামা ব্যক্তি নিজবাহুবলে রাজা হইলেন ? ইনিই কি দীর্ঘংগার সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বল্লাল সেন ?

শশাঙ্কের সময় বীরেন্দ্র সিংহ, বিধু সেন, বিনয় সেন জীবিত ছিলেন। দীর্ঘংগার রাজা বিনয় সেন শশাঙ্কের মহা প্রতিহার ছিলেন। রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসু ইতিহাস রচনা করিতে গিয়া যে সকল ঠাকুরমার গল্প বলিতেছেন, এদেশে তাহা ইতিহাস বলিবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার "বারেন্দ্র বিবরণ" গ্রন্থে অলীক গল্প কথার অবতারণা করিয়া ঐ বারেন্দ্র কায়স্থদিগের অন্তরে আঘাত দিয়াছেন। সত্যের অনুরোধে এই সকল কথার উল্লেখ করিতে হইতেছে, তাঁহার লেখনীর সমালোচনা অনাবশ্যক মনে করি।

এদেশে জাল সাহিত্যের ইতিহাস কেহই লিখেন নাই, সম্প্রতি প্রসিদ্ধ রাজা মদনমল্ল সিংহ, মদনমল্ল পরগণা যাঁহার নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাঁহাকে "দত্ত" বংশীয় বলিয়া এক প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষা চয়ন করিয়া একখানি পুরাতন বাঙ্গলায় রচিত নূতন পুস্তক 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের'

পত্রিকার পৃষ্ঠে স্থান পাইয়াছে, যে দেশের এইরূপ জঘন্য মনোবৃত্তি, সে দেশের ইতিহাস লেখা না হওয়াই ভাল।

কেহ কেহ বলেন, "আদিশূরের পর গোপালকে গৌড় সিংহাসনে বসাইয়া আবার বৌদ্ধ বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিল"—ইহা অসত্য মিথ্যা কথা।

মহাস্থানগড়ে রাজা মহেন্দ্র সিংহ পরাক্রমের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মীনসায় নামক আর একটি রাজার নাম পাওয়া যায়, ইনি গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংসকারী কায়স্থ জাতীয় লোক ছিলেন। পাণ্ডুয়া হইতে আরম্ভ করিয়া মাধাইপুরের বিলের পশ্চিম পার্শ্বদিয়া মাড়গাঁ, মাধাইপুর, ভাটুয়া, শান্তিপুর, প্রভৃতি গ্রামের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। মাধাইপুরকে মাধব সিংহ বা মাধাই সিংহের গড় বলে। করতোয়া তীরস্থ মহাস্থানে, দেবকোটে দেবহুতি নামক রাজা এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। পালবংশের পূর্ব্বে খড়্গবংশের অভ্যুদয়, এই সময় শূরবংশ কোন স্থানে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন, যখন আধুনিক সাহিত্যে শূরবংশকে লইয়া এত অধিক কেলেঙ্কারী চলিতেছে, কিন্তু এই সময়ের ইতিহাস যখন আমাদের নাই, তখন এই সময়কার আদিশূরকে লইয়া এত মাথা ঘামাইবার কারণ কি?

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"মনে হয় আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণানয়ন প্রসঙ্গ কুলাচার্য্যগণের উর্ব্বর মস্তিষ্ক প্রসূত অসার কল্পনামাত্র নহে।"

হরিদাস নন্দী লিখিয়াছেন—"শূরবংশীয়গণের নবদ্বীপ নগরে রাজধানীর কথা যদিও ঐতিহাসিকগণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক ইতিহাস দিতে সমর্থ হন নাই, তাহা হইলেও কিম্বদন্তী একেবারে ভিত্তিশূন্য এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় না।" কিন্তু ইতিহাসে প্রায় ২৫ পুরুষের শূরবংশাবলী বিশ্বকোষ প্রেস হইতে "ম্যানুফ্যাকচার" করা হইয়াছে। আরও কত কি হইবে, একটু ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করুন।

যে বৈদ্য কুলোদ্ভব দীনেশ সেন লিখিয়াছেন,—রাজা যশোবন্ত সিংহ বৰ্দ্ধমানের রাজা ছিলেন (?), সেই রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন বলিয়াছেন (বেশীদিন আগে নয়, "মহানাদ প্রথম খণ্ড" প্রকাশিত হইবার অল্পদিন পূর্ব্বেই),—"বাঙ্গলা দেশটা কি ছিল, তাহা জানিতে চাহিলে এমন একখানা ইতিহাস বা বিবরণী নাই, যাহা আমাদিগকে এদেশের সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করিবে।" কিন্তু সেন মহাশয় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' এর উপবীতধারী বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি "বিদ্যা ভুরভুড়ী" বা "বিদ্যাপুকুরদে"র অভিজ্ঞতা দেন না কেন? এবং তিনি ধোয়ী কবির বংশধর বলিয়া কে প্রচার করিল।

শ্রীহট্টে কায়স্থ ও বৈদ্য অদ্যাপি আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন এবং সম্প্রতি লুপ্ত হইলেও পূর্ব্ববঙ্গে বাঙ্গালদের মধ্যে ঐরূপ বিবাহ প্রথা ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, তথাপি সেন মহাশয় কায়স্থ হইতে চাহেন না, একেবারে ব্রাহ্মণ !!! *

কয়েক বর্ষ হইতে প্রত্যেক জেলার ইতিহাস লিখিত হইয়াছে। তাহার একখানিও ইতিহাস বলিবার উপায় নাই। শোভাসিংহ দেশোদ্ধারের ব্রত লইয়াছিলেন বলিয়া, নিখিল নাথ রায় বলেন—"দস্যু শোভাসিংহ জগৎপতি সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।" অবশ্য এই জগৎপতি দিল্লীর হিন্দুধর্ম্ম বিদ্রোহী আরংজীব! কিন্তু নিখিল রায়ের মত সকল হিন্দুই গোলামে পরিণত হয় নাই। পশ্চিম বঙ্গে এখনও মানুষ আছে। যে পূর্ব্ববঙ্গ পাণ্ডব-বৰ্জ্জিত দেশ বলিয়া আর্য্যদিগের নিকটে অনাদৃত হইত, তাহারাই দেশের ইতিহাস লিখিবে !!!

একজন পূর্ব্ববঙ্গের লোক যেমন জাভাদ্বীপে গেলেন, অমনি তিনি ঐ দ্বীপে অগস্ত্য মুনির ভগ্ন ধাতুমূর্ত্তি কুড়াইয়া পাইয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ

* রাজা রাজবল্লভকে ব্রাহ্মণেরা উপদেশ বা ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, বৈদ্যেরা কোমরে পৈতা রাখিতে পারে এবং সে সময়ে বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের দাস বলিয়াই পরিচয় দিতেন।

হইতে তাম্রশাসন, শিলালিপি, প্রাচীন কুলগ্রন্থ, এত শীঘ্র শীঘ্র আবিষ্কৃত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে স্তূপাকার হইতেছে যে, তাহা হইতে বাঙ্গলার ইতিহাস চরমে উপস্থিত হইবে। বলি, পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন ইটগুলা, প্রস্তরাদি মুসলমানদের যে নয়, তাহারই বা প্রমাণ কি? আর পূর্ব্ব বঙ্গের বৈদ্য বা কায়স্থ যাহা পারে, তাহা পশ্চিম বঙ্গের ব্রাহ্মণেও পারে না। এই দেখ, "গণেশের শুঁড় কেন"—এই গবেষণা করিয়া দক্ষিণের বিদ্যাভূষণ বিদ্যার লম্বা মাপকাটি দেখাইয়াছেন। এত বিদ্যা আছে বলিয়াই ত কায়স্থ পৈতা লইতেছে।

ব্রাহ্মণের সৃষ্টি প্রতিভা আজ ব্যাথায় ম্লান, কিন্তু শক্তির উৎস অফুরন্ত। স্যর জন মার্শাল প্রশ্ন তুলিয়াছেন—"মিসর ও ভারত কে কাহার নিকট ঋণী।" একথা পূর্ব্ব বঙ্গের দিগগজ কায়েত বদ্দী না হইলে জবাব দিবে কে? এক বৈদ্য জবাব দিয়াছে—"আশ্চর্য্য হইবার কারণ নাই, আমরা (?) ই মিশরের কাছে ঋণী।" সাবাস !!! যে অনুতাপ হোমাগ্নির মত আহুতিকে দগ্ধ করিয়া নবজন্ম দান করে, সে অনুতাপ সংসারে একান্ত দুর্ল্লভ। •

আবার শুনুন,—আর এক উপবীতধারী পণ্ডিত কি বলেন,—

"It is of course true that the ancient Itihasa-Vedas is no longer to be found. But it has been lost to us beyond recovery. Perhaps it can be recovered in fragments from our extant literature on stories."

সাবাস! এরাই দেশটাকে ডুবাইল। তারপর ঐ পণ্ডিতটা আরও বিদ্যা ফলাইয়াছেন,—

"The Mohabharata is the last remnant of the ancient Itihasa-Veda."

পাঠক, পাঠিকাগণ মনে রাখিবেন, এই প্রকৃতির লোকের জন্ত ইউরোপীয়ানগণ এদেশে আসিয়া তোমায় ও আমায় ঘৃণা করিয়া থাকে।

আত্মশক্তি যাহার হয় প্রতিষ্ঠা, সেই পারে জগতের উচ্চতর মহত্ত্বর দিক্‌গুলি ভাল করিয়া দেখিতে, অনুভব করিতে। অনার্য্যোচিত বিদ্যা শিক্ষার প্রথায় আর্য্যবংশধরগণের মেধা ও শক্তি হীন করিয়া দিয়াছে।

নসীপুরের রাজা বাৎস্য গোত্রীয় দেবী সিংহ ও কান্দীর রাজা দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ সারা জীবন কেবল অন্যায় কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহাদের লইয়া কিছু ইতিহাস লেখা চলেনা। ইহারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়া ছিল কিনা, ইতিহাস তাহা বলিয়া দেয়।

গৌড়রাজমালা লেখক মহাশয় রায় সাহেব নগেন্দ্র নাথ বসুর কথা কল্পিত ও মিথ্যা বলিয়াছেন। নগেন্দ্র বসু বলেন—"সেনরাজগণের প্রাচীন লেখমালায় সর্ব্বত্রই তাঁহাদের বৈদিক ধর্ম্ম প্রিয়তার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।" নগেন্দ্র বসু কোথায় যে "সেনরাজগণের প্রাচীন লেখমালা" দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা তিনি বলেন নাই। অল্পদিন হইল নগেন্দ্র বসু বাৎস্য গোত্রীয় সিংহবংশীয়দের বল্লাল সেনের প্রধান সেনাপতি প্রভৃতি আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন, সে সংবাদও আমরা রাখি।

ধর্ম্মপাল নিশ্চিতই ১০২৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গৌড়রাজ ধর্ম্মপাল, আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ক্ষিতীশের পৌত্র ও ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞী ওঝা বা আদি বরাহকে 'ধামসার' গ্রাম প্রদান করেন। এই সকল কল্পিত বচন আধুনিক ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন! বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ মতে আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাবকাল ১০২৪—২৫০—৭৭৪ খৃঃ। এই সময় আদিশূরের রাজ্যকাল কিরূপে সম্ভবে? প্রায় ৭৭৩ খৃঃ কাশ্মীররাজ জয়াপীড় জয়ন্তের কন্যা কল্যাণীর

পাণিগ্রহণ করেন! যখন আদিশূর সম্বন্ধে কোনও শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তখন তাঁহার পুত্র ভূশূর, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর বলা ভাল কথা নহে কি? এবং এই সকল অতিরঞ্জিত কাল্পনিক কথা দ্বারা ইতিহাস লেখায় ও পাঠ করায় অশ্রদ্ধা জন্মেনা কি?

যাঁহারা সেনরাজ বংশ লইয়া দুই তিন শত পাতার পুস্তক লিখিয়েছেন এবং সেনবংশের দীর্ঘ বংশাবলীও প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই বলিতেছেন যে,—"কিন্তু সেন বংশীয় কোন্ ব্যক্তি কোন্ সময়ে রাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন—সেনরাজগণের অদ্যাবধি আবিস্কৃত তাম্রশাসন সমূহে তাহার কোন উল্লেখ নাই।" "বাসুকী কুল গাথা" পুস্তক খানি নিছক কাল্পনিক।

কাটোয়ায় প্রাপ্ত তাম্রশাসন কাহার, তাহা অদ্যাবধি কেহ বলিতে পারিলেন না। উহার কোনও স্থলে "বিজয়" শব্দ থাকায়, বিজয় সেন ধরিয়া লওয়া হইয়াছে নাকি?

ভুজবসুদশমিতে ১০৮২ শকে অর্থাৎ ১২৬০ হইতে ৬১ খৃষ্টাব্দে শ্রীমান্ বল্লাল সেনের রাজ্যাদিতে বিশাখা নক্ষত্রে সপ্তর্ষি ৬১ বৎসর অবস্থিত ছিল—

"ভুজবসুদশ ১০৮২ মিতেশাকে শ্রীমদ্বল্লাল সেনঃ।
রাজাদৌ ষষ্ঠৈকবর্ষে মুনির্বিনিহিতো বিশাখায়াম্॥"

Journal of the Asiatic Society.

নগেন্দ্র নাথ বসু কোন এক স্থানে লিখিয়াছেন—"পঞ্চ গোত্রের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি আদিশূরের নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানিবার উপায় নাই।" তবে এতগুলি 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' লিখিবার উপকরণ ঐ কথার উপর নির্ভর করিয়া লিখিত নয় কি?

ঘটকদের কারিকা প্রায়ই মিথ্যা ও অপকৃত কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য মূর্খের রচিত। ঐ সকল গ্রন্থ লইয়া 'শব্দ কল্পদ্রুম' লেখা হইয়াছে।

বাঙ্গলার ইতিহাসে আজকাল ইদিলপুর প্রভৃতি পাণ্ডব পরিত্যক্ত দেশেও তাম্রশাসন, শিলালিপি, মুদ্রা প্রভৃতির নব নব আবিষ্কার হইতেছে।

যাহা পূর্ব্বে ছিলনা, তাহা নামহীন, বংশ পরিচয়হীন, গোত্রহীন তাম্রশাসন গুলি নিছক জাল ও কূট তাম্রশাসন বা শিলালিপি মাত্র।

দুইখানি "বল্লাল চরিত" দেখিতে পাওয়া যায়। দুই খানিই জাল গ্রন্থ। ঐ পুথি দুইখানি কাগজে লেখা পাওয়া গিয়াছে, তালপাতায় নহে এবং আধুনিক কালি ও কলমে লেখা। চুঁচুড়ায় এক সুবর্ণ বণিক বা সোণার বেণের ঘরে নাকি আর একখানি বল্লাল-চরিত পাওয়া গিয়াছে। এই বহিখানি কিন্তু এখনও প্রকাশিত হয় নাই !!! দেখুন মজার ব্যাপার। একখানি বল্লাল-চরিতেও বল্লালের সময়কার একটিও ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নাই বলিলেও হয়। সমর্থক প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত বল্লাল-চরিত, রাম চরিতের ন্যায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে বল্লাল-চরিত বল্লাল সেনের অস্তিত্বের প্রায় ৪০০ শত বৎসর পরে রচিত হইয়াছে। যখন এদেশে একশত বর্ষের ইতিহাস ঠিক থাকে না, তখন বল্লাল-চরিত একখানি কাল্পনিক গ্রন্থ মাত্র। বল্লাল-চরিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইলে বিক্রমপুরকে অনায়াসে রাঢ়দেশেই স্থাপিত করা চলে। পদ্মার নাম গঙ্গা, আর পাণ্ডব বর্জ্জিত ঢাকায় বিক্রমপুর, একথা বিশ্বাস যোগ্য নহে।

আধুনিক কল্পিত গ্রন্থ শ্যামদাসী ডাক ও পঞ্চাননের কারিকা এই দুইখানি পুস্তকের দোহাই দিয়া ইতিহাস লেখা চলে না। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য, "হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাসে" মহানাদ নগরীর নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই, চন্দ্রকেতু সিংহের নামোল্লেখ করেন নাই, হুগলী জেলার প্রসিদ্ধ বংশের নামোল্লেখ করেন নাই। গ্রন্থকার জনাই-বাকসার মিত্র রাজবংশের নাম শুনেন নাই, প্রসিদ্ধ দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র মিত্রের নামও শুনেন নাই, মহানাদ সিংহরাজবংশের নাম শুনেন নাই। ভাস্তাড়ার ছকুসিংহের নাম শুনেন নাই। সুলতানগাছার মধু মুখুজ্জের নাম শুনেন নাই। ছিনা-আকনার জেনারল কালু ঘোষ বা জাঁদরেল

কালু, সদর দেওয়ানী আদালতের জজ রায় বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ ঘোষের, কবি বনমালী ঘোষের নামও সংগ্রহ করেন নাই, তথাপি ইতিহাস লিখিতে তাঁহার সাধ কেন হইয়াছিল, তাহা লেখকই জানেন।

কলিকাতার একজন উপবীতধারী তিনশত কুলগ্রন্থের জমিদার বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, কিন্তু গত ২৫ বৎসরের মধ্যে একখানিও এ যাবৎ সাধারণে প্রকাশ করেন নাই।

ইদ্রাকপুরের রাজা শ্রীমন্ত দত্ত ছিলেন। এই রাজবংশের প্রাচীন বিবরণাদি কিছুমাত্র কুলগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না বলিয়াই এই সকল গ্রন্থের অসারতা প্রমাণিত হইতেছে। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে যদুনন্দনের পঞ্চ ঢাকুর প্রকাশ করেন। প্রাচীন গ্রন্থখানি কেহই দেখেন নাই, তবে মজুমদার মহাশয় নূতন খানি প্রকাশ করিয়া নিজেই ব্যক্ত করিয়াছেন, যে,—ঢাকুর গ্রন্থের কয়েকখানি হস্তলিপি গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া একখানি ঢাকুরগ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং বংশাবলী অনুসারে স্থানে স্থানে নাম সংযোগ ও অপরাপর প্রচলিত কুলপঞ্জিকার বিরোধী রচনাগুলি পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছেন।

ঔডুম্বর, পঞ্চাল প্রভৃতি স্থানে মিত্র রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। খৃষ্টীয় ১ম ও ২য় শতাব্দীতে এই বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ঔডুম্বর পুত্র অজমিত্র, মহীমিত্র, বিশ্বামিত্র, ভানুমিত্র প্রভৃতির মুদ্রা নবীনচন্দ্র সিংহ পাইয়াছিলেন। পঞ্চাল হইতে ভানুমিত্র, ধ্রুবমিত্র, সূর্য্যমিত্র, ফল্গুনি মিত্র, ভূমিমিত্র, অগ্নিমিত্র, জয়মিত্র, ইন্দ্রমিত্র, বিষ্ণুমিত্র এবং অযোধ্যা হইতে সত্যমিত্র, সঙ্ঘমিত্র ও বিজয় মিত্রের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রার চিহ্ন হইতে কাহাকে শৈব, বৌদ্ধ, কাহাকে বৈষ্ণব আবার কাহাকেও সৌর বলিয়া মনে হয়। এই রাজবংশের বিষয় এ যাবৎ কেহই আলোচনা করেন নাই।

একজন লেখক লিখিয়াছেন—"সেই সময়ে বৈদিক ব্রাহ্মণের চক্রান্তে বঙ্গদেশ যবনের অধিকৃত হইল। সেই বীভৎস মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হইতেছে না।" এইরূপ কথা যাহারা লিখিতে পারে, তাহাদেরই দ্বারা আদিশূর—বল্লাল সেনের কুল পরিচয় প্রচারিত হইতেছে। এই লেখক আবার লিখিয়াছেন—"রাজা কেশব সেন নিজ স্বজনবর্গ সঙ্গে লইয়া গৌড় রাজ্য ত্যাগ করিয়া ত্রিপুরা জেলায় এক রাজার নিকট গমন করেন এবং তথায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন"! বোধ হয় এই লেখকটির কাছে কেশব সেন Urgent Telegram করিয়া জানাইয়াছিলেন।

বল্লাল সেনের ইতিহাসিকতা সম্বন্ধে আরও সন্দেহ হয়, তাহার কারণ হাইকোর্টের জজ ৺সারদা চরণ মিত্রের "কায়স্থ সমাজ" হইতে প্রকাশিত কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় যে,—"সুদর্শন মিত্র বংশোদ্ভব বটেশ্বর মিত্রের কন্যা রামদাসী। বল্লাল সেন তাঁহারই পাণিগ্রহণ করেন"!! "মিশ্র কারিকা"য় মৌদ্গল্য গোত্রীয় সিংহ বঙ্গদেশে নাই, এইরূপ উল্লেখ করিবার কারণ কি? অন্যত্র উল্লেখ আছে যে, মাধাই নগরের তাম্রলেখে বল্লাল সেন চালুক্য-রাজকন্যা রামদাসীর পাণিগ্রহণ করেন! বাহবা, কলিকাতার নব্য কায়স্থ সমাজ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালীর ইতিহাস জানিতেন না, জানিবার জন্য অধীর হইয়াছিলেন। তাঁহার পরে কত লেখক কত মনোহর স্বপ্নই রচনা করিয়াছেন। ত্রিপুরার "রাজমালা" প্রণেতা ঐতিহাসিক প্রবর ৺কৈলাসচন্দ্র সিংহ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উপদেশ ছলে লিখিয়াছিলেন—"যদি ইতিহাস শিক্ষা করিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর, এবং মেইন, মিত্র, হাণ্টার প্রভৃতির কুসুমোদ্যানে প্রবেশ করিয়া তস্করতা বৃত্তি অবলম্বন করিওনা।"

হাণ্টার সাহেব জাল কথার বিচার না করিয়া Statistical account of Bengal লিখিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কালে District Gazeteer ঐ সকল অপ্রামাণিক কাহিনী লইয়া লিখিত হয়।

রাজা রাধাকান্ত দেব যে গ্রন্থ দেখিয়া শব্দকল্পদ্রুমে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, সেই হস্তলিপিখানি এখনও শোভাবাজার দেব বাটীতে আছে, উহাতে কেবল মাত্র ১০ টি শ্লোক আছে, ঐ লিপি দেখিলেই কেহ প্রাচীন বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। বিশেষতঃ তন্ত্রসার, মহাসিদ্ধি সারস্বত, বারাহী তন্ত্র, আগমতত্ত্ব বিলাস, রুদ্রযামলতন্ত্রে প্রায় ৫০।৬০ খানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন গ্রন্থেই 'আচার নির্ণয় তন্ত্রের' নাম পাওয়া যায় না। এইরূপ অপ্রামাণিক গ্রন্থ লইয়া শব্দকল্পদ্রুম প্রণয়নের পরে নিছক কল্পিত ও আধুনিক প্রচলিত ইতিহাস লইয়া বিশ্বকোষ লিখিত হয়। পুরাতন ঘটক গ্রন্থগুলি কেন বা কিরূপে লুপ্ত হইল, তাহা কেহই বলেন না এবং নূতন নূতন ঘটক-কারিকা প্রস্তুত হইয়া ইতিহাসের সত্যপথ আলোচনার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

ঢাকার ইতিহাস, বাকলার ইতিহাস, নদীয়া কাহিনী, মুরশিদাবাদ কাহিনী, বীরভূম কাহিনী (ইহাতে হেতমপুর রাজবাটীর কাহিনী), চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস, যশোহর খুলনার ইতিহাস, মেদিনীপুরের ইতিহাস বাঙ্গলার নবাবী আমল, ২৪ পরগণার ইতিহাস, হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস, হুগলী বা দক্ষিণ রাঢ়, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, কলিকাতার ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থগুলিকে ইতিহাস বলিতে পারা যায় না। যদি "অনুমান" "সম্ভবতঃ" "হইতে পারে" প্রভৃতি শব্দ ইতিহাসে স্থান পায়, তাহা হইলে সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের "সরলা" "অজিতা", রমেশ দত্তের "বঙ্গ বিজেতা", বঙ্কিম বাবুর "দুর্গেশ নন্দিনী"কেও ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

পাঞ্জাব মহেঞ্জোদারোতে যে সমুদয় মুদ্রা আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহাতে উৎকীর্ণ সাঙ্কেতিক চিহ্ন অথবা চিত্রলিপি এখনও পর্য্যন্ত পঠিত হয় নাই। যে দিন ইহা পঠিত হইবে, সে দিন ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের এক রুদ্ধ কক্ষ খুলিয়া যাইবে।

দেবানন্দপুরের ২ত্ত বংশে কামদেব দত্ত নবাব প্রদত্ত সিংহ উপাধি ব্যবহার করিতেন। ঐরূপে মিত্রপুরের হরিহর দেব, নবাব প্রদত্ত সিংহ উপাধি ব্যবহার করিতেন। যথা—"সিংহ দেব হরিহরে"। গোষ্ঠপতি হরিহর সিংহ একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

দেবানন্দপুরের শাণ্ডিল্য গোত্রীয় দত্ত মুন্সী বংশীয় ২৪ পরগণার বারুই পুরের দত্ত রায় চৌধুরী বংশ রাজা মদন মল্ল সিংহের বংশ বলিয়া একখানি অপ্রামাণিক গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় স্থান পাইতে পারে, কিন্তু "মহানাদ" এই পত্রিকায় এ যাবৎ স্থান পায় নাই। বুঝ লোক যে জান সন্ধান।

"গায়ে সই সইবে না রোদ
শুকিয়ে নে চুল ধূপদানীতে।"

মহারাজা গন্ধর্ব্ব খাঁ সিংহ।

গন্ধর্ব্ব খাঁ সিংহ আন্দুলিয়ার রাজা ছিলেন।* তাঁহার রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি আকাশের মত উদার, তরঙ্গহীন সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর, বালকের ন্যায় সরল এবং জন্ম জন্মান্তরের সুপরিচিতের ন্যায় উন্মুক্ত হৃদয় বলিয়া কীর্ত্তিত। 'কুলদর্পণ' মতে—

* ৭২ ঘরের কায়স্থগণ আদি গন্ধর্ব্ব খাঁ সিংহ কর্ত্তৃক সমাজ বন্ধন কালে আন্দুলিয়া সমাজে গৃহীত হইয়াছিল।

মৌলিক প্রধান আদি গন্ধর্ব্ব খাঁ সিংহের অনেক কীর্ত্তি বসু বংশীয় গন্ধর্ব্ব খাঁ বসুর বলিয়া প্রচারিত হইতেছে।
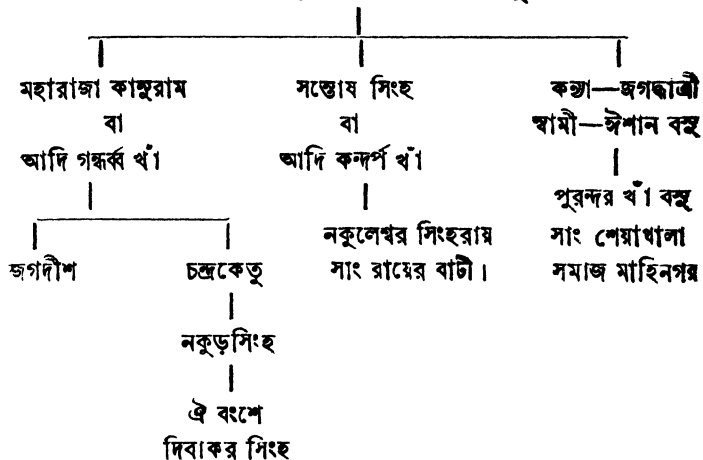
দিবাকরের পুত্র হরিনারায়ণ, তৎ পুত্র দর্পনারায়ণ সিংহ কালীচরণ বসুর কন্যাকে বিবাহ করেন।

১৪৮০ খৃষ্টাব্দে মহাভারত প্রণেতা বিজয় পণ্ডিত রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহের সভাসদ ছিলেন।

আর এক মহারাজা গন্ধর্ব্ব সিংহের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাতঃ স্মরণীয়া রাণী ভবানীর রাজধানী বড়নগরের অপর পারে অধুনা দেবীপুর নামক গণ্ডগ্রাম অবস্থিত আছে, এককালে তাহা সাধু মোহান্তদিগের লীলাক্ষেত্র ছিল। তথাকার মধ্যম আখড়ায় একটি শিলালিপি রক্ষিত আছে। ইহা দৈর্ঘে প্রায় ২৮ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১৪৷ ইঞ্চি, কঠিন কাল প্রস্তরে তোলা অক্ষরে খোদিত। ইহার চারি ধারও সুন্দর নক্সায় শোভিত। সমস্ত লিপিটি মধ্যভাগে একটি স্থূল রেখাদ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। উপরিভাগে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষায় পাঁচটি কবিতা লিখিত আছে। নিম্নভাগে আর একটি স্থূল রেখা দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত;

তাহার বামদিকে বাঙ্গলা অক্ষরে ও দক্ষিণদিকে পারসী কবিতায় লিপিটি খোদিত আছে। উপরোক্ত চারি ধারে প্রত্যেকটির মধ্যভাগে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় দেবতাদিগের নমস্কার খোদিত আছে। এইরূপ তিন ভাষাযুক্ত শিলালিপি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। শিলালিপির সারাংশ এই যে,—"বিক্রম সংবৎ ১৭৮১, শকাব্দা ১৬৪৬ বর্ষে বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে মহারাজ গন্ধর্ব্ব সিংহ বাহাদুর বাহাদুরপুরের সন্নিকট দেবীপুরের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে জমি ক্রয় পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থে হরিমন্দির নির্ম্মাণ ও কূপ খনন করাইয়াছিলেন।" উক্ত শিলালিপির প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল।

এই শিলালিপি বাহির হওয়ার পর ১৯০৮।৯।১০ ও ২৩ খৃষ্টাব্দে সাপ্তাহিক বসুমতী ও নায়ক দৈনিক পত্রিকায় আন্দুলিয়ার সিংহ বংশের কতক ইতিহাস ও গন্ধর্ব্ব সিংহের বিষয় বিস্তারিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এ যাবৎ কোন ঐতিহাসিক লেখকের দৃষ্টি তাহাতে আকৃষ্ট হয় নাই। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্যতম কর্ত্তা শ্রীযুক্ত অমূল্য চরণ ঘোষ মজুমদার বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে কোনও লেখক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধটি ফিরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"আন্দুলিয়ার মৌদগল্য গোত্রীয় সিংহবংশের উল্লেখ যখন 'বিশ্বকোষে' নাই, তখন এ প্রবন্ধ প্রকাশ যোগ্য নহে।"

রাজা বীরেন্দ্র সিংহ।

গড় মান্দারণের রাজা বীরেন্দ্র সিংহ (১৫ পর্য্যায়), পুত্র—রাজা দিলীপ সিংহ, পু—রাজা রামকৃষ্ণ, রাজা রঘুনাথ ও দেওয়ান কাশীনাথ। রাজা রামকৃষ্ণ পুত্র—রাজা হরিচরণ ও রাজা গোবিন্দ। হরিচরণের পুত্র রাজা বীরবন, পু—রাজা রঘুনাথ। রাজা হরিচরণ বা হরিবন বিদ্রোহ করেন, তৎপুত্র বীরবন বিদ্রোহের পর মোগল বাদশাহ কর্ত্তৃক

মহারাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ বাহাদুরের শিলালিপি।

৫০০ শত সৈন্যের মন্‌সব্‌দার হইয়াছিলেন। রাজা গোবিন্দ সিংহের পৌত্র রাজা ফতে সিংহ ও রাজা কীর্ত্তি সিংহ বরদা পরগণার রাজা ছিলেন। এই রাজবংশের অনেক কীর্ত্তি বরদা পরগণায় ও ঘাটালের নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামে বর্ত্তমান আছে। দেওয়ান কাশীনাথের পুত্র রাজা মেদনমল্ল সিংহ মেদনমল্ল পরগণা নির্ম্মাণ করেন। তিনি যুদ্ধে নিহত হন, তাঁহার বংশধরগণ চিংড়িপোঁতা সোণারপুরে আছেন। রাজা রঘুনাথের পুত্র রাজা কানাই বা কন্দর্প সিংহ, পুত্র—দুর্জ্জয় বা দুর্ল্লভ, পুত্র—মহারাজাধিরাজ বীরেন্দ্র সিংহ (চিতুয়া ও বরদা পরগণাদির মালিক ছিলেন) ও অনুপ সিংহ হাড়া ঠাকুর। অনুপ সিংহের পুত্র রাজা কৃষ্ণ সিংহ। রাজা বীরেন্দ্র সিংহের পুত্র রাজা সভারাম বা শোভারাম (শোভন সিংহ), হিম্মৎ সিংহ, বাবুরাম, ইন্দ্র চন্দ্র ও দাতারাম। শোভাসিংহের পুত্র শিবপ্রসাদ সিংহ কলিকাতার নিকটে ঢাকুরিয়া গড়ে বাস করিতেন। তৎপুত্র হরিনারায়ণ, দেবনারায়ণ, রাম নারায়ণ, গঙ্গানারায়ণ সিংহ। হরিনারায়ণের পুত্র—গিরিশচন্দ্র, পুত্র—অবিনাশচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র সিংহ।

রায়েরকাটীর সিংহ বংশ।

বরিশাল জেলার রায়েরকাটী নিবাসী সিংহ বংশীয় একমাত্র সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীলকান্ত রায় সিংহ তত্ত্ব-সাগর, কবি-তর্কসাংখ্য বেদান্তরত্ন, রসায়ন-শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতামহের হস্তলিখিত একখানি কীটদষ্ট বংশাবলীর প্রথমেই আছে,—"শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ—আনুলিয়া নিবাসী মহানাদের সিংহ বংশাবলী।" তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—

রাজা গঙ্গাধর খাঁ সিংহ চৌধুরীর ভ্রাতা রামদেব সিংহ * রাঢ় দেশের এগারটী পরগণার মালিক ছিলেন। গঙ্গাধর খাঁ সিংহ আনুলিয়ার রাজা পদ্মলোচন খাঁ সিংহের ভ্রাতা হইতেন। রাজা রামদেবের পুত্র হরিনাথ, পুত্র—রাম বল্লভ, পুত্র—রাজবল্লভ ও যাদবানন্দ সিংহ। রাজ বল্লভের পুত্র—হরগোবিন্দ, পুত্র—নীলমাধব, পুত্র—কমলকৃষ্ণ, পুত্র—রামজয়, পুত্র—রাম নারায়ণ, পুত্র—প্রতাপচন্দ্র সিংহ চন্দ্রকোণায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে থাকেন। তৎপুত্র—রাধাগোবিন্দ, পুত্র—বিষ্ণুপ্রসাদ, পুত্র—রাজা গন্ধর্ব্ব খাঁ সিংহ ও কন্দর্প খাঁ সিংহ।

---

* ভবদেব ও রামদেবকে এক গ্রামবাসী ও একই গোত্র সম্ভূত দেখিতেছি, কিন্তু বেলাব তাম্রলিপিতে উভয়ের যে বংশ পরিচয় আছে, তদ্বারা ইঁহারা একই বংশীয় বলিয়া বোধ হয় না। মেদিনীপুর ঘাটালের নিকট গোপীনাথপুর গ্রামের পার্শ্বে যে প্রাচীন ও ভগ্ন সিংহপুর গ্রাম দৃষ্ট হয়, সেই স্থানে রাজা রামদেব সিংহের একটী দুর্গ ছিল। প্রাচীন বংশাবলীতে রাজা রামদেব সিংহ 'বর্ম্মা' উপাধি দৃষ্ট হয় এবং তাহাতে তাঁহাকে "গঙ্গা রাজবংশীয়" বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। বরেন্দ্র ভূমির শৈলকুপা নগরের রাজা জটাধর নাগ আনুলিয়ার রাজা রামদেব সিংহের হস্তে নিহত হন। এই সময় যশোহর জেলার উত্তরাংশে পদ্মানদী ছিল। বরেন্দ্রভূমির পশ্চিম সীমায় মহানন্দা নদী, দক্ষিণ সীমায় পদ্মানদী, পূর্ব্ব সীমায় করতোয়া ও উত্তর সীমায় অন্যান্য (?) রাজগণের রাজ্য ছিল।

মতান্তরে গন্ধর্ব্ব খাঁ ১৩ পর্য্যায়ের ব্যক্তি ছিলেন। এই চন্দ্রকেতুর সময় মহানাদ মুসলমানদের কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত ও অপবিত্র হয় *। তাঁহাকে কাশীজোড়ের ক্ষত্রিয় রাজা কন্যা সম্প্রদান করেন। চন্দ্রকেতুর পুত্র নকুড় সিংহ। মতান্তরে গন্ধর্ব্ব খাঁর পুত্র নকুলেশ্বর সিংহ রায় রাজা, তৎপুত্র রাজা চন্দ্রকেতু। যাহা হউক বংশাবলীখানিতে নকুল সিংহ পুত্র কৃষ্ণানন্দ সিংহ ১৭ পর্য্যায় লেখা আছে। কৃষ্ণানন্দের পুত্র—রাজা গোবিন্দ সিংহ (বর্দ্ধা পরগণায় ছিলেন), রাজীব লোচন, বিষ্ণুদাস, যাদবেন্দ্র ও বিশ্বনাথ সিংহ। রাজীব সুত রমাকান্ত, পুত্র—রামনাথ, শিবরাম, জনার্দ্দন, মধুসূদন, মনোহর বা হরিহর সিংহ। রামনাথের পুত্র—২২ পর্য্যায় মাধবরাম বলরাম ও রাজারাম সিংহ। মাধবরামের পুত্র—রঘুনাথ, পুত্র—রামপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ, ভবানীপ্রসাদ বা ভীম সিংহ ও রাধাকান্ত সিংহ। রামপ্রসাদের পুত্র শ্যামরাম ও রাজচন্দ্র। জনার্দ্দনের পুত্র—ঘনশ্যাম (২৪ পর্য্যায় কুল একজায়ী করেন) ও ষষ্ঠীদাস সিংহ। ঘ-শ্যামের পুত্র রামকান্ত, রামহরি ও বৈকুণ্ঠ। রামকান্তের পুত্র বৈদ্যনাথ, রামমাণিক্য ও রামজয় সিংহ (নিঃ)। বৈদ্যনাথের পুত্র—কালাচাঁদ, দীননাথ, তারাচাঁদ—তিন জনেই নিঃসন্তান। রামমাণিক্যের পুত্র—তিলক, হারাণ ও কালীবর। রামহরির পুত্র—কমলাকান্ত, পুত্র—কাশীকান্ত ও নবকান্ত। কাশীকান্ত সিংহ পারস্য ভাষায় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তৎপুত্র—চন্দ্রকান্ত, সারদা প্রসন্ন, কুমুদকৃষ্ণ, শরৎকুমার ও সতীশচন্দ্র। শেষোক্ত চারিজন অন্নদা সুন্দরীর গর্ভজাত। চন্দ্রকান্তের মাতার নাম কুমুদিনী।

* সিংহবংশে একাধিক চন্দ্রকেতুর নাম পাওয়া যায়। এই চন্দ্রকেতুর সময়ে পাণ্ডুয়ার যুদ্ধ হইলে সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে উহার কাল নির্ণয় করিতে হয়। আবার ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের পর মহানাদের রাজা রত্নাকর সিংহের রাজত্বকালে মুসলমান সৈন্য পাণ্ডুয়া-মহানাদ জয় করেন, ইহাও সিংহবংশের কাগজে লিখিত আছে। কিন্তু পাণ্ডুয়া যুদ্ধের কাল কিঞ্চিদধিক ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে হওয়াই সম্ভব। ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রকান্তের পুত্র—নীলকান্ত, কেদার নাথ, প্রমথ নাথ, অমরেন্দ্র, নৃপেন্দ্র, দেবেন্দ্র ও রণজিৎ সিংহ। নীলকান্তের স্ত্রী—চারুশীলা, প্রমথ নাথের স্ত্রী—মনোরমা, অমরেন্দ্রের স্ত্রী—লীলাবতী, নৃপেন্দ্রের স্ত্রী—ইন্দুপ্রভা, রণজিতের স্ত্রী—রেণুকা। ২৬ পর্য্যায় নীলকান্তের পুত্র—রামকান্ত ও বিনয়কৃষ্ণ সিংহ ও কন্যা—পুষ্পরাণী। প্রমথ নাথের পুত্র—জগদীশ ও প্রফুল্ল চন্দ্র এবং কন্যা পুতুলরাণী।

রায়েরকাটীর সিংহগণ সুদূর বরিশাল জেলায় প্রায় ৮।৯ পুরুষ বাস করিয়াও পূর্ব্বপুরুষের অধ্যুষিত রাঢ়ের রাজধানী মহানাদ, সিংহপুর ও আন্দুলিয়ার নাম স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং প্রায় ৩০ পুরুষের নাম অতি যত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। ইহা প্রশংসার বিষয় বটে।

উপরোক্ত বংশাবলীর লিখিত কৃষ্ণানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র গোবিন্দ সিংহ বঙ্গের বিখ্যাত নবাব সুজা উদ্দৌলার দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রতিভ, সততা, কূট রাজনীতি বিদ্যা, ধর্ম্মানুরাগ, জ্ঞানচর্চ্চা ও ভগবৎ সাধনায় দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়া, শেষ বয়সে গোবিন্দ সিংহ ভ্রাতুষ্পুত্র রমাকান্তকে সঙ্গে লইয়া বহু তীর্থ পর্য্যটনের পর চন্দ্রনাথ যাইবার সময় পথে চন্দ্রদ্বীপ ও বাখরগঞ্জের মধ্যবর্ত্তী স্থানে মগ দস্যুরা তাঁহার বজ্‌রা লুণ্ঠন করিল। গোবিন্দ সিংহ নিঃসম্বল অবস্থায় রমাকান্তকে সঙ্গে লইয়া, দুই দিন অনাহারে অনিদ্রায় অরণ্যমধ্যে অবস্থান করিয়া, তৃতীয় দিবসে শ্রীরাম সেনের বাড়ীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময় মগদস্যুরা শ্রীরাম সেনের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তাহারা অর্থাদি না পাইয়া শ্রীরাম সেনের প্রথমা কন্যা কালীকে লইয়া গেল। তাহারা ঘর বাড়ী জ্বালাইবারও চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু রমাকান্তের অদ্ভুত বীরত্বে স্থির থাকিতে না পারিয়া অল্পকাল মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঋষিপ্রতিম ৺ চন্দ্রকান্ত সিংহ রায়।

৺চন্দ্রকান্ত সিংহ রায়ের পুত্র ও পৌত্রগণ।

৺চন্দ্রকান্ত সিংহ রায়ের স্ত্রী, ভগ্নী এবং পুত্রবধূ ও পৌত্রীগণ।

রমাকান্তের অদ্ভুত বীরত্ব, অপরূপ রূপ ও কুলমর্য্যাদাদির পরিচয় পাইয়া শ্রীরাম সেন তাঁহাকে তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার সহিত গোপনে বিবাহ দিলেন। গোবিন্দ সিংহ পরে তাহা জানিতে পারিয়া, অজ্ঞাত কুলশীলের কন্যাকে বিবাহ করায় রমাকান্তের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন এবং সেইখানেই রমাকান্তকে বাস করিতে আদেশ করিয়া পুরুষোত্তম অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ঠাকুরের রথ চলে না। প্রধান পাণ্ডা ধরণা দিলেন। আদেশ হইল—সাক্ষী গোপালের পথে তাঁহার এক ভক্ত মুমূর্ষাবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহাকে না আনিলে রথ আর চলিবে না। তখনই পাণ্ডারা অনুসন্ধান করিয়া গোবিন্দ সিংহকে রথের নিকটে রাখিয়া দিল। রথের সেই বামন মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে মুমূর্ষুর প্রাণ মুক্তির পথে চলিয়া গেল।

"একটা গেল যবে স্থবে
মগে হইল দোষ।
রমাকান্তে দিয়ে কন্যা
বড়ই পরিতোষ॥

* * * *

গোবিন্দ, গোবিন্দ বলি
প্রস্থান করিল।
রথের তলেতে পড়ি
পরাণ হারাল॥"

রথ চলিল। কোনও ভক্ত যাত্রীর সাহায্যে সেইস্থানে সপ্তাহ মধ্যে প্রস্তর বেদী নির্ম্মিত হইল। ঐ বেদীর নাম ছিল—গোবিন্দ সিংহের পাষাণ। সেই বেদিকা আজও ধর্ম্মের সাক্ষীরূপে উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

মথুরাপুরের সিংহবংশ।

কৃষ্ণচন্দ্রপুর নামক কোনও গ্রাম হইতে আসিয়া ইহারা মথুরাপুরে বাস করেন। আদিম বাসস্থান আন্দুল বা আন্দুলিয়া, গোত্র মৌদ্গল্য। আদি-পুরুষ সুবিখ্যাত রণপণ্ডিত গন্ধর্ব্ব সিংহ। এই বংশোদ্ভব কৃষ্ণবল্লভ সিংহ বর্গীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হওয়ায় এবং পত্নী বিয়োগে ব্যথিত চিত্ত হইয়া একমাত্র পুত্র রামেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া নানাদেশ পর্য্যটনান্তর মথুরাপুরে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তখন এই স্থানে জঙ্গলাদি ছিল। মথুরাপুরস্থ বর্ত্তমান পঞ্চানন্দ ঠাকুর সিংহগণের বাস্তু দেবতা। কৃষ্ণবল্লভ বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন ও বিশাল জমিদারী পুত্র রামেশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়া পরলোক গমন করেন। কৃষ্ণবল্লভের পৈতৃক নবাবী উপাধী ছিল "খাঁ"। কিন্তু রামেশ্বর উহা ত্যাগ করেন।

রামেশ্বরের পুত্র—রাধাকান্ত, গৌরীকান্ত ও চুনিলাল। রাধাকান্তের—বিজয়রাম, সীতারাম, শিশুরাম, রামরাম ও মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি নয়টি পুত্র হয়। চারি জনের বংশ বিদ্যমান। তিন জনের মথুরাপুরে ও একজনের মথুরাপুর হইতে চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী বহড়ুতে, বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

বিজয়রাম সিংহের পুত্র—দেবীচরণ, চণ্ডীচরণ, ভৈরব। দেবীচরণের, পুত্র—রামরতন, পুত্র—বৈকুণ্ঠ, পুত্র—তারক, লোকনাথ, নগেন্দ্র, চারু। তারকের পুত্র—ভবেন, দ্বিজেন, প্রবোধ, সুবোধ। ভবেনের তিন পুত্র, দ্বিজেনের চারি পুত্র, প্রবোধের দুই পুত্র। চণ্ডীচরণের পুত্র—স্বরূপ (বংশ লুপ্ত)। ভৈরবের পুত্র—বৈদ্যনাথ, পুত্র—হেম ও গিরি। পরে বংশ লুপ্ত। লোকনাথের পুত্র—সতীশ ও খগেন। ইহারা বর্ত্তমানে

কলিকাতায় থাকেন। চারুচন্দ্র সিংহও কলিকাতায় থাকেন, যদিও ইহাদের এখনও দেশে বাড়ী ও বিষয় আশয় আছে। নগেনের পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র সিংহ।

সীতারাম সিংহের পুত্র—অভয়, ঈশান (নিঃসন্তান), হরগোবিন্দ। অভয়ের পুত্র—প্রিয়নাথ, রজনী ও শশীভূষণ (নিঃসন্তান)। প্রিয় নাথের পুত্র—নরেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, অমূল্য ও প্রফুল্লকুমার। হরগোবিন্দের পুত্র নবীন ও কেদার। নবীনের পুত্র—হারাণচন্দ্র সিংহ M. B., হীরালাল ও অক্ষয়কুমার সিংহ (রেঙ্গুনের য়্যাড্‌ভোকেট)। হারাণচন্দ্র ও হীরালাল কলিকাতায় ইটালীতে থাকেন।

শিশুরাম সিংহ (অশ্বারোহণে সুদক্ষ ছিলেন, মথুরাপুরের চারি মাইল দূরে সিংহেরচক্ নামক গ্রাম স্থাপন করেন, এখনও তাঁহার বংশধরগণ ঐ গ্রামের মালিক আছেন) পুত্র—বিশ্বনাথ, পুত্র—জগবন্ধু, পুত্র—প্রমথনাথ, মন্মথনাথ (সুকবি, বামাবোধিনী ও বসুমতী পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন; ইঁহার প্রণীত বাঙ্গলা পদ্যে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা এবং ধ্যান ও স্তবমালা গ্রন্থ আছে) ও বিপিন বিহারী সিংহ। মন্মথনাথের নিত্য নিরঞ্জন নামে এক পুত্র ছিল, কিন্তু অল্প বয়সে পরলোকে গমন করে। বিপিন বিহারী কলিকাতা আলিপুরে বাস করেন। তাঁহার পুত্র—পুলিন বিহারী (ইঁহার দুই পুত্র), সন্তোষকুমার ও নকুলেশ্বর। প্রমথনাথ সিংহের পুত্র—ধীরেন্দ্রমোহন সিংহ (বিখ্যাত চিত্রকর, ইঁহার তিন পুত্র), রবীন্দ্রনাথ সিংহ (সি, পিতে ইঞ্জিনিয়ার) ও অবনী মোহন সিংহ B. A.।

মৃত্যুঞ্জয় সিংহ মথুরাপুর হইতে বহড়ু গ্রামে বাস করেন। তৎ-পুত্র—রামচাঁদ, পুত্র - ভোলানাথ, ভুবনমোহন, তারকনাথ ও গোপাল সিংহ। ভোলানাথের পুত্র—শশী, হরেন্দ্র, ভবেন্দ্র ও ভূপতি। গোপালের পুত্র—চারু ও হরি সিংহ।

গৌরীকান্ত সিংহের কয়টী পুত্র ছিল, তাহা জানা যায় না, তবে তাঁহার গঙ্গানারায়ণ নামক এক পুত্রের বংশ মথুরাপুর হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী জয়নগরে বিদ্যমান আছে। চিংড়িপোঁতার সিংহগণ ঐ গৌরীকান্তের বংশ হওয়া সম্ভব। গৌরীকান্ত পঞ্চানন্দ ঠাকুরের বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং তিনি দেবাদেশে রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী নামক পুরোহিত দ্বারা পঞ্চানন্দের গান বিরচিত করাইয়া প্রচারিত করেন। উহা কবিকঙ্কণের চণ্ডীর অনুরূপ নদী, সমুদ্র প্রভৃতির বর্ণনা ও গৌরীকান্তের এবং রুক্মিণীকান্তের বংশ ও স্বদেশ পরিচয়ের সহিত উক্ত দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশক কাহিনী সংবলিত। গঙ্গানারায়ণ সিংহ জয়নগরে উঠিয়া যান। তৎপুত্র—রামধন, হরগোবিন্দ (নিঃসন্তান), কৃষ্ণমোহন। রামধনের পুত্র—রাখাল (নিঃ) ও বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠের পুত্র—রজনী। কৃষ্ণমোহনের পুত্র—রাজেন্দ্র, কেদার ও হরিনাথ। রাজেন্দ্রের পুত্র—অন্নদা, জ্ঞানদা, মুনীন্দ্র, ভূতনাথ ও বঙ্কিম। হরিনাথের পুত্র—নরেন্দ্র সিংহ।

চুণিলাল সিংহের পুত্র—পার্ব্বতী ও দেবনাথ। দেবনাথের পুত্র—চন্দ্রশেখর, কালী ও বিশ্বম্ভর। চন্দ্রশেখরের এক কন্যা ছিল নাম সৌদামিনী। কালী সিংহের হরি নামক পুত্র ছিল। পরে বংশ লুপ্ত। বিশ্বম্ভর অপুত্রক, এইরূপে দেবনাথের বংশ লুপ্ত হয়। পার্ব্বতী সিংহের পুত্র—রাম সাগর ও রামকুমার।

রামসাগর সিংহের পুত্র—নীলমাধব, পুত্র—১। সুরেন্দ্রনাথ সিংহ B. A., B. L. ২। নন্দলাল সিংহ M. A., B. L. বিহার ও উড়িষ্যার সিবিল সার্ভিস এর ম্যাজিষ্ট্রেট। ইনি বহু সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন, পাণিনি পাবলিশিং হাউস এলাহাবাদ হইতে কয়েকখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ৩। কুঞ্জলাল সিংহ, ৪। মনীন্দ্রনাথ সিংহ। ৫। ফণীন্দ্রনাথ সিংহ B. A., B. E. D. পাটনা কলেজিয়েট

স্কুলের শিক্ষক। সুরেন্দ্রনাথের তিন পুত্র—অনাদিভূষণ, খগেন্দ্রনাথ ও নিত্যানন্দ সিংহ কলিকাতায় থাকেন।

রামকুমার সিংহের পুত্র রাজেন্দ্র ও গোপাল সিংহ। রাজেন্দ্রের পুত্র—অতুলকৃষ্ণ, লক্ষ্ণৌএ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার্থে তথায় "অতুল নাট্য-মন্দির" স্থাপিত হইয়াছে। অতুলের তিন পুত্র—কালিদাস, শ্যামাদাস ও তারাদাস সিংহ। এক্ষণে ইহারা লক্ষ্ণৌএরই অধিবাসী। গোপাল সিংহের পুত্র—বসন্ত সিংহ।

কৃষ্ণবল্লভ সিংহ ২০ পর্য্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৩ পর্য্যায় আদি গন্ধর্ব্ব খাঁ সিংহের বংশধর। ১৪ পর্য্যায় চন্দ্রকেতু সিংহ, তৎপুত্র ১৫ পর্য্যায় নকুল সিংহ, তৎপুত্র ১৬ পর্য্যায় নারায়ণ সিংহ, তৎপুত্র ১৭ পর্য্যায় কেশব সিংহ, পুত্র—১৮ পর্য্যায় বিজয় সিংহ ও গন্ধর্ব্ব সিংহ। গন্ধর্ব্ব সিংহের পুত্র—১৯ পর্য্যায় কীর্ত্তিচন্দ্র, পুত্র—২০ পর্য্যায় কৃষ্ণবল্লভ সিংহ সাং মথুরাপুর, ২৪ পরগণা।

মথুরাপুরের সিংহবংশ প্রাচীন বনিয়াদী জমিদার বংশ এবং অদ্যাপি দক্ষিণ ২৪ পরগণায় বিশেষ সম্মানিত। কিন্তু এক্ষণে সিংহবংশের সে প্রতাপ নাই। কালের পরিহাসে আজ এই বংশের সকল কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্ত প্রায়; দেবায়তন গুলি ধ্বংসোন্মুখ। কেবল মাত্র কয়েকটী উৎসব ও মেলা প্রাচীন গৌরবের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

শ্রীযুক্ত অবনীমোহন সিংহের নিকটে এই বংশের পদ্যে লেখা একখানি বংশাবলী আছে, স্থানাভাবে উহা আপাততঃ প্রকাশিত করিতে পারিলাম না।

স্বর্ণবেণে রাজবংশ।

সিংহরাজবংশের রাজত্বের অবসানের পর মহানাদে স্বর্ণবেণে জাতীয় রাজা রাধাকান্তের সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে (১ম খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ইনি কোন্ স্থান হইতে আগমন করিয়া রাজা হন, তাহার সন্ধান কিছু পাওয়া যায় না। রাজা রাধাকান্তের ভ্রাতা (কেহ বলেন পুত্র) রাজা লক্ষ্মীকান্ত ধর। লক্ষ্মীকান্তের পার্ব্বতী দাসী নামে একমাত্র কন্যা ছিলেন। মহানাদ হইতে রাজা লক্ষ্মীকান্ত ধর, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বাস করেন। রাজকন্যা পার্ব্বতী দাসীর পুত্র মহারাজ সুখময় রায়, তৎপুত্র রাজা রামচন্দ্র, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রাজা বৈদ্যনাথ, রাজা শিবচন্দ্র ও রাজা নরসিংহ চন্দ্র।
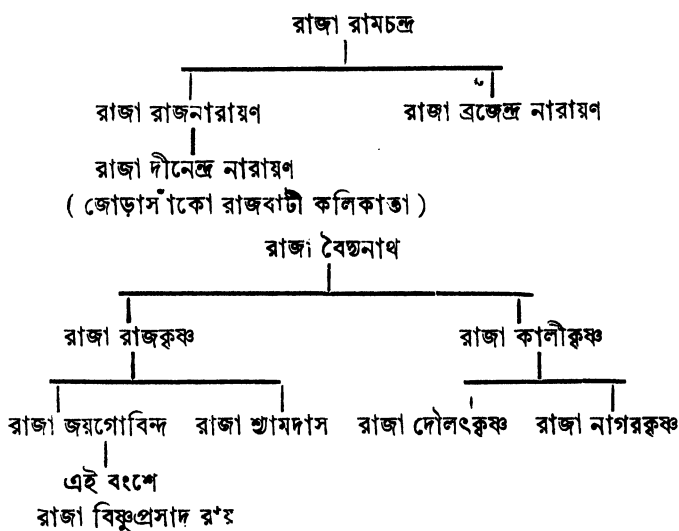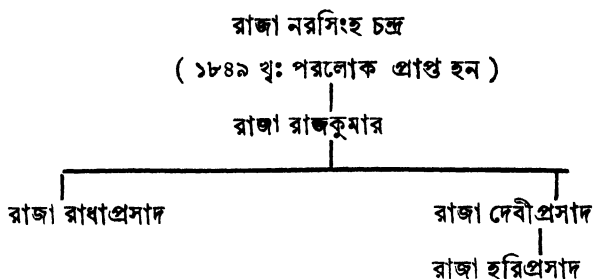
এই বংশের অপূর্ব্ব দানের কাহিনী এখনও মহানাদের লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়, ইহাদের অতুল দানের কথা এখনও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়। ইহারা বলেন যে, "রাজা লক্ষ্মীকান্ত ধর অকাতরে প্রচুর অর্থ দিয়া লর্ড ক্লাইবের সহায়তা করিয়াছিলেন।" এই বংশের বর্ত্তমান্ রাজা বিষ্ণুপ্রসাদ রায় কলিকাতায় দানের জন্য অতি প্রসিদ্ধ।

আর্য্য ভারত ভূমি।

বেদের কোন কোন স্থানে উষার পশ্চাৎ ধাবমান সূর্য্যকে যুবতীর অনুগমনকারী প্রণয়ীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। সূর্য্য উষার পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন ; ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবাদিদেব মহাদেব প্রজাপতি স্বদুহিতার প্রণয়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং ইহা হইতেই যাবতীয় জগৎ সংসার উৎপন্ন হইয়াছে। প্রজাপতি নিজ দুহিতার প্রণয়াসক্ত—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সূর্য্য প্রভাতের অনুগমন করেন।

দেবাসুরের সংগ্রামকালীন পৃথিবী পদ্মপত্রের ন্যায় বিচলিত এবং বিকম্পিত হইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে ইন্দ্রের অর্জ্জুন নাম প্রদত্ত হইয়াছে। ঋকবেদে প্রভঞ্জনের পিতা, অগ্নিরূপী বজ্রেরই অপর নাম রুদ্র। গিরিশিখরে মেঘমালা অবস্থান করে বলিয়া, রুদ্রের এক নাম গিরীশ, মেঘের বিভিন্ন বর্ণ হইতে রুদ্রের তাম্র, অরুণ, বভ্রু, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি নাম হইয়াছে।

যে কুরুক্ষেত্রের মহা-সমরাভিনয় একদিন ভারতবর্ষকে বীরশূন্য করিয়া ইহার ভবিষ্যৎ চিত্রকে ঘোর তমসাবৃত করিয়াছিল, ন্যায়ের অনুসরণ করিলে বলিতে হয়, একপ্রাণতা ও ভ্রাতৃপ্রেমের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। আজ বহুকাল মহানাদে বেদগানের অমৃতময় ঝঙ্কার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, জাতীয় একতার বিমোহন দৃশ্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, আর্য্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা প্রতিহত হইয়াছে।

ইন্দ্রালয় নামে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী এক স্থানের উল্লেখ আছে।

বৈদিক কবিরাই পরে পুরোহিতের পদ প্রাপ্ত হন। এই নানা প্রকার যাগযজ্ঞ ও কর্ম্মকাণ্ডময় ব্রাহ্মণ বিভাগের মধ্যে একটি অতি সারবান উজ্জ্বল অংশ লক্ষিত হয়। এই অংশের নাম আরণ্যক বা উপনিষদ্। ইহা ব্রাহ্মণ ভাগের অন্তর্নিবিষ্ট। তপোনিষ্ঠ মহর্ষিগণ নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া এই সকল পরমার্থ বিনির্ম্মিত পদাবলী গান করিতেন, এইজন্য ইহাদের নাম আরণ্যক হইয়াছে।

বৃত্র অনেক যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পলায়িত ও হত, অর্থাৎ অনাবৃষ্টির শেষ ও বৃষ্টির আরম্ভ। "সূর্য্যরশ্মি পশ্চিমদিকে বিলুপ্ত হইয়া আবার পূর্ব্বদিকে উদয় হয়," এই উপাখ্যান হইতে গ্রীকদের ট্রয় (Troy) অবরোধের উপাখ্যান বৈদিক উপাখ্যানের রূপান্তর মাত্র।

মহর্ষিগণ অনুষ্ঠানবহুল বৈদিক ধর্ম্মে সমাজের অনাস্থা ও অনাদর অনুভব করিয়া তাহার স্থানে শূদ্রদের জন্য লোকরঞ্জক পৌরাণিক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করেন এবং অতি সরল ও সহজ ভাষায় বহুবিধ মহাপুরাণ ও উপপুরাণ রচনা করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের কলেবর সবিশেষরূপে বর্দ্ধিত করেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের সাম্য, মৈত্রী, ও স্বাধীনতাবাদের বিজয় দুন্দুভির নিনাদে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বহুবর্ষ পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় থাকে।

মহাভারতের ন্যায় রামায়ণে ক্ষত্রিয়ের অগ্নিতুল্য তেজ এবং আত্মগৌরব রক্ষা দৃষ্ট হয় না, ব্রাহ্মণের প্রাদুর্ভাব বর্ত্তমান রামায়ণ রচনা সময়ে বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরশুরাম উপাখ্যানে গূঢ় ঐতিহাসিক সত্য রহিয়াছে। আর্য্য সভ্যতার যুগের আরম্ভে ও শেষে হিন্দু চরিত্রে যে মহাপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, মহাভারত ও রামায়ণই তাহার প্রমাণ।

ধ্বংসের কার্য্য শেষ হইলে পুনর্গঠন আরম্ভ হইবে। এই প্রচলিত অনাচারাদি দুষ্টক্ষতবিশিষ্ট গলিত পূতিগন্ধময় পচনোন্মুখ বিকৃত হিন্দুধর্ম্ম

অগ্রে পচিয়া যাইবে, পরে তাহাতে সার জন্মিবে, সেই সার হইতে পুনরায় নব হিন্দুধর্ম্ম মহাধর্ম্ম উত্থিত হইয়া জগতে বিস্তার হইবে।

যে ঋষিরা শাস্ত্রে নিরাকারোপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহারাই আবার সেই শাস্ত্রে কেন সাকারোপাসনার ব্যবস্থা দিয়াছেন, ইহা তত্ত্বপিপাসুদিগের অনুসন্ধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগে পুরুরবা নামক নৃপতি বেদকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। সংহিতোক্ত ধর্ম্ম, বাল্যসুলভ সরলতা ও কোমলতা ইহার প্রতি স্তরে প্রতিফলিত দেখা যায়। আর্য্য ঋষি নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখিলেন—রক্তবর্ণা ঊষার আবির্ভাবে প্রকৃতি রমণীয় অবস্থা ধারণ করিয়াছে, পূর্ব্বাকাশে নবোদিত সূর্য্যের কণকানুরঞ্জিত কিরণচ্ছটা, সুখদ সুস্নিগ্ধ সমীরণের মৃদুমন্দ সঞ্চার, বিহঙ্গকুলের হর্ষ-সূচক কল-কলধ্বনি, নব প্রস্ফুটিত কুসুমনিচয় প্রাণস্পর্শী সৌরভ বিস্তার করিতেছে, বসুন্ধরাসতী অল্পে অল্পে আপনার তিমিরাবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া, অসাড় জগতে চেতনা ও প্রাণের সঞ্চার করিয়া দিতেছে; এই সকল পরম মনোরম ব্যাপার দেখিলেন। বায়ু প্রবলাকার ধারণ করিয়া নিমেষে বৃক্ষলতা উৎপাটিত করে, ভয়ঙ্কর গর্জ্জনের সহিত ঘন ঘন প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলে, তখন বায়ুর প্রলয়কারিণী রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া বৈদিক ঋষিরা ভাবিলেন যে, ইহাদের পশ্চাতে এক কৌশলময়ী স্বতন্ত্র শক্তি সংযোজিত রহিয়াছে, যাহার দ্বারা সকল কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। তখন তাঁহারা বিশ্বের অন্তরালবর্ত্তিনী প্রতি পদার্থগত এক অন্তর্যামিনী শক্তির পরিচয় পাইলেন। এই স্থানে তাঁহাদের ঈশ্বর জ্ঞানের প্রথম পরিস্ফুটন হইল, তখন তাঁহারা সেই অন্তর্যামিনী শক্তির আরাধনা করিতে লাগিলেন। সংহিতার পর ব্রাহ্মণ বিভাগ। এই বিভাগ কেবল

যাগযজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডে পরিপূর্ণ। প্রকৃতির কোলে সদাই হরগৌরী-ভাব, দুই বিপরীত স্বরূপ বিকশিত।

পরাশরকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বাদশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮৬টি শ্লোক আছে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণু সংহিতা অপেক্ষা এই গ্রন্থ ক্ষুদ্র।

"মুদ্রারাক্ষস" কত শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ভোজদেবকৃত কামধেনু গ্রন্থের অস্তিত্ব বিলোপ পাইয়াছে। দানপত্রের মতে "ভোজদেব ৯৪৩ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।" দণ্ডীর সময় খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীরূপে বিবেচিত হইয়াছে। মুদ্রারাক্ষস নাটক বীররসে পরিপূর্ণ। এই নাটক ঐতিহাসিক ঘটনামূলক ; ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া কুটিল রাজনীতি বর্ণনই ইহার প্রধান লক্ষ্য।

আমরা বলিতে চাহি যে, আমাদের "আদিম" শব্দ বিকৃত করিয়া যবনেরা যেমন বিকৃত ও কৃত্রিম এক "আদম" খাড়া করিয়াছে, তেমনই তাহারা আমাদের নহুষকে "নোওয়া" ও যযাতিকে 'যেফত,' বানাইয়া এক নূতন বংশাবলীর পত্তন করিয়া বসিয়াছে।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই জগতের বিরাট এবং অতি প্রসিদ্ধ। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য ও সৌপ্তিক, এই কয়টি পর্ব্ব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধপর্ব্ব। সকল পর্ব্বেই এক বা একাধিক কলঙ্ক-চিহ্ন লুক্কায়িত আছে।

স্বপক্ষের অজ্ঞাতসারে শত্রুপক্ষকে নিজের বধোপায় বলিয়া দেওয়ায় ভীষ্মদেবের আদর্শচরিত্র কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছে কি না, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ প্রারম্ভেই কলঙ্কপৃষ্ঠ হইয়াছে কি না, উদার পাঠকের প্রতি তাহার বিচার ভার অর্পণ করিলাম। জয়দ্রথ বধে অর্জ্জুনের কিছুমাত্র পৌরুষ নাই, বরং শ্রীকৃষ্ণের কৌশল সহায়ে নিরস্ত্র, অন্যমনস্ক শত্রুকে বধ করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন। জয়দ্রথ বধ,—

অর্জ্জুনের মহৎ চরিত্রের একটি ক্ষুদ্র কলঙ্ক। তৎপরে দ্রোণবধ—ইহা পাণ্ডব পক্ষের একটি মহান্ কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে।

মহাভারতের পতনের (Heroic India) যুগেই বৌদ্ধযুগের আবির্ভাব হয়। যখন আমাদের নিরুক্তকারগণকে তোমরা তোমাদের মুসার (Moses) সমসাময়িক না ভাবিয়া পারিতেছ না, সে সময়েরও বহু পূর্ব্বে এদেশে পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, দর্শন, স্মৃতি, উপনিষৎ ও সমগ্র বেদ চতুষ্টয়ের দেহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সে দেশ কত কালের তাহা তোমরা ভাবিয়া দেখিতে সমর্থ নহ। এই মহামূল্য গ্রন্থগুলি যে আলাদীনের প্রদীপের ঘষায় উৎপন্ন হয় নাই, মহাজ্ঞান-সম্পন্ন ঋষিরা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও কি তোমরা সন্দেহ করিতে পার? এই সকল ঋষিরা যে সকল জ্ঞানবত্তা দেখাইয়া গিয়াছেন, তোমাদের কোন্ বৈদেশিক গ্রন্থে তাহা আছে ?

ইন্দ্র "হরিযুপীয়া" (ইউরোপ, কি ?) জনপদে গমন পূর্ব্বক বরশিখ নামক দৈত্যকে বধ করেন। ঐ হরিযুপীয়া, শব্দই ল্যাটিন ইউরোপে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের সামনে আজ বড়াই করিতে আসে! ভারতের মিশ্রজাতির দ্বারা অধ্যুষিত হইয়া উক্ত জনপদ ইজিপ্ট বা মিশর দেশ নামে প্রখ্যাতি লাভ করে।

অজয়তীরে জয়দেবের জন্মক্ষেত্র কেন্দ্রবিল্ল গ্রাম। আমার মনে হয় যে, অজয় আজও জয়দেবের মধুর গানে অনুপ্রাণিত—যেন অজয়ের গৈরিক জল-প্রবাহ খরস্রোতে দ্রুত যাইয়া একেবারে লম্ফ দিয়া "দেহি পদপল্লব মুদারম্" গাহিতে গাহিতে জাহ্নবীর উচ্ছ্বসিত বক্ষে ঝম্প প্রদান করিতেছে। জাহ্নবী পদ-পল্লব না দিয়া সসম্ভ্রমে আপনাকে দান করিয়াছেন, আপনার কালরূপ ত্যাগ করিয়া অজয়ের গৈরিকরূপে আত্মবিলীন করিয়াছেন।

পলাশীর আম্রকানন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গলার শ্যামল প্রান্তরে ব্রিটিশ "ইউনিয়ন্ জ্যাক" পতাকা উড্ডীন হইয়া যে লোক বিস্ময়কর দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল, তাহারই শত বৎসর পরে আবার সেই পতাকাকে রুধির-রঞ্জিত করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত করিবার জন্য আর একটী ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হয়। ইতিহাসে তাহা সিপাহী যুদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাহাতে যে রুধিরনদী প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গভূমি হইতে সুদূর দিল্লী প্রদেশ পর্য্যন্ত রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে পলাশীর আম্রকানন প্রান্তরে প্রথমে ইংরাজের (ইংলিশের) বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল, তাহারই নিকট বহরমপুরের শ্যামল প্রান্তরে সিপাহী-বিদ্বেষ বহ্নির প্রথম স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়।

মুসলমানদিগের যে অমানুষিক প্রচণ্ডতা পৃথিবীর বক্ষে উৎপাতের ও প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্য করিয়া, মানব সমাজকে চকিত, ভীত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার ইতিহাস দুর্ব্বল মানব মণ্ডলীর বেদনাজনিত অক্ষম অশ্রুপাতের ইতিহাস। বর্ষার প্রবল বন্যা পৃথিবী ধ্বংসের যে ইতিহাস রাখিয়া যায়, কাল স্বহস্তে তাহাকে স্নেহের আবরণে এমনই করিয়া ঢাকিয়া ফেলে যে, কোনখানে কোন চিহ্ন দেখা যায় না। মুসলমানেরা ভারতে উপস্থিত হইয়া, গৃহে গৃহে যে গগন বিদারী ক্রন্দনের রোল তুলিয়াছিল, আজ হয়ত ইতিহাসের জীর্ণ পত্রস্তূপ সরাইয়া আমরা সেই করুণ স্বরটি ঠিক ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। শত শত গৃহ দগ্ধ হইয়াছে, শত শত নগর নগরী শ্মশানে পরিণত হইয়াছে ও লক্ষ লক্ষ লোক হত হইয়াছে। অপর

কোন দেশে এরূপ ঘটিলে, হত বন্ধুবান্ধবের তপ্ত নিশ্বাসে বায়ু মণ্ডল এরূপ উষ্ণতা প্রাপ্ত হইত যে, যুগ যুগান্তরে মানব মণ্ডলীকে ইহাতে দগ্ধ হইতে হইত। কিন্তু হায়! ভারতবাসী মরিতেই জন্মিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগের হত্যার কেন খেদ করিবে? ভাতনীর দুর্গ-জয়ের পর দশ সহস্র হিন্দু নরনারী শিশুকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ভস্মীভূত করা হইয়াছিল। মুসলমানদের চক্ষে একটু জলও দেখা দেয় নাই। তৈমুরলঙ্গের আদেশে সিন্ধু নদতীরে একলক্ষ বন্দী হিন্দু নরনারীদের ক্ষিপ্ত মুসলমান অসিতে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছিল। মানুষ যে এইরূপ মেষের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে, জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সেকালে সিরি ও পুরাতন দিল্লী গোলাকার প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। মুসলমানদের পদার্পণে দিন রাত্র রক্তস্রোত বহিয়া অমরাবতী দিল্লী নগরী নরকঙ্কালে পরিপূর্ণ—প্রাণহীন শ্মশানে পরিণত হইল। সেই শ্মশানে বসিয়া পাঠান মোগলেরা হিন্দুর আর কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিল,—"টডের রাজস্থান" তাহার কতক গল্প বলিবে। তৈমুর—স্বদেশে যে বিশাল মসজিদ নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য ৩০ হাজার হিন্দু রাজমিস্ত্রীদিগকে তরবারির মুখে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, হিন্দুস্থান হইতে মেষপালের ন্যায় বন্দী করিয়া লইয়া যান। এগার মাস ভারতের নানাস্থান লুণ্ঠন ও দগ্ধ করতঃ তৈমুর স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ভগবানের ইচ্ছায় ভারত ব্রিটিশের হস্তগত হইয়াছে। ব্রিটিশ ভারত অধিকার না করিলে, আজ হয়ত ক্ষিপ্ত মুসলমানের হস্তে একজন হিন্দুও হিন্দুস্থানে বাঁচিয়া থাকিত না।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার পলাশীর প্রান্তরে ব্রিটিশের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্র যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া ইংরাজ দিল্লী

অধিকার করিলেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের সময় কলিকাতা হইতে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব হয়। ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে সাজাহানের দিল্লী পর্য্যন্ত এগার মাইল স্থানে এক একটা জাতির এক একটা রাজবংশের বহু ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহারই পার্শ্বে আট বৎসরের চেষ্টায় ও ১৫ কোটী ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইংরাজের নয়াদিল্লী (New Delhi) নির্ম্মিত হইয়াছে। বড়লাট লর্ড আরউইন ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীর উদ্বোধন করিয়াছেন। এক্ষণে এই নয়াদিল্লীই ভারতের রাজধানী।

ব্রিটিশের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি কিন্তু ভারতবাসীর উপযোগী হয় নাই। ইংরাজের স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয় গোলাম খানায় পরিণত হইয়াছে। ভারতবাসীকে দাসত্বে না ডুবাইয়া, ইংরাজ যদি তাহাদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের সুযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে ইতিহাসে ইংরাজের ভারতাগমন গৌরব মণ্ডিত হইয়া থাকিবে।

বর্ণমালার ইতিহাস।

পূর্ব্বকালে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৩০০০ বর্ষে কোন্ দিক হইতে (ডান বা বাম) লেখা আরম্ভ হইবে, তাহার কোন নিয়ম ছিল না। খরোষ্ঠী লিপি খৃঃ পূঃ ৪০০০ বর্ষে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ৬৯ হিজরীতে আরবী অক্ষরে হরকত দিবার ব্যবস্থা হয়। নেবতী ও ছুরয়ানী অক্ষর হইতে আরবী অক্ষর নির্ব্বাসিত হইল। খৃঃ পূঃ ২০০ বর্ষে হিব্রু অক্ষর ছিল না। ব্রহ্মালিপি খৃঃ পূঃ ২০০০ এবং অশোকলিপি খৃঃ পূঃ ৩০০ বর্ষে বর্ত্তমান ছিল। আর্য্য হিন্দুর নকল করিয়া পারসিক ও গ্রীকগণ বামদিক হইতে ডানদিকে, কখন বা ডান বাম দুই দিক হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যস্থানে বিস্তার শেষ করিতেন। (হিন্দু—মনু, রোমান বা এট্রাসকানদের—নুমা; ক্রীটানদের—মেনু ইত্যাদি)। যাহাহউক ট্যাক্সিলা বা তক্ষশীলায় লিখন-প্রণালী-বিজ্ঞান উন্নত হইলে, ভাষাবিদগণ নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী এক একটি প্রথা ঠিক করিয়া লইলেন। চীনদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ মনে করিতেন, ঈশ্বর সকল সৃষ্ট জিনিষের উপর বর্ত্তমান আছেন এবং সমস্ত বস্তু তাঁহার আদেশ অনুসারে উর্দ্ধ হইতে নিম্ন দিকে আসে। তাই তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শানুসারে উপর দিক হইতে আরম্ভ করিয়া নীচের দিকে অগ্রসর হইয়া অক্ষর সমাপন করেন। পালি ভাষা প্রায় সমস্ত এসিয়া, মিশর, গ্রীক প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করে। এইরূপে ব্রাহ্মণদিগের ধারণা এই যে, অন্তরের বামদিক হইতে ডান দিকে রক্তের চলাচল হয় এবং অন্তরকে বাক্‌শক্তির কেন্দ্রস্থল বলা হয়। তাই তাঁহারা

মনে করেন যে, বামদিক হইতে ডানদিকে অগ্রসর হইলেই ভাল হয়। এই ধারণায় ব্রহ্মীলিপি প্রচলিত হয়। আরব ও শ্যামদেশীয় লোকের ধারণা এই যে, স্বভাবতঃ মানুষের ডানহাত আগে চলে। সুমানী দেশীয় লোকগণ আরবী অক্ষর লিখিবার সময়েও উপর দিক হইতে নীচের দিকে বিস্তার লিখিয়া থাকেন। আরবে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচলিত হইবার সময় আরবী অক্ষর শুধু হেজাজে প্রচলিত ছিল এবং তাহাও অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এরাক ও তিউনিসবাসী নিজেদের প্রাচীন অক্ষর হারাইয়া ফেলিয়া আরবী অক্ষর লইয়াছে। মিশরীয় সভ্যতা পরবর্ত্তীগণের জন্য সভ্যতার চিহ্ন স্বরূপ নানা প্রকার মন্দিরাদি রাখিয়া গিয়াছে। বেবীলনীয়ান সভ্যতা শূন্যে উদ্যান, উচ্চ মন্দির ইত্যাদি সভ্যতার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। ল্যাটিন ভাষা এখন জীবিত ভাষা নয়। তুর্কী,—ইহা পূর্ব্বে ইগুরী অক্ষরে লিখিত হইত। কাজানী ও তাতার ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ। পাহলবী অক্ষর দুই প্রকার; যথা—সামানী ও আরামী। এতদ্ব্যতীত পাহলবী অক্ষরের আরও নানা প্রকার শাখা প্রশাখা আছে। তমাজগ্য ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন; ইহা মরক্কো দেশীয় বর্ব্বরগণের ভাষা। পৃথিবীর মানবগণের সকল ভাষার ও সকল অক্ষরের ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে, ব্রাহ্মণদিগের সংস্কৃত ভাষা হইতেই পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য-ভাষার জন্ম হইয়াছে।

"If India, nothing taught to Europe, the whole Europe is indebted to India at least for language,"
—F. Max Muller.

"The heroes of ancient India are the Gods of Greece, Rome and Judea."—Jaccolliott.

বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি সিংহল পাটনে। ভাষা জাগিলে জাতির জাগরণ অবশ্যম্ভাবী। সমগ্র জাতিকে জাগাইতে হইলে, মাতৃ ভাষাকে শিক্ষার বাহিনীরূপে গ্রহণ করাই একমাত্র উপায়।

অপ্রকাশিত কবিতা।

মহারাজ যাদবেন্দু সিংহ রচিত।

[গোষ্ঠ লীলা]

(১)

দিছে রাণী বামকরে শ্যাম।
দক্ষিণ করে বলরাম ॥
হের আয়রে বলরাম, হাত দে মোর মাথে।
প্রাণের অধিক শ্যাম সঁপে দি তোর হাতে ॥
রামের হাতে শ্যাম দিয়া বলে নন্দরাণী।
লঞা যেছো আমার গোপাল এনে দিও তুমি ॥
যমুনার তীরে যখন গোপাল খেঞা যায়।
আডুড় বিষম বড় সামালিও তায় ॥
গোধনে গোপনে যখন লাগে হুলাহুলি।
সেখানে সামালো আমার পরাণ পুতলি ॥
নব নব তৃণাঙ্কুর যেখানে দেখিবে।
সেইখানে গোপালে আমার কান্ধে করি লবে ॥
রবির কিরণে যখন ঘামিবেক গা।
নূতন পল্লব লঞা দিও মন্দ বা ॥
কাল যমুনার জল কাল নীলমণি।
কাল জলে কালরূপ মিশায় পাছে জানি ॥
প্রাণধন তোরে দিঞা আমি ঘরে যাই।
যাদবেন্দু বলে রাণী কিছু ভয় নাই ॥

(২)

রৈয় রৈয়
রৈয় রৈয় রে।

নেহারি বয়ান যুড়াক পরাণ
তবে মায়ে ছেড়ে যেওরে॥
আগে ধেঞা রাণী যশোদা রোহিণী
নেহারে চান্দ মুখখানি।
অন্তরে কাতরে আঁখে জল ঝরে
মুখে নাহি সরে বাণী॥
শ্রীদাম সুদাম শোন বলরাম
তোমা সভাদিকে কই।
মৃত তনু এই ঘরে লঞা যাই
পরাণ পুতলি ঐ॥
কল্যাণ কুশলে গোসাঞী রাখুক তোরে
মায়ের সনে এই দেখা।
যাদবেন্দু সুখী তবে প্রাণ রাখি
নন্দ ঘুচায় ধেনু রাখা॥

(৩)

গোঠ বিজই রাম কানু।
আগে পিছে শিশু ধায় লাখে লাখে ধেনু॥
নপুরের ধ্বনি শুনি মুনির মন ভুলে।
ঢাকিল রবির রথ গোক্ষুরের ধূলে॥
সুরঙ্গ চাহনি বিনোদ পাগুড়ি।
কারু নীল কারু পীত কারু রাঙ্গা ধড়ি॥

কারু হাতে রাঙ্গা লাঠি গলে গুঞ্জাহার।
কারু কারু কান্ধে শোভে ভোজনের ভার।
কেহ কেহ ধেঞা গিএ ধেনু বাছুড়ায়।
যাদবেন্দু এক পাশে দাঁড়াইয়া চায়॥

* * * *

নদীয়া—বাগাঁচড়ার পরলোকগত কবি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ মহাশয় গদ্য ও পদ্য রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুললিত ভাষায় হৃদয়গ্রাহী সুমধুর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রণীত "স্বদেশ রেণু", "ভূতের খেলা" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। তাঁহার লিখিত অনেক কবিতা এবং একখানি নাটক প্রকাশিত হয় নাই। ১৩৩২ সালের ৪ঠা মাঘ সরস্বতী পূজার দিন শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদে "সারস্বত উৎসব" হয়। তাঁহার নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু তিনি সরস্বতী পূজার দিন বাড়ী ছাড়িয়া কখন কোথাও যাইতেন না, অথচ কার্য্যগতিকে তাঁহাকে তৎপূর্ব্বদিন শান্তিপুরে যাইতে হইয়াছিল। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক ও কর্ম্মীগণ পাকড়াও করিলেন, তাঁহাদের কথা "যখন এসেছেন, তখন কা'ল থেকে যেতেই হ'বে।" পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত চণ্ডীবাবু অনেক চেষ্টাতেও অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া উৎসবে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু "সারস্বত উৎসবে" দিবার ত কিছুই নাই! এ এক মহা সমস্যা! সেজন্য বেলা ৯ টার সময় এক রুদ্ধগৃহে নির্জ্জন কক্ষে বসিয়া এক ঘণ্টার মধ্যে নিম্নলিখিত দুইটি গীতি রচনা করিলেন।

বাণী-স্তুতি।

(গীতি)

নমস্তে বাণি—বীণাপাণি!
নমো, কুন্দ-ইন্দুনিভ ধবল বরণী।

ঝঙ্কৃত ধৃতবীণা—মঞ্জুল সুর,
বেদ নিনাদিত—প্রণব মুখর,
সপ্ত লোকাতীত,
বিশ্ব বিকাশিত,
উদ্ভাসিতাসিত সুন্দর ধরণী।
নমস্তে বাণি—বীণাপাণি!

সূর্য্য শত শত, প্রস্ফুট অবিরত,
অনন্ত ব্যোম-তম উজ্জ্বল আলোকিত,
ধ্বান্ত অন্তর্হিত,
ধীর্জ্যোতি মণ্ডিত,
পুলক প্রকাশিত রাগ রাগিণী।
নমস্তে বাণি—বীণাপাণি!

তন্ত্রী উপর ধীর অঙ্গুলি চালনে,
কঙ্কণ শিঞ্জিত মিলিত সে বাদনে,
ছন্দ গঠিত নব,
মধু রব বৈভব,
নূপুর নিনাদ-গীতি-গুঞ্জন-গামিনী।
নমস্তে বাণি—বীণাপাণি!

নমো নমঃ দেবি, বিদ্যাবিধায়িনী,
বিজ্ঞান জ্ঞান দান কর জ্ঞানদায়িনী,
প্রণতি চরণে তব,
তব পূজা উৎসব,
সিদ্ধ হউক, দাও এ আশীস্ বাণী ।
নমস্তে বাণি—বীণাপাণি ।

তোমার গান ।

(গীতি)

মা ! তোমার সুরেই ভরিয়ে দিলে বিশ্বধাম !
কানে কেবল তোমার বাণী, আস্ছে ভেসে অবিরাম !
১ । পূবের পথে অরুণ-রথে, প্রভাত যখন ছুটে ধায়
সাতটা রঙে রঙিয়ে দিয়ে—নৈশাকাশের নীলিমায় ;
তখন তোমার বীণার তানে,
পুলক-জাগা-জীবন আনে,
পাখীরা তাই তোমার গানে,
শুনায় কানে তোমার নাম ।
মা ! তোমার সুরেই ভরিয়ে দিলে বিশ্বধাম ;
কানে কেবল তোমার বাণী আস্ছে ভেসে অবিরাম !
২ । আবার যখন প্রদোষকালে অস্তাচলে যা'ন তপন,
শ্যামার গায়ে নীলাম্বরীর জড়িয়ে স্নেহ-আবরণ ;
সন্ধ্যা-বধূ নীল আকাশে,
দীপাবলী জ্বাল্‌তে আসে,
তোমার সুরেই আনমনা সে,
দুলিয়ে চলে অলক দাম !

মা! তোমার সুরেই ভরিয়ে দিলে বিশ্বধাম ;
কানে কেবল তোমার বাণী আস্‌ছে ভেসে অবিরাম।

৩। নিঝুম রাতে স্তব্ধ ধরা, স্বপন মাখা পরাণ তা'র,
সীমন্তে লাখ হীরার সিঁতি, কণ্ঠে কোটী ফুলের হার ;
ঝিল্লি তখন তোমার গানে,
তন্দ্রামাখা ছন্দ আনে,
চেয়ে তোমার চরণ পানে,
গায় সে ব'সে চতুর্যাম।

মা! তোমার সুরেই ভরিয়ে দিলে বিশ্বধাম ;
কানে কেবল তোমার বাণী আস্‌ছে ভেসে অবিরাম।

৪। তরঙ্গিনীর কলনাদে, সমীরে ঐ বীণার তান,
মেঘের গুরু গরজনে, উঠ্‌ছে ধ্বনি কাঁপিয়ে প্রাণ ;
বর্ষাধারায় শুনি ও গান,
কোমল কড়ি সবই সমান,
(আমার) প্রাণের তারে তোল মা তান,
তা'র যেন আর হয় না বিরাম।

মা! তোমার সুরেই ভরিয়ে দিলে বিশ্বধাম ;
কানে কেবল তোমার বাণী আস্‌ছে ভেসে অবিরাম।

চণ্ডীবাবুর কখনও উপাধি-ব্যাধি ছিল না, বরং তিনি উপাধির বিরোধীই ছিলেন, কিন্তু এই দুইটি কবিতার জন্য সমবেত সভ্যগণ তাঁহাকে "কবিভূষণ" উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ঐ দান প্রত্যাখ্যান করেন নাই বটে, কিন্তু কখনও তাঁহাকে "কবিভূষণ" বলিয়া স্বাক্ষর করিতে দেখা যায় নাই।

প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার।

বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতি পৃথিবীর মহাকবিগণের কাব্য বহু শতাব্দী পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। তখন ছাপাখানা ছিল না, এক একখানা কাব্যের রচনা কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে নৈসর্গিক নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, রাষ্ট্রবিপ্লব অনেকবার হইয়াছে। তাহাতে কত নগরী, কত প্রাসাদ, কত প্রস্তর ও ধাতু নির্ম্মিত মূর্ত্তি, বিনষ্ট ভগ্ন বা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও শত শত সংস্কৃত কাব্য ও অন্যবিধ গ্রন্থ পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত থাকিয়া আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কাব্যগুলি হইতে তাঁহারা আনন্দ পাইতেন, কাব্যরস আস্বাদন করিবার শক্তি তাঁহাদের ছিল। আমাদের বাঙ্গালী কবিদের রামায়ণ, মহাভারতাদি কাব্য কেবল হাতের লেখা পুঁথি এবং গায়ক কথকদের স্মৃতির সাহায্যে বহুকাল জীবিত থাকিয়া এক শতাব্দী পূর্ব্বে ছাপাখানার সাহায্য লাভ করে।

নানাদেশের লোকদের পাটীগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র পড়িলে দেখা যায় যে, সর্ব্বত্রই মানুষের মনের চিন্তার নিয়ম ও যুক্তির প্রণালী একই রকম।

কবি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বগ। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, পর্ব্বতে, কন্দরে, গহন বনে, যখন যেখানে কবির ইচ্ছা হয়—মননমাত্রেই গমন করিতে পারেন। কবি ঘোর অন্ধকারে সুস্পষ্ট দেখিতে পান। সরোবরে কমলিনীকে ভ্রমর গুণ্ গুণ্ রবে কি বলিতেছে, বৃক্ষশাখায় স্বচ্ছন্দ-

বিহারী পক্ষীকুল অস্পষ্ট স্বরে কি সুমধুর আলাপ করিতেছে, গভীর নিশীথে অর্গল বদ্ধ গৃহাভ্যন্তরে কি গুপ্ত কথোপকথন হইতেছে, কবি তাহা শুনিতে পান। কবির কল্পনায় বাস্তব প্রতিফলিত।

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালী কবি গ্রন্থ-সমাপ্তিকাল লিখিয়া দিতেন। কেহ স্পষ্ট ভাষায় আঙ্কিক শব্দে লিখিতেন, কেহ স্পষ্ট না বলিয়া পাঠকের সহিত কিঞ্চিৎ কৌতুক করিতেন। কবি চণ্ডীদাসের একটা পদে না কি আছে—

"বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ।
নবহু নবহু রস গীত পরিমাণ॥"

বিধু = ১, নেত্র = ৩, পঞ্চবাণ = ৫ × ৫ = ২৫।

১৩২৫ শক। সংস্কৃতে পঞ্চবাণ থাকিলে ৫৫ বুঝিতাম।

আমাদের প্রতিদিনের ইতিহাসে রসও নাই, বৈচিত্রও নাই। এই বৈচিত্রহীনতায় মানুষের সমস্ত অন্তঃকরণ যেদিন সংসারের প্রতি সর্ব্বরকমেই বিমুখ হইয়া দাঁড়ায়, সেই দিনই তাহার মনে হয়—পৃথিবীর ভার মানুষের পক্ষে অনাবশ্যক ভাবে বেশী। ইহা বহন করিবার শক্তি তাহার নাই। সেই বিষাদ মূহূর্ত্তেই মানুষ এমন একটা কিছু চায়—যাহার কোলে আশ্রয় লইলে অন্ততঃ কয়েকটি মূহূর্ত্তও জীবনের সহস্র ত্রুটি বিচ্যুতির কথা ভুলিয়া থাকা যাইবে। মানুষের জীবনে এই বিশ্রাম বা ছুটীর প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। নতুবা এত বড় পৃথিবীটি এত দিনে প্রকাণ্ড এক পাগলা গারদে পরিণত হইত। কিম্বা সবাই একে একে আত্মহত্যা করিত। বলাবাহুল্য সেরূপ হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই।

কিন্তু হয় নাই কেন? উত্তরে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, "মানুষের সৃষ্ট শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস—মানুষকে এই অপমৃত্যু হইতে উদ্ধার করিয়া আসিতেছে।" প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের আরণ্যক

কবি ঋষিরা শিল্পী এবং সঙ্গীতকার, চারি সারি সারি যুগে যুগে যে রস সৃষ্টি করিয়া আসিতেছেন, তাহাই মানুষকে অনেক দুঃসহ মুহূর্ত্তে মুক্তির আনন্দ আস্বাদন করিবার সুযোগ দিয়াছে। সাহিত্য এবং শিল্পের আদর্শ কি,—সে সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আছে। একদলের মতে, জীবনের সহিত বাস্তবতার যোগ রাখিয়াও যে সাহিত্য ও শিল্প পৃথিবীর নিত্যকার তুচ্ছতার উর্দ্ধলোকে বিচরণ করিতে পারে—তাহাই আদর্শ। কঠোর বাস্তবতা যদি সাহিত্য হইত, তবে ও জিনিষটার কোন স্বতন্ত্র প্রয়োজনই থাকিত না। পৃথিবীতে যাহা ঘটিতেছে, তাহা নিত্যই দেখিতেছি। সেই সবের অবিকল প্রকৃতিই যদি সাহিত্য, তবে তাহার মধ্যে রচয়িতার সৃষ্টির পরিচয় কোথায়? কোথায় তাঁহার কল্পনার প্রসার?

আর্য্যাবর্ত্তের আদি কবি বাল্মীকিকে জানি। অরণ্যের মহর্ষিরা বোধ করি, মানুষকে প্রাত্যহিক দুঃখ দুর্দ্দশা হইতে কিছুক্ষণের নিমিত্ত অব্যাহতি দিবার জন্যই তাঁহার প্রথম কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। বর্ষার সন্ধ্যায় অন্ধকার আকাশের নীচে সঙ্গীহীন কক্ষে যখন একা 'সিংহগড্ডা'র মহাকবি কালিদাসের "মেঘদূত" পাঠ করি, কিম্বা পৃথিবীর সঙ্কীর্ণতা ও বন্ধনে ক্ষুব্ধ হইয়া যেদিন বেদ, পুরাণ প্রভৃতি পড়িতে বসি,—সেদিন বুঝিতে পারি, সাহিত্য মানুষের কত বড় ঐশ্বর্য্য। মহাভারত ও রামায়ণ, জাতক প্রভৃতি পাঠে বুঝিতে পারি, কোন্‌খানে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীর প্রভেদ। সাহিত্যে আজ মানুষ যেটাকে পূজা করে, কাল তাহার কথা ভুলিয়া যায়। সংস্কৃত গ্রন্থগুলি পড়িয়া আজও মানুষ তৃপ্তি পায় কেন? পালি গ্রন্থগুলির প্রতি চাহিয়া মানুষ আজও চোখ ফিরাইতে পারে না কেন? শাক্যসিংহকে আজও ইউরোপ শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতকার বলিয়া পূজা করে কেন? সংস্কৃত গ্রন্থ এত আদরের কেন? যে রচনায় বা শিল্পের কল্পনায় প্রসার ও ভাবের

অসীমতা নাই,—তাহাই ক্ষণস্থায়ী। বাল্মীকির মত সমস্ত বেদনার মধ্যে সাহিত্যের জন্ম। মানুষের মনের খবর সহজে জানা যায় না, কিন্তু বাহিরের দুঃখ লইয়া আলোচনা চলে।

কবি কালিদাসের কাব্যগুলি পড়িলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত দেশের সম্পূর্ণ এবং নির্ভুল ভৌগোলিক জ্ঞান গ্রন্থকর্ত্তার ছিল।

মেঘনাদবধ কাব্য রচয়িতা সাগরদাঁড়ী ~~নদ তীরস্থ সাতক্ষীরা~~ গ্রাম নিবাসী মধুসূদন দত্তের শেষ জীবন কাটিয়াছিল কয়েকজন পরহিতৈষী আত্মীয়ের অনুগ্রহে। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে মধুসূদন যখন আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে শেষ শয্যায় শায়িত, সে সময় তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটের মৃত্যু হয়। সে দিন মধুসূদনের এমন সম্বল নাই, যদ্বারা পত্নীর সমাধিভূমি প্রস্তরাবৃত করা চলে। কবি রজনীকান্তের "বাণী" "কল্যাণী"র সঙ্গীত আজ পল্লীর নিভৃততম প্রান্তেও গীত হয়, কিন্তু কবি গোবিন্দ দাসের মত, তাঁহার শেষ জীবন দুঃখ যন্ত্রণার এক করুণ ইতিহাস। বাণী-সেবকের সহিত অদৃষ্ট লক্ষ্মীর বিরোধ সহজে ঘুচিবার নয়।

পুরাণগুলিই ভারতের ইতিহাস। বর্ত্তমান পুরাণ সকল যে আকারে পাওয়া যাইতেছে, উহার ভাষা ইত্যাদির বিচারে পণ্ডিতেরা মনে করিয়া থাকেন যে, উহারা গুপ্ত কালেরই সঙ্কলন। গুপ্ত সাম্রাজ্য স্থাপনের বহু পূর্ব্বে প্রাচীন সিংহল পাটন রাজ্য ধ্বংস হয়। সিংহ রাজগণের রাজত্বকালেই রাঢ়ে জ্যোতিষের বিশেষ উন্নতিসাধন হয়। যজ্ঞ যুগের পর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব সময়ে উত্তর ভারতে এক রাষ্ট্র বিপ্লব উপস্থিত হয়। এই সময়ে ভারতের অন্যান্য স্থানের প্রাচীন রাজবংশসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। আজ যে সমগ্র ভারতে পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রভাব দেখা যায়, তাহার বীজ মহানাদেই উপ্ত

হইয়াছিল। মহানাদে সমুদয় সম্প্রদায়ের সাধু ও সন্ন্যাসীগণ একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি সমাজ গঠন করেন। প্রবাদ এখনও উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে,—"মহানাদে তেত্রিশ কোটি দেবতা একত্রিত হইয়াছিলেন।"

হিন্দু লেখকগণের ২০ খানিরও অধিক জ্যোতিষিক গ্রন্থের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। আইন-ই-আকবরীতে নয়খানি সিদ্ধান্তের নাম পাওয়া যায়—ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, গর্গ সিদ্ধান্ত, সূর্য্য সিদ্ধান্ত, নারদ সিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত, পরাশর সিদ্ধান্ত, বৃহস্পতি সিদ্ধান্ত, পুলস্ত্য সিদ্ধান্ত, বশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত। এ ভিন্ন অপর সিদ্ধান্তগুলির নাম নিম্নে দিলাম।

ব্যাস, লোমশ, আর্য্য, অত্রি, পুলিস, কশ্যপ, যবন, মরীচি, ভৃগু, মনু, চ্যবন, অঙ্গিরা। ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত শিরোমণি একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ খ্যাতিমান হইয়াছে (১১৫০ খৃষ্টাব্দে)। ব্রহ্ম সিদ্ধান্তখানি ব্রহ্মগুপ্ত দ্বারা সুসংস্কৃত হইয়া ৫৩০—৫৮০ খৃঃ অঃ মধ্যে ব্রহ্মস্ফুট সিদ্ধান্ত নামে পুনঃ প্রচারিত হইয়াছিল। সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকার নৃসিংহ বলেন যে, ব্রহ্মগুপ্তের নিয়মাবলী বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর পুরাণ হইতে সংঘটিত। শাকল্যের ব্রহ্মসিদ্ধান্তের নাম পাওয়া যায়। পঞ্চপদ্ধতি মধ্যে এক পদ্ধতি হইতেই বরাহ মিহির নাকি তাঁহার পঞ্চসিদ্ধান্তিকা সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থ কালের গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। যাহা অবশিষ্ট ছিল, মুসলমানেরা নষ্ট করিয়া দিয়াছে। তথাপি সেকালে রাঢ়ের মনীষিগণ যে জ্ঞানগর্ভ অমূল্য গ্রন্থরাজি তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য নিরূপণ করা যায় না। রাঢ়ের দান অতুলনীয়।

ষষ্ঠ শতাব্দীর লেখক দণ্ডীর কাব্যাদর্শে গৌড়ের লেখার রীতির উল্লেখ পাই। দণ্ডী লিখিয়াছেন—

"অস্ত্যনেকো গিরাং মার্গঃ সূক্ষ্মভেদঃ পরস্পরং।
তত্র বৈদর্ভ গৌড়ীয়ৌ বর্ণ্যে তে প্রস্ফুটান্তরৌ॥"

অগ্নিপুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় সমস্ত অলঙ্কার শাস্ত্রের পুথিতেই সংস্কৃত ভাষা রচনার অতি প্রসিদ্ধ "গৌড়ী" বা ঘোরী রীতির বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্য দণ্ডী, গৌড়ীকে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের সংস্কৃত রচনার আদর্শ রীতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই রীতির স্রষ্টা কে? কোল, পোদ, গোয়ালা, সাঁওতাল, চণ্ডাল, কাস্থ, বৈদ্দী, বাগদী, বাউরী, কলিতা, মোচ, কোচ, দৈবজ্ঞ কখনই গৌড়ী রীতির জন্ম প্রদান করে নাই।

প্রায় ১০০০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পুরুষোত্তমদেব, জয়দেব ও ধোয়িক, নৈয়ায়িকাগ্রগণ্য রঘুনাথ ও জগদীশ, স্মার্ত্তচুড়ামণি রঘুনন্দন প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করতঃ রাঢ়ের সংস্কৃত সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। মহানাদের বামন-জয়াদিত্য রচিত "কাশিকাবৃত্তি"র এক সময় খুব সমাদর ছিল। বৈয়াকরণ জিনেন্দ্রবুদ্ধি মহানাদে এই কাশিকাবৃত্তির টীকা (ন্যাস নামে অভিহিত) করিয়াছেন। ইনি ৭২২ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি নবীনচন্দ্র সিংহের নিকট হইতে "ন্যাস" গ্রন্থ লইয়া গিয়া ফেরৎ দেন নাই। মহর্ষি পাণিনি রচিত অষ্টাধ্যায়ীর টীকা—"ভাষাবৃত্তি" পুরুষোত্তম দেব রচনা করেন। ৺কালীদাস সিংহ লিখিয়াছেন—ইনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। ভাষাবৃত্তি গ্রন্থ, ভর্ত্তৃহরির ভাগবৃত্তি এবং বামনের কাশিকা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে। পুরুষোত্তম একজন বঙ্গীয় বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার "ললিত পরিভাষা", "পরিভাষাবৃত্তি", "জ্ঞাপক সমুচ্চয়" ও "উনাদিবৃত্তি" নামে আরও কয়েকখানি প্রসিদ্ধ পুস্তক পাওয়া যায়। ১৪' খ্রীষ্টাব্দে মহানাদে সৃষ্টিধর চক্রবর্ত্তী "ভাষাবৃত্তীয়ার্থ বিবৃতি" রচনা করেন। মহানাদে রক্ষিত

মৈত্রের "ধাতু প্রদীপ" পাওয়া গিয়াছিল। "তন্ত্র প্রদীপ"ও মহানাদ হইতে পাওয়া যায়। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা হরি সিংহের সভায় শরণদেব "দুর্ঘট বৃত্তি" প্রণয়ন করেন।

ভগীরথ দ্বিজ বিরচিত পদ্মপুরাণ ও তুলসী চরিত্র গ্রন্থদ্বয় লুপ্ত হইয়া থাকিবে। ইনি মহানাদবাসী ছিলেন।

কবি কর্ণপুর কৃত চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে মহানাদের রাজা কেশব সিংহ বা কৃত্তিবাস সিংহকে 'কেশব ছত্রি' বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়।

দ্বিজ রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল মহানাদে পাওয়া যায়। মাণিকরাম লিখিয়াছেন—"বন্দিয়া ময়ুর ভট্ট আদি রূপরাম।"

রামগতি ন্যায়রত্ন ১২৩৮ সালের ২৮শে আষাঢ় হুগলী জেলার অন্তর্গত ইলছোবা গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হলধর চূড়ামণি। তাঁহার রচিত অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস, বস্তুবিচার, রোমাবতী উপাখ্যান, দময়ন্তী, বাঙ্গলা ব্যাকরণ, বাঙ্গলার ইতিহাস, বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। ১২৭০ খৃষ্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্ন ইলছোবা গ্রাম হইতে বংশবাটীর শিবনাথ সিংহকে মহানাদের প্রাচীন ইতিকথা লিখিয়া দিয়াছিলেন।

দীনার দ্বীপ বা দিনারদি গ্রামে প্রায় ৩০০ শত বর্ষ পূর্ব্বে ষষ্ঠীবর সেন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সমগ্র মহাভারত, রামায়ণ ও পদ্মপুরাণের বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ করেন।

সিংহবংশের বিভিন্ন ঘটনা অবলম্বনে এই সকল উপন্যাস লিখিত হয়—

সরলা—সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়
শিবায়ণ—বাণেশ্বর ভট্টাচার্য্য
শোভাসিংহ—যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্রপ্রভা—তারকনাথ বিশ্বাস
বঙ্গ বিজেতা—রমেশচন্দ্র দত্ত

ইহা ব্যতীত ধর্ম্মপাল, চন্দ্রকেতু, চন্দ্রপ্রভা, নদীয়া কাহিনী, মুরশিদাবাদ কাহিনী, মেদিনীপুরের ইতিহাস, ময়মনসিংহ পরগণার ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থে এবং বঙ্গদর্শন, ভারতী, পুষ্পপাত্র, নবযুগ প্রভৃতি পত্রিকায় সময় সময় ছোট গল্প বাহির হইয়াছিল। সিংহবংশের প্রকৃত নাম, গোত্র, রাজধানী কল্পিত রূপেই এযাবৎ বিভিন্ন ইতিহাসে পাওয়া যাইত। "মহানাদ" প্রকাশিত হইবার পর বাঙ্গলার লুপ্তাবশিষ্ট ইতিহাসের বোধন বসাইয়াছে।

হরিচন্দ্র বা হরিশ্চন্দ্র সিংহ একজন সুকবি ছিলেন। মহাকৃতি হরিশ্চন্দ্র,—"হর্ষ চরিতে" তাঁহার গদ্য রচনা প্রশংসিত হইয়াছে। তাঁহার প্রণীত "ধর্ম্মশর্ম্মাভ্যুদয়" গ্রন্থে ধর্ম্মনাথ নামক রাঢ়ের কোন রাজার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

রাজ্যবর্দ্ধন, মালবরাজকে জয় করিয়া গৌড়ে আসিয়াছিলেন, 'শশাঙ্ক' বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন। ইহার চরিত্র অবলম্বনে "গৌড়বহ" নামক প্রাকৃত কাব্য রচিত হয়। একালের "কর্ম্মবীর" নাটক যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট গৌড়বহ ঐতিহাসিক নাটক কি না সন্দেহ উপস্থিত হয়। হর্ষবর্দ্ধন প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এই গৌড়াধিপকে পরাস্ত করিতে না পারিলে তিনি অনলে আত্মবিসর্জ্জন করিবেন। চারিদিক হইতে সৈন্য সমাবেশ হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে রাজা বিজয় হরিদেব সিংহ নিহত হন।

বাণভট্ট বাৎসায়ন বংশ সম্ভূত চিত্রভানু নামা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তিনি 'হর্ষচরিতের' প্রথম উচ্ছাসে আত্মজন্ম সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, রাজদেবী নাম্নী ব্রাহ্মণীর গর্ভে চিত্রভানু বাণভট্ট নামক পুত্রকে লাভ করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ কবি বাণভট্টের হর্ষ-চরিতের প্রথম উচ্ছাসে সমবয়স্ক সুহৃদগণের নামোল্লেখ সময়ে লিখিয়াছেন,—"চন্দ্রসেন ও মাতৃসেন" নামে তাঁহার দুইটী পারশব বা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন।

গঙ্গেশ চূড়ামণি, নব্য ন্যায়ের জন্মদাতা। যখন বঙ্গের নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল ছিল না, তাহারও অনেক পূর্ব্বে গঙ্গেশ সিংহপুরে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি—"তত্ত্ব-চিন্তামণি"। উহা 'ন্যায়-তত্ত্ব চিন্তামণি', 'চিন্তামণি' বা 'মণি' নামেও উক্ত হইয়া থাকে। এই মহা ন্যায়গ্রন্থ চারি খণ্ডে বিভক্ত,—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দখণ্ড। ইনি প্রত্যক্ষ খণ্ডে শিবাদিত্য মিশ্র ও টীকাকার বাচস্পতির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মুসলমান রাজত্বে ন্যায়শাস্ত্রে গঙ্গেশ, পক্ষধর, রঘুনাথ; ভক্তিমার্গে চৈতন্য, তুলসীদাস, অদ্বৈত; বেদান্তে মধুসূদন, সদানন্দ, শঙ্করারণ্য; ধর্ম্ম-শাস্ত্রে শূলপাণি, রঘুনন্দন, বাচস্পতি; বৈদ্যকে চক্রপাণি দত্ত, মাধব, ভাব-মিশ্র প্রমুখ মনীষিগণের উদ্ভব হইয়াছিল। বারাণসীর প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার, অযোধ্যা বৃন্দাবনের আবিষ্কার, হিন্দু সমাজ সংস্কারের সুব্যবস্থা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের দ্বারাই সংসাধিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে নবদ্বীপ ন্যায়শাস্ত্রাধিকারে নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধপীঠ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু প্রাচীনকালে মহানাদ এই ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষাদান সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠান্বিত ছিল। তৎপরে ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিবার জন্য মিথিলায় সমবেত হইতেন। যিনি মিথিলার অজেয় ন্যায় ভাণ্ডার অসামান্য শক্তি প্রভাবে লুণ্ঠন করিয়া মিথিলার গর্ব্ব খর্ব্ব ও মহানাদের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন—তিনি গৌড়ীয়। মহেশ্বর বিশারদের পুত্র বাসুদেব, পিতার ন্যায় ব্যাকরণ, সাহিত্য ও ব্যবহার বিধি অধ্যাপনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মহানাদে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মিথিলায় গমন করেন। তখন পক্ষধর মিশ্র মিথিলার প্রধান নৈয়ায়িক। অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রের শলাকা-পদ্ধতি কঠিন হইতে কঠিনতর ছিল। বাসুদেব একশত আট বার শলাকাবিদ্ধের কৌশলানুযায়ী পুথির ব্যাখ্যা করিয়া মিথিলার বিদ্বন্মণ্ডলীকে

পর্য্যন্ত স্তম্ভিত করিলেন। অধ্যাপক প্রীত হইয়া বাসুদেবকে "সার্ব্বভৌম" উপাধি প্রদান করিলেন। তাঁহারা পুথির নকল করিয়া লইয়া যাইতে দিতেন না। সেজন্য অপূর্ব্ব মেধাবী বাসুদেব মিথিলার বিশ্বপণ্ডিতগণের রূঢ় ব্যবস্থা, শিক্ষা জগতের এক গভীর কলঙ্ক ও ছাত্রগণের পক্ষে অবমান জনক মনে করিয়া, তাঁহার অসাধারণ মেধা ও স্মৃতিশক্তি প্রভাবে আপনার অন্তর মধ্যে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া মিথিলা হইতে বাহির হইলেন যে, কেহ তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই, এই শ্রুতিধর গৌড়ীয় ছাত্র মিথিলার সমগ্র ন্যায় ভাণ্ডার শুধু স্মৃতি সাহায্যে লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইতেছেন! মিথিলা ত্যাগ করিয়া বাসুদেব মহানাদের বশিষ্ঠ গঙ্গাতীরের বিদ্যাপীঠে বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করেন। বাসুদেবের প্রথম ছাত্রের নাম রঘুনাথ শিরোমণি, * ইনিই নব্য ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ন্যায় জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন। দ্বিতীয় ছাত্রের নাম রঘুনন্দন, যিনি আবহমানকাল প্রচলিত আর্য্য ব্যবহার বিধি ও স্মৃতিশাস্ত্রের সংস্কার করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তৃতীয় ছাত্র কৃষ্ণানন্দ আগম-বাগীশ, প্রনষ্টপ্রায় তন্ত্রের পুনরুদ্ধার করিয়া দেশমধ্যে পুনরায় তেজোময় তান্ত্রিক মতের প্রবর্ত্তন করিয়া যিনি দেশবরেণ্য হইয়াছিলেন। চতুর্থ ছাত্র—শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব, পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা যে অক্ষয়কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, আজিও তাহার স্মৃতি নবদ্বীপকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে এবং বাঙ্গালীর প্রতিভা ইউরোপের মনীষিগণকেও মুগ্ধ করিতেছে।

হরিহর ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ও তাঁহার বংশ আন্দুলিয়ার রাজবংশের কুলগুরু ছিলেন। তৎপুত্র রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ১৪২৯ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি

* মতান্তরে রঘুনাথ শিরোমণি শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণবংশ সম্ভূত, কাত্যায়ন গোত্র।

পঞ্চবিংশতি বৎসরের কঠিন পরিশ্রমে "অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্ব" প্রণয়ন করিয়া অসামান্য বুদ্ধিমত্তা, বিচারশক্তি, গভীর গবেষণা, সারগ্রাহিতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। রঘুনন্দনের গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে কেহই "স্মার্ত্ত" নামে অভিহিত হইতে পারেন না। প্রসিদ্ধ শূলপাণি ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিকার। তিনি 'প্রায়শ্চিত্ত বিবেক', 'শুদ্ধি বিবেক' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। রঘুনন্দন অনেক স্থলে শূলপাণির মত খণ্ডন করিয়াছেন।

কোনও লেখক রঘুনন্দনের জন্ম. বরেন্দ্রভূমিতে প্রমাণ করিতে গিয়া, বলিয়াছেন (রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৩য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)—"রঘুনন্দন কদলীপত্রে শ্রাদ্ধ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, যদি রাঢ়দেশে তাঁহার জন্ম হইত, তাহা হইলে তিনি শালপত্রেরই ব্যবস্থা করিতেন ; কেন না তথায় কদলীপত্র বিরল।" এ কথার কোন মূল্য নাই। ইহাতে লেখকের রাঢ়দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই সূচিত হইতেছে।

ময়মনসিংহ জেলার ন্যায়শাস্ত্র চর্চ্চার প্রবর্ত্তক রাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নাম বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার পিতা রমাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও সাধক ছিলেন।* তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ঈশ্বরোপাসনা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলার নলডাঙ্গার জমিদার মহাশয়গণের পূর্ব্বপুরুষ মুক্তারাম লাহিড়ী, ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বধলার বাগছিবংশ, পারিয়াখালির ভাদুড়ীবংশ,

† ধীতপুর গ্রামে তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের তপস্যাস্থান "ধীতপুর পঞ্চবটী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখনও তথায় বটবৃক্ষ বর্ত্তমান আছে এবং তৎপৌত্র ৺কমলাকান্ত ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের স্থাপিত বাটীর সম্মুখে "কমলেশ্বর শিবলিঙ্গ" বিদ্যমান আছে। ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের পুত্রবধূ ৺বিজয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত ৺কাশীধামে গণেশ মহল্লায় ৺রুদ্রচন্দ্র লাহিড়ীর বাড়ীতে "কালী বিজয়েশ্বর শিবলিঙ্গ" স্থাপিত আছে।

কুশমাইল ও হালালিয়ার ভাদুড়ীগণ, বড় বাশালিয়ার বাগছিবংশ, ফরিদপুর জেলার ভাকলার বাগছিবংশ প্রভৃতি বহু ধনবান ও কুলীন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। অদ্যাপি সিদ্ধান্ত মহাশয়ের বংশধরেরা ঐ সকল বংশের সন্তানদিগকে দীক্ষা প্রদান করিতেছেন। পিতার নিকটে ব্যাকরণ ও স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর রাধাকান্তের অন্তঃকরণে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে এবং খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক ভিখারী নামক ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করেন। তখন বাঙ্গলায় নবদ্বীপ ভিন্ন ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বিতীয় স্থান ছিল না। ময়মনসিংহ হইতে নবদ্বীপ যাত্রাও তখন এখনকার ন্যায় সহজসাধ্য না থাকায়, তিনি বহু কষ্টে বহু নদনদী অতিক্রমপূর্ব্বক সুদূর পথ পদব্রজে গমন করিয়া নবদ্বীপে উপনীত হন এবং সাত বৎসর কাল কঠোর অধ্যবসায়ের সহিত সমগ্র নব্যন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক "ন্যায়ভূষণ" উপাধিতে ভূষিত হন। অনন্তর বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ধীতপুর বাসভবনের সন্নিকট শিমূলজানি গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন পূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতে থাকেন। অদ্যাপি ঐ বাড়ী ' ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের চৌপাড়ী বাড়ী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ বাটীর সম্মুখে জীর্ণ বৃহৎ পুষ্করিণী এখনও বিদ্যমান আছে, এবং তিনি বাটী হইতে চতুষ্পাঠীতে আসার জন্য যে রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এখনও ঐ রাস্তা "ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের জাঙ্গাল" বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ চতুষ্পাঠীতে নানা স্থানের বহু ছাত্র তাঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; এবং নানা দিগ্‌দেশীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে জয়লাভ করিয়া সর্ব্বত্র সুখ্যাতি লাভ করেন। * তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও শাস্ত্রচর্চ্চার পুরস্কার স্বরূপ দেশীয় রাজা

* রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৭ম ভাগ, ২য় সংখ্যায় "ময়মনসিংহের ন্যায় চর্চ্চা" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

জমিদারগণ তাঁহাকে ব্রহ্মোত্তর ও অর্থাদি প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তদ্বংশধরগণ ঐ সকল সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন গৌরীপুর—রামগোপালপুরের জমিদার মহাশয়গণের পূর্ব্ববর্ত্তী ৺শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী জমিদার মহাশয় শিমুলজানি গ্রামে চতুষ্পাঠীর সহায়তার জন্য যে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছিলেন, ঐ জীর্ণ সনন্দ তদ্বংশধরগণের নিকট অদ্যাপি আছে, তাহা এইরূপ :—

শ্রীরামঃ

৺ইয়াদিকীৰ্দ্দি

শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ

সচ্চরিত্রেষু।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ স্মরণং (স্বাক্ষর)

সনন্দ পত্র মিদং সন ১১৭১ সনাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চআগে মৌজে শিমুলজানি চাকলে কসবা আমলে পরগণে ময়মনসিংহ মৌজে মজকুর পতিত মধ্যে ।৶ সাত আড়া জমি ব্রহ্ম উত্তর করিয়া দিলাম, আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগামল করহ, রাজস্ব তলব নহিবেক, ইতি তারিখ ৭ই মাঘ।

এই বংশে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্থানাভাবে সকলের পরিচয় দিতে পারিব না। উক্ত রাধাকান্ত ন্যায় ভূষণ মহাশয়ের বংশধর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাভূষণ ১২৮৮ সনের ৪ঠা বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিমুলজানি "বিজয়া চতুষ্পাঠী"তে ব্যাকরণ ও কাব্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিক্রমপুর "ইছাপুরা চতুষ্পাঠী"তে নব্য স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন ও "বিদ্যাভূষণ" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি রঙ্গপুর "কালীধাম চতুষ্পাঠী"তে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেন। তাঁহার পিতামহী ৺বিজয়া দেবীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে স্বীয় বাসস্থান

শিমুলজানিতে "বিজয়া লাইব্রেরী" নামক পুস্তকালয় স্থাপন করেন, "শিমুলজানি বিজয়া বোর্ড মডেল স্কুল" তাঁহার চেষ্টাতেই স্থাপিত হইয়াছে। ইনি খ্যাতনামা সাহিত্যিক; বিবিধ মাসিক পত্রে ইহাঁর লিখিত বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, এবং "বঙ্গীয় অধ্যাপক জীবনী", "প্রবন্ধ প্রসূনাঞ্জলি" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থও লিখিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এবং রঙ্গপুরস্থ শাখা পরিষৎ ইহাঁকে অধ্যাপক সদস্যপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় "রঙ্গপুর কালীধাম চতুষ্পাঠী"তে অধ্যাপনা-কালীন ১৩১৫ বঙ্গাব্দে "নবদ্বীপ সমাজ"এর স্মৃতিশাস্ত্রের পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং ১৩১৭ বঙ্গাব্দে হুগলী-চুঁচুড়ার প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্থাপিত "বিশ্বনাথ ফণ্ড" হইতে বার্ষিক ৫০৲ টাকা হারে "বিশ্বনাথ অধ্যাপক বৃত্তি" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ময়মনসিংহের এই সুপ্রসিদ্ধ সুপণ্ডিত, সাধক ও গুরুবংশ মহানাদেরই গৌরব। মহানাদ বা 'মানাদদেশ' হইতে যাঁহারা বঙ্গের নানাস্থানে বিশেষতঃ, পূর্ববঙ্গে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন, ইহারা তাঁহাদের অন্যতম। মহানাদের ৮।৯ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে (যাহা পূর্ব্বে 'মানাদ দেশের' অন্তর্ভূত ছিল) ই, আই, রেলওয়ের শক্তিগড় ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ উত্তর পূর্ব্বদিকে গাঙ্গুল বা গাঙ্গুর (১৯৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) নামক স্থানে ইহাদের আদি বাসস্থান ছিল। তথা হইতে শিব গাঙ্গুলী আমাটিয়ায় বাস করেন। আমাটিয়া হইতে জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য্য বাঙ্গালার বিভিন্ন স্থানের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়নপূর্ব্বক অবশেষে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সুখহারী গ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত কবিবল্লভ তর্কাচার্য্য * মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন। তর্কাচার্য্য

* সুখহারী গ্রামের "কাশ্যপ বংশাবলী"র ভূমিকা ৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মহাশয় তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ লোক বিবেচনা করিয়া স্বীয় ভগিনী শিবানী দেবীর সহিত বিবাহ দেন। তর্কাচার্য্য মহাশয়ের পিতা দশাবধান ভট্টাচার্য্য মহাশয় মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুরের রাজপণ্ডিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শিবপুর নামক পল্লীর স্থান ও আটাশিয়া প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম নবাবের নিকট হইতে লইয়া জামাতাকে প্রদান করেন এবং কন্যা শিবানীর নামানুসারে শিবপুর নামক গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় বাস ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তদবধি জানকীবল্লভ ও তাঁহার বংশধরেরা ময়মনসিংহবাসী হইয়াছেন। তাঁহার পৌত্র শিবরাম পঞ্চানন ধীতপুরে আসিয়া বাস করেন। ইঁহাদের বংশধরগণ ময়মনসিংহের শিবপুর, ধীতপুর, শিমুলজানি, ইটাগ্রতলা এবং ঢাকা জিলার সাবেক বাঘিয়া (এক্ষণে এই গ্রাম পদ্মা নদীর গর্ভে) বর্ত্তমানে ইছাপুরা, রাজদিয়া প্রভৃতি গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহারা রাঢ়ীশ্রেণী, সাবর্ণি গোত্র, বেদগর্ভের সন্তান, আমাটিয়ার গাঙ্গুলীবংশোদ্ভব। ইঁহাদের সংক্ষিপ্ত বংশাবলী,—

বেদগর্ভ

("বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে সর্ব্ববেদ পরায়ণঃ"

|

অধস্তন ১৭শ পুরুষ

শিব গাঙ্গুলী

(গাঙ্গুর হইতে আমাটিয়ায় বাস)

|

বেদগর্ভ হইতে অধস্তন ২৩শ পুরুষ

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য্য
(আমাটিয়া হইতে ময়মনসিংহ শিবপুরে বাস)
কৃষ্ণদেব বিদ্যামণি (শিবপুর)
শিবরাম পঞ্চানন
সাং ধীতপুর
রামগোপাল বিদ্যাবাগীশ
রমাকান্ত তর্ক সিদ্ধান্ত
রাধাকান্ত ন্যায়ভূষণ
কমলাকান্ত ন্যায়বাগীশ
চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য
কালীনাথ ভট্টাচার্য্য
রাজচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
সাং শিমুলজানি
শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
("কুমার দ্বয়" প্রণেতা)
কুমুদচন্দ্র
শ্রীরক্ষাকর
শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র বিদ্যাভূষণ
শ্রীসুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য
শ্রীনগেন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি,এ,
শ্রীরমেশচন্দ্র
শ্রীঅনিলকুমার
শ্রীঅজিত কুমার

*　　*　　*　　*

পূর্ব্বোক্ত ৺রমাকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের শিষ্যমণ্ডলীও ধন, মান, কুলমর্য্যাদা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও পাণ্ডিত্যাদি সর্ব্ববিধগুণে বিভূষিত ছিলেন; তাঁহাদিগের বংশধরদিগের মধ্যে এখনও অনেকে ঐ সকল গুণের অধিকারী আছেন। তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের উপযুক্ত শিষ্য মুক্তারাম লাহিড়ীর বংশধর রঙ্গপুর নলডাঙ্গার জমিদার ৺নালকমল লাহিড়ী বিদ্যাসাগর মহাশয় খ্যাতনামা সাধক ও সাহিত্যিক এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের অতি উপাদেয় বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থ "কাল্যর্চ্চন চন্দ্রিকা" এবং "কৃষি-তত্ত্ব," 'শক্তি ভক্তি রস কণিকা" "শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন এবং বিবিধ মাসিক পত্রে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার সাধনাশ্রম বাসাবাটীতে শ্রীশ্রী৺কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; ইহা এক্ষণে "রঙ্গপুর কালীধাম" বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺গুরুপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও বৈষয়িক কার্য্যে বিশেষ দক্ষ ছিলেন, এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণ তীর্থ মহাশয় প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত। তাঁহার রচিত "রচনানুবাদ শিক্ষা" সংস্কৃত শিক্ষার্থীর বিশেষ উপযোগী হইয়াছে। ইঁহার চেষ্টায় "রঙ্গপুর কালীধাম চতুষ্পাঠী" স্থাপিত হইয়াছিল। ভবানী বাবুর একমাত্র পুত্র ৺গিরিজাপ্রসন্ন লাহিড়ী M.A. কাব্য ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় অতি অল্প বয়সে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ্চ স্কলার ছিলেন। ইনি বিশ্ববরণ্যে কবি রবীন্দ্র নাথের 'গীতাঞ্জলি" কাব্যের সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার
ডুবাও চোখের জলে॥"

৺নীলকমল লাহিড়ী বিদ্যাসাগর

জন্ম—বঙ্গাব্দ ১২৩৫, ১৮ই পৌষ।

মৃত্যু—বঙ্গাব্দ ১৩০৩, ১৯শে ফাল্গুন।

অনুবাদ—

(তব) চরণ ধূলি সমুপরি কুরু মদীয় মৌলি মানতম্।
মদহঙ্কৃতি জালং কুরু নেত্রনীর-বিপ্লুতম্॥

"রঙ্গপুর বঙ্গ সাহিত্যানুশালন সমিতি" গিরিজা প্রসন্নেরই স্থাপিত ইহার রচিত অলঙ্কার সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছিল। অল্প বয়সে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় প্রতিভার বিকাশ হইল না, দেবশিশু দেবলোকে চলিয়া গেলেন।

পুত্র বিয়োগের পর ভবানী বাবু নানা তীর্থ ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সুচারুবালা দেবীকে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বাঘবেড় নিবাসী প্রসিদ্ধ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বংশ সম্ভূত তারকেশ্বর ষ্টেটের বর্ত্তমান সুযোগ্য রিসিভার শ্রীযুক্ত অমূল্য চন্দ্র ভাদুড়ী এম, এ মহাশয়ের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। এক্ষণে ৺ গুরুপ্রসন্ন বাবুর একমাত্র পুত্র স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ প্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় শ্রীশ্রী৺রী কালীমাতার সেবাপূজা ও অতিথি সেবাদি যথানিয়মে সম্পাদন করিতেছেন।

ইঁহাদের অপর অংশী ৺জ্যোতীন্দ্র মোহন লাহিড়ী একজন সদাশয় লোক ছিলেন। তিনি ৺কাশীধামে বাস করিতেন। তাঁহার মাতার স্থাপিত দেবনাথপুরা নিজবাসায় শিববিগ্রহ ও অন্নসত্র আছে। জ্যোতীন্দ্র বাবু গুরুদেবের ঋণ পরিশোধের জন্য এককালীন দুই হাজার টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার দত্তক পুত্রের নাম শ্রীমান্ মনীন্দ্র মোহন লাহিড়ী।

নলডাঙ্গার দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ীর * বংশীয় ৺সুরেশচন্দ্র

---

* দেওয়ান ৺কালীচন্দ্র লাহিড়ী ও তৎপুত্র দেওয়ান ৺কালীকৃষ্ণ লাহিড়ী অতি প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। উভয়েই দক্ষতার সহিত কুচবেহার রাজ্যের প্রধান অমাত্যের কার্য্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে তাঁহাদের বংশধর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র চন্দ্র লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত হরিদাস লাহিড়ী B. A. ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র লাহিড়ী B. A. ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র লাহিড়ী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

লাহিড়ী মহাশয় অতি অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার চেহারা অতি সুন্দর ছিল। দুঃখের বিষয় তিনি অল্প বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। সুরেশ বাবুর জামাতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ সান্যাল এম, এ, বি, এল হাইকোর্টের উকিল।

* * * *

রাঢ়ের এই সিদ্ধ সাধক গুরুকুলের অন্যতম শিষ্য ময়মনসিংহ—নেত্রকোণা বারের প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বাগচী মহাশয় দৈবযোগে মহানাদে প্রায় দুই বৎসর বাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় মেধাবী, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সরল মিষ্টভাষী এবং ধর্ম্মপ্রাণ লোক অতি বিরল। ইনি পূর্ব্বধলা মডেল স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া অধিক বয়সে ইংরাজি অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং স্বীয় অধ্যবসায় বলে বি,এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মহানাদ ফ্রি চার্চ্চ মিশন স্কুলে ৪০৲ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং মহানাদে থাকিয়া বি, এল, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। ইত্যবসরে ৬০৲ টাকা বেতনে চন্দননগর—গোন্দলপাড়ার স্বনাম খ্যাত জমিদার ৺ গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী জামাতা হাইকোর্টের উকিল অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের একমাত্র পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া বি, এল, পরীক্ষা দিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন এবং অল্পদিন মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নেত্রকোণায় ওকালতি করিতে থাকেন।

খ্রীষ্টান মিশনারীগণের অনেকেরই স্বভাব এই যে, নূতন সমাগত কোন হিন্দু বিশেষতঃ, ব্রাহ্মণের নিকটে হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা ও কূটতর্ক এবং খ্রীষ্টানধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার প্রচার করিয়া থাকেন। মহেন্দ্রবাবু মহানাদে

আগমনের পর তাঁহার সহিত তৎকালের সেক্রেটারী রেঃ ম্যাকালক্ সাহেব এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও হেড্‌মাষ্টার বিপিন বাবু (B. B. Dutta) ঐ প্রকার ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান তেজস্বী ব্রাহ্মণ মহেন্দ্রবাবু চাকুরীর মায়া না করিয়া যথোচিত প্রত্যুত্তরে তাঁহাদের মতবাদ খণ্ডনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিরস্ত করেন।

মুক্তাগাছার মহারাজা সূর্য্যকান্ত ও রাজা শ্রীযুক্ত জগৎকিশোর আচার্য্য প্রভৃতি জমিদারবর্গের পূর্ব্বপুরুষ অসাধারণ প্রতিভাশালী পণ্ডিত ও তাপস "কুসুমাঞ্জলি" নামক উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ প্রণেতা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বংশধর * বরেন্দ্রশ্রেণীর অন্তর্গত ভূষণা পটির শ্রেষ্ঠ কুলীন 'ভাদুড়ী গাঁই' ময়মনসিংহ—ঘাগড়ার রাজা কৃষ্ণকমল সিংহ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত মহেন্দ্রবাবুর বিবাহ হয়। মহেন্দ্র বাবুও ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বধলার বাগছী বংশোদ্ভব বরেন্দ্র শ্রেণীর ভূষণা পটীর শ্রেষ্ঠ কুলীন। পূর্ব্ববাস পূর্ব্বধলায় ছিল; এক্ষণে ঐ জেলার সুপ্রসিদ্ধ কংসনদের তীরবর্ত্তী ঘাগড়া গ্রামে বাস করিতেছেন। ইঁহার পিতার

* মুক্তাগাছার জমিদার বংশের পূর্ব্ব পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য মুরশিদাবাদ নবাব সরকার হইতে আলাপসিংহ পরগণা জমিদারী সত্ত্বে প্রাপ্ত হন। তাঁহার বংশধর মহারাজা সূর্য্যকান্ত ও রাজা শ্রীযুক্ত জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী ("শিকার ও শিকারী" নামক গ্রন্থ প্রণেতা) ও শ্রীধর আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতি জমিদারবর্গ এবং ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত পূর্ব্বধলার নিকটবর্ত্তী "ধূপাভহরের রায় বংশ" উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বংশধর। মুক্তাগাছার রাজবংশে রাজর্ষি ৺গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী ধর্ম্মরত্ন মহাশয় অতি ভাল লোক ছিলেন। ইঁহার যত্নে মুক্তাগাছা হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইঁহার স্বধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরাগের পরিচয় পাইয়া পণ্ডিত মণ্ডলী ময়মনসিংহ ধর্ম্মসভায় সভা আহ্বান করিয়া "রাজর্ষি" উপাধি দ্বারায় ভূষিত করিয়াছিলেন। মহারাজা সূর্য্যকান্তের পুত্র মহারাজা শ্রীযুক্ত শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী।

নাম ৺ জগদ্বন্ধু বাগছী। ভগবানের কৃপায় ইঁহার পুত্রগণও কৃতবিদ্য;
"পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্।"

ইনি কার্য্যস্থল নেত্রকোণায় থাকিয়া জনহিতকর সকল কার্য্যেই সংসৃষ্ট আছেন। তাঁহার সকল সদনুষ্ঠানের পরিচয় দিতে না পারিলেও দুইটী স্থায়ীকীর্ত্তির কথা উল্লেখ করিব; ইঁহার চেষ্টার ফলে নেত্রকোণার ৺ কালীবাড়ীর নাটমন্দির গৃহ ও ভোগগৃহ এবং প্রাচীর ইত্যাদি নির্ম্মিত এবং ৺রী মায়ের সেবা পূজার সুবন্দোবস্ত হইয়াছে। ঐ জেলার অন্তর্গত ধীতপুর শিমুলজানি নিবাসী তাঁহার গুরুদেব শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে পানীয় জলের অভাব দেখিয়া অন্যান্য শিষ্যগণকে অনুরোধ করিয়া সাহায্য সংগ্রহ পূর্ব্বক একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন এবং নিজেও এই কার্য্যে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা সাহায্য করিয়াছেন। উক্ত পুষ্করিণীর জলও উৎকৃষ্ট হইয়াছে। এখানে একটী কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; পূর্ব্বোক্ত নাটমন্দির গৃহ প্রস্তুতের ব্যয় ধীতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় সাহিত্যশাস্ত্রী এম, এ, বি, এল, মহাশয় দিয়াছেন। উক্ত রায় মহাশয় প্রাচ্য পাশ্চাত্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত, সংস্কৃত কবিতা রচনায়ও সুদক্ষ। তাঁহার রচিত "মৃত্যুঞ্জয় স্তোত্র" প্রভৃতি কবিতা পাঠে পণ্ডিত মণ্ডলী ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। উক্ত বিপিন বাবুর পিতা ৺ জয়নাথ রায় মহাশয় পূর্ব্বোল্লিখিত ধীতপুরবাসী গাঙ্গুলীবংশের দৌহিত্র।

মহেন্দ্রবাবু গরিবের ন্যায় গুপ্তভাবেই মহানাদে আগমন ও অবস্থান করিয়াছিলেন; কেবল একবার মাত্র কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমি গরিব, কিন্তু আমার শ্বশুর বড়লোক।" বিরহী কবি গাহিয়াছেন—"স্মৃতি করে অতি জ্বালাতন", কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর স্মৃতি সেরূপ হয় নাই, সে স্মৃতি অতি সুখকর—অতি মধুর হইয়া রহিয়াছে।

* * * *

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বাগছী B. A. B. L.

বালিয়াটী সমাজাধিপতি উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী "কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং কাশীধামে গমন করিয়া পণ্ডিতপ্রবর কুল্লূক ভট্টের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিচারে বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করেন। উদয়নাচার্য্য চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। কাউয়েল সাহেব অনুমান করেন—'কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লেখা। গৌড়ে ব্রাহ্মণ গ্রন্থধৃত (ভাদুড়ীকুলের বংশাবলী গ্রন্থে)—

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধবিধ্বংস হেতবে।
খ্যাত উদয়নাচার্য্যো বভুব শঙ্করো যথা॥
সন্দেশং পিতৃনাশস্ত তথা পিতৃপরাভবং।
বৌদ্ধানাং বিজয়ঞ্চৈব শ্রুত্বা জজ্বাল মন্যুনা॥
ততঃ কালেন কিয়তা বৌদ্ধান্ জিত্বা বিচারতঃ
ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশায় চকার কুসুমাঞ্জলিং॥

ময়মনসিংহ—ঘাগড়ার রাজা কৃষ্ণকমল সিংহ মহাশয় এবং তাহিরপুর ও চৌগ্রামের রাজবংশ সকলই উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বংশধর। এই ভাদুড়ীবংশের অন্যতম রামগোবিন্দ ভাদুড়ী সুসঙ্গের রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। রাজা সুসঙ্গ রাজত্বের দুই আনা অংশ যৌতুক স্বরূপ দান করেন। তন্নিবন্ধন রামগোবিন্দের পুত্র হরিরাম "সিংহ" উপাধি ধারণ করেন। ঐ হরিরামের বংশধর সুসঙ্গ পূর্ব্বধলা—ঘাগড়ার রাজবংশ। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর অন্যতম বংশধর রসিক রায়ের পুত্র রামকান্তকে কাশ্যপ গোত্র সুষেণবংশীয় নাটোরের রাজা রামজীবন দত্তক গ্রহণ করেন (১১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ঐ কারণে রসিক রায় ইসলামাবাদ এবং চৌগ্রাম পরগণা প্রাপ্ত হইয়া জমিদার হন এবং নাটোরের নিকটে রসিকের অন্যতম পুত্র কৃষ্ণকান্ত রায় বসতি করেন।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর বাসস্থান সম্বন্ধে "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা লিখিয়াছেন—"কেহ কহেন বগুড়ার অন্তঃপাতী নিসিন্ধাতে, অন্যেরা কহেন বালিয়াটীতে।" উক্ত ভাদুড়ী প্রণীত "কুসুমাঞ্জলি" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ময়মনসিংহ - সেরপুর নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রাঞ্জল সংস্কৃত ভাষায় একখণ্ড টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং তাহার পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ মহাশয় একখণ্ড টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং জেলা ঢাকার অন্তর্গত কৃষ্ণপুরা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ তর্কতীর্থ মহাশয় "কুসুমাঞ্জলি সৌরভ" নামে বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন।

"কুসুমাঞ্জলি" প্রণেতা, চৈতন্যদেবের সমসাময়িক বালিয়াটী সমাজাধিপতি করণ প্রথার প্রবর্ত্তক ও কাপের সৃষ্টিকর্ত্তা

* যখন উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করেন, সেই কালে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণকে কৌলিন্য মর্য্যাদা হইতে বহিষ্কৃত ক[illegible] গর্ভজাত পুত্র পশুপতিকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন। জেলা পাবনার অন্তর্গত বাগবাড়ীর রায়বংশ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর প্রথম পক্ষের সন্তান, কাপ।

অংশুমান
৫। রুদ্রাণীপতি
৬। শচীপতি
মুকুন্দ ভাদুড়ী
গোপীনাথ
(বংশাবলী অন্যত্র দ্রষ্টব্য)
শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী
(রাজা কংসনারায়ণের ভগ্নীপতি)
সুবুদ্ধি খাঁ
(একটাকিয়া রাজবংশ)
কেশব খাঁ
১। যদুরাম
২। রঘুরাম
৩। প্রভুরাম
৪। শিবরাম
জগদানন্দ রায়
জানকী বল্লভ
ভুবনবল্লভ প্রভৃতি
রামকৃষ্ণ রায়
শ্যাম রায়
পাচু রায়
রসিক রায়
ভুবন রায়
হর গোবিন্দ
কৃষ্ণ কান্ত
রুদ্রকান্ত
রোহিণীকান্ত
দত্তক পুত্র
(চৌগ্রাম রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ)
রমণীকান্ত
রাজেশকান্ত রবীন্দ্রকান্ত রমেন্দ্রকান্ত
রাম কান্ত
(নাটোরের মহারাজা)
আনন্দীরাম রাম
(ইনি তাহিরপুরের রাজবংশের কন্যা গ্রহণ করেন এবং রাজত্বের ৷৶০ আনা অংশ প্রাপ্ত হন। নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তর গমনের পর ভ্রাতা বিনোদ-রাম ঐ অংশ প্রাপ্ত হন)
বিনোদরাম
রাজা বীরেশ্বর
(তাহিরপুর রাজবংশ)
রাজা চন্দ্র শেখর
রাজা শশীশেখরেশ্বর রায়, তাহিরপুর। বহু সদ্‌গ্রন্থ প্রণেতা ৺কাশীধামে বাস করিতেছেন।

অনারেবল কুমার শিব শেখরেশ্বর রায় (বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী) | কুমার শান্তি শেখরেশ্বর রায় | কুমার ৺শক্তি শেখরেশ্বর রায়

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় লিখিত)

গোপী নাথ ভাদুড়ী
|
যদুনাথ
|
লক্ষ্মীনাথ
|
রামবল্লভ (বেণী অবসাদ গ্রস্ত) | হরিবল্লভ (রোহিলাপটী) | প্রাণবল্লভ (রোহিলাপটী) | গৌরবল্লভ (ভূষণাপটী)

গৌরবল্লভ
|
রামগোবিন্দ ভাদুড়ী
(ইনি সুসঙ্গ রাজের কন্যাকে বিবাহ করিয়া সুসঙ্গ রাজত্বের ৵০ অংশ প্রাপ্ত হন)
|
হরিরাম ভাদুড়া*
(ইনি সিংহ উপাধি ধারণ করেন এবং পূর্ব্বধলা ঘাগড়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ)।

* * * *

* উকীল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বাগচীর শ্বশুর রাজা কৃষ্ণকমল সিংহ (৩৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এই হরিরাম সিংহের বংশধর। কৃষ্ণকমল সিংহ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সিংহ জীবিত আছেন।

গৌরীপুরাধিপতি

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

ময়মনসিংহ—রামগোপাল পুরের রাজা ৺যোগেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বাহাদুরের ৩য় পুত্র শ্রীযুক্ত কুমার সৌরীন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয় একজন সাহিত্যানুরাগী এবং সুলেখক। ইনি "ময়মনসিংহের বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার" নামক ইতিহাস গ্রন্থ দুই খণ্ড লিখিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় আছে,—"নাটোর, রামগোপালপুর, গৌরীপুর, গোলকপুর, ভবানীপুর, বাসাবাড়ী প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণের বংশধর। ঐ বংশীয় শ্রীকৃষ্ণ (তলাপাত্র) চৌধুরী, নবাব মুরশিদ কুলী খাঁর আমলে অনুমান ১১২৫ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহ পরগণার জমিদারী ফরমান প্রাপ্ত হন। ঐ হইতেই শ্রীকৃষ্ণ, চৌধুরী উপাধিতে ভূষিত হন এবং কেল্লা বোকাই নগরের সন্নিকট বাসাবাড়ীতে প্রথম বাস করেন। ঐ জমিদারী পূর্ব্বে মঙ্গলসিদ্ধ গ্রাম নিবাসী দত্ত নন্দীদের জমিদারীভুক্ত ছিল। সরিকী বিবাদে এবং দেশের দুরবস্থার দরুণ প্রজার খাজনা আদায় করিয়া নবাবের রাজস্ব দিতে না পারায় ঐ জমিদারী নবাব সরকার হইতে বাজেয়াপ্ত হইয়া উক্ত চৌধুরীকে অর্পণ করেন।"

ময়মনসিংহের অন্তর্গত গৌরীপুর পূর্ব্বে কায়স্থ জাতীয় দত্ত নন্দীদের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান সময় ঐ গৌরীপুরে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর বংশধর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী জমিদার মহাশয় বাস করিতেছেন। তিনি সাহিত্যানুরাগী এবং বিবিধ মাসিক পত্রের লেখক এবং ঔদ্যানিক কৃষিতত্ত্ববিৎ ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ দক্ষ এবং সামাজিক সংস্কারে বিশেষ যত্নবান। বরেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন শ্রোত্রিয় ৮টী পটী বা শ্রেণীতে বিভক্ত, এই পটীর সহিত অন্য পটীর বৈবাহিক সম্বন্ধ হইত না। ব্রজেন্দ্র বাবু ও সুসঙ্গের মহারাজ ৺ কুমুদচন্দ্র সিংহ, তাহিরপুরের রাজা শ্রীযুক্ত শশীশেখরেশ্বর রায়, ময়মনসিংহের উকীল ৺ ত্রৈলোক্যশরণ সান্যাল ও "চক্রবর্ত্তী কুলপঞ্জিকা" প্রণেতা রাজসাহীর উকীল শ্রীযুক্ত অনুকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির চেষ্টায় পটী সমন্বয় হইয়াছে; ব্রজেন্দ্র বাবুই

অগ্রণী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত দেবমন্দিরের অনাচারের প্রতিকার, প্রাচীন পদ্ধতি রক্ষা এবং সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিকল্পে তিনি বদ্ধপরিকর। তাঁহার সহায়তায় বোকাইনগর শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরীর বাড়ীতে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী এবং ময়মনসিংহ সহরে ও জামালপুর টাউনে বিশ্বেশ্বরী চতুষ্পাঠী এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভায় "বেদবিদ্যালয়" চলিতেছে। "বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সভা" তাঁহারই যত্ন চেষ্টা ও সহায়তায় পরিচালিত হইতেছে। এই সকল কারণে সাধারণের নিকটে তিনি কেবল "রাজা" নামে অভিহিত না হইয়া "রাজর্ষি" বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত বংশাবলী—

শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী
|
২য় পুত্র—কৃষ্ণ গোপাল রায়
|
যুগলকিশোর রায় চৌধুরী
|
হর কিশোর ,, ,,
|
আনন্দ কিশোর ,, ,,
|
রাজেন্দ্র কিশোর ,, ,,
|
শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী
|
শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী B. A.

* * * *

জেলা ধুবড়ীর অন্তর্গত গৌরীপুর বহুকাল হইতে কায়স্থ রাজার অধিকারে রহিয়াছে। এখন তথায় রাজা শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর জীবিত আছেন। তিনি অত্যন্ত সাহিত্যানুরাগী। তাঁহার উদ্যোগে অনেকদিন পূর্ব্বে একবার গৌরীপুরে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল।

* * * *

নবদ্বীপের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়ের ২য় পুত্র রাজা মহেশচন্দ্রের দৌহিত্র বংশীয় জেলা নদীয়ার অন্তর্গত শিব নিবাস নামক প্রসিদ্ধ পল্লীবাসী শ্রীযুক্ত অতুলগোপাল রায় মহাশয় কর্ম্মস্থল—গণ্ডিয়া, সি, পিতে (Mr. A. G. Roy. Commercial Inspector, B. N. Ry.) উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন। ইনি ধর্ম্মপ্রাণ এবং সুলেখক এবং পূর্ব্ব বর্ণিত সিদ্ধ সাধক রমাকান্ত সিদ্ধান্ত মহাশয়ের বংশধর স্বধর্ম্মনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় উভয়েই, সুবিখ্যাত ধর্ম্মবক্তা বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা, "উৎসব" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার এম, এ মহাশয়ের নিকট ধর্ম্ম বিষয়ক উপদেশাদি গ্রহণ করিয়া তদনুসারে পরিচালিত হইতেছেন। অতুলবাবু সময় সময় "উৎসব" পত্রিকায় আধ্যাত্মিক ভাব পূর্ণ কবিতা লিখিয়া থাকেন এবং উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও "উৎসব" পত্রিকায় ধর্ম্ম বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন; তাঁহার লিখিত "পূজা প্রবন্ধ, অতুলবাবুর লিখিত "মিষ্টি কথা" কবিতা উল্লেখযোগ্য। ইনি সস্ত্রীক ভারতের বহু তীর্থস্থান পর্য্যটন করিয়াছেন এবং নানা সদনুষ্ঠানে বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। শিবনিবাস গ্রামে বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ৩০০০৲ টাকা ব্যয়ে স্বর্গীয়া জননী জয়কালী দেবীর স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ একটী নূতন গৃহ নির্ম্মাণ ও ২৫০৲ টাকার আসবাব খরিদ করিয়া দিয়াছেন। মাসিক ১৫৲ টাকা দরিদ্র ছাত্রের বেতন ও ১০টি বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যার ভরণপোষণ প্রভৃতি সৎকার্য্যে মাসিক ১৩০৲ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন। এরূপ ধর্ম্ম-প্রাণ লোক আজকালের দিনে বিরল। কলিকাতাতেও বাড়ী আছে। দুঃখের বিষয় তাঁহার কোনও সন্তান জীবিত নাই। কলিকাতার বাড়ীতে তাঁহার সহোদর ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বাস করিতেছেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র শুদ্ধ শ্রোত্রীয় ছিলেন, অতুল বাবুর কৌলিক উপাধি মুখোপাধ্যায় (রায় রাজদত্ত উপাধি); বলরাম ঠাকুরের সন্তান, ফুলেমেল, স্বভাব নৈকষ্য কুলীন। বংশাবলী—

মহারাজাধিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়

বড় রাণীর গর্ভজাত সন্তান	ছোটরাণীর গর্ভজাত সন্তান
(১) শিবচন্দ্র রায়	(১) শম্ভুচন্দ্র রায়
(২) মহেশচন্দ্র রায়	
(৩) হরচন্দ্র রায়	
(৪) ভৈরব চন্দ্র রায়	
(৫) ঈশানচন্দ্র রায়	
(৬) কন্যা—অন্নপূর্ণা দেবী	

জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্র কৃষ্ণনগরে বাস করিতেন। মধ্যম পুত্র মহেশচন্দ্র শিবনিবাসে বাস করেন। হরচন্দ্র ও ভৈরবচন্দ্র হরধামে বাস করেন। ছোট ঈশান চন্দ্র ও ছোট রাণীর পুত্র শম্ভুচন্দ্র আনন্দধামে বাস করেন। ঐ সকল স্থান নদীয়া জেলার ভিতর।

শিবনিবাসে রাজা মহেশচন্দ্রের দুই পুত্র ও এক কন্যা হয়। ১ম পুত্র—নৃসিংহচন্দ্র রায়। ২য় পুত্র—উমেশচন্দ্র রায়। কন্যা—ভবসুন্দরী দেবী।

ভবসুন্দরীর বিবাহ হয় শ্রীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত। তিনি বিবাহ করিয়া শিবনিবাস রাজবাটীতেই থাকিতেন। ভব সুন্দরীর এক কন্যা ও দুই পুত্র হয়। পুত্রদ্বয়—
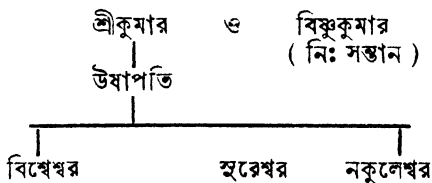
শ্রীযুক্ত অতুল গোপাল রায় (অপর ৫ ভ্রাতা—বিজয়, নীরদ, হরি, অনিল, কৃষ্ণ ও ভগ্নী—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী)।

অতুল বাবুর স্ত্রী—শ্রীযুক্তা কমলিনী দেবী।

শিবনিবাসে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কষ্টিপাথর নির্ম্মিত রামচন্দ্রের প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ও অষ্ট ধাতুর সীতামূর্ত্তি সুবৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং দুই রাণীর নামে দুইটী বৃহৎ শিবমন্দির ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এত বড় শিব বিগ্রহ ভারতের কোথায়ও আছে কি না সন্দেহ। এখনও উক্ত দেবমূর্ত্তি ও মন্দিরগুলি বর্ত্তমান আছে এবং নিত্য পূজা ও সেবাদি হইয়া থাকে। বাৎসরিক ৬০,০০০৲ ষাট্ হাজার টাকা উক্ত দেবোত্তর জন্য আছে। গ্রামটীর তিন দিকেই নদী ছিল, অপর দিকটী কাটাইয়া উক্ত নদীর সহিত মিলাইয়া দিয়া গ্রামটীকে দ্বীপে পরিণত করা হইয়াছিল। শুনা যায়, নদীর ধারে ধারে গোলাকারে ১০৮ শিব ও মন্দির স্থাপন করিয়া গ্রামটীকে ৺কাশীধামে পরিণত করিয়াছিলেন। একটী ছড়া আছে,—

"শিবনিবাসী তুল্য কাশী,
ধন্য নদী কঙ্কনা,
উপরে ঘড়ি নীচে ঘড়ি,
বাজ্‌ছে ঘড়ির ঠন্‌ঠনা।"

উপরোক্ত সুরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৩২৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শন আকাঙ্ক্ষায় ৺কাশীধামে গমন করেন। তৎকালে সুবিখ্যাত ধার্ম্মিক প্রবর শ্রীযুক্ত রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ও কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার রাণামহল স্থিত আশ্রমে প্রত্যহ বহু সংখ্যক ধর্ম্মপিপাসুর সমাগম ও সৎপ্রসঙ্গে বিমল আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইত। এই সময়ে সুরেন্দ্রবাবু যে সদুপদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্ত্তীকালে পত্নীবিয়োগ ও একমাত্র পুত্র (সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন—জন্ম ১৩১৯।২১শে পৌষ, মৃত্যু ১৩৩৩।২৫শে অগ্রহায়ণ) বিয়োগ জনিত ভীষণ শোকে তাঁহাকে শান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিল।

সুরেন্দ্র বাবুর কাশীধামে উপস্থিতির সময়ে শ্রীযুক্ত অতুল বাবু ও তাঁহার সাধ্বী সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা কমলিনী দেবী এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের তিনটী সন্তানকেই কালের কবলে বিসর্জ্জন দিয়া শোকে জর্জ্জরিত সাধারণ মানব মানবীর ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে, শান্তির আশায় বহু তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক ৺কাশীধামে উপস্থিত হন এবং সৌভাগ্যক্রমে মজুমদার মহাশয়ের দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার অমূল্য উপদেশে সংসারের অনিত্যতা ও স্ত্রী পুত্র কন্যাদি জলবুদ্‌বুদের মত ক্ষণস্থায়ী উপলব্ধি করিয়া শান্তিলাভ করেন। এই সময় সুরেন্দ্রবাবু অতুল বাবুর সহিত পরিচিত হন ও ক্রমে তাহা গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। অতুল বাবুর বংশে এখনও পুর মহিলাদের পত্র ব্যবহার করিবার রীতি নাই

অতুল বাবুর আশ্রিত-বাৎসল্যও অসাধারণ। তিনি কৃষ্ণপদ দাস নামক ভৃত্যকে বিবাহ দিয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন ও তাহার স্ত্রীকে পুত্রবধূরূপে রক্ষা করিতেছেন। শ্রীমান কৃষ্ণপদও ইঁহাদের সেবায় নিজের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সাধন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে মোহগ্রস্ত আধুনিক যুগে পবিত্র বংশের পুর মহিলাদের সাবিত্রীব্রত প্রভৃতি পুণ্যানুষ্ঠান, যাহা আর কিছু দিন পরে এই বিকৃত সমাজে কেবল পুথিগত বা উপহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে, বিগত ১৩৩৫ সনে শ্রীযুক্তা কমলিনী দেবী কলিকাতাস্থ ৩।২ রাজা পাড়া লেনের "শান্তি নিকেতন" নামক তাঁহাদের বাসভবনে সেই সাবিত্রীব্রত যেরূপ আন্তরিকতা ও সমারোহের সহিত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের যে সমস্ত দ্রব্যাদি সধবা ও ভূদেবগণের উদ্দেশে দান করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতঃই দর্শনযোগ্য হইয়াছিল। তাঁহার "পতিপূজা" যেরূপ চিত্তাকর্ষক ও আদর্শ স্থানীয় হইয়াছিল, তাহার আলেখ্য "মহানাদ" গ্রন্থকে সুশোভিত করিয়াছে। ঐ দেখুন পবিত্র চিত্রে কি অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট,—শ্রীযুক্ত অতুল বাবু

আদর্শ হিন্দু কুললক্ষ্মী শ্রীমতী কমলিনী দেবীর
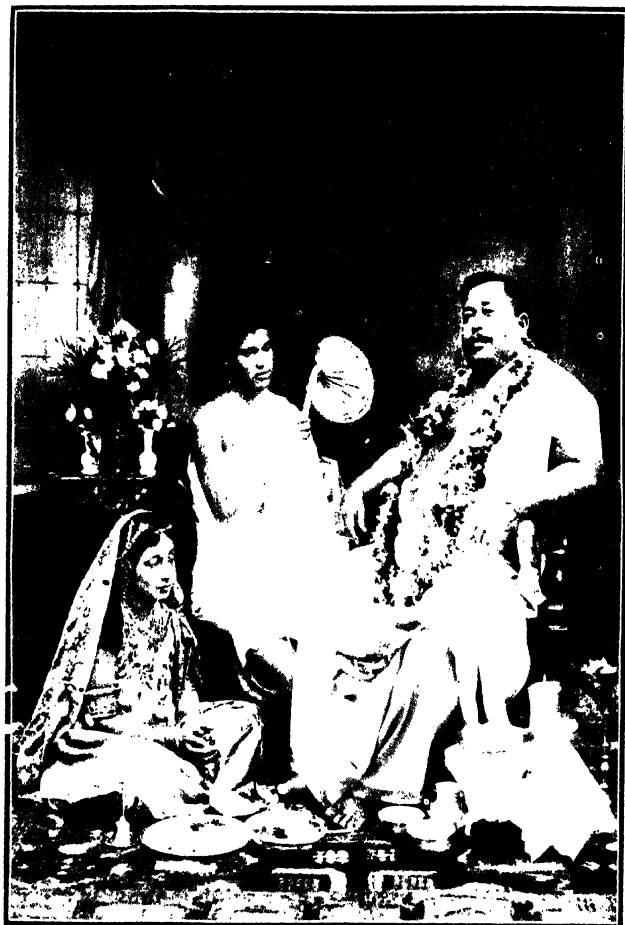
পতি পূজা।

উপবিষ্ট ও তদীয় পত্নী শ্রীযুক্তা কমলিনী দেবী অনন্যমনে ভক্তিভাবে পতিপূজা করিতেছেন এবং তাঁহাদের পার্শ্বে পুত্রোপম সেবক শ্রীমান কৃষ্ণপদ দাস প্রভুকে ব্যজন করিতেছে।

*   *   *   *

"শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাবের পর ১৬ বৎসরের জীবনের ঘটনা ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বাঁশবেড়ে বা বংশবাটীর তখনকার রাজা সহস্ররাম সিংহ লিখিয়া গিয়াছিলেন।"

শ্রীশ্রীসোণার গৌরাঙ্গ পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

বঙ্গরমণী কবি মাধবী মহানাদে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যের শতবর্ষ পূর্ব্বে ছিলেন। তাঁহার কবিতা তাঁহার সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিগণের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। মাধবী দেবীর পদগুলি ঐতিহাসিক তত্ত্বেও পূর্ণ।

দৈবকীনন্দন সিংহের উপাধি ছিল কবিশেখর। ইহার পিতার নাম চতুর্ভুজ এবং মাতার নাম হরাবতী, নিবাস মহানাদ। ইনি গোপাল চরিত নামক মহাকাব্য, কীর্ত্তনামৃত নামক সঙ্গীতমালা এবং গোপাল বিজয় নামক নাটক রচনা করেন। ১৬৫১ খৃষ্টাব্দ।

"সিংহ বংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন।
শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্ব্বজন॥
বাপ শ্রীচতুর্ভুজ মা হরাবতী।
কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুল শীল জাতি॥
কলিতে বিদ্যায় দুষ্ট বাড়ায় অহঙ্কার।
পুথিতে অভ্যাস করে ধন অর্জ্জিবার॥
একেত অধিকার নাই ভাষার বিচার।
বুঝিয়া মরম অর্থ করি ব্যবহার॥
সব ভাল ফুলে মালা নাহি গাঁথে মালী।

সর্ব্বক্ষণ মধুর না কুরুলে কোহিলী ॥
হেন মতে দোষগুণ দেখিয়া সংসারে।
দোষ আচ্ছাদিয়া গুণ করিবে প্রচারে ॥
মৃত্যুকালে যে পুরুষে যে ভাবনা উঠে।
পুনর্জন্মে সে জনার সেইরূপ ঘটে ॥”

মহানাদ নিবাসী লক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬১২ খৃষ্টাব্দে, ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে, রামেশ্বর নন্দী ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে এবং কৃষ্ণানন্দ বসু ১১৯০ সনে বা বঙ্গাব্দে “মহাভারত” রচনা করেন।

১৫৩৪ শকে বা ১৬১২ খৃষ্টাব্দে বিশারদ নামক এক ব্রাহ্মণ “বিরাট পর্ব্ব” বঙ্গানুবাদ করেন। তাঁহার নিবাস মহানাদে ছিল।

রাজা যাদবেন্দু সিংহের পুত্র কৃষ্ণরাম সিংহ মহাভারত রচনা করেন, ১৬৭০ খৃষ্টাব্দ বা কিছু পরে।

“মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ মহাফল যায়।
তে কারণে উহাতে উৎখাৎ মহা হয় ॥
হরিশ্চন্দ্র রাজা কৈল পৃথিবী দিয়া দান।
বড় দুঃখ পাইল রাজা বড় অপমান ॥”

অদ্ভূতাচার্য্যের রামায়ণ। মাণিকরাম গ্রন্থ সমাপ্তি কালের শক মাস দিন তিথি নক্ষত্র দিয়াছেন। জগতরাম সিংহ রায়ের অষ্টকাণ্ড রামায়ণ। ইনি বিষ্ণুপুর রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন এবং মহানাদবাসী ছিলেন। ১৬৯২ শকে “দুর্গা পঞ্চরাত্রি” এবং ১৭১২ শকে “অষ্টকাণ্ড রামায়ণ” লিখিয়াছিলেন। ইহাতে পুষ্কর কাণ্ড আছে। সীতা কালীরূপে সহস্রস্কন্ধ রাবণ বধ করিয়াছিলেন। জগদ্রামী রামায়ণ নামে উহা পরিচিত ছিল। এই রামায়ণের এখনও দেড় শতবর্ষ হয় নাই।

নেপালের কবি ভানুভক্ত একখানি রামায়ণ রচনা করেন, তিনি মহানাদে কয়েকবর্ষ এক পণ্ডিতের নিকট বিদ্যালাভ করেন।

১৫২৬ শকে বা ১০১১ সালে কাশীরাম দাস মহাভারত রচনা করেন।

"ভাগীরথী তীরে বটে ইন্দ্রায়নী নাম।
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গী (সিংহী) গ্রাম।
অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বাম পদ তলে।
নিবাস আমার সেই চরণ কমলে।"

বাঁশবেড়ের রাধামোহন সিংহ রচনা করেন,—

"ইহ সব বচন শুনই নাহি পারই
রহুঁ রাধামোহন দূর।"

ভূপতি সিংহ রচনা করেন,—

"ময়ূর কোকিল কত ঝঙ্কার দেয়ত
মঝু মনে মনমথ শেল॥
ছল ছল নয়ান বয়ান ভরি রোয়ত
চরণ পাকড়ি গড়ি যায়।
হাঁ হা সো ধনী হামে না হেরব
সিংহ ভূপতি রস গায়॥"

বিশ্ব সিংহের পুত্র সমর সিংহের আদেশে কবি পীতাম্বর মার্কণ্ডেয় পুরাণ রচনা করেন, ১৪৩০ খৃষ্টাব্দ।

১৬৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে রাঢ়ে দেবাইয়ের বৃহন্নারদীয় পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলিত ছিল।

কৃষ্ণদাসের নারদ পুরাণ, গোবিন্দ দাসের গরুড় পুরাণ লুপ্ত হইয়া থাকিবে।

বৃহজ্জাতক প্রকাশ রচয়িতা মহাদেব হরিবংশ ১৫২১ খৃষ্টাব্দে রাজা রামভদ্রের সভায় বিদ্যমান থাকিয়া উক্ত গ্রন্থ সমাপন করেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ মহানাদে পাওয়া যায়।

গঙ্গাধর সিংহ একজন প্রাচীন কোষকার। গদ সিংহ ও রমানাথ সিংহ কর্তৃক গঙ্গাধর কোষ উদ্ধৃত হইয়াছে।

গঙ্গারাম সিংহ—একজন বিখ্যাত সংস্কৃত জ্যোতির্ব্বিদ। ইনি ভাবফল, যুদ্ধ জয়োৎসব ও রত্নস্রোত নামে জ্যোতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন; ন্যায় কুতুহল—ন্যায়গ্রন্থ, ভক্তিরসাদ্ধি কলিকা গ্রন্থ প্রণেতা ও গোবর্দ্ধন সপ্তসতীর একজন টীকাকার।

ব্রজমোহন সিংহ ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে অঙ্গিরা-সংহিতা প্রকাশিত করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিষ্ণু সংহিতা ১১০০ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। অত্রি সংহিতা প্রণেতা অত্রির সময় ৩য় বা ৪র্থ শতাব্দী, এসময় রঘুনন্দন জন্মান নাই।

মুদ্গল পুরাণ নামে একখানি গ্রন্থ এদেশে প্রচলিত ছিল।

মহারাষ্ট্র পুরাণ নামক একখানি গ্রন্থ বর্গীর হাঙ্গামার সময় লিখিত হয়।

অদ্বৈত সিদ্ধান্ত প্রণীত "দাসোৎকর্ষ" গ্রন্থ কৈবর্ত্ত কুলপঞ্জি নিতান্ত আধুনিক।

ছিন্ন আকনা গ্রামের ভবানন্দ "হরিবংশ" রচনা করেন ১০৫০ বঙ্গাব্দে।

দ্বিজ মাধবানন্দ ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে আন্নলিয়া গ্রামে তাঁহার "দণ্ডী কাব্য" রচনা করেন।

আদিত্য পুরাণ—সৌরপুরাণ, ভাস্কর পুরাণ, ইত্যাদি শব্দেও আদিত্য পুরাণ বুঝায়।

গণেশ পুরাণ, ইহাতে গণেশের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। একখানি উপপুরাণ।

কায়স্থ পুরাণ, কলিকাতার উপবীতধারী নব্য কায়স্থগণের লিখিত আধুনিক গ্রন্থ, উহা ঋষি প্রণীত উপপুরাণ বলিয়া গণ্য হইবে না।

গন্ধর্ব্বরাজ, রাগরত্নাকর নামে সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ প্রণেতা। ইনি খৃঃ পূঃ ১৩০০ অব্দে জীবিত ছিলেন।

কায়স্থ কৃষ্ণরাম দাস ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে "রায় মঙ্গল" রচনা করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথম একখানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন বলিয়া প্রাণারাম নামক জনৈক কবি লিখিয়াছেন।

প্রায় চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় একখানি "বিশ্বকোষ" নামীয় গ্রন্থ ছিল। বর্ত্তমান বঙ্গভাষায় বিশ্বকোষ রচনার পর আর সে গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায় না।

বখ্তাবর খাঁ ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে "মিরাৎ-ই-আলম" নামে একখানি ইতিহাস রচনা করেন। তাহাতে মহানাদের রাজবংশকে অতি সুপ্রাচীন রাজবংশ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

কাজি দৌলত আরাকান্-রাজ থিরি সুধর্ম্মা রাজার সময়ে (১৬২২—১৬৩৮ খৃঃ অঃ) "সতী ময়নাবতী ও লোর চন্দ্রানী" রচনা করেন। তিনি উহা সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই মারা যান। অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করেন সৈয়দ আলাওল।

১৬১৯ খৃষ্টাব্দে মহানাদের কৃষ্ণরাম সিংহ 'পদ্মাবতী' নামে পারস্য ভাষায় পদ্মাবতীর উপাখ্যান রচনা করেন।

মহানাদের বলভদ্র শুক্ল, কুণ্ডতত্ত্ব প্রদীপ রচনা করেন। ইনি ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ জয়সিংহ দীক্ষিতের নামে উৎসর্গ করেন। ইহাঁর পিতার নাম স্থবির।

মহানাদের বলরাম কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরামের পূর্ব্বে চণ্ডীগ্রন্থ অনুবাদ করেন। মুকুন্দরাম স্বীকার করিয়াছেন,—"গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ" ইত্যাদি।

রস কি তাহা বুঝাইবার জন্য অলঙ্কার শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। ভারতের আদি নাট্যাচার্য্য ভরত মুনির প্রণীত নাট্যসূত্রই অলঙ্কার শাস্ত্রের মূল গ্রন্থ। ভরত মুনি বহু সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে ছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারে নাটক প্রচুর। খৃঃ পূঃ ১০০০০ বর্ষ হইতেই এদেশে অভিনয় একটি প্রধান কলা বলিয়া পরিগণিত। ঋষি ভরত, এই কলার গুরু ছিলেন। তিনি নিজে নাটক লিখিতেন, গন্ধর্ব্ব ও অপ্‌সরাদিগকে উহার অভিনয় শিখাইতেন, তাহার পর শিষ্য ও শিষ্যাদিগকে লইয়া দেবতাদের সম্মুখে অভিনয় করিতেন।

নাটকে অভিনয় আছে, যাত্রাগানেও অভিনয় আছে। উভয়ের প্রাণ বস্তুর হিসাবেই দুইয়ে বিভিন্ন।

নাটকের প্রাণ—আদি বা বীররস।

যাত্রার প্রাণ—করুণ, শান্তরস।

নাটকের অঙ্ক, পাঁচের কম এবং দশের অধিক হইতে পারিবে না। যাত্রায় এ বিধি মানা হয় নাই। যাত্রা সাধারণ মানুষের কথা লইয়া হয় না, ভগবৎ কথাই যাত্রার আখ্যান বস্তু। কৃষ্ণ কথা ভিন্ন অন্য কথায় যাত্রা হয় না, কিন্তু নাটক হয়। যাত্রার প্রকৃত,, অর্থ কীর্ত্তন যাত্রা। সেকালে হস্তলিখিত নিমন্ত্রণ পত্রে লেখা হইত—"অদ্য মমালয়ে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ গুণ কীর্ত্তন যাত্রাগান হইবে।" সেকালে যাত্রায় স্ত্রীলোক ছিল না, পুরুষেই স্ত্রী সাজিয়া অভিনয় করিতেন। এখন স্ত্রী যাত্রারও আবির্ভাব হইয়াছে, স্ত্রীলোকেও পুরুষ সাজে। এখন যাত্রা সখের জিনিষ। এখন যাত্রায় হাসি আছে, অশ্রু নাই; আমোদ আছে, পরমানন্দ নাই; তৃষ্ণা আছে, তৃপ্তি নাই।

মহানাদ এক সময় যাত্রার অধিকারীরূপে বড়ই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। মহানাদের দূতীপনা, বাঙ্গলার যাত্রার ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে। পাঁচালী, কবিগান, যাত্রা ও কীর্ত্তনে দারুণ রাঢ়ের

অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব বর্ত্তমানেও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সঙ্গীত ও সঙ্গতের আসরে বনবিষ্ণুপুর, ছিনা আকনা, আম্বুলিয়া, মহানাদের নাম আজিও সম্ভ্রমের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, গোবিন্দ অধিকারী, দাশুরায়, নিধুবাবু প্রভৃতি অমর সঙ্গীত-রচয়িতাগণ এই রাঢ় দেশকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। কোন সময়ে সঙ্গীত বিস্থার অনুশীলনকারীদিগের চেষ্টায় এদেশে "বঙ্গালী" এবং "গৌড়ী" রাগিণীর উদ্ভব হইয়াছিল।

পূর্ব্বে অধিকাংশ গ্রামে বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে পাঁচালী ও কবির লড়াই হইত এবং লোকে ঐ লড়াই শুনিতে বড় ভালবাসিত। সুপ্রসিদ্ধ ফিরিঙ্গি এণ্টনী সাহেবের কবির দল ছিল। ইনি এক বিধবা ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করিয়া হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হন। উদারতার হিসাবে ইনি দিল্লীর মোগল বাদশাহ আকবর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রবাদ আছে যে, এণ্টনী সাহেব "উলোই পাগলা"দের মত দুর্গা পূজা করিতেন। তাঁহার স্তবের সামান্য অংশ এই যে,

"আমি ভজন পূজন জানি না মা
জাতিতে ফিরিঙ্গী।"

উত্তর পাড়ার কালী মন্দিরের সন্নিকট ৺মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় কবির বাঁধনদার ছিলেন। মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক গ্রন্থ হইতে উদ্ভট ও জটিল প্রশ্নের সম্যক্ উত্তর সভাস্থলে কবির বাঁধনদারদিগকে মুখে মুখে দিতে হইত। এই সময় বিপক্ষদলের নৃত্যকারিগণ বাঁধনদারের সম্মুখে নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করতঃ নৃত্য করিয়া ও ঢুলিগণ কাণের কাছে উচ্চ বাদ্য করিয়া তাহার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইত। একদা এণ্টনী সাহেবের সহিত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের দলের লড়াই হয়। কথিত আছে, এণ্টনী সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিবার কালে একখণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার স্কন্ধদেশে পতিত হইয়া কিয়দংশ

দগ্ধ করে, কিন্তু মধুসূদন এরূপ তন্ময় ছিলেন যে, ঐ যন্ত্রণা আদৌ অনুভব করিতে পারেন নাই। এণ্টনী সাহেব তাঁহার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর পাইয়া প্রীত হন ও তাঁহার কবিত্ব শক্তির প্রশংসা করেন। এণ্টনী সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে মধুসূদনের কবিতার শেষ পংক্তি,—

"তুই জাতে ফিরিঙ্গি, জবড়জঙ্গী, পারবোনা তোকে কথাতে।
যিশুখৃষ্ট ভজ্‌গে যা তুই, শ্রীরামপুরের গীর্জ্জাতে॥"

এণ্টনী সাহেব ও কলিকাতা নগরের প্রতিষ্ঠাতা জবচার্ণক প্রায় সমসাময়িক ছিলেন।

* * * *

সিদ্ধসাধক পূর্ণানন্দ গিরির কথা—সংসারের নিরানন্দ গিরির চাপে পড়িয়াও পূর্ণানন্দ অনুভব করায়। বিখ্যাত সাধক মহারাজ রামকৃষ্ণ একদিন রুদ্ধ মন্দিরে মনোময় উপচারে মনোময়ীর পূজায় ব্যাপৃত, আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্যাদি প্রদানান্তে স্নান করাইয়া বসন ভূষণে সাজাইবার সময়ে মনোময় মণি মুকুটে মুক্তকেশীর সীমন্ত সুশোভিত করিয়াছেন, তাহার পরেই ভক্তবৎসলার কম্বুকণ্ঠে রক্তজবার মালা সাজাইয়া উভয় হস্তে প্রদানে উদ্যত, কিন্তু উচ্চ কিরীটের শিখরে ঠেকিয়া মালা ফিরিয়া আসিতেছে, বারবার উদ্যম ব্যর্থ দেখিয়া রাজা বড়ই বিষন্ন ও বিপন্ন হইয়া ভাবিতেছেন, "বুঝি আজ আর মাকে মালা পরাইতে পারিলাম না"। অপার দুঃখভরে বিশাল চক্ষু ছল ছল হইয়া উঠিল, কাঁদিয়া বলিলেন "মা! আমি কি করিব?" মন্দিরের বাহির হইতে উত্তর হইল 'রামকৃষ্ণ, কাঁদ কেন?' মুক্তকেশীর মস্তকে আজ মুকুট দিয়াই ত এ বিপদ ঘটাইয়াছ, মুকুট উঠাইয়া মালা পরাও"। মা রহিল, পূজা রহিল, রামকৃষ্ণ চমকিয়া উঠিয়া মন্দিরের কবাট খুলিলেন, অন্তমন্দিরেরও কবাট খুলিয়া গেল, চাহিয়া দেখিলেন—ভস্মভূষিত

তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসীমূর্ত্তি মহাপুরুষ—চিনিলেন—জন্মান্তরের শশ্মান সাধনার বন্ধু—সেই সিদ্ধ সাধক পূর্ণানন্দগিরি।

তাঁহার সময়ে মহানাদে তন্ত্রের বিজয় বিষাণ ভীষণ রবে বাজিয়াছিল। তিনি পূর্ব্বপুরুষের সাধনার স্থান মহানাদে বহুদিন অবস্থান করিয়া শব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। পূর্ণানন্দের ঊর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষের নাম অনন্তাচার্য্য, তাঁহার নিবাস মহানাদে ছিল। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে সময় মুসলমানেরা পাণ্ডুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মহানাদ অধিকার করেন, সেই সময়ে অনন্তাচার্য্যের জনৈক শিষ্য অযোধ্যানাথ বা হংসদাস মুসলমান অত্যাচারে পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া যান, কিন্তু তিনি মধ্যে মধ্যে গুরুদর্শনের জন্য মহানাদে আগমন করিতেন। অনন্তর অনন্তাচার্য্যও সপরিবারে মহানাদ হইতে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি ময়মনসিংহ জেলায় কাটিহালি, ডোহাখলা, নহাটা, দিয়াড়া, আগুজিয়া, লক্ষ্মীপুর, মাঘান প্রভৃতি গ্রামে ও অন্যত্র বাস করিতেছেন। পূর্ণানন্দের প্রকৃত নাম জগদানন্দ। জগদানন্দের গুরু ব্রহ্মানন্দ "পূর্ণানন্দ" নাম রাখেন এবং তিনি পূর্ণানন্দ গিরি নামেই সর্ব্বত্র সুপরিচিত। গিরি উপাধিতে তাঁহাকে দশনামী সন্ন্যাসীদিগের অন্যতম (গিরিপন্থী) বলিয়া মনে হয়। তিনি পরিব্রাজক, যতি, পরমহংস ও গিরি নামে অভিহিত। কামাখ্যা পীঠ লুপ্ত হওয়ার পর পূর্ণানন্দ গিরিই নীল পর্ব্বতে কামাখ্যা দেবীর পীঠস্থান নির্দ্দেশ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি খৃষ্টীয় ১৫৭১ অব্দে "শাক্তক্রম", ১৫৭৭ অব্দে "শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি" রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত "শ্যামারহস্য", "তত্ত্বানন্দ তরঙ্গিণী", 'ষট্‌চক্র নিরূপণ", "কালী ককার কূট সহস্র নাম টীকা" এবং "যোগসার" প্রভৃতি তাঁহার রচিত আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে। শক্তি সাধনায়—শাক্তের নিকটে পূর্ণানন্দের আসন অতি উচ্চে।

*　　*　　*　　*

২৪ পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে ১৬৪০—৪৫ শকাব্দের মধ্যে রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন স্বভাব কবি ও কালীভক্ত ছিলেন। তাঁহার মন সংসারে আসক্ত ছিল না। তিনি কোন ধনীগৃহে মুহুরীগিরি কর্ম্ম করিবার সময় খাতা লিখিতে বসিয়া খাতার চতুর্দ্দিকে কালী বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া লিখিয়া রাখিতেন। উহা দেখিয়া উক্ত ধনীর প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ঐ ঘটনা তাঁহার প্রভুকে জানান। কথিত আছে—প্রভু তাহাতে বিরক্ত না হইয়া রামপ্রসাদকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। রায় কৃপারাম সিংহ এই সময় কৃষ্ণনগরের মহারাজার প্রধান দেওয়ান ছিলেন। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত রামপ্রসাদের পরিচয় করাইয়া দেন। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে রামপ্রসাদ "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি দিয়াছিলেন। সাধক রামপ্রসাদ পঞ্চমুণ্ডি আসনে বসিয়া সাধনা করিতেন। কুমারহট্টে আজু গোঁসাই নামে এক ব্রাহ্মণ কবি ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব মতাবলম্বী, রামপ্রসাদ শাক্ত। কৃষ্ণচন্দ্র রায় শাক্ত বৈষ্ণবে দ্বন্দ্ব বাধাইয়া আমোদ উপভোগ করিতেন। রামপ্রসাদের পত্নী বৃদ্ধ বয়সে গর্ভবতী হন, তজ্জন্য আজু গোঁসাই রামপ্রসাদকে লক্ষ্য করিয়া যে গানটি রচনা করেন। উহার এক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা
　　কাঁচায়েছ পাকা ঘুঁটি।"

প্রাচীন জাতিতত্ত্ব

ঢাকার ঢাকাই বৈদ্যের দেখাদেখি কয়েক বৎসর হইতে যুগী ও সুবর্ণবণিক নিজেদের যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পান। প্রায় সেই সময় হইতেই চণ্ডাল বা চাঁড়ালদিগের নমশূদ্র জাতি বলিয়া পরিচিত হইবার ইচ্ছা হয়। নমশূদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি কি তাহা জানা যায় নাই। এখনও ব্রাহ্মণের অনুমোদিত জাল পুস্তকও দেখা দেয় নাই। একজন নমশূদ্র লেখক বলেন,—প্রকৃতপক্ষে শব্দটা নমঃশূদ্র এবং অর্থ—নমস্য শূদ্র। তাহারা বলেন, চণ্ডালদিগের আদি-পুরুষের নাম রাজা লোমশ। লোমশ নামে এক ব্রাহ্মণ ঋষি ছিলেন। তাঁহার সন্তান বলিয়া পরিচয় দিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, এই জন্য শূদ্র শব্দটা ইহাতে যোগ করা হইয়াছে। এইরূপেই লোমশ শূদ্র. নমঃশূদ্র এবং অবশেষে নমশূদ্র হইয়াছে। বন্য, অসভ্য বর্ত্তমান আসামের হাড়ি ও ডোমরা পুরাতন নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যথাক্রমে বৃতিয়ান, নদিয়াল ও বড়ুয়া কায়েত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই অবস্থার উন্নতি করিয়া কায়স্থ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন কথাও শুনা যায়। আসামের গ্রহাচার্য্যগণ এতদিন গণক ছিলেন, এক্ষণে দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ, বেজ-বড়ুয়া-ব্রাহ্মণ বলিতেছেন। কাছারীরা সজাই ও হাজাই জাতি বলেন যে, ভীমের (ভীং সেং) পুত্র ঘটৎকচ তাহাদের আদিপুরুষ ছিলেন। ঘটৎকচ নামে একজাতি আফ্রিকার অরণ্যে বাস করেন। মণিপুরীরা বলেন যে, অর্জ্জুনের পুত্র বভ্রুবাহন তাঁহাদের আদিপুরুষ। মিকির জাতির দাবী কিন্তু তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি ও কল্পনার

ঔৎকর্ষ প্রকাশ করে। তাহারা বলে যে, কিষ্কিন্ধ্যার বানররাজ বালি বা আলি তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্ব্বে গৌড়বঙ্গ মৌর্য্য এবং সুঙ্গ বংশীয় নৃপতিগণের শাসনাধীনে ছিল। মৌর্য্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে নন্দ মহারাজার রাজত্বকালে কায়স্থ জাতির প্রভাবের পরিচয় বিশাখ দত্তের "মুদ্রারাক্ষস" নাটকে পাওয়া যায়। মহামন্ত্রী কায়স্থ শকটারই প্রকৃতপক্ষে নন্দবংশের ধ্বংসসাধন করেন; তিনি ব্রাহ্মণ চাণক্যকে শুধু অস্ত্ররূপে ব্যবহার মাত্র করিয়াছিলেন। ভাষ্যকার বিজ্ঞানেশ্বরের পুথিতে কায়স্থের পরিচয় পাওয়া যায়। মৌর্য্যবংশে অশোকের পৌত্রের নাম বন্ধুপালিত এবং প্রপৌত্রের নাম ইন্দ্র পালিত। মৌর্য্যবংশীয় চিত্তোড় বা চিতোরগড়ের ভাগিনেয় বাপ্পরাওয়ের পূর্ব্বে গুহ হইতেই মেবাড় রাজবংশীয়গণ গোহিলোত উপাধি পাইয়াছেন। সম্রাট স্কন্দগুপ্তের উপরাজ পর্ণদত্ত পুত্র চক্র পালিত ১৩৭ গুপ্তাব্দে (৪৫৭ খৃঃ) রৈবতক পর্ব্বত হইতে নির্গত পলাশিনী নদীর বাঁধ এবং সুদর্শন নামক তড়াগ (প্রবল বন্যায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়) সংস্কার এবং পর বৎসর ৪৫৮ খৃষ্টাব্দে তথায় একটী দীর্ঘ অলঙ্কারময়ী কবিতা খোদাইয়া তাঁহার কীর্ত্তিকে চিরস্থায়িনী করিয়া দিয়াছিলেন। পুরাণ মতে গুপ্তবংশ (৩১৯—২০ খৃঃ অব্দে গুপ্তাব্দ সুরু হইয়াছে) গঙ্গাতীর হইতে আরব্ধ করিয়া উজান বহিয়া,—বহুজনপদ উপভোগ করিতেছিলেন। মহানাদের প্রাচীন কায়স্থকুলে কত শত রত্ন উদ্ভূত হইয়াছিলেন,—কত শত যে আবার কাল-সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছেন, তাহা কে নির্ণয় করিবে?

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর বর্ণের কথা, একেবারেই নাই; সম্প্রদায়গুলির নামও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ঋত্বিক, ক্ষত্র, বিশ, দাস স্থানে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য, শূদ্র হইয়াছে। আর্য্যরাজ্য সময়ে রাজাধিকরণে কার্য্য করিবার ক্ষমতা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য বর্ণের ছিল না। বিষ্ণু-

সংহিতায় যাহাদের কায়স্থ বলা হইত, তাহারা হয় ব্রাহ্মণ না হয় ক্ষত্রিয়, ক্ষাতি বা হিটাইট জাতি বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। ভবিষ্য পুরাণে কায়স্থ ও অম্বষ্ঠের জন্ম-বৃত্তান্তটী আসল নহে, নকল। চিত্রগুপ্ত আখ্যায়িকা রোচক বাক্য, উহা স্যার রাধাকান্ত দেবকে তুষ্ট করিয়া যজ্ঞোপবীত গ্রহণ হইতে বিরত করিবার প্রয়াস মাত্র।

ভগবান যমরাজ কায়স্থগণের আদিপুরুষ এবং যম ইরাণিদের "যিম" ও জাপানীদের "যমতো" দেবের সহিত অভিন্ন। ইরাণীগণের আবেস্তা গ্রন্থে—যিমের অচ্ছেদ্য উপাধি "ক্ষয়েত" Yima—Kshaita—এইরূপ তিনি সর্ব্বত্র লিখিত হইয়াছেন। এই ক্ষয়েত শব্দের অর্থ—দ্যুতিমান তেজস্বী, শক্তিমান ইত্যাদি। কায়স্থ শব্দের ব্যাকরণগত নিরুক্তির অভাবে পৌরাণিক নিরুক্তির আবিস্কার হওয়াও খুব স্বাভাবিক। প্রাচীন মিশরের "Skhai" বা "স্কৈ" অক্ষরের দ্বারা প্রাচীন ইজিপ্টে "লেখা" ক্রিয়াপদ প্রকাশ করিত। ঐ Skhai বা লেখা হইতে Skaith কিম্বা Skaeth "লেখক" অর্থে প্রস্তুত হইয়া পরে ইরাণীদের মুখে Khshaeta হইতেও পারে। মিশরের সহিত প্রাচীন পারস্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকার কথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন, প্রাচীন ভারতে পারস্যে এবং মিশরে ধর্ম্ম আত্মীয়রূপেই গৃহীত হইত।

কয়েক বৎসর মধ্যে ধানাইদহ গ্রামে, দামোদরপুরে, কয়েকখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে, এইগুলি ১৩০০ হইতে ১৫০০ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। যে সময়ে দেশে "দীনার" নামক স্বর্ণ মুদ্রার ব্যবহার সুপ্রচলিত ছিল, ঐ সময়ে দলিলগুলি লেখা হইয়াছিল। এই দলিলগুলি পড়িয়া দেখিলে স্পষ্ট দেখা যাইবে যে, খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দে এবং তাহারও পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গলায় ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ, সেন, সিংহ, দত্ত, পাল, পালিত, ভদ্র, নাগ, নন্দী ইত্যাদি উপাধিধারী লেখক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। মুসলমান বিজয়ের পর দেশে যে সময়

সমাজ বিপ্লব হইয়াছিল, তাহাতেই সমাজে বহু নিম্নশ্রেণী প্রবেশ করিয়া কায়স্থ জাতির দলপুষ্টি করিয়াছিল। উত্তর রাঢ়ে ও বারেন্দ্রের কলিতা জাতি কায়স্থ সমাজে মিশিয়া গিয়াছে।

পদ হইতে যে শূদ্র উৎপন্ন হইল, তাহার কি নাম ছিল? এই শূদ্র যখন ব্রাহ্মণের ন্যায় 'সদারকাঃ' উৎপন্ন হওয়া দেখা যায় না। তখন তাহার একমাত্র পুত্র হীম কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? যদি ব্রাহ্মণকন্যা সম্ভূত হইয়া থাকে, তবে ত সে চণ্ডাল এবং তাহার পৈতৃক ব্যবসায় ত্রিবর্ণের সেবার অনধিকারী। তাহা হইলে শূদ্র আর কেহ থাকিল না, কেন না হীম তাহার পিতার একমাত্র পুত্র ; তৎপর ব্রহ্মা কি ত্রিবর্ণের সেবার জন্য আবার শূদ্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন? কই তাহার ত কোন উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। হীমের একমাত্র পুত্র প্রদীপ, প্রদীপের একমাত্র পুত্র কায়স্থ লিপিকার হইল। গণেশ মহাভারতের লিপিকার কেন হইলেন? চণ্ডাল বা চাঁড়াল পুত্রের পক্ষে লিপিকার হওয়া অসম্ভব নয় কি? আর লিপিকারের পুত্র চিত্র (গুপ্ত) স্বর্গে গিয়া চতুর্ব্বর্ণের পূজনীয় হইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা চিত্র (সেন) পৃথিবীতে (Egyptian Picture Writings) থাকিয়া ত্রিবর্ণের সেবক শূদ্র হইলেন কেন?

> "চিত্রগুপ্ত স্থিতি স্বর্গে চিত্রাঙ্গদ পাতালে।
> সেনি অবতার মর্ত্ত্যে ব্যাপ্ত ভূমণ্ডলে॥
> কায়স্থ সেনির বংশ দীপ্ত ক্ষিতিতলে।
> সেনি প্রদীপের বংশ বিদিত সকলে॥
> প্রদীপ ব্রহ্মার বংশ নহেত অন্যথা।
> কায়স্থের পরিচয় আদি সূত্রে গাঁথা॥
>
> কাশীনাথের ঢাকুরী।

গৌড়দেশের চির অধিবাসীগণই মৌলিক কায়স্থ। মৌলিক কায়স্থগণ

কাহার বংশ নির্ণয় করিতে না পারিয়া ব্রজমোহন সিংহ ও রাধামোহন সিংহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, তাঁহারা চিত্রগুপ্ত বংশজ। তাঁহারা 'কর্ণাট রাজী' ও 'কবি ময়ুর' গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া "মৌলিক কায়স্থ সমাজ" প্রণয়ন করেন।

পাদজ শূদ্র বংশোদ্ভব কায়স্থ নামা লিপিকর প্রজাপতির চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির চারি পুরুষের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল দেখা যায়। দেবাসুরের যুদ্ধের সময় কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন? এই কায়স্থ নামা ব্রহ্মার সন্তান হইতেই যদি কায়স্থ বা খায়েত্ বা ক্ষায়তিয়ান্ জাতির নামকরণ (Scythia or Kaithia of the Greeks) হইয়া থাকে, তবেত কায়স্থ জাতি আদিমকাল হইতেই বর্ত্তমান ছিল, তাহা হইলে বেদ সমূহে এবং মনুসংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থ জাতির উল্লেখ দেখি না কেন?

কায়স্থ যখন শূদ্রের একমাত্র বংশধর, তখন কায়স্থ জাতিও শূদ্রবর্ণ সমার্থবাচক্ হইয়া পড়ে, কিন্তু কোথায়ও কায়স্থ শূদ্র শব্দের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখি কিম্বা শুনিনা কেন? তান্ত্রিক ধর্ম্ম যখন রাঢ়ে (নদীয়া ও হুগলী জেলায়) প্রবল হইয়াছিল, ঠিক তাহার পরেই কায়স্থের দাস উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বঙ্গজ কায়স্থেরা দাস শব্দ ব্যবহার কখন করেন নাই।

রামানন্দ ঘোষের "নূতন রামায়ণ" নামে একখানি রামায়ণের পুথি ছিল। রামানন্দ ঘোষ লিখিয়াছেন যে, "বৈবস্বত-মনু-পুত্র ইক্ষাকুর যজ্ঞকুণ্ড হইতে সূর্য্য কৃপায় মসিজীবিগণ উঠিয়াছিলেন।"

বৌদ্ধাচার্য্য চাঙ্গুদাসের কারিকায় লিখিত আছে, কায়স্থদের ইষ্ট দেবতা বুদ্ধ।

বারেন্দ্র কায়স্থ কুলজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, আদিশূরের বহুপূর্ব্বে নিত্যানন্দ নামে জনৈক রাজা এদেশে বাস করিতেন। তিনি বাহাত্তরটী

বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার ৭২টী (স্ত্রীর) পুত্র মাতামহালয়ে বাস করেন এবং মাতুল পদ্ধতিক্রমে গুরুর গোত্র প্রাপ্ত হন,—তাঁহারাই বাহাত্তুরে কায়েত।

বঙ্গদেশে ঘোষ, বসু, মিত্র, দাস, দত্ত, দে, সেন, সিংহ, গুহ প্রভৃতি ব্যতীত নিম্নলিখিত উপাধিধারী কায়স্থ বংশও পাওয়া যায়। যথা— স্বর, ধরণী, গুঁই, বাণ, ঈভ, পৈ, শাল, বিন্দু, লোধ, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, হুই, রাজ, খিল, পিল, চাঞ্চি, হেশ, বন্ধু, সাঞ্চি, সুমন, গণ্ডক, রাহুত, দাহ, দানা, গণ, মল, মাল, খাম, অপ, ঘর, ক্ষোম, বৈ, তোষ, এন্দ, অর্ণব, অব, শক্তি, ভূত, সঙ্গ, ওম, হেম, বদি, ভূঞ্চি কীর্ত্তি, যশ, শীল, ধনু, দাঁড়ী, গুণ, মালি, শ্যাম, পুঞ্চি, তেজ, নাদ, রোই, হোম, হাতী, ঢোল, দূত। হালদার উপাধিধারী বাহাত্তুরে কায়স্থও আছে। কিরূপে এবং কোন্ সময়ে এই সকল উপাধিধারী (কায়স্থ) বংশ সকল কায়স্থ সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, এবিষয় ইতিহাস নিস্তব্ধ।

কায়স্থগণ "কায়স্থ পুরাণ"ই লিখুন বা উপবীত ধারণই করুন, অথবা শত শত আদিশূর ও বল্লালের দোহাই দিন, তাঁহারা যে শূদ্র— তাহাতে সন্দেহ নাই।

"লঘু ভারত" কর্ত্তা সেনরাজ-বংশের আদিপুরুষ বীরসেনকে মাহিষ্য জাতি বলিয়াছেন এবং তিনি মাহিষ্যকেই বৈশ্য বলেন। এই মাহিষ্য জাতি বাঙ্গলা দেশে নাই। এই নাম আজ কয়েক বর্ষ হইতে কৈবর্ত্তেরা (চাষি কৈবর্ত্ত ও কৈবর্ত্ত সভ্য) ব্যবহার করিতেছেন। বোধ হয় পাঞ্জাবের অম্বষ্ঠ, বাঙ্গলার মাহিষ্য একই জাতি ছিল। মাহিষ্যদের পরাজিত করিয়া আর্য্যগণ ভারতের নানাস্থানে আর্য্য-রাজ্য বিস্তার করেন। অল্প সংখ্যক মাহিষ্যরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকিবে, ইহাই অনেকে বিশ্বাস করেন।

শ্রীহট্টে কায়স্থের সহিত বৈশ্যের বিবাহ হইয়া থাকে। অতি

প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত উভয় জাতির মধ্যে এইরূপ আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে। প্রমাণের অভাব নাই, তথাপি মৌলভি বাজার মহকুমার অন্তর্গত দুইটি পাত্র পাত্রীর নাম ঠিকানা লিখিত হইল,—

১। পাত্রী—হেমাঙ্গিনী ঘোষ, পিতা রাধানাথ সেন, সাং হিঙ্গাজিয়া, পরগণা লঙ্গলা। পাত্র—শশীভূষণ ঘোষ, পিতা রুদ্রনারায়ণ ঘোষ, সাং খলাগ্রাম, পরগণা ইন্দ্রেশ্বর।

২। পাত্রী—রামমণি সেন, পিতা রামকেশব রায় (দে) কানুনগো, সাং নর্ত্তন, পরগণা লঙ্গলা। পাত্র—বৈকুণ্ঠনাথ সেন, পিতা চন্দ্রনাথ সেন, সাং হিঙ্গাজিয়া, পরগণা লঙ্গলা।

ভরত মল্লিক প্রণীত চন্দ্রপ্রভা নামক বৈদ্যকুলগ্রন্থে আছে যে, পাহাড় খণ্ডের বা সেন ভূমের রাজা বিজয় সিংহের বা সেনের পুত্র রাজা চন্দ্র সেনের ১৮টি পুত্র ছিল, তন্মধ্যে ৮ জন কায়স্থ এবং ১০ জন বৈদ্য। কায়স্থ ও বৈদ্য যে একই বর্ণের অন্তর্গত ছিল, তাহার প্রমাণ উভয়ের কুলগ্রন্থেই যথেষ্ট পাওয়া যায়।

পূর্ব্বকালে যশোহর জেলায় "ডেঙ্গর কায়স্থ" বা পাণ্ডব বর্জ্জিত জাতি (?) র বাস ছিল।

প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয় বীরগণ, ব্রাহ্মণের যজ্ঞকালে সশস্ত্র উপস্থিত থাকিয়া যজ্ঞীয় হবি রক্ষা করিতেন। যজ্ঞ রক্ষার জন্য ত্রেতায় রাজর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের নিকট হইতে মহাবীর রামচন্দ্রকে চাহিয়া লইয়াছিলেন। যজ্ঞকালে হবি রক্ষা একটী প্রধান অঙ্গ ছিল। সেদিন কৃষ্ণনগরাধিপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় যে বৈদিক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাতে একজন কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বরণ দেওয়া হইয়াছিল; তৎসম্বন্ধে ক্ষিতীশ বংশাবলীতে এইরূপ লিখিত আছে—

অগ্নিহোত্রমহাযজ্ঞে কায়স্থান্ ক্ষত্রিয়াসনে।
চকার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রঃ নবদ্বীপাধিপঃ সুধীঃ॥

এই কায়স্থ কে জানেন? ইনি ভালুকা নিবাসী মহানাদ সিংহবংশীয় দেওয়ান রায় কৃপারাম সিংহ (খাঁ চৌধুরী)।

বাঙ্গলার "রোজপুত বা রজপুত" জাতি আর নাই। বোধ হয় ইহারাই "রজক" নামে ক্ষীণস্মৃতি বহন করিতেছে। রাজপুত-ক্ষত্রিয় বাঙ্গলার রজপুত ও রাজবংশী হইতে বিভিন্ন সঙ্ঘ।

কেহ কেহ বলেন, মিশর দেশের ব্রাহ্মণেরা "মিশ্র" ব্রাহ্মণ নামে এদেশে আজিও প্রচলিত। মিশরকে আরবেরা মিছর বলে, আমাদের দেশেও মিশ্র ব্রাহ্মণকে মিছির ব্রাহ্মণ বলা হয়।

অলীক ব্রাহ্মণ—বর্ণ-ব্রাহ্মণগণ। ইহারা ব্রাহ্মণ বেশধারী হইলেও মূলতঃ শূদ্র। বর্ণব্রাহ্মণগণের উপনয়ন হয়। নমশূদ্রেরাও দশদিন অশৌচ পালন করে। বাঙ্গলায় শ্রাদ্ধে শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ বিদায়ের পরে অলীক বিদায় করা হয়। অলীক বুঝিতে লগ্নাচার্য্য বুঝায়। অলীক ব্রাহ্মণ সৃষ্টি কবে হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। কোন কোন পুরাণে পরাশর, স্কন্দ ও পরশুরাম কর্তৃক শূদ্রদিগের গলায় পৈতা দিয়া ব্রাহ্মণ করিবার কথা আছে, কিন্তু তাহা বাঙ্গলার বাহিরের কথা। শঙ্করচরিতে তৎকর্তৃক ব্রাহ্মণ সৃষ্টির কথা আছে, কিন্তু সে সৃষ্টিও বাঙ্গলার বাহিরেই হইয়াছিল। বাঙ্গলার "অলীক ব্রাহ্মণ" বল্লালের সৃষ্টি বলিয়া প্রবাদ। যে জাতি পুরোহিত চায়, তাহাদের মধ্য হইতেই এই প্রকার ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হইয়াছিল।

শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণ সমাজের পূর্ব্বপুরুষ পৃথু, নৃসিংহ, বিষ্ণু, লোকনাথ, জনার্দ্দন, কেশব, কৃত্তিবাস, নারায়ণ, দণ্ডপাণি ও মহানন্দ মহানাদবাসী ছিলেন। ইহাদের গোত্র যথাক্রমে কাশ্যপ, ঘৃত কৌশিক, গৌতম, মৌদ্গল্য, ভরদ্বাজ, বাৎস্য, শাণ্ডিল্য, পরাশর, জামদগ্নি ও আলম্যান এবং

ইহাদের উপাধি বৃহজ্জোষী, কাশ্‌পটী, ওঝা, আচার্য্য, ঘটক, পাঠক, মিশ্র ও উপাধ্যায়।

"গঙ্গার পশ্চিম ভাগে বালীগ্রাম সীমে।
আশী ক্রোশ মৌড়েশ্বর তাহার পশ্চিমে॥"

অর্থাৎ—রাঢ়ের পশ্চিমাংশে কোট মৌড়েশ্বর হইতে পূর্ব্বাংশে বালীগ্রাম পর্য্যন্ত ৮০ ক্রোশ মধ্যে ইহাদের বাসস্থান বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।

মৌদ্গল্য গোত্রীয় মীনকেতন আচার্য্য ও গর্গ গোত্রীয় হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব মহানাদে বাস করিতেন।

সমগ্র ভারত খণ্ডে ১৮০০ আঠার শত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহাদের মধ্যে একে অন্যের অন্ন বা কন্যা গ্রহণ করেন না। এই বাঙ্গলাদেশেই এমন ব্রাহ্মণ অনেক আছেন—যাঁহাদের জল ব্রাহ্মণ দূরে থাকুক, জল-আচরণীয় শূদ্রেও স্পর্শ করে না। বাঙ্গলাদেশে যে প্রায় ১৪,০০,০০০ চৌদ্দ লক্ষ নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জাতির নরনারী রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একতা আছে কি ?

বৈদিক যুগে দেখা যায়, আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে পরাজিত করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত-দ্রাবিড় দেশে বাস করিয়াছিলেন। আর্য্য ও অনার্য্যের বর্ণসঙ্করতা নিবারণের জন্যই বর্ণভেদ বা জাতিভেদের উৎপত্তি। শূদ্রগণকে হীনাবস্থা করিয়া রাখার জন্য অনেকে মনুকে দোষ দেন, কিন্তু যখন মনে পড়ে—সেই সকল শূদ্র,—কোল, ভীল, নাগা, আফগান ও খৃষ্টানদের জ্ঞাতি ছিল, তখন এই নিয়মের আবশ্যকতা বুঝা যায়। এই সকল হীন ব্যক্তির হস্তে পড়িলে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শাসন ক্ষমতা এবং ধনের যে বহুল পরিমাণে অপপ্রয়োগ হইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি। মহাকুল-প্রসূত জনমে কোন দোষ থাকিলে

সে অবশ্যই অল্প পরিমাণে হউক আর প্রচুর পরিমাণেই হউক, তাহার নীচ কুলোদ্ভব পিতৃমাতৃ স্বভাবের অনুসরণ করিবেই।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ব্রজমোহন সিংহ লিখিয়াছিলেন—"অনেকের ধারণা কুরু পাণ্ডবগণ চন্দ্রবংশীয়, বাস্তবিক তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় নহেন। সূর্য্য বংশীয় সম্বরণ রাজার স্ত্রী সূর্য্যকন্যা তপতীর গর্ভেই কুরুরাজের জন্ম হয়। এই কুরুরাজ কর্ত্তৃক কুরুক্ষেত্র তীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়।"

প্রায় দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিংহল পাটনে পণি নামে এক পরাক্রান্ত জাতি বাস করিত। ঋগ্বেদে সায়নাচার্য্য এই জাতিকে অসুর (Assyrians) বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন। অথর্ব্ব সংহিতায় পণি (Penik or Punic) ও অসুর স্বতন্ত্রভাবেই কথিত হইয়াছে। বেদে "দাস" জাতির উল্লেখ আছে। রসানদী প্রাচীন 'গান্ধার' বর্ত্তমান আফগানি স্থানের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুর সহিত মিলিত। এই নদীতীরে পণিদিগের সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। পণিগণ ভাগবতে বৃষল বলিয়াই পরিচিত। জড়ভরত এখানে আঙ্গিরস নামে উক্ত হইয়াছেন। ভারতের কাশ, কাশ্য বা কাশেয় (Kassites) জাতি কাশি জনপদ প্রতিষ্ঠা করেন, ইহাদের উপাস্য সুরিয় বা সূর্য্য ছিল। মিশর বা ইজিপ্ট দেশ ইহাদের নিকট সভ্যতা-শিক্ষায় ঋণী। ভারতে চিত্রলিপি প্রচলিত থাকিলেও এই পণি জাতিই এদেশে সঙ্কেত লিপি ও বর্ণলিপি প্রচার করিয়া নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

বলন্দ মহানাদের একটি আদিম অধিবাসী। এক্ষণে তাহাদের এ অঞ্চলে অস্তিত্ব নাই। ইহারা ভক্ত-বলন্দ নামক গোঁড় জাতির অন্যতম শাখা। একদিন বলন্দগণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিল। ব্যাণ্ডেলে তাহাদের রাজধানী ছিল। গোঁড় ও ক্রোঞ্চ নামক কোল জাতির উপর্য্যুপরি আক্রমণে বলন্দ রাজবংশের উচ্ছেদ সাধিত হয়।

কিছু দিন হইতে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে পরস্পর ঈর্ষা ও নিজের জাতিকে বড় প্রতিপন্ন করিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে দেখা যাইতেছে। ইহার মূলে একটি প্রধান কারণ জানিতে পারা গিয়াছে যে, ইউরোপীয়ানরা নাকি বলিয়াছেন—ভারতের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ব্যতীত আর আর সকলে অনার্য্য জাতি। সেইজন্য কতকগুলি জাতি উচ্চবর্ণে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন। সেকালের একটা কথা আছে—

"রায় রায় রায় ছেঁড়া জুতা পায়।
ঘরে খেতে কড়ি নাই বৌ আন্‌তে চায়॥"

অনেক দিন হইতে কায়স্থের সহিত বৈদ্যের ন্যায় কায়স্থের সহিত সদ্‌গোপ জাতিরও স্ব স্ব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিরোধ চলিতেছে। "কায়স্থ-সদ্‌গোপ-সংহিতা" গ্রন্থে কায়স্থকে গালি দিয়া লেখনী সঞ্চালন করা হইয়াছে। রাঢ়খণ্ডের কিয়দংশ স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে সদ্‌গোপ নামক জাতির অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না। শ্রীহট্টে গোপ বা গোয়ালারা সম্প্রতি সদ্‌গোপ নামে পরিচিত হইতেছে। সদ্‌গোপ জাতি রাঢ়খণ্ডের চিরাধিবাসী। বাঙ্গলার "জাঠ-শূদ্র" সম্প্রদায় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহারা পূর্ব্বকালে সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত হইয়া অতুল বীরত্ব গাথা রচনা করিয়াছিল। ভীষণ কৈবর্ত্ত বিপ্লব ধ্বংস করিয়া "ত্রিপিনী" বা ত্রিবেণী তীর্থ স্থান ব্রাহ্মণদিগের হস্তে পুনরার্পণ করিয়াছিল। নারায়ণ গড়ের রাজা পৃথ্বীধর (বা পৃথ্বীবল্লভ) পাল ও নাড়াজোলের রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ রাজা অজিৎ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাসদ্ধ হন। এই সদ্‌গোপ জাতির সাহায্যে বিষ্ণুপুরের রাজা, চক্রধরপুরের রাজাকে বন্দী ও পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পুরাণ বা হিন্দু শাস্ত্রে এই সদ্‌গোপ জাতির নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। সদ্‌গোপ

জাতি কায়স্থ জাতি অপেক্ষা যুদ্ধ বিদ্যাদিতে কোন অংশে হীন ছিলেন না, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

নবশাখ বংশাবলী—

[শ্রীবিশ্ব মিশ্রেণ দিগ্বাণেন্দু শক বর্ষে (১৫০১) বিরচিতঃ॥ ১৬৪৫ শক বর্ষে শ্রীকেশব দত্তেন যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং ॥]

"বৈশ্যের বিস্তর পুত্র জন্মিল ক্রমে ক্রমে।
তাদের বংশের কথা কহি অনুক্রমে ॥
এক পক্ষে নব সুত গোপ আদি করি।
মালাকর কোলাল মদক আর বারি ॥
উপজিল নবপুত্র তিলি অন্তে ধরি ॥
এইরূপে নবশাখ নব বংশ জাত।
ইহা হইতে অন্ত্যজ বর্ণসঙ্কর উপস্থিত ॥
বৈশ্যের দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হইল।
তাহা হইতে পঞ্চজন বণিক জন্মিল ॥
পঞ্চজনের পঞ্চ নাম শুন দিয়া মন।
গন্ধ শঙ্খ কংস স্বর্ণ মাণিক্য পঞ্চজন ॥
স্বর্ণ আদি চুরি করে যে কারণ।
তে কারণে অনাচার স্বর্ণাদি দুই জন ॥
গন্ধ শঙ্খ কংস তিনে বৈশ্যের ব্যবহার।
তে কারণে সর্ব্ববর্ণে করে ব্যবহার ॥
এই মতে সৃষ্টি বাড়ে যুগ যুগেতে।
কুলশাস্ত্রে নিরূপণ কহিনু সাক্ষাতে ॥"

বারেন্দ্র কুলগ্রন্থ।

বাউরী পশ্চিম বঙ্গবাসী জাতি। কৃষিকার্য্য, ইষ্টক নির্ম্মাণ ও পাল্কী বহন ইহাদের প্রধান ব্যবসা। বক বা কুকুর মারিলে বাউরিকে জাতিচ্যুত হইতে হয়। ইহাদের মনসা, ভাদু, মানসিংহ, বড়পাহাড়ী, ধর্ম্মরাজ ও কুক্রসিনী পূজ্য দেবতা। মনসা ও ভাদু বাগ্‌দীদিগেরও উপাস্য দেবতা। ইহাদের স্বজাতি মধ্যস্থ লাবা বা দেঘরিয়া পূজকগণ যাজকতা করিয়া থাকে।

বর্ত্তমান বাঁশবেড়ে গ্রামে প্রাচীন কালে ডোম নামক জাতির এক শাখা "বাঁশফোড়" বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। বেরানগরের উত্তর পশ্চিমস্থ বীরসিংহপুর নামক স্থান হইতে আসিয়া এই বাঁশফোড়েরা বাঁশবেড়ে গ্রাম নির্ম্মাণ করে। তাহারা বলে যে, পন্নারাজ্যের বিস্‌পুর নামক স্থান তাহাদের জন্মভূমি ছিল। অযোধ্যার রামচন্দ্রের ভক্ত স্বপচ ভকৃত নামা জনৈক ব্যক্তিকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া পরিচয় দেয়। ঐ ব্যক্তির মানদেবী ও পানদেবী নামে দুই স্ত্রী ছিল। বাঁশফোড়েরা মানদেবীর গর্ভজাত। মহানাদের নিকটবর্ত্তী ডুঙ্গরপুর নগরের রাজাকে ইহারা নিহত করে। বিন্ধ্যাচলের বিন্ধ্যবাসিনী দেবীই ইহাদের প্রধান দেবতা। প্রতি চৈত্রমাসের ৯ই তারিখে দেবীর উদ্দেশ্যে তাহারা শূকর বলি দেয়, কালিকা দেবীর পূজা করে। ৫ই শ্রাবণ নাগপূজার বিধি আছে। এতদ্ভিন্ন দীহনামক (দেওদত্ত) গ্রাম্য দেবতা ও পিপুলাদি বৃহত্তর নানা পূজাও দৃষ্টিগোচর হয়।

সিংহবাহিনীর উপাসক রাজা সুরৎসিংহ খয়রা জাতীয় ছিলেন। ইহাদের বাঁকুড়া জেলায় পাওয়া যায়। 'সিংহরায়" উপাধি অনার্য্য। এককালে এই জাতির লোক খদির বৃক্ষ হইতে নির্যাস—খয়ের বাহির করিত। এক সময় মহানাদে খদির বৃক্ষ প্রচুর ছিল।

মহানাদে "কোড়া" নামে একজাতি বাস করিত। কোড়া নাম বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে "কুড়ব"; ইহাদের এক ভাগের নাম "শেখর", ঐ

পুরাণে আছে। বাউরীদের মধ্যে "শেখরিয়া" ভাগ আছে। পরেশনাথ পাহাড়ের নাম শেখর এবং শেখরভূম আছে।

জেল্যা ও কেওট উভয়েই কৈবর্ত্ত। মহানাদ ও হুগলী জেলায় মেট্যা-বাগদী জাতি পাওয়া যায়। বাগদী বা লেট বাগ্দী মুরশিদাবাদ জেলায় আছে। বাঁকুড়ায় বলে 'বাগতী'। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে আছে— "ইহারা মহাদস্যু বলবান ধনুর্দ্ধর; ক্ষত্রিয়ের দ্বারাও বারিত হইলে 'বাক্-অতীত', আজ্ঞা মানে না, এই হেতু নাম বাগতীত।" দুল্যা বাগ্দী কৈবর্ত্ত জাতি ছিল। বেদে জাতি দুর্দ্ধর্ষ বেদুঈন। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে 'মত্ত' নামক জাতির উল্লেখ আছে, উৎপত্তি ধীবর ও শূদ্র হইতে। বাগ্দীরা নানাবিধ পক্ষীমাংস খায়, কিন্তু বকের মাংস খায় না। মাঝি জাতি আছে। লোহার বাগ্দী পূর্ব্বকালে লোহার আকর হইতে লৌহ নিকর্ষণ করিত। ঝিনুক, শামুকের খোলা পোড়াইয়া চুণারি বাগ্দী নাম হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গে সূত্রধর জাতির পৌরহিত্য এক বর্ণের ব্রাহ্মণগণ করিয়া থাকেন। ইহারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের সময় হইতে বৃষকাষ্ঠ তৈয়ার করে। প্রতিমায় 'পাট খিল" সূত্রধরে না দিলে প্রতিমা গঠন হয় না; সূত্রধর জাতির অভাবে কর্ম্মকারে উহা প্রস্তুত করে। বর্ণ ব্রাহ্মণ যাজিত সম্প্রদায়ের কাষ্ঠের কাজ পেশা নহে এবং বিশ্বকর্ম্মা পূজাও তাহারা করে না। আজকাল সূত্রধর জাতির লগ্নাচার্য্য ব্রাহ্মণগণই পুরোহিত। সূত্রধর জাতির উৎপত্তির বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই। মনে হয় "হিটাইট" জাতিই সূত্রধর সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া থাকিবে। এই জাতি এককালে এসিয়া মহাদেশ কম্পিত করিয়াছিল। সম্বর (সামোরাইট) ও অম্বর (আমোরাইট) ও পানি (ফোনিসিয়ান) প্রভৃতি জাতিদের সহিত পঞ্চনদে মিলিত হইয়া ঋগ্বেদীয় যুগে শূদ্রকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সূত্রধর জাতি ময়মনসিংহ জেলায় তুর পর্ব্বতের পাদমূলে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনা করিয়াছিল।

যে সকল শূদ্রজাতি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি উচ্চ জাতিতে পরিণত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা বহুকাল হইতে শূদ্রাচার সম্পন্ন থাকায় ধর্ম্মশাস্ত্র মতে তাঁহারা শূদ্র বলিয়াই পরিগণিত হইবেন, জাতির আর পরিবর্ত্তন হয় না, জাতি অপরিবর্ত্তনীয়।

সকল জাতিই স্ব স্ব গণ্ডীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণেরা কোনও জাতিকে ঘৃণা বা অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন না। সকল জাতির সমষ্টিই একটি সুবৃহৎ সমাজ। আচার ব্যবহারাদি কতকগুলি কারণে কোন কোন জাতি অস্পৃশ্য হইয়াছে মাত্র। কিন্তু আজ "শিক্ষিত" বাবুরা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আর্য্য সমাজি, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতির শুদ্ধি ব্যাপারে পতিতকে উদ্ধার করিয়া একেবারে চট্টোপাধ্যায় উপাধি প্রদত্ত হইতেছে। অথচ এদিকে রাজসরকারে হিন্দুর নাম গন্ধের অস্তিত্বই আর নাই, হিন্দুস্থানের হিন্দু এখন অ-মুসলমান।

জাতি-তত্ত্বের সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে আলোচনা করিয়া লাভ নাই, বরং তাহা জাতি বিশেষের প্রীতিকর না হইতেও পারে। কারণ—

"দেবতার কুলজী গাহিলে দেবতা হন তুষ্ট।
মানুষের কুলজী গাহিলে মানুষ হয় রুষ্ট॥"

———

কুশীনামার বিচ্ছিন্ন সম্পদ।

প্রাচীন কালের অনেক ইতিহাস বর্ত্তমান কালে পাওয়া যায় না। টুক্‌রা টুক্‌রা প্রাচীন কথা যাহা পাওয়া যায়, তাহার আলোচনা কাহারও দ্বারায় এ যাবৎ হয় নাই।

"শান্তিপুর গ্রামে এক আছিল রাজন।
আদিকান্ত সিংহ নামে রাজা অলঙ্ঘ্য বচন॥
সেই রাজার কন্যা এক চন্দ্রাবলী।
তাঁহার স্ত্রীর নাম হএত কুন্তলী॥

*　　*　　*

সে পঞ্চ গৌরমৈদ্ধে পঞ্চগ্রাম স্থল।
ত্রিপিনি (ত্রিবেণী) নামে গঙ্গা তথা অতি মনোহর॥

*　　*　　*

গোপীনাথ সিংহ এক চৈতন্যের দাস।
অক্রুর বলি প্রভূ যারে কৈল পরিহাস॥
গোবিন্দ মাধব বাসুদেব তিন ভাই।
যা সবার কীর্ত্তনে নাচে চৈতন্য নিমাই॥

*　　*　　*

ধর্ম্মপাল নামে ছিল রাজ্য অধিপতি।
কদলীপাটন নাম তাহার বসতি॥
তাহার বংশে রাজা হৈল মহীপাল নাম।
শান্ত দান্ত সুশীল মহা গুণধাম॥

*   *   *

মহানাদ সিংহগড়ে,   ঝুম্‌ঝুমি বরাটেশ্বরে,
যেয়ে পাইল বশিষ্ঠগঙ্গার ঘাট।
নারদ কপিল তপে   মুদ্‌গল ছিল জপে,
মহামুনি দুর্ব্বাসার পাট॥

*   *   *

রামসিংহ সাজিল বিনোদ সিংহাড়া।

*   *

গজ পীঠে সাজিল অজয় সিংহ শূর।
হাকিম ছিকিম সাজে সাকিম কাঁউর॥
বার হাজার ধনে সাজে আম্বর ভূঞা।
শ্বেত গজে সাজিল দন্তের সিংহ ভূঞা॥

*   *   *

কালু সিংহ রায়   কামাখ্যার পায়
দণ্ডবৎ সাত বার।
কালুসিংহ বলে শুন লাউসেন ভূপ।
এখনি জিনিঞা রাজা দিব মহারূপ॥
এত বলি প্রণাম করিল ভ্রাতৃ পায়।
কাঙুরগড় জিনিতে কালুসিংহ যায়॥

*   *   *

দুর্জ্জন সিংহ * সুত   গোপাল সিংহ খ্যাত
বৈষ্ণব প্রহ্লাদ সমান্।
তস্য দেশে বাস   ধর্ম্মের ইতিহাস
দ্বিজ রামচন্দ্রে গান।

* দুর্জ্জন সিংহ মহানাদের রাজা ছিলেন।

*　　　*　　　*

অদ্রিজা মঙ্গল কাম　বিরচিল হরি রাম
শোভাও সিংহে রক্ষিবে অম্বিকা ॥

*　　　*　　　*

নরসিংহ নামে রাজা রহে মহানাদে।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বহু রহে মান্য পদে ॥

*　　　*　　　*

শুনি রাজা নরসিংহ করিলা গমন।
চলিলা রাজার সঙ্গে রূপ নারায়ণ॥

*　　　*　　　*

হলকুমে হানে তেগ ও কে বসে ছাতিতে।
আফতাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা রাতিতে॥
আসমান ভরে গেল গোধূলিতে দুপরে।
লাল নীল খুন ঝরে কুফারের উপরে ॥

*　　　*　　　*

আইল কালাপাহাড়।
ভাঙ্গিল লোহার ঘর।
খাইল মহানাদের পানি।
স্বর্ণ বালিরে হেড়া পরশান্তি মুকুন্দরাণী ॥

*　　　*　　　*

তখন ডাকিয়া দোঁহে আলি খাঁ-জাহান।
সিঙ্গীর জায়গীর দিল করিয়া বাখান ॥

*　　　*　　　*

হরি সিংহ মৌদগল্য গোত্রের বীজি হয়।
পুরাতন গ্রন্থের মর্ম্ম প্রকাশি ভাষায় ॥

*　　　*　　　*

১২১৮ সালের ২রা কার্ত্তিক কৃত্তিবাস ঘোষ মহানাদে একখানি কুশীনামা লেখেন। তাহার একটু—

শুনি নৃপ অর্দ্ধ পথে গলে বস্ত্র জোড় হাতে
ফিরাইয়া আনিলা পঞ্চমণিঃ
পাদ্য অর্ঘ সিংহাসনে বসাইলা পঞ্চজনে
সারঙ্গে পূজিল বেদধ্বনিঃ

* * *

একটি প্রাচীন গাথা—

"জলাপন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়।
রাজদ্রোহী দস্যুবৃত্তি করেন সদায়।।"

* * *

"মৌদগল্য মুনির শিষ্য সহস্রাক্ষ নাম।
লভিলা মৌদগল্য গোত্র মহা গুণধাম॥
সেই বংশে হরিশ্চন্দ্র হন অবতার।
সিংহের প্রভাবে সিংহ উপাধি তাহার॥
গুহ কাশ্যপের গোত্র মহানাদে গিয়া।
বরাটেশ্বর হল সিংহে বিয়ে দিয়া॥"

এই কবিতাটী সন ১২৪৫ সাল, ১৪ই শ্রাবণ শনিবারে রাঢ়ী-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কাশ্যপ গোত্রীয় ঘটক ৺রাধামোহন চক্রবর্ত্তী সরস্বতীর লিখিত। ঘটক রাধামোহন ও ঘটক শম্ভুচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার দুই ভাই। শম্ভুচন্দ্রের পুত্র ৺জগতচন্দ্র ঘটক বাচস্পতির লিখিত. হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, নদীয়া জেলার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কুলীন ও মৌলিকদের বংশাবলী আছে। তৎপুত্র রামেন্দ্রনাথ ঘটক বিদ্যারত্ন, গ্রাম বিভাগদি, যশোহর জেলা, থানা অভয়া নগর। পুরুষানুক্রমে কুলাচার্য্য ঘটকের ব্যবসা

করিতেছেন বলিয়া হস্তলিখিত পুথিতে সহস্রাধিক বংশাবলী পুরাতন জীর্ণ খাতায় আছে। পূর্ব্বে ইহাদের পাকড়াশী উপাধি ছিল।

রাজা বিজয় রাম সিংহের গ্রন্থে আছে—

' যে দেশে যখন যাই সে হয় হুদিশ।
সুবুদ্ধি বুঝিতে পারে মূখে´ লাগে বিষ॥
রচিল বিজয়রাম সেবিয়া ঈশ্বরে।
এই আর্য্যা লও শিশু সুধির অন্তরে॥"

* * *

' সম্মুখ সমরে যার মাথা কাটা যায়।
কবিগণ মুক্তকণ্ঠে তাঁর যশ গায়॥"

খেঁই মেড়ে গ্রামের ৺রামচন্দ্র সিংহের নিকটে একখানি কবিতায় লেখা বংশাবলী পাওয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তাহা পোকায় কাটিয়া নষ্ট করিয়াছে। উহা হইতে নিম্নলিখিত কবিতাটুকু সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে—

"বসিয়া প্রভাত কালে
মানাদের দুর্গ ভালে
মহেন্দ্র খাঁ হেরিলা একদিন।
সিংহপুর সিংহবংশ
হইয়াছে পূর্ণ ধ্বংস
স্মৃতি আছে হইয়া মলিন॥

* * *

পলায়ে গিয়াছে সব বান্ধব স্বজন।

* * *

তোলে স্মৃতি আনুলের পুরাণ ঘটন।
হৃদিপদ্ম জিনি রাঙ্গা
ফুটায়েছে অজস্র গোলাপ।
মধুকুল্য সিংহবংশ
সেতারে সে করেছে আলাপ॥"

———

রাঢ়ে সংস্কৃত চর্চ্চা।

গ্রন্থকারের গুরুকুলের নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বংশাবলী পাঠে জানা যায় যে, কিছুদিন পূর্ব্বেও এদেশে কিরূপ সংস্কৃত চর্চ্চা ছিল,—

হুগলী জেলার দীর্ঘস্থই গ্রাম নিবাসী সভারাম বেদান্তবাগীশ, তৎপুত্র রামকানাই বাচস্পতি। ইনি দীর্ঘস্থই গ্রামের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন, এবং ঐ গ্রামে তাঁহার বংশধরগণের বাটী অদ্যাপি "বাচস্পতি বাটী" নামে অভিহিত হইতেছে। ইঁহার আট পুত্র ও সাত কন্যা, তন্মধ্যে মাত্র ছয় পুত্রের নাম পাওয়া যায়, যথা—রামধন ন্যায়পঞ্চানন, রামরতন তর্কালঙ্কার, শিবরাম বিদ্যাবাগীশ, রামরাম বিদ্যালঙ্কার, রামতনু তর্কালঙ্কার ও রামভদ্র চূড়ামণি। রামধন ন্যায়পঞ্চাননের পুত্র বিশ্বেশ্বর তর্কবাচস্পতি রামরতন তর্কালঙ্কারের পুত্র—দুর্গাচরণ ন্যায়ালঙ্কার। ইনি গঙ্গাতীরে সিজাগ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন ও নব্য ন্যায় এবং রঘুবংশের টীকা করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থাভাব প্রযুক্ত তাহা ছাপাইতে পারেন নাই, এবং সে সময় পণ্ডিতদিগের ঐরূপ ঝোঁকও ছিল না। তবে ছাত্রদিগকে তাহা পাঠ দিয়াছিলেন। পরে গৃহদাহ হইয়া সে সকল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যা বিক্রয় করা হইবে বলিয়া তিনি চাকরী স্বীকার করেন নাই, বিশেষতঃ তৎকালে তাঁহারা দাসত্বকে ঘৃণা করিতেন। ইহার পর কালস্রোত অন্য দিকে ফিরিল, হিন্দুর কর্ম্মকাণ্ডে ভাটা পড়িল, তাই পরবর্ত্তী বংশধরগণ ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আকৃষ্ট

হইলেন। শিবরাম বিদ্যাবাগীশের পুত্র—রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় B. A. ইনি ফরাসী ভাষা ভাল জানিতেন।
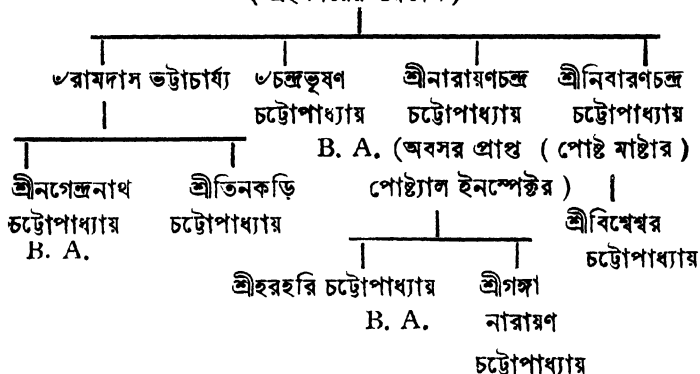
গুহ বংশ

পুরাণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের রাজকুলের অনেক নাম আছে। বিদেশীয়দের অত্যাচারে কত নামই লুপ্ত হইয়াছে! গুহ পরিবার যে রাজবংশ সম্ভূত এবং গুহের পূর্ব্বপুরুষেরা যে এককালে গঞ্জাম জেলা হইতে পশ্চিমে নর্ম্মদা তীরস্থ মাহিষ্মতী পর্য্যন্ত মধ্য ভারতের কটিবন্ধস্থিত প্রদেশ গুলির রাজা ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পুরাণ হইতে জানিতে পারা যায়। পার্ব্বতীনন্দন ময়ূর বাহন গুহকে (কার্ত্তিকেয়) চিরকুমার বলিয়া অনেক পণ্ডিতের ধারণা আছে, কিন্তু মহাভারত এবং মহাপুরাণের মতে আমাদের দশ জনের মতই বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করিয়াছিলেন। চক্রতীর্থে গুহবংশের কীর্ত্তির উল্লেখ পাওয়া যাইত। চক্রতীর্থ তাপ্তী ও পূর্ণানদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল। কিন্তু মগরা ষ্টেশনের নিকট লুপ্ত মাধবপুর গ্রামে চক্রতীর্থের স্থান বলিয়া এ অঞ্চলের লোকের বিশ্বাস ছিল এবং কুন্তীনদীতে লোকে ধর্ম্মার্থে স্নান করিত। বাণেশ্বর দেব ঘটক প্রাচীনকালে চাকি, গুহ বংশের অগ্রে সিংহবংশের বর্ণনা করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি লুপ্ত হইলেও, অনেকে এই কথাই বলিয়া থাকেন যে, সে সময়ে সিংহবংশের মধ্যে ধন জনের প্রাধান্য ঘটে।

"উদয়পুরের বা চিতোর মেওয়ার প্রদেশের রাজবংশ ব্যতিত অন্য কোন জাতির উপাধি গুহ নাই, সুতরাং অনায়াসে উপলব্ধি হইতেছে, এই গুহ উক্তবংশের পূর্ব্বপুরুষ গুহবংশ।"—কায়স্থ পুরাণ, ১ম ভাগ, ১২৫ পৃষ্ঠা।

কালক্রমে অর্থাৎ ১৩ পর্য্যায় সময় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ অধঃপাতে গেলে পুরন্দর খাঁ বসু কর্ত্তৃক সেয়াখালা গ্রামে নূতন সমাজ গঠন হয়। কন্যাগত কুল পুত্রগত কুলে পরিণত হয়। গুহবংশকে মৌলিক আখ্যা দিল। সিংহবংশ হইতে গোষ্ঠীপতিত্ব কাড়িয়া লইয়া কুলীনগণ গোষ্ঠীপতি হইতে লাগিলেন। এই সময় গুহবংশ বরাট হইতে পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া যান। মহানাদের শ্রেষ্ঠ গুহবংশীয়েরা বানারিপাড়া, কাঁচাবেলিয়া, টাকি, শ্রীপুর, জালানপুর, ইটনা, ভরকির, লক্ষণকাটি, উজিরপুর, গাভা, হানুয়া, ইদিলপুর প্রভৃতি অনেকানেক গ্রামে বসতি স্থাপন করেন।

"ভায়ে ভায়ে তারা সবে বিবাদ করিয়া
বিভিন্ন জেলায় গেল পৃথক হইয়া।"

বিরাট গুহ
|
নারায়ণ
|
থায়ু বা আয়ু — সূর্য্য — করায়ক — দশরথ — বৈধৃতি

দশরথ
|
রাম — লক্ষণ — ভরত — শত্রুঘ্ন — উদন — ব্রহ্মা

লক্ষণ
|
হাড় বা হাড়ো গুহ
(মহানাদে ছিলেন। মহানাদের হাড়যালা পল্লী তাঁহার নামে কি ?)

রুদ্র (বঙ্গজ সমাজ) — বামন (দক্ষিণ রাঢ় সমাজ) — কামদেব (দক্ষিণ রাঢ় সমাজ)

রুদ্র
|
চণ্ডেশ্বর — বায়ু — ভীম

চণ্ডেশ্বর
|
গোবিন্দ

ঘটক নন্দরাম মিত্র ভরত গুহকে বংশশূন্য বলিয়াছেন, কিন্তু ভরত গুহের বংশধরগণের পরিচয় পাওয়া যায়। অম্বুগুহ ও গোবর প্রভৃতি বিখ্যাত মল্লবীর এই বংশের বীরত্ব গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

বশিষ্ঠ গুহ বংশীয়রা লক্ষীকুল গ্রামে ছিলেন। এই বংশে রাজা প্রভুরাম রায় গুহ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

রামগোপাল গুহ রায়ের বংশ পাটপশার গ্রামে ছিলেন।

বীর নামা এক নৃপতি মহানাদের নিকটে রাজত্ব করিতেন, রামচরিতের টীকায় তাহার উল্লেখ আছে। রাম চরিতে এই বীরকে "গুণ" উপাধিতে বর্ণিত হইয়াছে। মহানাদের 'জামাই জাঙ্গালের' উত্তরাংশের কতক স্থান "বীরভূমি" বা "বীরমাটী" নামে কথিত হয়। স্থানটি ঠিক নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও এই প্রবাদে বীর নৃপতির অস্তিত্ব ও বাসস্থান স্মরণ করাইয়া দেয়।

নানা প্রাচীন পুরাণ ও বৌদ্ধ গ্রন্থে জানিতে পারা যায়, গুহ বংশ কলিঙ্গে আধিপত্য করিতেন। এই গুহবংশীয় গুহশিব বা শিবগুহের (৩৭০—৩৯০ খৃঃ) নাম বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। এক সময় গুহবংশ দন্তপুরী হারাইয়া উৎকলের গড়জাত আশ্রয় করেন। রাই-বনিয়া গড় এবং ময়ুরভঞ্জের নানাস্থানে বহুতর বিরাট কীর্ত্তি নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে। সেই বিরাট নৃপতির নাম লুপ্ত হওয়ায় মহানাদে তিনি বিরাট বা বীরাট গুহ নামে পরিচিত হন।

ক্ষীরধার নামক পার্শ্ববর্ত্তী এক নৃপতি আসিয়া গুহশিবের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। গুহশিবের আজ্ঞায় মহানাদ হইতে পবিত্র বুদ্ধদন্ত সিংহলে প্রেরিত হয়। গুহবংশের কোটদেশই এক্ষণে মহানাদের অন্তর্গত কোটালপাড়া গ্রাম হইবে। গুহেরা নাগ উপাসক ছিলেন। বিজয় সিংহ "নাগদিগকে" দমন করিয়াছিলেন। বালিয়া বা বালিচড়ার মাধব সিংহের সহিত গুহবংশের যুদ্ধ হয়।

১৮ পর্য্যায় রামেশ্বর গুহ রায় সাং মহানাদ, হাং পালপাড়া। ২০ পর্য্যায় সনাতন গুহ রায়, সমাজ মহানাদ, সাং সনাতনকাটী। এই গ্রাম সনাতন গুহ স্থাপন করেন। ২১ পর্য্যায় বাবুরাম গুহ রায় সমাজ মহানাদ—সাং বরাট, হাং জিথড়। ২১ পর্য্যায় রাধাকৃষ্ণ গুহরায় সাং বরাট, গঙ্গাধর মিত্রকে কন্যাদান করেন। ২১ পর্য্যায় আনন্দিরাম (নন্দরাম) গুহ মজুমদার সমাজ মহানাদ, হাং মহেশ্বর পাশা, ইনি ২১ পর্য্যায় প্রাণকৃষ্ণ মিত্রকে (টেকা সমাজের) কন্যাদান করেন, সাং মহেশ্বরপাশা। ২১ পর্য্যায় জানকীরাম গুহ সরকার, সাং মেছুয়াবাজার কলিকাতা, পূর্ব্ববাস মহানাদ বরাট গ্রাম। ২২ পর্য্যায় বিশ্বনাথ গুহরায় সাং বরাট। ইনি গুয়াতলির ঘনশ্যাম মিত্রকে কন্যাদান করেন। ২২ রামকান্ত গুহ মজুমদার সাং মহানাদ, হাং জশড়া। ২২ পর্য্যায় রামহরি গুহরায় সাং বরাট, গুয়াতলির শ্রীকান্ত মিত্রকে

কন্যাদান করেন। ২২ সদানন্দ গুহরায়, সমাজ মহানাদ বরাট। ২২ প্রভূরাম গুহ মজুমদার, সমাজ মহানাদ, সাং মহেশ্বর পাশা। ২২ পর্য্যায় দ্বীপচন্দ্র গুহরায়, সমাজ মহানাদ—বরাট, হাং সাং জিথড়। ঈশান ঘটকের কারিকায় দ্বীপচন্দ্রকে ২১ পর্য্যায় বলা হইয়াছে।

গুহ বংশ মহানাদ সমাজস্থ ছিলেন বলিয়া বিজয় কৃষ্ণ ঘটকের কায়স্থ কারিকায় লিখিত আছে। এই গুহ বংশে রামভদ্র গুহ রায় নবম পর্য্যায় কুল একজায়ী করিয়া গোষ্ঠীপতি ছিলেন।

১৫৮০ খৃষ্টাব্দে মহানাদের ভবানীদাস গুহরায় চৌধুরী সিংহবংশ ধ্বংস সাধনার্থে আকবরের সভাসদ প্রতাপাদিত্যের সহিত মিলিত হইয়া, বাঙ্গলার বার ভুঞার সর্ব্বনাশ সাধন করেন। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিশ্বাস ঘাতকতার পুরস্কার স্বরূপ এক বিস্তৃত জমিদারীর সত্ত্বাধিকারী হন। শুনা যায়—তিনি খুলনা জেলার শ্রীপুরে বাস করিয়াছিলেন।

তপন
বেকা
শঙ্কর
বিদগুহ
বিনগুহ
নরপতি
নীলাম্বর
রাঘব
বেদগর্ভ
গঙ্গাধর বা গদাধর গুহ
চণ্ডীদাস
রামকৃষ্ণ
মথুরা বল্লভ
(বিজয় কৃষ্ণ ঘটক কারিকা)
*
দশরথ গুহ
রাম
লক্ষ্মণ
*ভরত
শত্রুঘ্ন
সুদর্শন
ব্রহ্মানন্দ
শ্রীধর
শিবদাস
রামশঙ্কর
মহারাজ
শিবদাস
রামভদ্র
ষষ্ঠীবর
রামভদ্র
কাশীনাথ
ত্রিলোচন
অনিরুদ্ধ
সাং উত্তরডিহি
হরিনাথ
ত্রিলোচন
অনিরুদ্ধ
কৃত্তিবাস
পূর্ণানন্দ
কৃত্তিবাস

এই বংশাবলীতে নামের গোলমাল আছে।

* * * *

হাড়ো — রুদ্র

মুরারীধর
|
বীরভদ্র
|
দিবাকর
(মহানাদ সমাজে বাস করিতেন)
|
বশিষ্ঠ
|
পৃথ্বীধর
|
সৃষ্টিধর
|
কমলাকান্ত
|
ব্রহ্মানন্দ
|
রামশঙ্কর
|
শ্রীকর
|
গোপাল গুহ
সাং মহানাদ (১৫৫৩ খৃঃ)
|
শিব
|
হরিদাস
|
চণ্ডীদাস ১৭ পর্য্যায়
(মহানাদ হইতে মহেশ্বর পাশায় বাস করেন)
|
শ্রীমুখ রায় — রাজীব মজুমদার ১৮ — কমল লোচন সরকার

রাজীব মজুমদার ১৮
|
রামচন্দ্র ১৯
|
মহাদেব ২০ — কাশীশ্বর

পীতাম্বর
|
সাঞ্রী
|
তপন
|
শঙ্কর
|
অশ্বপতি
বা আশ গুহ
|
গজপতি
|
ছকড়ি
|
রামচন্দ্র নিয়োগী
|
ভবানন্দ গুহ মজুমদার
|
শ্রীহরি বা রাজা বিক্রমাদিত্য
(সপ্তগ্রাম)
|
মহারাজ প্রতাপাদিত্য
(যশোহর)
|
প্রতাপভীম
(ইঁহার বংশধরগণ সকলেই মুসলমান হইয়াছেন)

মহাদেব
|
নন্দরাম ২১
(মহানাদে প্রাপ্ত কারিকায় ইহার নাম
আনন্দিরাম গুহ মজুমদার লেখা আছে।)
|
১। প্রভুরাম
(মহানাদে প্রাপ্ত বংশতালিকায়
ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় :
২। শুকদেব
৩। রামদুলাল
৪। রামনিধি
৫। কৃষ্ণ চন্দ্র
৭। রাম লোচন
৬। ইন্দ্রনারায়ণ গুহ ২২
|
শম্ভুনাথ ২৩
|
পিয়ারী মোহন ২৪
|

কেদার নাথ মজুমদার ২৫ (কুচবিহারের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট)*	রায় সাহেব বঙ্কিমচন্দ্র মজুমদার (কালাহাণ্ডির ষ্টেট্ ইঞ্জিনিয়ার)*	শরচ্চন্দ্র মজুমদার M.A. (পাটনা কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল)*
শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর নলিনীনাথ মজুমদার ২৬ *	সুবোধচন্দ্র মজুমদার M. Sc,; B. L. উকিল	ডাঃ সুধীরচন্দ্র M. B. (মেডিকেল কলেজের হোম সার্জ্জন)
শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ২৭		

* ইঁহাদের বিস্তারিত জীবনী ও বংশাবলী "মহেশ্বর পাশা পরিচয়" নামক গ্রন্থে সবিশেষ লিখিত আছে।

গুহ বংশের তিনটি প্রবাদ প্রচলিত আছে,—

প্রথম প্রবাদ। যশোহরের বিদ্রোহী মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পৌত্র প্রতাপভীমের পুত্র কৃষ্ণ বল্লভ গুহ জাতিচ্যুত হন। তাঁহার পুত্রের নাম রুম্মা যবন।

দ্বিতীয় প্রবাদ। প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতা রাজা প্রতাপভীম তৎকালীন বাঙ্গলার নবাবের একজন পারিষদ ছিলেন।

তৃতীয় প্রবাদ। ১২৯৫ সনে চন্দ্রকান্ত গুহ মৌলিক প্রকাশ করেন, প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য ছিলেন। কিন্তু উদয়াদিত্য নিঃসন্তান বলিয়া তাঁহার পরবর্ত্তী কাহারও নাম নাই। অপরপক্ষে প্রতাপাদিত্যের এক ভ্রাতা ছিলেন। নাম—

১৫। ভূপতি
|
১৬। মুকুটমণি
|
১৭। রামেশ্বর
|
১৮। গৌরচরণ

মন্তব্যে আছে, ইঁহার বংশধরগণ ভূলুয়াতে বাস করেন। কেহ মুসলমান হইয়াছেন, এমন কথা বংশাবলীর বৃত্তান্তে নাই। এক্ষণে পাওয়া যাইতেছে !!

প্রতাপাদিত্যের চরিত্র বিশ্বাসঘাতকতা ও নৃশংসতায় পরিপূর্ণ থাকিলেও তিন স্বাধীনতাপ্রিয় বীরপুরুষ ছিলেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের রণ-পাণ্ডিত্যের কারণ—তাঁহার দিল্লীবাস ও সামরিক শিক্ষা।

মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পূর্ব্বপুরুষের জন্মভূমি মহানাদ। এই মহানাদ হইতেই গুহবংশ বঙ্গের নানাস্থানে গিয়া বাস করিয়াছেন। মহানাদের কায়স্থ পল্লী বেজপাড়ার উত্তরাংশে গুহবংশের বাসভবন ছিল এবং এই স্থানই বরাট নামে কথিত হইত। মহানাদে গুহবংশের

অস্তিত্ব লোপ হওয়ার সঙ্গেই বরাট নামও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মহানাদ বরাটের রামহরি গুহ রায় ৯ম পর্য্যায় কুল একজায়ী করেন।

মহানাদ সমাজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে রাঢ়দেশে কায়স্থদিগের ৮টি কুলস্থান ছিল,—হরিপুর, গৌণগ্রাম, বটগ্রাম, মঙ্গলকোট, বর্দ্ধমান, মধুগ্রাম, কঙ্কগ্রাম ও কর্ণসুবর্ণ। তন্মধ্যে মধুগ্রাম ও কঙ্কগ্রামে কাশ্যপ গোত্র গুহ এবং কর্ণসুবর্ণে গুহবংশ ছিলেন। কাশ্যপ গোত্র ব্যতীত গুহবংশের অন্য গোত্র দেখা যায় না।

মহানাদ—বরাটের ৯ম পর্য্যায়ের নন্দন গুহের পুত্র বিষ্ণুর বংশধর বানাইল গ্রামে গুহ খাসনবীশ উপাধিতে খ্যাত হন। নন্দনের পৌত্র ত্রিলোচন আলেয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ত্রিলোচনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র ১৫শ পর্য্যায়ের যাদবেন্দ্র গুহ রায় কাগমারী পরগণায় আধিপত্য স্থাপন করেন। যাদবেন্দ্রের ভ্রাতৃ-পৌত্র বিশ্বনাথ গুহ রায় চৌধুরী সন্তোষ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। এই বংশে বর্ত্তমান রাজনীতিক রাজা স্যর মন্মথনাথ রায় চৌধুরী রহিয়াছেন। এই বংশের ২০ পর্য্যায় রাজা গদাধর রায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ঘটক নারায়ণ বসু বলেন—

"বেদগর্ভ মুনি সঙ্গে, দশরথ গুহ বঙ্গে,
মিত্রবংশে মুখ্য তারাপতি।"
"গুহবংশ ভিট্টি গাঞী কাশ্যপেতে গোত্র।
নগরগ্রামী মিত্র তথা গোত্রে বিশ্বামিত্র॥
দে মাধব, দত্ত অনন্ত, ভৈরব বংশে কর।
সুলোচন সন্তান পালিত, শম্ভু সিংহবর॥
শ্রীরীতি সেনেতে স্থিতি, দর্পণেতে দাস।
আনন্দ সন্তান গুহ, রাঢ়ীর প্রকাশ॥"

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকারিকায় গুহবংশের কোন উল্লেখ নাই। দশরথ গুহ, গুহবংশের উজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ, কোট দেশের অধিপতি, বেদনিষ্ঠ ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। দশরথ গুহ বলিতেছেন—"আমি শ্রীহরি মণির দাস, অনেককাল বিপ্র সঙ্গে বাস"। শ্রীহরিই—শ্রীহর্ষ, নৈষধ চরিতের কবি।

১৫৭২ শকে ভবানী দাস গুহ মহানাদে বাস করিতেন। এই ভবানীদাস টাকী, শ্রীপুর এবং সৈয়দপুরের গুহ রায় চৌধুরীগণের পূর্ব্বপুরুষ।

গোরক্ষপুরের নিকট মহারাজা জয়াদিত্যের যে শাসনপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে বরাটের গুহরাজবংশ ও মহানাদের সিংহরাজবংশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

নবীনচন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন,—বিরাট গুহ তাম্রলিপ্ত নগরে বাস করিতেন। মতান্তরে কাশ্যপগোত্রীয় বিরাট গুহ মেদিনীপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। কোনও কারণে তিনিই বর্ত্তমান মহানাদের চন্দ্রকেতুর গড়ের পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীনগর গ্রামের পূর্ব্বাংশে "বরাট" নাম দিয়া একটী উদ্যানবাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার "রায়" উপাধি থাকায় মনে হয় মুসলমান রাজত্বকালেই তিনি জীবিত ছিলেন। ছিনা-আকনা—ডালিম্ব নিবাসী ৺হারাণ চন্দ্র গুহ রায় মজুমদার বলিতেন যে, তাঁহারা "গোহা" বংশীয় ছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তীকালে "গুহ" আখ্যা ধারণ করেন। হারাণ গুহ লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, কিন্তু তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তিনি কবিতা রচনা করিয়া গ্রামের অন্য লোক দ্বারা লিখাইয়া লইতেন। তাঁহার নানা বিষয়ক কবিতা এখনও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। একটু নমুনা দিব,—তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কবিতার কিয়দংশ—

"হারাণ ত গুহ বংশ
ক অক্ষর গোমাংস,
কথা বড় টান টান
যেন কত ধনবান,
কিন্তু কাঙাল মস্ত।"

ছিনা আকনা গ্রামে হারাণ গুহবংশের ভিটায় এক্ষণে ডাঃ হরিচরণ মিত্র ও সবজজ ৺নবীনকৃষ্ণ পালিত বংশীয়েরা দৌহিত্রসূত্রে বাস করিতেছেন। গুহবংশ এখানে আর কেহ নাই।

বিরাট গুহের বংশাবলী বর্ত্তমানকালে বিশ্বেশ্বর ঘোষ লিখিয়াছেন। কিন্তু সিংহবংশের রক্ষিত বংশ তালিকার সহিত মিল হয় না।

বিরাট গুহ ১
|
রঘুজী গুহ ২
|
শিবাজী গুহ ৩
|
রামজী গুহ ৪
|
দৌলৎ গুহ ৫
|
সহস্রবাহু গুহ ৬
|
জীৎমল্ল গুহ ৭
|
অজিৎরাম গুহ ৮
|
গোষ্ঠীপতি রামহরি গুহ রায় প্রভৃতি আট পুত্র। ৯
|
কন্যা—সরস্বতী

স্বামী—গোষ্ঠীপতি ১০ম পর্য্যায় কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ চৌধুরী।

কৃষ্ণপ্রসাদ সিংহের পুত্রেরা মহানাদে বাস করিতেন। কালক্রমে

ইহারা গুহবংশের সহিত ছিনা আকনার উত্তরদিকে লুপ্ত নন্দিনীপুর ও ডালিম্ব গ্রামদ্বয়ে বাস করিতে থাকেন। বোধ হয় মহানাদ গ্রামে এই সময় বহুব্যক্তির বাস থাকায় স্থান সঙ্কুলান হইত না। নন্দিনীপুর হইতেই কয়েক ঘর "গুহ" পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া যান। বরিশাল জেলায় কয়েক ঘর গুহ ও ঘোষবংশের বংশ-পরিচয়ে মহানাদ ও আকনা সমাজের গুহ, ঘোষ. সিংহবংশের পরিচয় পাইয়াছি।

রামকান্ত গুহ সরকার সাং সিংহটি, হুগলী জেলা। তৎপুত্র গঙ্গানারায়ণ ও অপর ৪ পুত্র ছিল। গঙ্গা নারায়ণের পুত্র শম্ভূচন্দ্র গুহ সরকার। ইহারাও মহানাদ বরাটের গুহবংশ।

মৌলিকদিগের বংশ পরিচয়ে সেন, সিংহ, দাস, গুহ, ভঞ্জ রাঢ়দেশে বিশেষরূপে পরিচিত। রামহরি গুহ রায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে কুলীন বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ১৩ পর্য্যার সময় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ ও তদীয় ভাগিনেয় পুরন্দর বসু কর্ত্তৃক সমাজ গ্রথিতকালে মৌলিকরূপে গণ্য হয়, তদবধি মৌলিক বলিয়া পরিচিত। অবশ্য বঙ্গজ কায়স্থসমাজে গুহবংশ অদ্যাপি কুলীনরূপে সম্মানিত।

এক সময় "গুহ" উপাধি বীরত্বের উপাধি বলিয়া গণ্য হইত বিরাট গুহ নিজে গোষ্ঠীপতি ছিলেন না, তিনি কুলীন ছিলেন। তাঁহার সময়ে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে সৌকালিন ঘোষ, গৌতম বসু. বিশ্বামিত্র মিত্র, কাশ্যপ গুহ, ভরদ্বাজ দাস—কুলীন বলিয়া পূজিত হইতেন। মৌদ্গল্য সিংহ—গোষ্ঠীপতি ছিলেন। কাশ্যপ দত্ত সমাজপতি ছিলেন। কৃষ্ণাত্রেয় গোত্রীয় দত্ত অর্দ্ধকুলীন বলিয়া পরিগণিত হইতেন।

বানারিপাড়া গ্রামে গুহ বিশ্বাসবংশীয় দেবেন্দ্রকুমার গুহ, হেমেন্দ্র গুহ, সুধেন্দ্র গুহ, হিরেন্দ্র গুহ, সত্যেন্দ্র গুহ আছেন। স্বর্গীয় রাজকুমার গুহের পুত্র অনন্ত গুহ। মহানাদ হইতে গুহ বংশীয়েরা পূর্ব্ববঙ্গে বসতি

বিস্তার করিয়া, তাঁহারা প্রথম ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে প্রচলন করেন। মহানাদ হইতে আগত গুহবংশকে বাঙ্গালেরা বা মৌলিকেরা কুলীন শ্রেণীতে পূজিত করেন।

"আকনাতে গেল ঘোষ মাহিনাতে বসু।
বরিশা রহিল মিত্র দুঃখ রহে কিছু॥
থানায় রহিল দত্ত প্রতাপ প্রচুর।
ব্রহ্মগ্রামে গেল সেন দে চিত্রপুর॥
সিংহপুরে রয় সিংহ হরিপুরে দাস।
মহানাদে গত চন্দ্র* গুহ বঙ্গবাস॥"

—(হারাণ গুহ ঘটক)

* মতান্তরে—"পানিহাটী গত চন্দ্র" আছে।

বাৎস্য গোত্রীয় সিংহবংশ।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে বাৎস্য গোত্রীয় সিংহ কুলীন বলিয়া গণ্য হয়। ইহাদের বংশাবলী দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের সময় হইতে পোষ্য পুত্ররূপে অনেক পুরুষ হইতে চলিয়া আসিতেছে। বাস্তবিক বংশ একবার নির্ব্বংশ হইয়া গেলে তাহার পূর্ব্ব ইতিহাস লুপ্তই হইয়া থাকে। সেইজন্য ইহাদের বংশাবলী আলোচনা করিবার সুবিধা নাই। উত্তর রাঢ়ীয় সমাজের বিষয় বাণেশ্বর দেবের ঢাকুরীতে আছে,—

"অথন কহিব সাধ্য কুলের বিস্তার।
সিংহের সমাজ স্থান করিব প্রচার॥
করাতিয়া, জামতৈল, কান্দি বাঁশবেড়িয়া।
এহি চারি স্থান আগে কহিব বর্ণিয়া॥
কান্দি আর বাঁশবেড়িয়া গৌণ অনুমানি।
করাতিয়া জামতৈল সমাজ বাখানি॥"

আনুলিয়া হইতে মধুকুল্য গোত্রীয় বনমালী সিংহ ময়ুরাক্ষী তীরে বন কাটিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। পরবর্ত্তীকালে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ রুদ্রকণ্ঠ সিংহ এই অঞ্চল বনমালী সিংহের বংশধরদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন, বোধ হয় সেই পাপে রুদ্রকণ্ঠের বংশ পোষ্যপুত্রে চলিয়া আসিতেছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব মহাশয় ঐ বনমালী সিংহকে বাৎস্য গোত্রীয় বলিয়াছেন।

করাটিয়া গ্রামটী অদ্যাপি ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহা বাজু সমাজের এলাকার অন্তর্ভুক্ত। ব্যাস সিংহ পাঠান রাজত্বের সময় উক্ত বঙ্গজ সমাজ পরিত্যাগ করিয়া রাঢ়ে বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে অথবা অন্য কোন কারণে বাস স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ব্যাস সিংহ বল্লাল সেন নামে কোন রাজার সংস্রবে ছিলেন না। বল্লাল সেন করাত দিয়া ব্যাস সিংহের

মাথা কাটেন নাই, ইহা কবির কল্পনা-প্রসূত মিথ্যা কথা। এই করাটিয়ার ব্যাস সিংহ রাঢ়দেশে উপনিবিষ্ট হইবার পর পাঠানদের নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ হইতে সাড়ে ছয় ঘর কায়স্থ সংগ্রহ করতঃ (কর্কট ও জটাধর নাগের ন্যায়) রাঢ়ে একটী 'সাড়ে সাত ঘরি পটী' সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং এই পটীই মূল রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ হইতে পৃথক হইয়া উত্তর রাঢ়ীয় সমাজ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বর্দ্ধমান জেলার আনুলিয়ায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ সিংহ প্রভৃতি বাৎস্য গোত্রীয় সিংহ আছেন। কিন্তু এই বর্দ্ধমান জেলার আনুলিয়া গ্রাম কোন্ সময় কাহার দ্বারা স্থাপিত হয়, সে সম্বন্ধে কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। বাৎস্য গোত্রীয় সিংহবংশ উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ। আনুলিয়ার সিংহ সমাজের সহিত ইঁহাদের কোন সম্বন্ধ ছিলনা। কলিকাতায় চারি শ্রেণীর কায়স্থরা এক্ষণে উপবীত ধারী হইয়া পরস্পর কায়স্থ সমাজে আদান প্রদান করিতেছেন বলিয়া, বাৎস্য গোত্রীয় সিংহদের আনুলের সিংহ বলিতে পারি না।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে একটি রীতি আছে,—তাঁহারা স্থানচ্যুত হইলে তাঁহাদের কৌলিন্যের আংশিক হানি হইয়া থাকে। বর্দ্ধমান জেলায় দাসকলগ্রামে শ্রীযুক্ত মণিলাল সিংহ আছেন, তিনি ধার্ম্মিক ব্যক্তি ; তাঁহার বাটীতে পূজা পার্ব্বণাদি যথারীতি হইয়া থাকে। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল কান্দি। এই দাসকলগ্রামে আসাতে তাঁহাদের চৌদ্দ আনা ভাব হইয়াছে, অর্থাৎ দুই আনা কৌলিন্য কমিয়া গিয়াছে। কান্দি মুরশিদাবাদ জেলায় আছে, বর্দ্ধমান জেলাতেও আছে।

নানা স্থানের বাৎস্য গোত্রীয় সিংহবংশের বংশাবলী প্রভৃতি আমার সংগৃহীত আছে, কিন্তু গ্রন্থের আকার অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় বলিয়া আপাততঃ সে সকল প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

অত্রি গোত্র সিংহবংশ।

১ম—চৌলার রাজা লক্ষণ সিংহের পৌত্র মধুসূদন সিংহ রায় চৌধুরী। ঐ বংশে ১৯ পর্য্যায় পরমানন্দ সিংহ রায় চৌধুরী, পুত্র—২০ মুরারীধর সিংহ রায় চৌধুরী, সাং বন্দিপুর। তৎপুত্র—জনার্দ্দন, পুত্র—কৃষ্ণদেব, কামদেব ও নরোত্তম। নরোত্তমের পুত্র—রাজকিশোর, রামকিশোর, রামচন্দ্র, রামনারায়ণ। রামকিশোরের পুত্র—হরচন্দ্র ও মদনমোহন। হরচন্দ্রের পুত্র—রামরতন ও শ্যামলচন্দ্র। শ্যামলচন্দ্রের পুত্র—বীরেশ্বর, পুত্র—জ্যোতীশচন্দ্র, পুত্র—হেমকান্তি, মনীন্দ্রনাথ, নিতাইচাঁদ। হেমকান্তির পুত্র—শীতলপ্রসাদ। রামনারায়ণের পুত্র—আনন্দচন্দ্র, পুত্র—অভয়চরণ, পুত্র—রাজেন্দ্রলাল, মহেন্দ্রনাথ, ভূতনাথ। রাজেন্দ্রের পুত্র—শৈলেন্দ্র, ভূপেন্দ্র, অমরেন্দ্র। মহেন্দ্রনাথের পুত্র—রবীন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ। ভূতনাথের পুত্র—রমেন্দ্রনাথ, সৌরেন্দ্রনাথ, মনীন্দ্রনাথ।

অন্যত্রে কথিত হইয়াছে—চৌলা সিংহসমাজভুক্ত কায়স্থ,—১ লক্ষণসিংহ, পুত্র—২ নাম অজ্ঞাত, পুত্র—৩ মধুসূদন সিংহ রায় চৌধুরী, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯,—১০ রাঘবরাম সিংহ রায় চৌধুরী, ১১ চণ্ডীদাস, পরমানন্দ, নন্দন, কমল। চণ্ডীদাসের পুত্র—১২ রামসিংহ ও রাজবল্লভ। রামসিংহের পুত্র—১৩ প্রসাদ, পুত্র—১৪ কিঙ্কর, নারায়ণ, কৃপানারায়ণ, দক্ষদেব, মঙ্গল, রাধাবল্লভ। কিঙ্করের পুত্র ১৫ কৃষ্ণদেব, কামদেব ও নরোত্তম। নরোত্তম সিংহ রায় চৌধুরী সাং খিসিমায় বাস করেন।

বন্দিপুর হইতে শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে তথাকার অত্রিগোত্রীয় সিংহবংশের একখানি হস্তলিখিত বংশাবলী

দিয়াছিলেন। আমি জামালপুর, চিত্রশালী, খিসিমা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রামসমূহের সিংহবংশাবলীর সহিত ঐ বংশাবলীর কিছুমাত্র মিল না দেখিয়া, এবং 'কায়স্থ সমাজ" ও "কায়স্থ পত্রিকায়" বারংবার উহার প্রতিবাদ হওয়ায়, এবং বিখ্যাত ঈশান ঘটক ও বিজয়রত্ন ঘটকের "কায়স্থ কারিকা"য় বন্দিপুরের সিংহবংশীয় ব্যক্তিগণের কুলীনদের সহিত আদান প্রদানের নামের তালিকার মিল হয় না দেখিয়া ঐ বংশলতা (রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী—সাহিত্য পরিষদের সভ্য যাহা পূর্ব্বে প্রকাশ করেন) পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহার অন্যতম কারণ এই যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে বংশতালিকা পাঠাইয়াছেন, তাহাতে দেখি যে,—লক্ষণসিংহের অধস্তন রাঘবরাম সিংহ ১১ পুরুষে রায় রাঞা উপাধি পাইয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। কিন্তু সকলেই জানেন যে, ঐ লক্ষণসিংহ হইতে ঐ ১১ পুরুষ পর্য্যন্ত অত্রিগোত্রীয় সিংহবংশ কায়স্থ সমাজে আদান প্রদান করিতেছিলেন এবং কায়স্থকারিকাগুলিতে তাঁহাদের নাম ও দান গ্রহণের বিবরণ আছে। আর এক কথা এই যে, ঐ বংশাবলীর নামের সহিত টডের রাজস্থানের চিতোরের রাণাবংশের নামের সহিত হুবহু মিলিয়া যায়। আরও বিশেষ কথা এই যে, চিতোরের রাণাবংশের রাজস্থানের বর্ণিত বংশাবলীর সহিত, কিছুদিন আগে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের লিখিত নামেরও মিল হয় না বলিয়াই, এই বংশাবলী কাল্পনিক ছাড়া আর কি মনে করিব? ইহারা যে বহুকাল হইতে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে আছেন এবং ইহারা যে "হাম্ভি কায়েত" নহেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

এখন বন্দিপুরের বর্ত্তমান সিংহ রায় চৌধুরী বংশের পুরোহিত শ্রীযুক্ত কালিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, এই লক্ষণসিংহ চিতোরের কি চৌলার?

গোঁড়পাড়া গ্রামে—ধরণীধর সিংহ, পুত্র—দুর্গাদাস, পুত্র—ভুবনেশ্বর ও কিশোরীলাল। ভুবনেশ্বরের পুত্র বিনোদ ও বঙ্কবিহারী। বিনোদের পুত্র—অতুলচন্দ্র। বঙ্কবিহারীর পুত্র—চন্দ্রমাধব, সূর্য্যমাধব, ও নীলমাধব সিংহ। গঙ্গা-চিত্রশালী গ্রামে অত্রিগোত্রীয় সিংহবংশ বাস করেন। অত্রিগোত্রীয় সিংহ জিরেট বলাগড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানেও আছেন। ইহারা প্রায় ২৭।২৮ পুরুষ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে বর্ত্তমান আছেন।

———

ভরদ্বাজগোত্রীয় দাসবংশ।

ভুরশুট পরগণার রাজা পাণ্ডুদাস বৌদ্ধ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার বংশ মহানাদ নগরে কয়েক পুরুষ বাস করিবার পর, বরাটের গুহবংশের সহিত পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া যান। তাঁহাদের একটী শাখা সুসঙ্গ দুর্গাপুরে বাস করিতেন। ঐ বংশে—
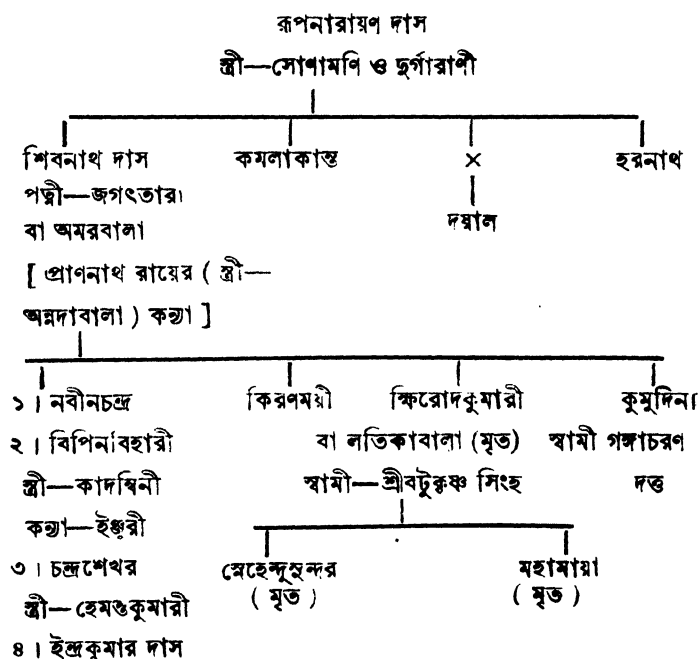
অযোধ্যার সিংহবংশ।

ভূরশুট পরগণার অন্তর্গত অযোধ্যাগ্রামে মৌদ্গল্য গোত্র সিংহবংশ মহানাদ অথবা আম্লুলিয়া কায়েত পাড়া হইতে আসিয়া বাস করেন। অযোধ্যাগ্রামে চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে এই সিংহবংশের অতুল কীর্ত্তির নিদর্শন বর্ত্তমান থাকিয়া পূর্ব্বগৌরবের স্মৃতি স্মরণ করাইয়া দেয়। "হাওড়া ও হুগলীর ইতিহাস" লিখিতে গিয়া ঐতিহাসিকগণ ইঁহাদের কথা একেবারেই উল্লেখ করেন নাই। বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত একখানি গল্প পুস্তকে এই সিংহবংশীয় "রায়বাঘিনী'র গল্পকে এক ব্রাহ্মণ রাজবংশের বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তীকালে এই গল্প পুস্তকখানি তাহারই সাক্ষ্য দান করিবে!
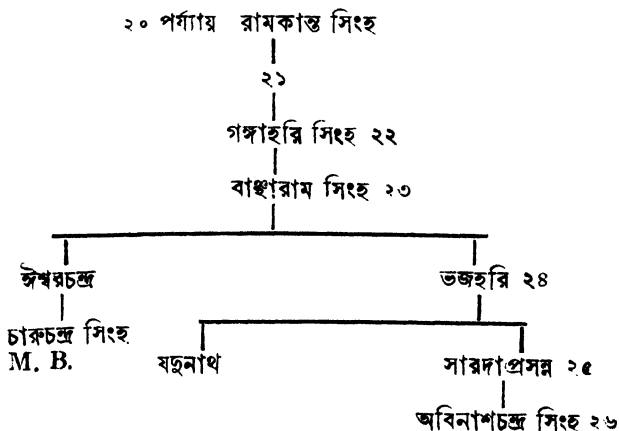
বসুয়ার সিংহবংশ।

৺ মথুরানাথ সিংহ চৌধুরী বর্দ্ধমান, বিষ্ণুপুর ও কৃষ্ণনগরের রাজাদের বিরুদ্ধাচরণ হইতে নিজ জমিদারী রক্ষা করিতেন। তাঁহার মত প্রতাপশালী জমিদার সে সময় আর কেহ ছিল না। মথুরানাথ সিংহের পুত্র গোপাল চন্দ্র সিংহ, তাঁহারা কয় ভ্রাতায় ১৮ পর্য্যায় কুল একজায়ী করেন। বোধ হয় গঙ্গার ভাঙ্গনে প্রাচীন আন্থলিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে ইহারা বসুয়ায় বাস করিয়া থাকিবেন (৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। গোপাল চন্দ্র সিংহ চৌধুরীর পুত্র রামেশ্বর, রামচন্দ্র (ঈশান ঘটকের কারিকায় রামভদ্র), রাধাকান্ত (মতান্তরে রাধাকৃষ্ণ) ও গোপীকান্ত সিংহ চতুর্দ্ধুরীণ্। রামেশ্বরের পুত্র দৈবকী নন্দন, রামরাম ও গঙ্গারাম।

রামচন্দ্র সিংহের পুত্র সভারাম (ঈশান ঘটকের কারিকায় শোভারাম) ও গদাধর। সভারামের পুত্র নিত্যানন্দ, কৃষ্ণানন্দ, জগন্নাথ। নিত্যানন্দের পুত্র—পঞ্চানন, ভবানীচরণ, গঙ্গাগোবিন্দ। জগন্নাথের পুত্র পরমানন্দ। ভবানীচরণের পুত্র প্রিয়গোপাল ও গৌরগোপাল (সাং বসুয়া হাং দশঘরা) গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র প্রাণ গোপাল প্রভৃতি হাং সাং দশঘরা। পরমানন্দের পুত্র হরিমোহন সিংহ (নিঃসন্তান)। গদাধরের পুত্র কমলাকান্ত সিংহ, পুত্র—যাদবেন্দ্র ও চৈতন্য চরণ। চৈতন্য চরণের পুত্র ক্ষেত্রমোহন, পুত্র—বিনোদ বিহারী ও লাল গোপাল (উভয় ভ্রাতাই নিঃসন্তান)। যাদবেন্দ্রের পুত্র মদন মোহন (নিঃ), জগৎ মোহন ও ভুবন মোহন (নিঃ)। জগৎ মোহনের পুত্র—ব্রজনাথ (নিঃ), সীতানাথ, রূপচাঁদ ও সূর্য্যকুমার সিংহ। রূপচাঁদের কন্যা থাকমণির বিবাহ কাঁকড়াকুলি গ্রামে মিত্রবংশে হয়। সীতানাথের পুত্র প্রসন্নকুমার, পূর্ণচন্দ্র, নারায়ণ

চন্দ্র। প্রসন্নকুমারের পুত্র চরণ দাস, তুলসীদাস, কৃষ্ণদাস। তুলসী দাসের পুত্র দাশরথী। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র অনাদিকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ, বিজয়-কৃষ্ণ (B. A.), অমর কৃষ্ণ (B. Sc., M. B.), সুধীর কৃষ্ণ (B. Sc.)। অনাদিকৃষ্ণের পুত্র নির্ম্মলকৃষ্ণ, বিমলকৃষ্ণ। নারায়ণ চন্দ্রের পুত্র হরিদাস সিংহ (S. A. S.), পুত্র—তারাদাস সিংহ।

রাধাকান্ত সিংহের (১৯ পর্য্যায়) পুত্র—কৃষ্ণদেব ও কামদেব। কৃষ্ণদেবের পুত্র রামকান্ত। কামদেবের পুত্র রাজনারায়ণ ও দর্পনারায়ণ, সাং খেজুরদহ, উভয়েই নিঃসন্তান।

আন্দুলিয়ার সিংহবংশই দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের প্রথম গোষ্ঠীপতি। তৎপরে ১৮ পর্য্যায় পর্য্যন্ত গোষ্ঠীপতিত্ব মিত্র, পাল, দত্ত, রায়, গুহ, দাস ও চন্দননগর গড়ের মুনিরাম সেনের পুত্র ভায়া কিঙ্কর সেনের হস্তান্তরিত হয়। ঐ কিঙ্কর সেনের কন্যা ইচ্ছাময়ীর পাণিগ্রহণ করিয়া রাজা গোপীকান্ত সিংহ চৌধুরী ১৯ পর্য্যায়ের কুল একজায়ী করিয়া মেলকাটী গোষ্ঠীপতিত্বের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি গোপীনগর ইছাপুর গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। বসুয়ার সিংহবংশ বিভিন্ন সময়ে ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩ পর্য্যায় কুল একজায়ী করিয়াছিলেন; গোপীকান্তের পুত্র হরি সিংহ, খানাকুল কৃষ্ণ নগরের মুখ্য কুলীন কিঙ্কর বসু সর্ব্বাধিকারীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া যথাক্রমে ২০ ও ২১ পর্য্যায়ের কুল একজায়ী করিয়া যশস্বী হন; তাঁহার বংশে শোভা-বাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বিবাহ (স্বগোত্রে) করিয়া * গোষ্ঠীপতি হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন (প্রথম খণ্ড ৭৬, ২১৪, ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

---

* শূদ্রের স্বগোত্রে বিবাহ হয়। কায়স্থ যে শূদ্র জাতি, রাজা রাধাকান্ত দেবের এই বিবাহই তাহা সপ্রমাণ করিয়া দেয়।
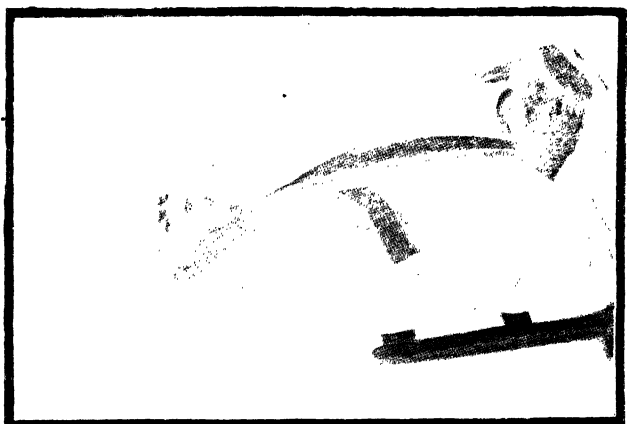
১৯ পর্য্যায় গোপীকান্ত সিংহ চৌধুরীর (চতুর্দ্ধুরীণ) পুত্র—হরি নারায়ণ, শিবনারায়ণ, নর নারায়ণ, ইন্দ্র নারায়ণ ও প্রতাপ নারায়ণ। হরি নারায়ণের পুত্র—রামকান্ত, রামলোচন, নিমাই চরণ ওরফে উমাকান্ত। রামকান্তের পুত্র—রাম নারারণ, জগমোহন ও রূপনারায়ণ। নিমাই চরণের পুত্র নীলমণি (নিঃ), রতনমণি ও রামকৃষ্ণ বা রামকানাই। ইহাদিগের সন্তানাদির উল্লেখ নাই। শিব নারায়ণের পুত্র দেবনারায়ণ, পুত্র—কৃষ্ণ মোহন ও বৃন্দাবন সিংহ (মুন্সী)। ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র ঠাকুরদাস, পুত্র—রাঘবরাম, নকুড়, রামধন। রাঘব রামের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ। ইহার কন্যা ছিল। নকুড়ের পুত্র তারিণী (নিঃ) ও কালীচরণ। কালীচরণের পুত্র—পরেশ, পূর্ণচন্দ্র, এককড়ি। পরেশের পুত্র নুটবিহারী। এককড়ির পুত্র—তারক, শঙ্কর লাল। রামধনের পুত্র তিনকড়ি (নিঃ) ও বামাচরণ। [মতান্তরে হরিনারায়ণের পুত্র রামকান্ত, রামকৃষ্ণ ও রামলোচন (নিঃ)। রামকৃষ্ণের পুত্র রামরতন ও রামকানাই (নিঃ)। রামরতনের পুত্র মহেশচন্দ্র (নিঃ] জগমোহনের পুত্র কিশোরী মোহন সাং সুগন্ধা গ্রাম। কিশোরী মোহনের পুত্র ছকুরাম, পুত্র—আশুতোষ, ব্রজেন্দ্র নাথ ও পরেশ নাথ। রূপ-নারায়ণের পুত্র হলধর, পুত্র—কৃষ্ণ গোবিন্দ (নিঃ), মান গোবিন্দ ও কাঙ্গালীচরণ। মানগোবিন্দের পুত্র মন্মথ নাথ ও ফকীর সিংহ। কাঙ্গালীচরণের পুত্র ভোলানাথ ও বিশ্বনাথ। রাম নারায়ণের পুত্র শ্রীনাথ ও রাম গোপাল সাং রায়না-বৰ্দ্ধমান। শ্রীনাথের পুত্র গোষ্ঠ সিংহ। রামগোপালের পুত্র অমৃত সিংহ।

২০ পর্য্যায় দৈবকীনন্দনের পুত্র রঘুনন্দন, পুত্র—নন্দনন্দন, রামলোচন ও হরেকৃষ্ণ। নন্দনন্দনের পুত্র নীলমণি ও রতনমণি (নিঃ)। রাম-লোচনের পুত্র রামমোহন (নিঃ), কাশীনাথ (নিঃ), দুর্গাপ্রসাদ ও ভবানীচরণ। দুর্গাপ্রসাদের পুত্র বিপিন বিহারী, রাখাল কিশোর

(নিঃ), নবীনচন্দ্র (নিঃ), নারায়ণ চন্দ্র। বিপিনের পুত্র নৃত্য-গোপাল। নারায়ণের পুত্র ভূপাল। ভূপালের পুত্র—পাঁচু, ছাঁচু, নাচু ও হাঁচু। ভবানীচরণের পুত্র বিনোদ, পুত্র—কিরণ, পুত্র—কালীকৃষ্ণ ও শিশির কুমার (নিঃ)।

২০ পর্য্যায় রামরাম সিংহের পুত্র উদয় নারায়ণ ও কৃষ্ণচন্দ্র। উদয় নারায়ণের পুত্র মাধবচন্দ্র ও কিশোর চন্দ্র। মাধবের পুত্র রাধাবল্লভ, পুত্র—বনওয়ারীলাল ও রায় বিনোদ বিহারী (নিঃ)। বনওয়ারীর পুত্র অধর চন্দ্র, পুত্র—হরিশৈল, পুত্র—গৌরহরি। কিশোরের পুত্র—রাজবল্লভ মাখম লাল ও কুঞ্জ বিহারী। রাজবল্লভের পুত্র—নন্দলাল (নিঃ), যশোদালাল, নিরদ লাল (নিঃ)। যশোদালালের পুত্র এককড়ি, পুত্র—কালিদাস (নিঃ)। মাখম লালের পুত্র—নদীয়া (নিঃ) ও ঘোঁতা (নিঃ)। কুঞ্জবিহারীর পুত্র রাখাল দাস (নিঃ) ও তুলসী দাস। তুলসীদাসের পুত্র সুশীল কুমার, শরৎ কুমার ও সুবোধ কুমার। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র আনন্দ মোহন, তাঁহার দুই কন্যা—গোপী-কিশোরী ও প্রাণ কিশোরী।

২০ পর্য্যায় গঙ্গারামের পুত্র মনোহর, শ্যাম সিংহ ও ব্রজ মোহন সিংহ (সাং ভেড়চি)। মনোহরের পুত্র রায় লাল ও রায় লালা গৌর-হরি সিংহ,—ইনি কোম্পানীর ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সময় সাত চাকলার দেওয়ান ছিলেন। ইঁহার শ্রীহট্ট পরগণা ও বীরভূম জেলার আট আনীর জমিদারী ছিল। ইঁহার অধিকৃত ভূভাগের আয় বার্ষিক প্রায় নয়লক্ষ টাকা হইয়াছিল। হেষ্টিংস সাহেব ইঁহাকে এক ছড়া গজমতি হার উপহার দিয়াছিলেন। তৎপুত্র রায় রাধা গোবিন্দ সিংহ বিপুল সম্পত্তির মালিক হইয়া জমিদারী রক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিয়া কর্ম্মচারী এবং সুদক্ষ জামাতা মুখ্য কুলীন খেলাৎ ঘোষের তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বিশ্বাস ঘাতক কর্ম্মচারী সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া দেয়।

উত্তর পাড়া—বসুয়া গ্রামের ৺ উমেশচন্দ্র সিংহের পুত্র পাঁচুগোপাল সিংহ কলিকাতা নারিকেল ডাঙ্গায় বাস করেন এবং বসুয়ায় রামেশ্বর বাটীর নিকটে ৺ আশুতোষ সিংহ বাস করিতেন, তাঁহার পুত্র অনিল-কৃষ্ণ সিংহ। ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই।

চন্দননগরের নন্দলাল ঘোষ দ্বিতীয় পক্ষে অধর চন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠা কন্যা হরিদাসীর পাণিগ্রহণ করেন। নন্দলাল ঘোষের মধ্যম পুত্র (প্রথম পক্ষের) কার্ত্তিক চন্দ্রের পুত্র শ্যাম ঘোষ বিবাহ করেন, রায় নিত্যানন্দ সিংহের পৌত্রীকে।

ঘটক বিজয়কৃষ্ণ ও ঘটক ঈশান চন্দ্রের কায়স্থ কারিকায় বসুয়ার সিংহবংশীয় সন্তানেরা কুলীনদের সহিত পর্য্যা মিলাইয়া আন্তরসে কন্যা দান করেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

বসুয়ার সিংহ বংশের প্রাচীন বাদশাহী সনন্দ প্রভৃতি বর্গীর হাঙ্গামার সময় মুকুট রায়ের বিদ্রোহে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অদ্যাপি ইঁহাদের রক্ষিত বহু পুরাতন কাগজ পত্রাদিতে দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বের ঐতিহাসিক কাহিনী পাওয়া গিয়াছে। বসুয়ার সিংহবংশের পরিখা বেষ্টিত পুরাতন একশত বিঘার বাস্তু ভিটা বসুয়ার (উজানী বা রুদ্রাণী) পূর্ব্বদিকে বর্ত্তমান আছে। তথায় বহু ভগ্ন ও অভগ্ন প্রস্তর মূর্ত্তি পতিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজা রামচন্দ্র গুহের বংশধারা।

ভরত গুহের অধস্তন ৮ম পুরুষ রামচন্দ্র গুহকে রামচন্দ্র নিয়োগী নামেও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় (৩৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এক্ষণে ইঁহার বংশধরগণের অবস্থা হীন হইলেও বাঙ্গালার অন্যতম প্রাচীন স্বাধীন রাজবংশের সন্তান বলিয়া দেশবাসীর নিকটে রাজা নামেই অভিহিত হইয়া থাকেন এবং ইঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের সমাজপতি বলিয়া খ্যাত আছেন। এই রাজা রামচন্দ্র গুহের বংশধর রাজা ৺নগেন্দ্রনাথ রায় B. L. মহাশয় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজি ভাষায় "প্রতাপাদিত্য" নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং বিগত ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র (রাজা) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় মহাশয় ঐ পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে নিম্নলিখিত বংশাবলী আছে,—

রাজা রামচন্দ্র গুহ, পুত্র—ভবানন্দ মজুমদার, গুণানন্দ ও শিবানন্দ (কানুন গো)। ভবানন্দের পুত্র—শ্রীহরি (মহারাজা বিক্রমাদিত্য), তৎপুত্র—মহারাজা প্রতাপাদিত্য, পুত্র—উদয়াদিত্য ও সংগ্রামাদিত্য। গুণানন্দ মজুমদারের পুত্র—জানকীবল্লভ বা মহারাজা বসন্ত রায়। তৎপুত্র—গোবিন্দ রায় (প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত), রঘুদেব রায় বা কচু রায় (মহারাজা যশোরজিৎ) নির্ব্বংশ ও রাজা চন্দ্রনাথ রায় (কচুরায়ের উত্তরাধিকারী)। রাজা চন্দ্রনাথের পুত্র—রাজা রাজারাম রায়, পুত্র—রাজা নীলকান্ত রায় ও রাজা শ্যামসুন্দর রায় (প্রথম মুনসবদার)। রাজা নীলকান্তের পুত্র—রাজা মুকুন্দদেব, পুত্র—রাজা কৃষ্ণদেব, পুত্র রাজা গোবিন্দ দেব, পোষ্য পুত্র—রাজা নৃসিংহ দেব, পোষ্য পুত্র—রাজা বৈকুণ্ঠ দেব, পোষ্য পুত্র—রাজা রাজেন্দ্রনাথ, পুত্র—গিরিন্দ্রনাথ এবং তৎ ভ্রাতা।

রাজা শ্যামসুন্দর রায়ের পুত্র—রাজা কৃষ্ণকিঙ্কর রায় ও রাজা নন্দকিশোর রায় (মুনসবদার)। রাজা কৃষ্ণকিঙ্কর রায়ের পুত্র—রাজা হরেকৃষ্ণ রায় ও রাজা প্রাণকৃষ্ণ রায়। রাজা হরেকৃষ্ণ রায়ের পুত্র—রাজা বৈদ্যনাথ রায়, পুত্র—রাজা ক্ষিতিনাথ রায়, পুত্র—রাজা নগেন্দ্রনাথ রায় (B. L.), পুত্র—রাজা নৃপেন্দ্রনাথ রায় ও রাজা রবীন্দ্রনাথ রায়। রাজা নৃপেন্দ্রনাথের পুত্র—বিনয়েন্দ্র ও সরোজেন্দ্র। রাজা রবীন্দ্রনাথের পুত্র—সত্যেন্দ্রাদিত্য ও রথীন্দ্রাদিত্য এবং ভ্রাতা।

রাজা প্রাণকৃষ্ণ রায়ের পুত্র—রাজা কালীনাথ রায় ও ভ্রাতা। রাজা কালীনাথের পুত্র—রাজা যোগেন্দ্রনাথ রায়।

রাজা নন্দকিশোর রায়ের পুত্র—রাজা রাধানাথ রায়, পুত্র—রাজা রামনারায়ণ রায়, পুত্র—রাজা জয়নারায়ণ রায়, পুত্র—রাজা অন্নদা তনয় রায়, পুত্র—রাজা যতীন্দ্রনাথ রায় এবং ভ্রাতাগণ।

ভবানন্দ মজুমদার

ভবানন্দ মজুমদার হুগলীর কানুনগোর কার্য্য করিয়া মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে তাঁহার নাম দুর্গাদাস ও 'সমাদ্দার' উপাধি ছিল (নদীয়া কাহিনী দ্রষ্টব্য)। ইনি আকবরের সমসাময়িক ব্যক্তি। স্বীয় বুদ্ধি কৌশলে তিনি অনেকগুলি পরগণা জায়গীর পাইয়া কেশরকুলি নামক প্রাচীন নগরের একাংশে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া পরে গড় কৃষ্ণনগর বা গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর নাম পরিবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমান কালে উহা গড় কৃষ্ণনগর নামে কথিত হইতেছে। ইনি বর্ত্তমান নদীয়াধিপতির পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। এই ভবানন্দ মজুমদারের সহিত ঐতিহাসিক বিচারে ধূমঘাটের জমিদার 'মহারাজা প্রতাপাদিত্য গুহের' কোন সম্বন্ধ ছিল না।

প্রতাপাদিত্যের পিতামহ আর এক ভবানন্দ মজুমদার হুগলীর কানুনগোইতে কার্য্য করিয়া মজুমদার (শুদ্ধ ভাষায় মজ্মুদার ?)

উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কোন প্রাচীন পুস্তকে আমরা কিছুই পাই না। তথাপি তাঁহার নামে বাঙ্গলার অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি উৎসর্গ করিয়া ইতিহাস গ্রন্থ প্রচারিত হইতেছে।

বংশাবলী সংগ্রহ করিয়া তৃতীয় ভবানন্দ মজুমদারকে পাইতেছি। কমলপুর গ্রামের সিংহ মজুমদার বংশের বংশাবলীতে পাইয়াছি যে,—সুরসিংহ বা সুষেণ সিংহের পুত্র দনুজ রায় কমলপুরের স্বাধীন রাজা ছিলেন এবং গঙ্গারাম সিংহ সেই সময় সুবর্ণগ্রামে ছিলেন। ১২৮২ খৃষ্টাব্দে গঙ্গারাম সিংহ কমলপুর আক্রমণ করিয়া দনুজরায় ও মুঘিউদ্দীন তুগ্রলকে আচম্বিতা-ফুলবাড়ীতে অবরুদ্ধ ও নিহত করেন। সুলতান বুলবন এই ঘটনার সময় জাজনগরে (ত্রিপুরা) ছিলেন। কথিত আছে, পোড়াদহ গ্রামে ভবানন্দ সিংহ মজুমদার আত্মীয় দনুজরায়ের বিয়োগে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। আন্দুলিয়ার নিকটে "পোড়াদহ" নামক স্থানে তাঁহার একখানি অস্থি প্রোথিত হয়। যুগলকিশোর ঘোষ ঘটক তাঁহাকে 'পোড়া রাজা' বলিয়াছেন। এই ভবানন্দ মজুমদারের বংশ এক্ষণে কমলপুর, মাঝের গ্রাম, আকনা-দেবানন্দপুর, আমনপুর, জয়ন্তী প্রভৃতি গ্রামে বর্ত্তমান আছেন।

শুনা যায় যে, নৈহাটীর ঘোষ মজুমদার বংশের পূর্ব্বপুরুষও আর এক ভবানন্দ ঘোষ মজুমদার ছিলেন এবং তিনি জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময় ধূমঘাটের প্রতাপাদিত্য গুহের বিরুদ্ধে মোগল শাসনকর্ত্তার নিকট আবেদন করেন।

আমাদের দেশে যদি প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার লোক থাকিত, তাহা হইলে এক জনের ইতিহাস অন্যের উপর চাপাইয়া 'ইতিহাসের লাউঘণ্ট' লিখিত হইত না।

বংশাবলী সংগ্রহ করিতে পারিলে, আরও অনেকগুলি ভবানন্দ মজুমদারের হয়ত সন্ধান পাওয়া যাইবে। কিন্তু 'মহানাদ'এর অরণ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—"হস্তক্ষেপ করিবে কে ?"

রাজা মাধব খাঁ সিংহের শাখা।

(শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ সিংহের বংশাবলী)

মৌদ্গল্য গোত্র ১৫ পর্য্যায় রাজা মাধব খা সিংহের পুত্র—রাজা শিবানন্দ সিংহ, সাং বসুয়া ; ইনি বৈষ্ণব বা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। শিবানন্দের পুত্র—জয়রাম, গোবিন্দ, বিনোদ, মথুরানাথ। জয়রাম সিংহ বেলুন গ্রামে বাস করেন। তৎপুত্র-হরানন্দ, পুত্র—শিবচন্দ্র, পুত্র—দেবীনাথ ও হরিনাথ। দেবীনাথের পুত্র রামনাথ, পুত্র—রাধাচরণ বেলুন হইতে মহানাদে আসেন। তৎপুত্র বেচারাম ও নিধিরাম। নিধিরামের প্রপৌত্র ক্ষেত্রমোহন সিংহ জয়পুর-বাঘাটি গ্রামে বিবাহ করিয়া মহানাদ হইতে যাইয়া তথায় বাস করেন। তৎপুত্র কৃষ্ণকালী সিংহ নিঃসন্তান। ইনি বিখ্যাত বিধু ডাকাতের সহকর্ম্মী ছিলেন।

বেচারাম সিংহের বংশধরেরা কলিকাতাবাসী হইয়াছেন। বেচারামের পুত্র—জগৎবল্লভ, পুত্র—ঠাকুরদাস, পুত্র—দুর্গাদাস, পুত্র—অন্নদাপ্রসাদ সিংহ, তৎপুত্র—নন্দলাল, হীরালাল, চুনিলাল, নৃত্যলাল, দেবীলাল, বীরলাল, রামলাল, কালীলাল ও হরিলাল। হরিলালের পুত্র—প্রহ্লাদচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, বলাইচাঁদ, খোকা ও কন্যা সরযুবালা। হীরালাল সিংহের পুত্র—ধীরেন্দ্র নাথ সিংহ, পুত্র—দ্বিজেন্দ্র, দীনেন্দ্র, দ্বীপেন্দ্র, দিকেন্দ্র, দিব্যেন্দ্র ও কন্যা পুষ্পরাণী।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ সিংহ স্বোপার্জ্জিত ধনে ধনবান। শুনা যায়, তিনি মুক্ত হস্তে দরিদ্রকে দান করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থে তাঁহার দানের একটু চিহ্ন আছে। শ্রীযুক্ত বটুকৃষ্ণ সিংহ আমাকে যে আনুলিয়ায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনের ব্লক দিয়াছেন, যাহা পরবর্ত্তী "প্রতিবাদ ও সমর্থন" প্রবন্ধে মুদ্রিত হইয়াছে, সেই ব্লক ধীরেন্দ্র বাবু প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

রাজা রামসুন্দর দত্ত।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় কায়স্থ রাজা রামসুন্দর দত্ত মহানাদে রাজত্ব করিতেন। তিনি সাহ আলম কর্ত্তৃক রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইবে। তৎপুত্র—মনোহর দত্ত, পুত্র—কালাচাঁদ দত্ত, পুত্র—পঞ্চানন দত্ত। এই পঞ্চানন দত্তের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির (১ম খণ্ডে প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে) ও একটি দোলমঞ্চ মহানাদে ভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। পঞ্চাননের পুত্র—গোবর্দ্ধন, মতিলাল, তিনকড়ি, মহেশচন্দ্র, যদুনাথ, বিপিনচন্দ্র। পিতার মৃত্যুর পর ইঁহারা কলিকাতা শিয়ালদহের পূর্ব্বদিকে বড় দীঘির তীরে মাতামহালয়ে (শিবচন্দ্র বসুর বাটীতে) বাস করেন। অন্যান্য জ্ঞাতিগণ মহানাদে ছিলেন। গোবর্দ্ধনের পুত্র—কানাইলাল ও নিত্যলাল। কানাইলালের পুত্র—গদাধর, অমূল্য, পূর্ণচন্দ্র, সন্তোষ, প্রকাশ, প্রভাত। গদাধরের পুত্র—প্রফুল্ল, দারহরি, বীরেন, শৈল, বাদল। নিত্যলালের পুত্র—ফণীন্দ্র, সুধীর, জিতেন্দ্র। ফণীন্দ্রের পুত্র—সমরেন্দ্র ও কন্যা শৈলবালা। তিনকড়ি দত্তের পুত্র—চারুচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র। চারুচন্দ্রের স্ত্রী—সুশীলাবালা (বিহারীলাল মিত্রের কন্যা, ১৯ নাথের বাগান, আহিরীটোলা) পুত্র—মণীন্দ্রনাথ দত্ত (স্ত্রী—শরৎনলিনী) পুত্র—অজিৎকুমার ও পাঁচটি কন্যা। মহেশচন্দ্রের পুত্র—রাধাকান্ত পুত্র—শম্ভুনাথ দত্ত। মণীন্দ্র বাবুর নিকটে সাহ আলমের প্রদত্ত রাজা রামসুন্দরের সনন্দ ও উহার খাপ এবং একটি শীলমোহর ছিল। এই বংশের দেবেন্দ্রনাথ দত্ত নামক একব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়, তিনি অন্যত্র বাস করেন।
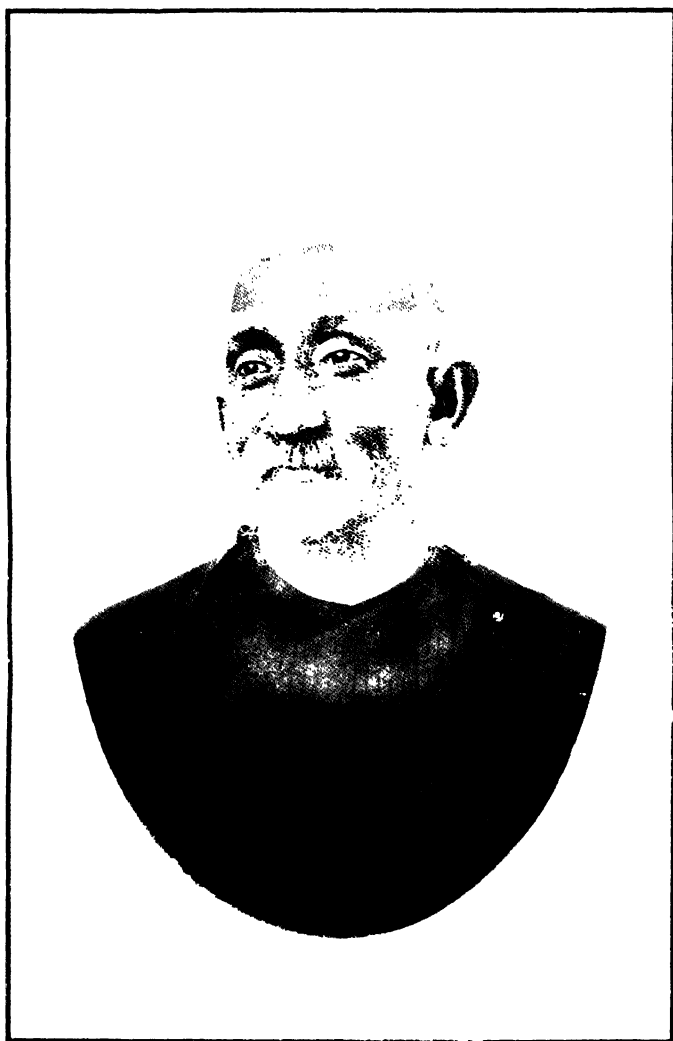
৺তিনকড়ি দত্ত।

৺কানাই লাল দত্ত।

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র দত্ত।

শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীমতী শরৎনলিনী দত্ত।

(শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ দত্তের সহধর্ম্মিণী

মহানাদের বসুবংশ।

"মহানাদ প্রথম খণ্ডে" ১৩০ পৃষ্ঠায় যে বসুবংশের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই বংশের বংশধর শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু এক্ষণে এলাহাবাদে বাস করিতেছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—তাঁহারা বাগাণ্ডার বসু, তাঁহাদের প্রাচীন বংশ তালিকা হারাইয়া গিয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা দীননাথ বসুর লিখিত বংশাবলীর কতকাংশ যাহা তাঁহার নিকটে ছিল, তাহা তিনি পাঠাইয়া দিয়াছেন, নিম্নে প্রকাশিত হইল,—
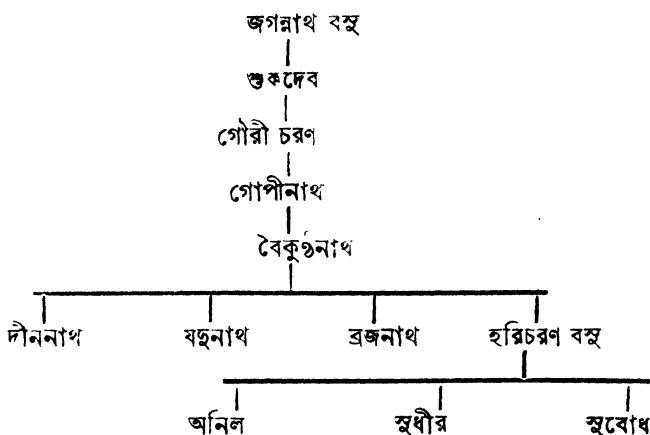
হরিচরণ বাবু অল্পবয়সে পিতামাতা হারাইয়া লাহোরে বড়দাদার (দীনবাবুর) নিকটে গিয়া প্রথমে একটী মার্চ্চেণ্ট অফিশে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। পরে দার্জ্জিলিং গিয়া পল্টনে কমিশেরিয়েট বিভাগে ষ্টোর কিপারের কর্ম্ম প্রাপ্ত হন, 'এবং "টচি" 'টিরা" "ওয়াজিরি" "চীন"

প্রভৃতি নানাস্থানের যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। অবশেষে পেন্সন লইয়া এলাহাবাদে আছেন।

হরিচরণ বাবুর Family Group চিত্রে দেখা যায়—প্রথম লাইনে বামদিকে হরিচরণবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র অনিলকুমার, তাঁহার কোলে মধ্যমপুত্র সুধীরকুমারের দ্বিতীয়পুত্র, তাহার পর বড় পুত্রবধূ (মারা গিয়াছে), তৎপরে মধ্যম পুত্র সুধীরকুমার, মধ্যম পুত্রবধু, তৃতীয় পুত্র সুবোধকুমার ও কনিষ্ঠ পুত্রবধূ। দ্বিতীয় লাইনে কনিষ্ঠা কন্যা—কণকপ্রভা, ৪র্থ কন্যা সুবর্ণপ্রভা, ৩য় কন্যা—শৈলবালা, ২য় কন্যা—নন্দরাণী, তারপর হরিচরণবাবু ও তাঁহার স্ত্রী, জ্যেষ্ঠা কন্যা—তরুবালা, তারপর প্রথমা কন্যার জ্যেষ্ঠপুত্র। তৃতীয় লাইনে কন্যাগণের পুত্রকন্যাগণ।

*　　　　*　　　　*

উপরোক্ত বংশাবলীর লিখিত গৌরীচরণের গোপীনাথ প্রভৃতি ছয়পুত্র ছিল। ৫ম পুত্র—রামতনু, পুত্র—বংশীধর, পুত্র—রাখালদাস, পুত্র—কৃষ্ণদাস বসু। ইনি সাটীথান গ্রামে বাস করেন। তথায় কৃষ্ণদাসের পুত্র—তারকদাস বসু আছেন।

*　　　　*　　　　*

বেজপাড়ায় বর্ত্তমান সময়ে আর তিন ঘর বসু উপাধির কায়স্থ বাস করেন।

(১) মাচাদীঘির দক্ষিণ দিকে এক বসুবংশের বাস আছে। ইঁহাদের বিস্তৃত বংশাবলী ছিল। এখন কেবল শিবচন্দ্র বসুর পুত্র—চন্দ্রকুমারের দুই পুত্র সতীশ ও দাশরথী বসু বাস করেন। শিবচন্দ্রের খুড়তুত ভাই যদুনাথ, কালীচরণ ও উমাচরণ। যদুনাথের পুত্র প্রভাস, অরুণ, গোবরা ও কিরণ। গোবরা খৃষ্টান হয়। উমাচরণের পুত্র রামবসু, ইনি ভাস্তাড়ার শিবচন্দ্র ঘোষের দৌহিত্র। (২) অঘোরবসুর পুত্রদ্বয়। (৩) কিরণ বসুর পুত্র। কিরণবসু দুর্গোৎসব করিতেন।

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু ।

শ্রীযুক্ত অনিলকুমার বসু M. I. B. T. (Lond).

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসুর পরিবারবর্গ।

স্বর্গীয় কেদার নাথ মজুমদার

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য)।

রায় সাহেব বঙ্কিম চন্দ্র গুহ মজুমদার

(মহেশ্বর পাশা পরিচয়—পৃঃ ১৮২)　　৩৫৫ (খ)

Mohila Press, Cal.

শ্রীশরৎ চন্দ্র গুহ মজুমদার এম্ এ,
এফ, আর, জি, এস,

(মহেশ্বর পাশা পরিচয়—পৃঃ ১৮৮)

৩৫৫ (গ)

Mohila Press, Cal.

রায় শ্রীযুক্ত নলিনী নাথ মজুমদার বাহাদুর।

(শ্রীখগেন্দ্র নাথ বসুর "মহেশ্বরপাশা পরিচয়ের" জন্য।)

* * *

মহানাদের লুপ্ত বসুবংশ—

১১ পর্য্যায় পঞ্চানন বসু, পুত্র—গৌড়েশ্বর বসু মাহিনগর হইতে মহানাদে বাস। তৎপুত্র পীতাম্বর বসু বা রামচন্দ্র খাঁ, পুত্র—কৃষ্ণানন্দ বসু খাঁ, পু—শিবানন্দ বসু খাঁ, পু—রঘুনাথ বসু খাঁ (বংশাভাব) ও কন্যা—কমলা, স্বামী মহেন্দ্রনাথ খাঁ সিংহ।

বড়া শ্রীরামপুরের বসুবংশ, মহানাদ হইতে তথায় বাস করেন। এই বংশে বসু মজুমদার ও বসু চৌধুরী উপাধি দৃষ্ট হয়।

১৫ পর্য্যায় কেশববসু মহানাদে বাস করিতেন। তৎপুত্র ১৬ লোকনাথ, মাধব ও কানাই। লোকনাথের পুত্র—১৭ গঙ্গারাম, পু—১৮ রমাকান্ত, পু—১৯ গোবিন্দ, রামনারায়ণ, কৃষ্ণদেব, জানকীবল্লভ (সাং মথুরাবাটী) ও রামশরণ। গোবিন্দের পুত্র—২০ গোপীকান্ত, (?) রুদ্রেশ্বর, কিঙ্কর (সাং মহানাদ)। গোপীকান্তের পুত্র—২১ প্রীতিরাম, পু—২২ গুরুপ্রসাদ, দেবীপ্রসাদ। গুরুপ্রসাদের পুত্র—২৩ আনন্দ, পু—২৪ শ্যামাচরণ সাং পানিশেহালায় বাস। তৎপুত্র—২৫ বিপ্রচরণ বসু। রুদ্রেশ্বরের পুত্র—২১ খেলারাম সাং গোলাগড়, পরে ছিনা আকনায় বাস। তৎপুত্র—২২ মনোহর, বাণেশ্বর, শ্যামসুন্দর, রামরাম। বাণেশ্বরের পুত্র—২৩ রামসুন্দর ও রাজচন্দ্র। রাজচন্দ্রের পুত্র—২৪ নবকুমার বসু। এই বংশ আর মহানাদে নাই।

দক্ষিণরাঢ়ীয় বসুবংশীয় কায়স্থগণের মধ্যে দশরথ হইতে ২৯ এবং অনন্তানন্দ হইতে ৩৭ পুরুষ পাওয়া যায়। ৪ পুরুষে গড় পড়তা এক শতাব্দ ধরিলে দশরথ ও আদিশূর ১২০৪ খৃষ্টাব্দে হইবেন। কেননা বর্ত্তমান কুলজী গ্রন্থে দশরথ, আদিশূরের রাজসভায় কনৌজ হইতে আসিয়াছিলেন, আর অনন্তানন্দকে ৯২৪ খৃঃ পাওয়া যায়।

দাসবংশ।

মহানাদের বেজপাড়ায় যে কয়ঘর দাস উপাধির কায়স্থ আছেন, তাঁহারা কাশ্যপগোত্র এবং শাঁখরাইলের রামদাসের সন্তান। শাঁকরাইলে রামদাসের বাসস্থানে মদনগোপাল বিগ্রহ আছেন ও তাঁহার জমিদারী আছে। ঐ বংশীয় প্রাণকৃষ্ণ দাস শাঁকরাইল হইতে চণ্ডী ও শ্রীধর দেবতাকে সঙ্গে লইয়া মহানাদে আসেন। কোন্ সময় হইতে বা কি উপলক্ষে তিনি মহানাদে বাস করেন তাহা অজ্ঞাত। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ দাসের বাটীতে আজিও চণ্ডী ও শ্রীধরের যথারীতি সেবাপূজা হইতেছে।

প্রাণকৃষ্ণ দাসের পুত্র আত্মারাম, পু—রামপ্রসাদ, পু—কাশীনাথ। তাঁহার রামকুমার প্রভৃতি চারিপুত্র। রামকুমারের পুত্র—রামগোপাল, পু—গুরুচরণ, পু—সত্যচরণ, পু—পাঁচুগোপাল ও রাধারমণ।

এই বংশে কৃষ্ণপ্রসাদ দাস, পুত্র—জগন্নাথ, পু—রামানন্দ, পু—রামধন, পু—ক্ষেত্রমোহন, পু—আশুতোষ, হৃষিকেশ ও কৃষ্ণমোহন। আশুতোষের পুত্র গঙ্গাধর ও বলরাম। ক্ষেত্রমোহন দাসের একটী পাঠশালা ছিল। তিনি ঐ পাঠশালার শিক্ষকতা এবং কবিরাজি ও অবধৌতিক মতে চিকিৎসা করিতেন। তিনি মিষ্টভাষী, অমায়িক, ধর্ম্মপরায়ণ ও সুরসিক লোক ছিলেন। তাঁহার সদালাপে সকলেই মুগ্ধ হইতেন।

শ্রীযুক্ত বটুকৃষ্ণ সিংহ তাঁহার পিতার সংগৃহীত ১২২৮ বঙ্গাব্দের হস্তলিখিত কাগজ হইতে শাঁখরাইলের দাসবংশের নিম্নলিখিত বংশাবলী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন,—

আদি—পৃথ্বীধর দাস, পু—ভূধর দাস, পু—গজদানী, রামদেব, মহাক্ষণি, শুনের দণ্ডী, রামদাস। শুনের দণ্ডীর পুত্র মারাধর, পু—সনাতন, পু—রূপরাম, পু—রামকান্ত, পু—জগদীশ, রাজীব ও রাঘব। রাঘবের পুত্র শিবরাম, পু—প্রাণবল্লভ, পু—গৌরীবর, পু—গোপীকান্ত, পু—মণিরাম, পু—গৌরীচরণ, পু—জয়রাম ও সীতারাম। জয়রামের পুত্র শঙ্কর, কিঙ্কর ও নন্দরাম। শঙ্করের পুত্র নিমাই, পু—গুরুদাস ও ও রামদাস। পরবর্ত্তী বংশাবলী পড়িতে পারা যায় না। আদি পৃথ্বীধর দাসের গোত্র জানা নাই। রাঢ়ীয় কায়স্থ কুল পঞ্জিকায় লিখিত আছে,—ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, আলমান ও কাশ্যপ এই চারিগোত্রের দাসবংশ বিখ্যাত। কাশ্যপ গোত্রীয় দেবদত্ত দাস ৮৮২ খৃঃ বা ৮০৪ শকে রাঢ়ে সিংহপুর রাজ্যে বিদ্যমান ছিলেন।

সরকার বংশ।

জাগুলে হইতে শাণ্ডিল্য গোত্র মুরলীধর দে সরকার মহানাদের বেজপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। ঐ বংশে রামহরি সরকার ও রতনেশ্বর সরকার (অখিলেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠাতা)। গৌরহরি পু—নন্দলাল, পু—সদাশিব, পু—রামলোচন সরকার *। তৎপুত্র হরি প্রসাদ, পু—ঈশ্বরচন্দ্র, পু—রামলাল সরকার ও বেচারাম সরকার। রামলালের পুত্র—এককড়ি, বামাচরণ, ভূপাল, নীরদ, জিতেন্দ্র। বেচারামের পুত্র—শৈলেশ্বর, পু—ধর্ম্মদাস সরকার।

---

* মহানাদের দক্ষিণপাড়ার রামলোচন সরকার নামে এক ধনাঢ্য কায়স্থের বাস ছিল। ঈশান ঘটক এই রামলোচন সরকারের কথাই উল্লেখ করিয়া থাকিবেন, কারণ এই সরকার বংশ মহানাদের প্রাচীন অধিবাসী ছিলেন। ১ম খণ্ড ১৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

মহানাদের অন্যান্য কায়স্থবংশ।

বর্ত্তমান সময়ে মহানাদের বেজপাড়ায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ দত্ত ও অবিনাশচন্দ্র দত্ত নামক দুইজন দত্তবংশীয় সম্ভ্রান্ত কায়স্থের বাস আছে। তারকবাবুর একটী পুত্র ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম, এ, এবং অবিনাশবাবুরও পুত্রের নাম ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ। ইহাদের বিস্তৃত বংশাবলী নাই।

মহানাদে ঘোষ উপাধির কায়স্থ ছিল, এক্ষণে তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহাদের বংশধর অন্যত্র থাকিতে পারে। বেজপাড়ায় রায় উপাধির কায়স্থ—তুলসীচরণ রায় ছিল, ধীরেন্দ্রনাথ রায় নামে তাহার এক পুত্র আছে। এক্ষণে তাহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর, ঐ পিতৃ-মাতৃহীন বালক মাতুলালয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত মহানাদে আর কোন কায়স্থের সন্ধান পাওয়া যায় না।

আচার্য্য বংশ।

(ঘোষাল ও হালদার)

মহানাদের বেজপাড়ায় অতি প্রাচীনকাল হইতে আচার্য্যবংশীয় খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের বাসস্থান ছিল। এক্ষণে ঘোষাল ও হালদার উপাধির দুই ঘরের বাস আছে। ইহাদের ধারাবাহিক বংশাবলী পাওয়া যায় না।

ঘোষাল বংশ সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য বিখ্যাত। ইঁহারা টোলে বিদ্যার্থীগণকে বিদ্যাদান করিতেন। এই বংশে রামময় ঘোষাল বহুকাল মহানাদ উচ্চ ইংরাজি মিশন স্কুলে হেড্ পণ্ডিতের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার অক্ষয়, জ্ঞানেন্দ্র, সত্য, নারায়ণ ও ধনঞ্জয় নামে পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে এক্ষণে নারায়ণ ও ধনঞ্জয় জীবিত। জ্ঞানেন্দ্রের দুইপুত্র ও নারায়ণের পাঁচ পুত্র আছে।

কলিকাতা, গড়পার, ১২নং বিপ্রদাস ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিজা ভূষণ ঘোষাল M. A. মহাশয়ের পিতা ৺ভোলানাথ ঘোষাল মহাশয়ের জন্মভূমি মহানাদে উপরোক্ত ঘোষাল বংশে। বৈদ্যনাথ ঘোষালের পুত্র কৃষ্ণকান্ত ঘোষাল। তৎপুত্র—ব্রজমোহন, তৎপুত্র—ভোলানাথ। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ভোলানাথ অতিকষ্টে বিদ্যাশিক্ষা করেন। অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষার সুযোগ না পাইলেও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি মহানাদ মিশন স্কুলে শিক্ষালাভ করার পর ডফ্ কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের স্বনামখ্যাত উকিল রায় বাহাদুর ৺নলিনাক্ষ বসু তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ মনের বলের ন্যায় শারীরিক বলও যথেষ্ট ছিল। তাঁহার বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী, সুবৃহৎ "মাচা দীঘি" যাহার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত লক্ষিত হয় না, সেই বিশাল দীর্ঘিকা তিনি বাল্যকালে অবলীলাক্রমে বহুবার সন্তরণে পার হইতেন। দিনাজপুরে যখন তিনি ডাকবিভাগের ইনস্পেক্টরের পদে কার্য্য করিতেন, তখন একদা একটী উৎকৃষ্ট অশ্বে আরোহণ করিয়া ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ঐ অশ্বটির প্রতি, জেলার হাকিমের পত্নীর লোভ-দৃষ্টি পতিত হয় এবং হাকিম ঐ ঘোড়াটী গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু ভোলানাথ অশ্বের মায়া

পরিত্যাগ না করিয়া চাকরীর মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ জেলা হইতে চলিয়া আসেন। পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি ডাকবিভাগে বহুলোকের চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন। পেন্সন পাইয়া শেষ জীবনে কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন ও তথায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। কাশীবাস কালেও তিনি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিভিসনের কমিশনার, পোষ্টমাষ্টার জেনারেল প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর প্রিয়পাত্র ছিলেন। কাশীতে দশাশ্বমেধ ঘাটের ডাকঘর ভোলানাথ বাবুর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীও অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন ও দীর্ঘকাল কাশীবাসের পর স্বর্গারোহণ করেন। জপ করিতে করিতে তাঁহার সমাধি হইত। ভোলানাথবাবুর মাতুল পণ্ডিত চুণীলাল মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ও সমসাময়িক সুধীমণ্ডলীর মধ্যে বৈয়াকরণিক হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

ভোলানাথ ঘোষালের তিন পুত্র ও এক কন্যা। দুইটি পুত্র জমজ, নাম—হরিপ্রসাদ ও হরপ্রসাদ। হরপ্রসাদ কাশীধামে মাতার নিকটে থাকিতেন। মাতার ৬ কাশীপ্রাপ্তির একমাস পরেই ১৯০৫ সালের ১৪ই আগষ্ট ২০ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্ত হয়। হরিপ্রসাদ বি, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টে কোষাধ্যক্ষের পদে কর্ম্ম করিতেন। কঠিন পীড়ার জন্য পদত্যাগ করিয়া তিনি এক্ষণে বৃন্দাবনে বাস করিতেছেন। কন্যা—শরৎকুমারী ৬ সুরেন্দ্র চন্দ্র আচার্য্য সব ডেপুটি মহাশয়ের পত্নী ছিলেন। তিনি ২৯ বৎসর বয়সে যক্ষ্মা রোগে মৃত্যুমুখে পতিতা হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র—গিরিজা ভূষণ বরাবর গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি পাইয়া ১৯০৪ সালে বি, এ উপাধি প্রাপ্ত হন। কিছুদিন শিক্ষা বিভাগে কাজ করিয়া কলিকাতা পুলিশ কোর্টে দ্বিভাষীর পদে নিযুক্ত হন। ১২ বৎসর চাকরী করিবার পর বিবিধ কার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি ১৯১৬ সালে

৺ভোলানাথ ঘোষাল।

শ্রীযুক্ত গিরিজা ভূষণ ঘোষাল M. A.
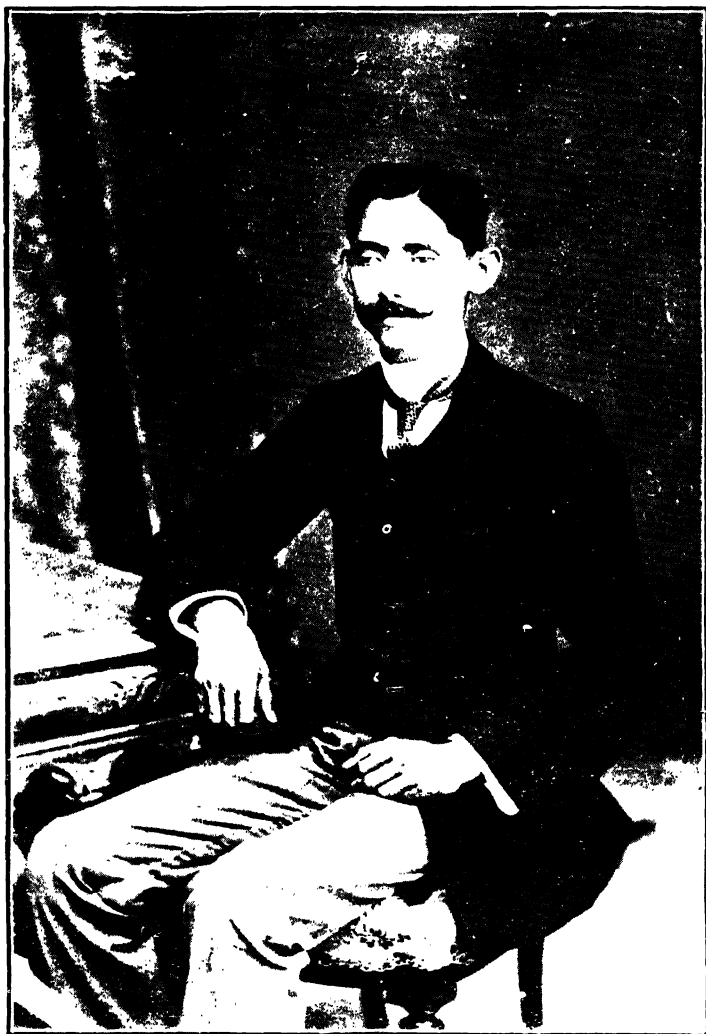
৺ চারুলতা দেবী (ভারতী)।

এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এখন তিনি কলিকাতার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে দ্বিভাষী।

মেট্রপলিটান কলেজের অধ্যাপক যোগীন্দ্রচন্দ্র কবিভূষণ মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত গিরিজাভূষণের অতি অল্প বয়সে পরিণয় হয়। এই পত্নী দুইটি কন্যা ও একটী পুত্র রাখিয়া ১৯১২ সালের মার্চ্চ মাসে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হইয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। অনন্তর স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় ৮ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য মহাশয়ের ভাগিনেয়ী, আবগারী বিভাগের পরিদর্শক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রভূষণ আচার্য্যের কন্যার সহিত দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। ইহার নাম চারুলতা দেবী। ইনি অতি মেধাবিনী ও শিক্ষিতা ছিলেন। তিনি স্কুলে বা কলেজে পড়েন নাই। শৈশব কাল হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত উচ্চ ধর্ম্মভাবাপন্ন কবিতাবলী প্রায়ই মাসিক পত্রাদিতে বাহির হইত। তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণ তাঁহাকে "ভারতী" উপাধিতে ভূষিতা করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি চিররুগ্না ছিলেন এবং অনেক রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ১৯৩০ সালের ৩রা অক্টোবর রাজগীর (রাজগৃহ—জেলা পাটনা) তীর্থে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ গীতা প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন, স্বদেশজাত দ্রব্য তাঁহার প্রিয় ছিল, তিনি খদ্দর পরিধান করিতেন, পরোপকার তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল, তিনি গোপনে অনেককে সাহায্য করিতেন, কোন সাহায্যপ্রার্থী তাঁহার নিকটে বিমুখ হইত না। পতিকে রাখিয়া নিজে পরলোকে যাইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার অত্যধিক ছিল, তাঁহার রচিত "মহামিলন" নামক কবিতায় এই ভাবটি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—

"আমি যদি আগে চলে যাই—
অনন্ত আলোকে ভরা অজ্ঞানিত দেশে,
একেলা বসিয়া রব সাধিকার বেশে।
তোমার পথের পানে চাহিয়া থাকিব,
ধ্যানের প্রদীপ শিখা জ্বালিয়া রাখিব।
অবশেষে প্রিয়তম, আসিবে যখন,
তোমার চরণে লুটি, পড়িব তখন।
তুমি যদি আগে চলে যাও—
বিরলে বসিয়া আমি ভাবিব তোমায়,
কামনা উজ্জ্বল হবে তব কল্পনায়।
তুচ্ছ সংসারের শত সুখের বাসনা,
ভুলিয়া করিব নাথ তোমার সাধনা।
পরিশেষে মৃত্যু যবে ডাকিবে আমায়,
বরিয়া লইব তারে তোমার আশায়।"

* * * *

গোলোকচন্দ্র হালদারের পুত্র নকুড়চন্দ্র হালদার। গোলোক চন্দ্রের অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু নকুড়চন্দ্র স্বীয় প্রতিভাবলে ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। বর্ত্তমান ইষ্টক নির্ম্মিত বাসভবনাদি তাঁহারই নির্ম্মিত। নকুড় চন্দ্রের পুত্র ননীগোপাল ও মাখনলাল হালদার. ননীগোপাল অপুত্রক অবস্থায় ২৪।২৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। মাখনলাল পিতার উপযুক্ত সন্তান। তিনি মিষ্টভাষী এবং সকল প্রকার সৎকর্ম্মে সংশ্লিষ্ট ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি। তিনি বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন। মাখনের দুই পুত্র—পাঁচুগোপাল ও তিনকড়ি এবং তিন কন্যা—শৈলবালা, হিরণবালা ও পদ্মাবতী।

শ্রীযুক্ত মাখন লাল হালদার।
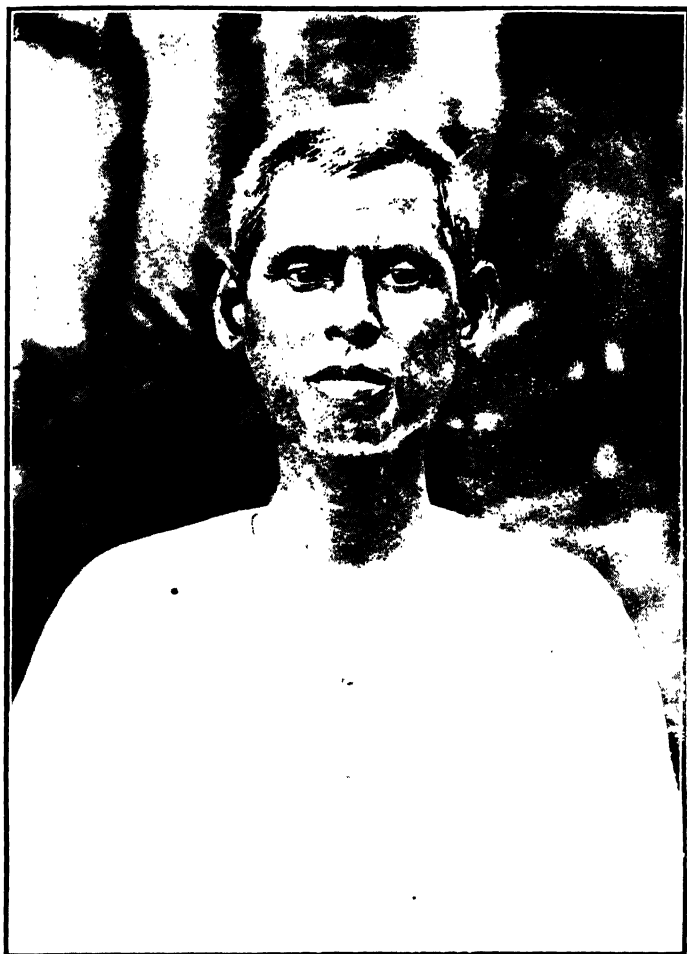
প্রোথিত প্রস্তরের গুপ্ত রহস্য।

পৌরাণিক স্যমন্তকের গল্পটির সিংহ এবং ঋক্ষরাজ জাম্ববান কে? তাঁহারা সত্যই বনের পশুরাজ সিংহ এবং ভয়ানক ভল্লুক, না তাঁহারা মানুষ?

সিংহের সম্বন্ধে—যাদবদিগের রাজধানী দ্বারাবতী নগরের অনতিদূরে (গুপ্ত-সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিকগণের মতে বিন্ধ্য পর্ব্বত মালার) মহাবনে এই সিংহের বাসস্থান ছিল এবং সেই সিংহ অস্ত্র শস্ত্র সজ্জিত মৃগয়াপটু যাদববীর প্রসেনকে তাঁহার ঘোড়ার সহিত বধ করিয়া তাঁহার গলা হইতে স্যমন্তক (কোহিনুর) হীরকটি চুরি করিয়াছিল।

ঋক্ষরাজ জাম্ববান—নির্ঝর এবং বনপূর্ণ কোন উপত্যকার ভিতর মহীদুর্গ করিয়া, অর্থাৎ ভূনিম্নস্থ এবং ভূগর্ভে সুরক্ষিত দুর্গের মধ্যে বাস করিতেন এবং ঐ দুর্গে প্রবেশ নির্গমের জন্য অন্ধকারময় গুহাপথ ছিল। মহানাদের অত্যাশ্চর্য্য প্রস্তর কি ঐ গুহাপথের প্রবেশ দ্বার?

ঋক্ষ এবং রুশ একই শব্দের ভিন্ন উচ্চারণ মাত্র। "ঋ" কে বাঙ্গলায় এবং হিন্দীতে "রি" বলিয়া উচ্চারণ করিলেও দক্ষিণে ওড়িয়া এবং মারাঠিরা "রু" উচ্চারণ করে, এবং সেইজন্য রাজপুতরা "রিছ" যাহাকে বলে, মারাঠিরা তাহাকে "রুশ" বলে। সংস্কৃত "ঋক্ষ" লাটিন ভাষায় "উর্শা" হয়। রুশ জাতির বাসস্থান বলিয়াই বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা ঋক্ষ পর্ব্বত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল এবং জাম্ববান এই ঋক জাতিরই রাজা ছিলেন। সিরদরিয়া এবং আমুদরিয়া (Jakartes and oxus) হিমালয়ের মুশট্যাগ বা কারাকোরাম পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া

পশ্চিম উত্তর মুখে গিয়া আরাল হ্রদে পড়িয়াছে। আমাদের পৌরাণিক ভূগোল শাস্ত্রে উহাদের নাম সীতানদী এবং যক্ষু (চক্ষু, বংক্ষু) নদী এবং উহারা যে যে দেশ দিয়া বাহির হইয়া গিয়া পশ্চিম সমুদ্রে (কাস্পীয় এবং আরাল হ্রদ সে সময়ে যুক্ত ছিল) পড়িয়াছিল, তাহাও যথাযথ বর্ণিত আছে। সীতানদীর অববাহিকাকে এখনও রুশিয়ার তুর্কিস্থান বলিতেছে। "কুকুরেরা" যদুদিগেরই এক শাখা, চীন এবং যবনেরা কাশ্মীর মণ্ডলের পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বাস করিতেন। যদু বংশীয়েরা বাহ্লিক (Baktria) মদ্র (Media) এবং কেকয় Armeria) দেশের ক্ষত্রিয়দিগের সঙ্গে বহুকাল হইতে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। আফগানিস্থান যদুবংশীয়গণের অধিকারে ছিল এবং যদুবংশীয় গজসিংহই "গজনী" নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যদুবংশের তালিকায়, সত্বতের পুত্র—অন্ধকের পুত্র—কুকুর হইতে ঐ শাখার বিস্তার হইয়াছিল। ঋক্ষপাদ পর্ব্বতই রুশ (Russia) দিগের আদি নিবাস। কাশ্মীর মণ্ডলের পশ্চিম দিকে অবস্থিত কম্বোজ এবং দরদ (Province of Sir-daria) লোকেরা উত্তর বঙ্গে এবং পূর্ব্ব উপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন ও রাজ্য করার এবং সম্রাট ধর্ম্মপাল কম্বোজদেশ জয় করার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রুশ জাতীয় শিল্পীরাই ভারতে মহীদুর্গ নির্ম্মাণের প্রবর্ত্তক ছিলেন কিনা তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

প্রাচীন সপ্তগ্রামে সত্রাজিত নামে এক রাজা ছিলেন। পৌরাণিক সত্রাজিতের এক হীরক ছিল। সেই হীরকের এরূপ প্রভাব ছিল যে, প্রত্যহ উহা হইতে বহু স্বর্ণমুদ্রা জন্মিত এবং উহা যে স্থানে থাকে, তথায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ এবং মড়ক ইত্যাদি দুর্ব্বিপাক ঘটিত না। সত্রাজিত তাঁহার স্নেহভাজন ভ্রাতা প্রসেনের কাছে ঐ মণিটি রাখিতে দিয়াছিলেন এবং প্রসেন একদিন ঐ মণিটি গলায় পরিয়া ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া মহাবনে শীকার করিতে গিয়াছিলেন।

প্রসেন আর নগরে ফিরিয়া আইসেন নাই, তখন প্রসেনের অনুসন্ধানের জন্য তাঁহারই ঘোড়ার ক্ষুরের দাগ দেখিতে দেখিতে ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুদূরে গিয়াই বলরাম, সাত্যকি, শ্রীকৃষ্ণ এবং আরও আত্মীয় বীরপুরুষরা দেখিতে পাইলেন যে, প্রসেন এবং তাঁহার ঘোড়া উভয়েই ক্ষত বিক্ষত দেহে মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং স্যমন্তক মণি প্রসেনের গলা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। রক্তের দাগ ধরিয়া আরও অল্প কিছু দূরে গেলেই যাদববীরেরা এক সিংহকেও ক্ষত বিক্ষত দেহে মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলেন। সিংহের নিকটে রক্তাক্ত পদচিহ্ন ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, ঐ পদচিহ্নগুলি মৃত্তিকার নিম্নে অবস্থিত একটি গুহাপথে প্রবেশ করিয়াছে। অন্ধকারময় ঐ ভূগর্ভস্থ গুহার ভিতর প্রবেশ করিতে যাদববীরগণের সাহসে কুলাইল না। কিন্তু পুরুষসিংহ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই গুহার বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, নিজেই নির্ভয়ে সেই অন্ধকারময় ভূগর্ভে প্রবেশ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অন্ধকারময় গুহাপথে খানিকটা অগ্রসর হইবার পরই শুনিতে পাইলেন যে, একটি শিশু আবদার করিয়া কাঁদিতেছে এবং এক নারী গান গাহিয়া উহার কান্না থামাইবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি তাড়াতাড়ি আর একটু আগাইয়াই এক অচিন্তিত-পূর্ব্ব দৃশ্যের সম্মুখে আসিয়া নিজেই বিস্ময়ে ডুবিয়া গেলেন! তথায় স্তিমিত অথচ স্পষ্ট আলোকে সেই শিশু এবং নারীকে দেখিতে পাইলেন এবং শুনিতে পাইলেন,—শিশুর ধাত্রী সেই নারী মধুর কণ্ঠে গান গাহিতেছে :—

"সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদীস্তবহ্যেষ স্যমন্তকঃ॥"

অর্থাৎ—"সিংহ প্রসেনকে হত্যা করিয়াছিল এবং জাম্ববান কর্ত্তৃক

সিংহ হত হইয়াছে ; হে সুকুমার, ক্রন্দন করিওনা ; ঐ দেখ তোমার জন্য সেই স্যমন্তক মণি আনিয়াছি।”

“মহানাদ” ১ম খণ্ডের বর্ণিত (১৫৫ পৃষ্ঠায়) অত্যাশ্চর্য্য প্রস্তরের নিম্নে যে গুহা লুক্কাইত আছে, তাহার অনুসন্ধানের মানুষ এখনও বাঙ্গলার মাটিতে জন্মায় নাই।

আরব্যোপন্যাসের আলিবাবা এক মহাবনে কাষ্ঠ আহরণ করিতে গিয়া দৈবাৎ দস্যুদের ধনভাণ্ডারের সন্ধান পাইয়াছিল। যে গুহায় এই ধন ভাণ্ডার ছিল, সেইরূপ গুহার অস্তিত্ব পৃথিবীর নানা স্থানে আছে। মহানাদের গুহার সম্বন্ধে একটি প্রবাদ কথা বাঁশবেড়িয়া নিবাসী নগেন্দ্র নাথ সিংহ বলিয়াছিলেন— ‘মহানাদের পতিত প্রস্তর দ্বয়ের নিম্নে যদি কেহ পাঁচ গজ পর্য্যন্ত খনন করে, তাহা হইলে সে এক বৃহৎ গুহার ছাদে গিয়া পৌছিবে। গুহার ছাদ ৭০ গজ দীর্ঘ। ইহাতে দুইটী কামরা আছে। গুহার কক্ষ হইতে দুই শত গজ দূরবর্ত্তী প্রধান প্রবেশ পথে পৌছিবার জন্য পূর্ব্বপার্শ্বে একটি অপ্রশস্ত পথ আছে। সূর্য্যরশ্মি তির্য্যকভাবে গুহা মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুইটি স্বর্ণ মূর্ত্তির চক্ষুস্থিত অতি উজ্জ্বল ও বৃহৎ রত্ন চতুষ্টয়কে এমন ভাবে আলোকিত করে যে, তাহা হইতে অতি উজ্জ্বলচ্ছটা বাহির হয়।” ইত্যাদি—ইহাই মহানাদের প্রোথিত প্রস্তর দুইটির গুপ্ত রহস্য। কে ইহার সন্ধান করিবে!

———

মহানাদে প্রাপ্ত দ্রব্য।

মহানাদে সময় সময় ভূগর্ভে যে সকল দেবমূর্ত্তি, মুদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে, তাহা "মহানাদ ১ম খণ্ডে" কতক উল্লেখ করিয়াছি। এখন জানিতে পারা গিয়াছে যে, মহানাদে ও মহানাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রস্তর "ঢেঁকির গড়" রূপে ব্যবহৃত হইতেছে, ঐ সকল প্রস্তর মহানাদের রাজবাটী হইতে সংগৃহীত। কাগজীপাড়ায় কাগজ কুটিবার যে সকল বৃহৎ ও কঠিন প্রস্তর সমূহকে ঢেঁকির গড় করা হইয়াছিল, তাহার অনেক গুলি এখনও দেখিতে পাওয়া যায় এবং পাছে ঐ সকল প্রস্তর কেহ লইয়া যায় বলিয়া, বর্ত্তমান কাগজী-বংশীয়রা স্ব স্ব বাটীর নিকটে মৃত্তিকার ভিতরে পুঁতিয়া রাখিয়াছে। ঐ প্রস্তরগুলি ৮।১০ হাত লম্বা ও তিন পোয়া—এক হাত চওড়া, এবং তাহার একদিকে কারুকার্য্য খচিত আছে। উহা দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ গুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাসাদের ভগ্নাংশ। মহানাদের যে কোন পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিবার সময় ভগ্ন দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তাহার সকলগুলি সযত্নে রক্ষিত হয় নাই। কতকগুলি জাততলায় আছে, এবং কতক দেশ দেশান্তরে নীত হইয়াছে। ভগ্ন রাজবাটী পরিদর্শনকালে অগ্নি সংযোগে গলিত ধাতু-পদার্থের জমাট (প্রায় অর্দ্ধসের) একটী. পাওয়া গিয়াছিল। উহা এবং একটি ভগ্ন মন্দিরের একখানি কারুকার্য্য খচিত ইষ্টক শ্রীযুক্ত বটুকৃষ্ণ সিংহ লইয়া গিয়াছেন।

মহানাদের অদূরে রোসনা গ্রামে "পদ্ম পুকুর" নামক প্রাচীন

সুবৃহৎ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিবার সময় বিগত ১৩৩৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে ৬ ফুট পাঁকের নিম্নে তিনটী ভগ্ন বাসুদেব মূর্ত্তি এবং দুইটী প্রাচীন-কালের হাঁড়ী পাওয়া গিয়াছিল। ঐ পুষ্করিণীর সত্বাধিকারী সদ্‌গোপ-বংশীয় ৺চন্দ্রকুমার মোড়লের পুত্র শ্রীমান্ রাসবিহারীর নিকট হইতে ঐগুলি চাহিয়া পাইয়াছিলাম। আরও কতকগুলি দ্রব্য আমার গৃহে আনিয়া রাখিয়াছি। যথা—

মহানাদ নিবাসী মিঃ পি, সি, সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত রাজবাটীর দ্বিতল গৃহের প্রস্তর নির্ম্মিত কার্ণিশ। উহা তাঁহার বাড়ীতে ঢেঁকির গড় রূপে রক্ষিত ছিল। এক্ষণে তিনি অন্য একটী বৃহৎ প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া ঢেঁকির গড় করিয়াছেন, উহাতেও কারুকার্য্য আছে। আর একটী কারুকার্য্য খচিত প্রস্তর তিনি আমাকে দিয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিমান চন্দ্র রায় (মদ্য বিক্রেতা) রাজবাটীর একস্থান হইতে ইষ্টক সংগ্রহ করিবার সময় এক ডাবা চূণ বাহির হইয়া পড়ে। অনুমান উহাতে ১৵০ মন চূণ আছে। এই চূণ ছয়শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া অনুমিত হয়। ঘরের মেজের উপরে ঐ ডাবা বসান ছিল এবং উপরে গৃহ ভগ্ন হইয়া চাপা পড়িয়াছিল। ডাবাটী ফাটিয়া গিয়াছে ও উহা এখনও ঐ স্থানে আছে। ভগ্ন ডাবার কিয়দংশ সহ খানিকটা চূণ আমি আনিয়া রাখিয়াছি।

বশিষ্ট গঙ্গার তীরে ভ্রমণ কালে আমি একটী ক্ষুদ্র প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। উহাতে বাসুদেব মূর্ত্তি খোদিত আছে। ভগ্ন রাজবাটীর স্তূপ হইতে সংগৃহীত কতকগুলি অগ্নিদগ্ধ প্রস্তরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চটা এবং কতকগুলি কারুকার্য্য খচিত ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড এবং মাচা দীঘির বায়ুকোণের স্থাপিত প্রাচীন শিবমন্দিরাভ্যন্তর হইতে প্রাপ্ত অগ্নিদগ্ধ গৌরীপট্টের কিয়দংশ। এই সকল আমার গৃহে সযত্নে রক্ষিত আছে।

একপাদ ভৈরবমূর্ত্তি ও মকরের মুখ। রাজবাটীর ড্রেণ।।
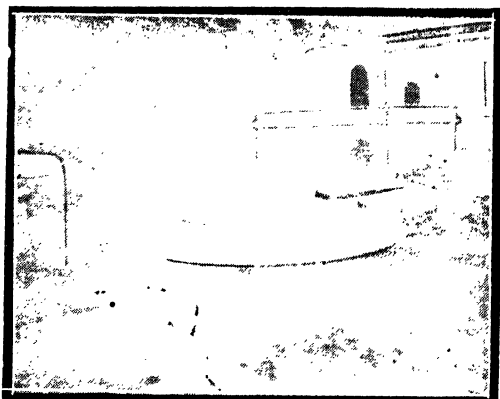
মাচা দীঘির পাড়ে—ভগ্নপ্রায় প্রাচীন শিবমন্দির।

প্রতিবাদ ও সমর্থন।

শ্রীযুক্ত অমৃত লাল শীল এম, এ (পারসিয়ান স্কলার, হায়দ্রাবাদের নিজামের শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম করিতেন, এক্ষণে পেন্সন লইয়া এলাহাবাদে আছেন) লিখিয়াছেন—

"আপনার পুস্তকের (মগনাদ ১ম খণ্ডের) ১৮৮—১৮৯ পৃষ্ঠায় একটী স্বর্ণমুদ্রার কথা আছে, তাহার পাঠ ঠিক হয় নাই। উপরকার পংক্তিতে 'ইয়া আল্লা তায়ালা' লেখা। তাহার পর মধ্য অংশে "মহম্মদ-অল-শরাইফ আলাও-উদ্দীন বাদশাহ গাজী" ঠিক পাঠ হইবে। অর্থ—"শরাইফবাসী মহম্মদ, আলাও-উদ্দীন বাদশাহ গাজী"। বঙ্গে ১৪৯৭ ঈশাব্দে এই (মক্কার নিকটে) শরাইফবাসী মহম্মদ, রাজার মন্ত্রী ছিল। রাজাকে মারিয়া সিংহাসন লাভ করে ও আলাও-উদ্দীন উপাধি গ্রহণ করে। এই লোকটি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, চরিতামৃতে "সৈয়দ হুসেন শাহ" ইহারই নাম। পূর্ব্বে রাজা সুবুদ্ধির কর্ম্মচারী ছিল। ফরিশতার ইংরাজি অনুবাদে (By Colonel Briggs) ইহার নাম "মক্কাবাসী সৈয়দ শরীফ" লেখা আছে। আমার কাছে উপস্থিত আদত পার্শী গ্রন্থ নাই, বোধ হয় ফরিশতা (Farishta) "সৈয়দ অল শরাইফ" লিখিয়া থাকবেন, ইংরাজ অনুবাদক আপনার ইচ্ছামত "সৈয়দ শরীফ" লিখিয়াছেন। কিন্তু এই মুদ্রা অলাও-উদ্দীন খিলজীর কথাই নহে। সৈয়দ হুসেন শাহ ১৪৯৭ হইতে ১৫২৩ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজধানী গৌড়ে (লক্ষণাবতী) ছিল। কোনও মুসলমান স্বহস্তে একটী কাফেরকে

হত্যা করিতে পারিলেই 'গাজী' হয়, অতএব মুসলমান রাজারা সকলেই 'গাজী' উপাধি ধারণ করিত।" শ্রীযুক্ত শীল মহাশয়ের পাঠোদ্ধারই ঠিক। কিন্তু তাহা হইলেও মুদ্রাটি চারিশত বৎসরের অধিক কালের পুরাতন এবং ঐরূপ মুদ্রা আজ পর্য্যন্ত আর কোনস্থানে পাওয়া যায় নাই।

* * * *

এই গ্রন্থের ২২৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত একটী প্রাচীন কবিতায় 'অমরা নগর'কে অমরারগড় মনে করিয়া আমি উক্ত কবিতার লিখিত রাজা হরিশ্চন্দ্রকে অমরার গড়ের সদ্গোপ-বংশীয় রাজা নির্দ্দেশ করিয়াছি (ঐ পৃষ্ঠার টীকা), কিন্তু রাজা হরিশ্চন্দ্র নামে কোন রাজা সদ্গোপ জাতির মধ্যে ছিলেন, ইহা কোন স্থানে উল্লেখ দেখা যায় না; দুই জন ঐতিহাসিকও তাহাই বলিয়াছেন, সুতরাং ঐ রাজা হরিশ্চন্দ্র সিংহ-বংশীয়ই হইবেন। বর্দ্ধমান জেলার মেমারি ষ্টেশনের নিকটে যে আমরা গ্রাম আছে, তাহাই অমরা নগর কিনা ঐতিহাসিকগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। আমরা গ্রামে সিংহবংশের বাস আছে। ২৩ পর্য্যায় কেশবরাম সিংহ, পুত্র—বিজয়রাম, পুত্র—নীলমণি, পুত্র—ধনকৃষ্ণ, পুত্র—যোগেন্দ্রকৃষ্ণ, পুত্র—সত্যচরণ সিংহ। মগধ, রাঢ় ও বঙ্গে রাজা হরিশ্চন্দ্র সিংহের কীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ দৃষ্ট হয়।

আনুলিয়া গ্রাম বর্দ্ধমান জেলায়, বিদ্রোহী রাজা লক্ষ্মীকান্ত সিংহ স্থাপন করেন। ঢাকা জেলায় মাণিকগঞ্জ সবডিভিসনে রাঢ় দেশের কোন স্থানের রাজা হরিশচন্দ্র নামক এক ব্যক্তি আগমন পূর্ব্বক আনুলিয়া নামে গ্রাম স্থাপন করিয়া বাস করিয়াছিলেন; তাঁহার অনেক কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আনুলিয়া হইতে সাভার পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি বৌদ্ধ বা জৈন ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার গোত্র বা

মানিকখাম প্রাপ্ত তাম্রশাসন। শ্রীবল্লভ সিংহ - ১৩৫০ শকাব্দা
উদয়চাঁদ প্রসাদ সিংহের পৌত্র শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ সিংহ (কোষ্ঠীকার)
মহাশয়ের সৌজন্যে এই ব্লক নির্মিত হয়েছে।
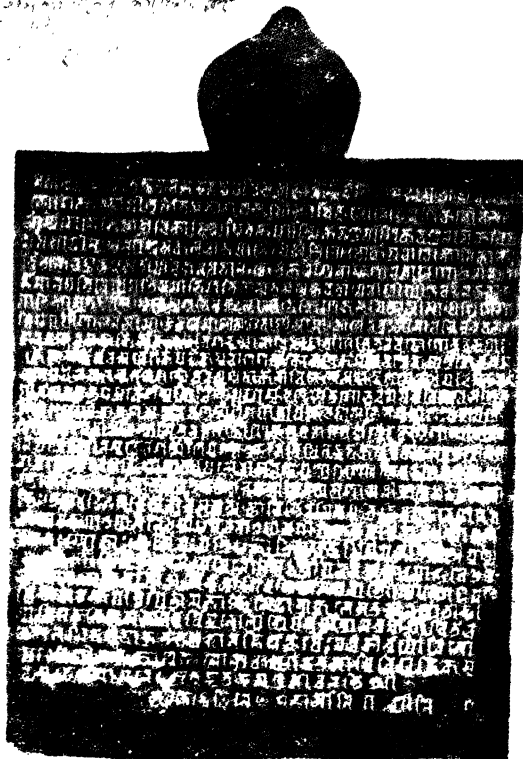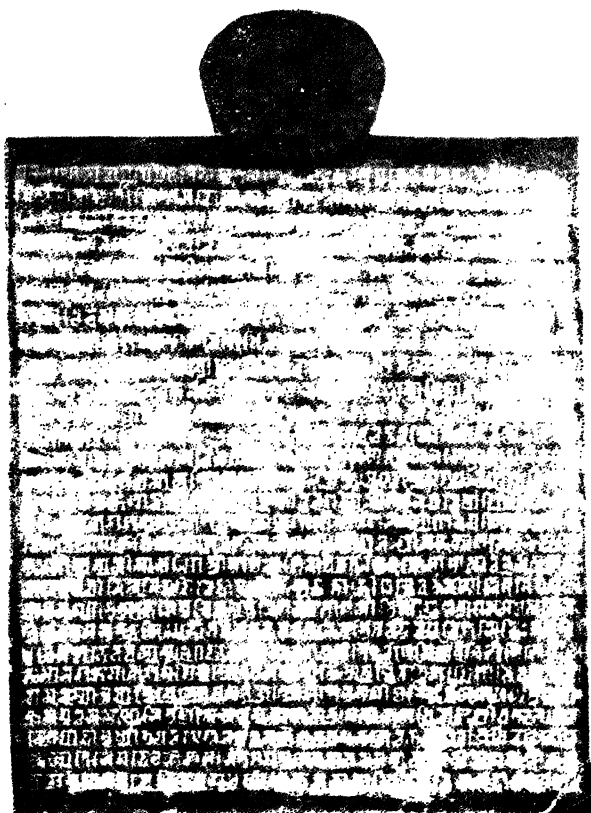
বংশধরের পরিচয় ঢাকা জেলায় পাওয়া যায়না, কিন্তু নদীয়া জেলায় মৌদগল্য গোত্রীয় সিংহ বংশের কুলজীতে হরিশচন্দ্রের নাম পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়—এই হরিশচন্দ্র হইলেও হইতে পারে। আবার মুরশিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের নিকটবর্ত্তী স্থানে আর এক আন্দুলিয়া গ্রাম দৃষ্ট হয়, তথায় সিংহবংশ আছেন; কিন্তু তাঁহাদের গোত্র জানিতে পারা যায় নাই। খুলনা জেলাতেও আন্দুলিয়া আছে ("মহানাদ ১ম খণ্ডের" ২০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। রাজসাহী জেলাতেও আন্দুলিয়া গ্রাম আছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, হরিশচন্দ্র নামে এক ব্যক্তির অনেক কীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই হরিশচন্দ্র কে? এবং ইঁহার বাসস্থান গুলির নাম আন্দুলিয়া হইবারই বা কারণ কি? তবে মনে হয়—এলেকজেণ্ডার যেমন নিজ নামে বহু স্থানে নগর প্রতিষ্ঠা করিতেন, সেইরূপ এই ব্যক্তিও কোন অজ্ঞাত কারণে যখন যেখানে গিয়াছেন তথায় আন্দুলিয়া নামে নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

নদীয়া আন্দুলিয়ার সিংহীপোঁতার পশ্চিমাংশে চূর্ণী নদীর ভাঙ্গনে তিনটী বড় বড় কূয়ার পাট, দুইটি বৃহৎ বাসুদেব মূর্ত্তি, একটী প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ ও একখানি তাম্রলিপি বাহির হয়। একজন কৃষক দেখিতে পাইয়া গ্রামবাসীকে খবর দেয়। মূর্ত্তিগুলি ও শিবলিঙ্গ ঐ গ্রামে স্থাপিত আছে এবং তাম্রলিপিটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আছে। নদীয়া—আন্দুলিয়ার প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় ঐ তাম্রশাসনটীর পাঠোদ্ধার করিয়া জানিতে পারেন যে, আন্দুলিয়ার পূর্ব্ব নাম অনল বা আন্দুল্যা ছিল এবং হরিশচন্দ্র বলিয়া কোন এক রাজার নাম উহার একস্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের বিশ্বাস—এই তাম্রলিপিটী সেনবংশের ও সেন রাজারা সিংহ উপাধি ব্যবহার করিতেন। কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে শ্রীযুক্ত বটুকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় ঐ তাম্রলিপির প্রতিকৃতি (ব্লক) প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়াছেন, উহা পর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল।

তাম্রশাসনটির সকল স্থান পড়িতে পারা যায় না, চারি লাইন মাত্র পড়িতে পারা গিয়াছে। সে কবিতাটি এই—

মুদ্গল মুনির শিষ্য সহস্রাক্ষ নাম।
লভিলা মৌদ্গল্য গোত্র মহা গুণধাম ॥
সেই বংশে হরিশ্চন্দ্র হন অবতার।
সিংহের প্রতাপে সিংহ উপাধি তাঁহার ॥

* * * *

চন্দননগর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ এবং চন্দননগরের ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র দে মহাশয় ১৩৩৬ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ মহানাদ পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। "মহানাদ ১ম খণ্ডের" ১০১ পৃষ্ঠায় রাজা বিজয় রাম সিংহের মাল্যচন্দন গ্রহণ উপলক্ষে যে "চন্দননগর" নামের উৎপত্তিবিবরণ লিখিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে হরিহর বাবু বলেন,—"আজ পর্য্যন্ত বিবাহাদি কার্য্যে চন্দননগরে যেরূপ মাল্যচন্দনের অত্যধিক ব্যবহার ও আড়ম্বরাদি দেখা যায়, সেরূপ এ প্রদেশে আর কোন স্থানে নাই।" মহানাদ হইতে হরিহর বাবুর পূর্ব্বপুরুষের ভিটার সংগৃহীত দুইখানি প্রাচীন ইষ্টক তাঁহার চন্দননগরের বাস ভবনে সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন।

সেনাপতি "মহানাদ"।

সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তীর "ভূপাল অপেরা পার্টী"তে এক্ষণে "বিন্ধ্যা-বলী" নামক পালার অভিনয় হয়। বিন্ধ্যা—দৈত্যরাজ বলির স্ত্রী। অনুহ্লাদ—প্রহ্লাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা হিরণ্যকশিপুর পুত্র ও বলির

পিতামহ। অনুহ্লাদ দেবদ্বেষী এবং তাহারই পরামর্শে বলি স্বর্গরাজ্য জয় করেন, তৎপরে বলির অশ্বমেধ যজ্ঞ ও বামনকে ত্রিপাদ ভূমি দিয়া অভিনয় পরিসমাপ্তি। দেবতাদের সহিত যুদ্ধকালে বলির ময় ও মহানাদ নামে দুইজন প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়। দুষ্টবুদ্ধি অনুহ্লাদের দুর্ব্যবহার ও কুপরামর্শে ন্যায়পথাবলম্বী সেনাপতি মহানাদ তীব্র প্রতিবাদ করে, এবং অনুহ্লাদের পরামর্শ মত অন্যায় কার্য্য (দেবতাদের অবমাননা ও লাঞ্ছনা) করিতে অনিচ্ছুক হয়, অনুহ্লাদ সেজন্য মহানাদকে ভয় দেখায় এবং তাহাকে বলে—"তুমি জান, আমি হিরণ্যকশিপুর পুত্র—প্রকারান্তরে আমিই সম্রাট, আমার অমতে চলিলে আমি তোমার যথোচিত শাসন করিতে পারি, তুমি একজন নগণ্য সেনাপতি মাত্র।" অবশেষে উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিবাদ উপস্থিত হইলে অন্যতম সেনাপতি ময় মহানাদকে এইরূপ অনুরোধ করেন যে, "আপনি অন্যায়ের সমর্থন না করিলেও সম্রাটের পিতামহ বলিয়া অনুহ্লাদের সম্মান যাহাতে নষ্ট না হয় তাহা করিবেন।" অনুহ্লাদের অন্যায় আচরণে সম্রাট বলিও বিরক্ত হন, তিনি সেনাপতি মহানাদকে বলেন—"তুমি ন্যায়পথ হইতে ভ্রষ্ট হইও না, ন্যায়ানুসারে স্বীয় কর্ত্তব্য পালন জন্য পিতামহ অনুহ্লাদের অন্যায় কার্য্যের যথোচিত সুব্যবস্থা করিবে এবং উহা করিতে তুমিই পারিবে।"

"মহানাদ" গ্রন্থের আভ্যন্তরিণ ব্যাপারের সহিত অনেকাংশে ইহার মিল হয়, কিন্তু তাহা কবির অজ্ঞাত। উক্ত পালার রচয়িতা শ্রীযুক্ত ভোলানাথ রায় কাব্যশাস্ত্রী। এই কবির লেখনীতে মহানাদ নামক সেনাপতির কল্পনা কেন উদয় হইয়াছিল, কে বলিতে পারে?

পুষ্পাঞ্জলি।

(১)

পুষ্প, সৃষ্টির অতুল সম্পদ, পুষ্প স্বর্গীয় সুষমা। দেবতার পদে পুষ্পাঞ্জলি দিলে মানব ধন্য হয়, দেবতা সুপ্রসন্ন হন।

তত্ত্ব জানিবার জন্য মানুষের মনে একটা স্বাভাবিক আকূতি আছে। মানুষ—মানুষ বলিয়াই তাহার মনে এ জিজ্ঞাসার উদয় হয়।

মানবের স্বভাব—সত্যের সন্ধান করা। মানুষের সত্য সন্ধানের প্রবৃত্তিই জগতে সভ্যতার বিকাশ করিয়াছে। সৃষ্টির বিকাশ হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার এই স্বভাব-ধর্ম্ম ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া প্রসারিত হইতেছে।

ইতিহাস দেশের বা সমাজের শরীর, কবির কাব্য, দেশের বা সমাজের মন। ইতিহাস পত্র পুষ্প ফল শোভিত নানাবিধ বৃক্ষের সুরম্য উদ্যান, উপন্যাস নাটকাদি সেই উদ্যানের বৃক্ষ বিশেষ হইতে সংগৃহীত কুসুমিত শাখা প্রশাখা। ইতিহাস ভবিষ্যতের সাক্ষী। জাহ্নবীর সন্নিহিত তমসার পবিত্র তীর্থে কবিগুরু বাল্মীকির বিনোদ বীণায় একদিন যে ঝঙ্কার জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে বিশ্ব বিমোহিত।

ইতিহাস মানবকে উদার ও কর্ত্তব্যপরায়ণ করে, সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা কুপথ হইতে নিবৃত্ত করে এবং প্রবল শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা প্রদান করে ও মুক্তির পথে লইয়া যায়; এক কথায় ইতিহাস মানুষকে সর্ব্বজ্ঞ করিয়া দেয়। ইতি হ—অস্ এই অর্থে ইতিহাস নিষ্পন্ন হইয়াছে।

বিশ্বনটরাজ ও বিশ্বনটরাণী ।

গ্রন্থকারের ২য় পুত্র

৺গঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ও গঙ্গেশের কন্যা শ্রীমতী মহামায়া দেবী।

মানুষের দেহান্ত হইলেই হিন্দুর নিকটে সেই ব্যক্তি ঈশ্বর (৺) নামে অভিহিত হন, অর্থাৎ নামের পূর্ব্বে ঈশ্বর (৺) যোগ হয়। সৃষ্টির প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত এইরূপ ঈশ্বর যে কত সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কেহ করিতে পারে না। ইতিহাসের আলোচনাই সেই ঈশ্বরের আরাধনা। এই সাধনায় যে সিদ্ধিলাভ হয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

"মহানাদ প্রথম খণ্ড" ১৩৩৫ সালের ৭ই জ্যেষ্ঠ মুদ্রণারম্ভ হইয়া ২রা মাঘ প্রকাশিত হয়। "ভারতবর্ষ" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ * মহাশয় ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ২৫শে ফাল্গুন মহানাদ পরিদর্শন করিতে আগমন করেন। তৎপূর্ব্বে ১৬ই কার্ত্তিক আমার ৩০ বৎসর বয়স্ক পুত্র গঙ্গেশচন্দ্র মারা যায় এবং ২৯শে মাঘ আমার স্ত্রীবিয়োগ হয়। এই সকল দুর্ঘটনার ভিতরেও আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করিতে না পারিয়া বীরেন্দ্রবাবু সবিস্ময়ে তাঁহার সহযাত্রী সুরেন্দ্রবাবুকে বলিয়াছিলেন—'ইতিহাসের আলোচনাই এই বিয়োগ ব্যাথাকে দূরে রাখিয়াছে।"

জগতে প্রকৃত কৃতজ্ঞতা নাই। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিবিধ শক্তির অনন্ত আধার। সংসারক্ষেত্রে পদে পদে বিপদ।

আপনি সিদ্ধ না হইলে, আপনাকে ডুবাইতে না পারিলে, পরোপকার করা ভণ্ডামী বই আর কিছুই নয়।

হিংসার প্রত্যুত্তরে মানুষ হিংসাই দিতেছে। ইহার ফলে জগতে সর্ব্বদাই অশান্তি ও দুঃখের আগুন জ্বলিতেছে, ইহার শেষ কোথায়?

অহঙ্কার যখন বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, লোভ যখন অত্যুগ্র হইয়া উঠে, তখন যাহা অনুচিত—তাহাই সে উচিত বোধ করে।

* হুগলী জেলায় বহুয়া ষ্টেশনের নিকটে কনুইবাঁকা গ্রামে বীরেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বপুরুষের বাস ছিল। জোড়াসাঁকো রাজবাটীর ম্যানেজার ৺অনুকূল ঘোষ তাঁহার জ্ঞাতি ছিলেন।

যেখানে কামনা বাসা বাঁধিয়া থাকে, সেখানে ক্রোধের আগুন সহজেই জ্বলিয়া উঠে। করুণার ধারা মরুদগ্ধ প্রাণ শীতল করে, সত্য মিথ্যা নির্ব্বাচন করে না। "মা" বলিলেই যদি মুক্তি হইত, তাহা হইলে জীবন নিরাময় দিব্য হওয়া সাধন সাপেক্ষ হইত না। কথা কাজ নয়, ভাষা ভাবের আভাস মাত্র। সত্যের ঘনীভূত রূপ ফুটাইতে সাধকের হৃদয় চিরিয়া রক্ত দিতে হয়।

কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের পূর্ব্বেই আমাদের সমাজ বিশেষরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ফলে প্রাচীন আর্য্য অনার্য্য, অসুর রাক্ষস, নরবানর সমাজ ভাঙ্গিয়া একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ ভাঙ্গিবার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু পুনর্গঠনের সনাতন উপকরণ সমূহ নিজের জীবন ও উপদেশের দ্বারা বর্ষভারতকে দিয়া গিয়াছেন। কলিযুগ ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের যুগ। ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্রে ভগবান প্রকট হইয়া কার্য্য করিতেছেন, আর নিত্য কুরুক্ষেত্রে অকপট নিত্য লীলায় তিনি বুদ্ধিরূপে সারথি হইয়া কার্য্য করিতেছেন।

প্রকৃত সাম্য ব্যভিচারের সৃষ্টি করে না। ব্রাহ্মণ শাসিত ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিদ্বেষমূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আইসে নাই। প্রত্যেকের নিজ নিজ কুলধর্ম্মে বিত্তার্জ্জন হইত বলিয়া প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট ছিল এবং প্রত্যেকের কর্ম্মেরই একটা স্বতন্ত্র মর্য্যাদা ছিল বলিয়া কেহই জিগীষা-পরায়ণ হয় নাই। ব্রাহ্মণ গঠিত হিন্দু সমাজ ছিল একটী বৃহৎ গোষ্ঠি, একান্নবর্ত্তী পরিবারের রাজসংস্করণ। হিন্দুধর্ম্ম না পড়িয়া যাঁহারা ঋষিদিগের হস্তনির্ম্মিত সনাতন সমাজকে ইউরোপের নকলে গড়িতে চাহেন, তাঁহাদের শূদ্রমুখে বৈদিক মন্ত্র শুনিতে চাহি না। কথায় বলে—

"থাক রে মন সয়ে
কার্ত্তিক মাসে ভাত দিব তোরে
ঝিঙ্গের ঝোল দিয়ে।"

মনু মহারাজ চতুর্ব্বর্ণের বাহিরের লোকদিগের সাধারণ নাম "দস্যু" রাখিয়াছেন।

পুরাণে আছে,—দেবাপী ও মরু নামক দুইজন রাজা কলাপ গ্রামে যোগ সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন। এই কলিযুগ আর বেশী দিন থাকিবে না। কলিযুগের অবসানে সত্যযুগের অভ্যুদয়ে সেই দুইজন রাজা আসিয়া আবার বর্ণাশ্রমাচার প্রবর্ত্তিত করিবেন।

মুসলমান ধর্ম্মের সাধারণ তন্ত্রতার বাণী, পুরোহিত-তন্ত্র হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার জন্য রঘুনন্দনকে নব্যস্মৃতি রচনা করিয়া হিন্দুসমাজের দুর্গ প্রাচীরকে দৃঢ় করিতে হইয়াছিল।

হিন্দু সমাজের পৃথক সত্তা রক্ষার জন্য মাধবাচার্য্য ও রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ ব্রাহ্মণ সমাজকে এমন শাসন ও অনুশাসনের শৃঙ্খলে বাঁধিলেন যে, তাহাতে উচ্চ ও নীচ হিন্দুতে দূরতা ঢের বেশী বাড়িয়া গেল এবং সমন্বয়ের নিষ্ঠা প্রবৃত্তির গতিরোধ হইয়া গেল।

দেবপূজায় সকাম মানুষের স্বাভাবিক অধিকার। যেখানে মহত্ত্ব ও বিভূতির প্রকাশ, মানুষ সেইখানেই মস্তক অবনত করিবে।

বাঙ্গালী জাতি মৃতব্যক্তির সাধনা করেন, কিন্তু জীবিত ব্যক্তি অবহেলিত হইয়াই থাকে। সেইজন্য কবি গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন,—
"ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি ম'র্‌লে তোরা আমার চিতায় দিবি মঠ?"
সেই কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

"চিতায় মঠ দিবে কেহ,
গড়্‌বে ষ্টাচ্যু অর্দ্ধ দেহ,
ছায়া চিত্র রাখ্‌বে কেহ,
কেউবা তৈল চিত্র-পট!

* * *

স্বর্গ কিম্বা নরক হ'তে
আস্‌ব তখন আকাশ পথে,
দেখ্‌তে আমার শোক সভা,
সঙ্গে নিয়ে অলকট্‌।”

আশা এক অনন্ত অফুরন্ত বিরহ বই আর কিছুই নহে। আকর্ষণই আশার আদি, অন্ত ও পরিসমাপ্তি। তাই ভোগীর ভোগ ফুরায় না, মানীর মানতৃষা কমে না, পদস্থের পদবৃদ্ধির অবধি নাই। অগ্নিতে যত ঘৃত দেওয়া যায়, ততই অগ্নির বিস্তৃতি ঘটে, নিবৃত্তি হয় না। বর্ষায় জল বাড়ে, স্রোত কমে না। মনের কালি তুলিতে গেলে একমাত্র সরলতার দ্বারাই তাহা উঠাইতে হইবে। পূর্ব্বজন্মের বহুপুণ্যফলে লোক সদ্বংশে জন্মলাভ করিয়া থাকেন এবং উহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া লোকে মনে করেন। গুণের আদর সর্ব্বত্রই। গুণ দেখাইতে না পারিলে এ দুনিয়া হইতে লোপ পাইতে হইবে, ইহা অনিবার্য্য।

বর্ষার বারি লইয়া প্রবাহিনীর ধারা যে দিন গিরিপাদ হইতে পূর্ণ ও পুষ্ট হইয়া নামিয়া থাকে, সে দিন তাহার সেই যৌবন-জল-তরঙ্গ যেমন রোধ করা যায় না—সে আপনার বলে ও আপনার আনন্দে আপনি বহিয়া যায়, মহানাদের মুক্তি কামনা তেমনই যখন দেশাত্মবোধের গিরিগাত্র হইতে উদ্‌গত দৃঢ় সংকল্পে পুষ্ট ও পূর্ণ হইয়া প্রবাহিত হয়, তখন কেহ তাহার গতিরোধ করিতে পারে না। জগতের ইতিহাসে কোথাও তাহার গতিরোধ হয় নাই, কখন হইবে না। কোনও কিছুকে কঠিনভাবে ধরিয়া থাকিয়া নূতনের গতিরোধ করা তাহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ। অন্তরে স্পন্দন না থাকিলে নূতনের দাবী নিয়া পথ চলা অসম্ভব।

কর্ম্ম—ভাবের বাহ্যমূর্ত্তি। ইউরোপ চাহে জড় জগতের সুখ, এবং ইহার সে চরম করিয়াছে। ঐ জড় প্রিয়তার জন্য পাশ্চাত্য সাম্য

মৈত্রী স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হইল না। ফলে পাশ্চাত্য জাতি সমূহ বিপ্লবের প্রলয়ঙ্কর ঝঙ্কার মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। স্থিতির একটা ধর্ম্ম আছে। বর্ত্তমান ইউরোপ প্রাচীন গ্রীকের উত্তরাধিকারী। গ্রীক-সভ্যতা জড়বাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, ভোগ তাহার চরম ঈপ্সিত। সেই বিশ্ববিজয়ী গ্রীক কিন্তু জয়ী হয় নাই। কোথায় সেই বিশ্ব বিস্ময় গ্রীক! কোথায় তাহাদের সাম্রাজ্য ঐশ্বর্য্য! গ্রীক মরিল, ইউরোপ তাহার উত্তরাধিকারী হইল। গ্রীককে যাহা স্বল্পায়ু করিয়াছে, ইউরোপকে তাহাই চিরজীবী করিবে কি?

জগতে দুইটি জাতির সভ্যতা সূর্য্য চন্দ্রের মত উদ্ভাসিত হইয়াছিল। একটি আর্য্য সভ্যতা, অপরটি যুনানী সভ্যতা। একজন সত্যের সন্ধানে অন্তর্মুখী, অপর জন বহির্মুখী। আর্য্যের আবিষ্কারে অধ্যাত্মতত্ত্ব, আর গ্রীকের জড়বাদ। নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন, সহানুভূতিহীন প্রতিযোগীতাই ইউরোপের মূলমন্ত্র। রোমজাতির স্মৃতিমাত্র অবশিষ্ট। ভারত যে ভারতের সনাতনী সত্তা বিশ্বনাথের সহিত রঙ্গমঞ্চে লীলা করিয়া আসিতেছে, সেই ভারত—নব্য ভারত—সৃষ্টির ভ্রান্ত প্রলোভনে কি গ্রীকের মত সৃষ্টির বক্ষ হইতে চিরতরে উৎসাদিত হইতে চাহে?

ঘটনাকে যাহারা কাল সমুদ্রের একটা অহেতুক বুদ্‌বুদ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের ধারণা ভ্রমাত্মক। অতি ক্ষুদ্র ঘটনাও বিশ্ব ব্যাপারের সহিত কার্য্য কারণ সূত্রে আবদ্ধ বিশ্বনাট্যের এক একটা অঙ্ক, এক একটা অধ্যায়; উহা সমগ্র মহানাট্যটিকে সার্থকতা দান করিবার এক একটি উপাদান। রাষ্ট্র-অধীনতা একটা সাময়িক সুষুপ্তি মাত্র, আসে—আবার যায়। ভারতের ব্রহ্মসিন্ধুর আপূর্য্যমান তপ্ত শোণিত পান করিতে বুভুক্ষু শিবা ও গৃধিনীর মত গ্রীক, শক, হুণ—পরবর্ত্তী দিনে তাতার, মঙ্গল, আরব আসিয়াছিল, তাহারা ভারতের বক্ষে রুদ্র মশাল লইয়া নাই—

নিশার দুঃস্বপ্নের মত বিলীয়মান হইয়াছে। ভারত কিন্তু আছে—ও থাকিবে।

সূর্য্যের ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত প্রবল বলিয়া সে এই জড় জগৎ ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহকে তাহার অধীন করিয়া রাখিয়াছে, পর্ব্বতের ব্যক্তিত্ব বেশী বলিয়া সে বিপুল দর্পে গম্ভীর হইয়া জগতের বুকের উপর দাঁড়াইয়া আছে। ব্যক্তিত্ব না থাকিলে সে ধূলা হইয়া মাটীতে মিশিয়া যাইত।

কীর্ত্তিই মানব জাতির অসাধারণ বল। কীর্ত্তি বিহীন মনুষ্যের জীবন ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। কীর্ত্তিই মানুষকে অমর করিয়া রাখে। একবার কীর্ত্তি লোপ হইলে লোক জন্মের মত উৎসন্ন হইয়া যায়।

কোন নির্দ্দিষ্ট মানবকে জানিতে হইলে তাহার বংশ, জন্মস্থান, যে ভাবে লালিত পালিত, শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি জানা আবশ্যক।

যৌবনান্তে বার্দ্ধক্যের কষাঘাত বড় মর্ম্ম বিদারক, মানুষ চায় তাই যৌবনকে ধরিয়া রাখিতে। দারিদ্র্য রাক্ষসীর প্রাণ বধ করিয়া সম্পদ লক্ষ্মীকে অচলা করিয়া রাখার জন্য জগতের মানুষ আজ দৈত্যের মত কর্ম্মবীর।

শুধু উদারতার বীজমন্ত্র আওড়াইলে সমাজ কল্যাণ হয় না, সমাজকে সবল করা চাই। সবলের সঙ্গে দুর্ব্বলের বন্ধুত্ব-চেষ্টা বিড়ম্বিত হইবার উপায় মাত্র।

মানুষের চরিত্র ফুটিয়া উঠে—বিপদে ও প্রলোভনে। মানুষ তাহার সুখের দিনে শৌর্য্যে, বীর্য্যে, গৌরব গরিমায়, দয়া-দাক্ষিণ্যে, ক্ষমা ও মহানুভবতা দেখাইতে অপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মনুষ্য-জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা লাভ করে নাই, সুখ দুঃখে পড়ে নাই, দুর্ব্বলের অবস্থা বুঝে নাই এবং শক্তি হাতে পায় নাই,—সে ব্যক্তি কখনও একটা জাতির আদর্শ হইতে পারে

না। আত্মার সহানুভবতার নাম ক্ষমা। অতীত ঘটনার জন্যই কেবল ক্ষমার প্রয়োজন হইয়া থাকে। অতীত পাপ রাশির জন্য ক্ষমা না পাইলে কেহ সৎপথে চলিতে পারে না। বিশ্বস্রষ্টার কাছে ক্ষমা নাই, আছে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া লওয়া। সেই জন্য নাস্তিকেরা ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেন।

সংসারে বা সমাজে মানুষের বিকাশ সম্পূর্ণ নয়, সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রশস্ত : সেখানে সমাজ বা সংসারের বন্ধন ছিঁড়িয়া মানুষ যখন সমগ্র দেশ বা পৃথিবীর নিকট আত্মপ্রকাশ করে, তখনই তাহাকে পূর্ণভাবে দেখিতে পাই। সেই বিকাশই মানুষকে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে মোহিত করিয়া রাখিতে পারে।

বসন্তকালে বিশ্ব-প্রকৃতির প্রাণের আবেগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রকাশিত হয়। বসন্তে ফুল ফুটে, বিশ্ব-প্রকৃতির প্রাণের আবেগ এই বিকশিত ফুলের মধ্যেই পরিব্যক্ত। এই ফুলগুলির শোভা ও সৌরভ একদিন অতি ক্ষুদ্র বীজের অবস্থার মধ্যে অবরুদ্ধ ছিল।

"গন্ধহীন ফুল কাছে ভ্রমর না যায়।
বিত্তহীন বংশযশ কেহ নাহি গায়॥"

বিচ্ছেদ ও বিরহ দুইটি আলাদা জিনীস। বিচ্ছেদ চির বিদায়ের নামান্তর, তাই বিচ্ছেদে জ্বালা আছে। বিরহ ক্ষণেকের অদর্শন মাত্র; "আবার পাইব" এই আশা আছে বলিয়া, বিরহের অদর্শন-ব্যথা দুঃখের হইয়াও সুখের। স্মৃতি তখনই মধুর হয়, যখনই জানি যে, এই স্মৃতির আড়ালে মিলন-পূর্ণিমা রজত-শুভ্র আলোয় বিকশিত হইয়া উঠিবে। যুগে যুগে বিরহের স্মৃতি পূজা এমনই ভাবে হইয়া আসিতেছে এবং হইবেও।

বিচ্ছেদে কাতর কবি গাহিতেছেন,—

"স্মৃতির মালা রইল আমার
বক্ষে দুলানো!
তোমার পরশ রইল আমার
প্রাণে বুলানো!

(২)

সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। কথিত আছে, রাজা যুবনাশ্ব পুত্রার্থী হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান সমাপন পূর্ব্বক শয়ন করেন। পরে রাত্রিকালে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যজ্ঞীয় কুম্ভ সলিল পান করায় ইহার গর্ভ হয়। তাহাতে যুবনাশ্বের বাম কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া মান্ধাতা জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। একদা ইনি পৃথিবী জয় করিয়া স্বর্গ জয়ে উদ্যত হইলে, দেবেন্দ্র ইহাকে মধু-তনয় লবণের পরাজয় করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে রাজা মান্ধাতা মধুবনে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ প্রার্থী হইলে, লবণের প্রক্ষিপ্ত শূলে নিহত হন।

দেবরাজ ইন্দ্রের চক্রান্তে মহর্ষি কপিলের কোপানলে চিত্রবীর্য্যের পূর্ব্বপুরুষগণ ভস্মীভূত হইলে, চিত্রবীর্য্য মহর্ষির তুষ্টি সাধন করিয়া "বশিষ্ঠ গঙ্গা দ্বারা পিতৃপুরুষগণের উদ্ধার হইবে"—বর গ্রহণ করেন। ইন্দ্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া চিত্রবীর্য্য ইন্দ্রের মুখ দর্শন করিবেন না বলিয়া কৃত-প্রতিজ্ঞ হইলে ও ইন্দ্র তাঁহাকে প্রসন্ন করিলে চিত্রবীর্য্য স্বীয় চরণে চক্ষুর সৃষ্টি করিয়া ইন্দ্রমুখ দর্শন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য সিংহপুর মহানাদে দেবগণ মহাশঙ্খ নিনাদ করিলেন, সেই অবধি স্থানের নাম হইল "মহানাদ" এবং এই স্থানেই চিত্রবীর্য্য বংশ প্রতিষ্ঠা করিলেন। চিত্রবীর্য্য,—ইন্দ্রের সারথিরূপে রথ চালনায় সৌকর্য্য দেখাইয়া চিত্ররথ নাম লাভ করেন।

অক্ষমালা—মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতি। গগনমণ্ডলে উত্তর দিকে সপ্তর্ষিমণ্ডলে মালাকারে বশিষ্ঠ সমীপবর্ত্তিনী অরুন্ধতি দেবীর বেষ্টন করিয়া থাকেন ; তজ্জন্য অক্ষ-পরিবেষ্টিতা মালা ইঁহার আছে বলিয়া অক্ষমালা নাম প্রসিদ্ধ।

অগস্ত্য আয়ুর্ব্বেদবিৎ ছিলেন, কুম্ভর পুত্র। মহানাদে ইঁহার আশ্রম ছিল। ইনি যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া নক্ষত্র লোক লাভ করেন। ইনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিধাতা। ইনি বিন্ধ্যপর্ব্বত হইয়া দ্রাবিড় দেশে ভ্রমণ করেন।

অগ্নিবাহু চিরজীবন ব্রহ্মচারী ছিলেন। জম্বুরাজ প্রিয়ব্রতের ঔরসে কাম্যার গর্ভসম্ভূত সন্তান।

অগ্নিবর্ণ মহারাজ সুদর্শনের পুত্র ছিলেন। সাতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা দোষে যক্ষ্মারোগে ইঁহার অকাল মৃত্যু ঘটে।

অগ্নিবেশ্য স্বীয় শিষ্য দ্রোণাচার্য্যের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র প্রদান করেন।

প্রজাপতি বৈরাজ পুত্র নকুল সিংহপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সিংহপুরে নবলা ও মনু চাক্ষুসের আশ্রম ছিল।

নারদ বীণা-চ্যুত আকাশ হইতে পতিত মাল্যের আঘাতে মহারাজ বৃদ্ধির পত্নীর অকালমৃত্যু ঘটে।

জয় নামক দেবগণ ব্রহ্মশাপে অজিতগণ নামে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া, ত্রিবেণীর সন্নিকট জয় নামক দেবগণের আশ্রম জয়পুর নামে খ্যাত হয়। বিদ্রার্চিতির ঔরসে সিংহিকা গর্ভসম্ভূত পুত্র অঞ্জক সিংহলপাটন প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্রহ্মার মানসপুত্র অত্রি, দক্ষকন্যা অনুসূয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তৎপুত্র সোম, দত্তাত্রেয় ও দুর্ব্বাসা। ইনি বৈদিক সামগীতি প্রণেতা ও অত্রি-সংহিতার গ্রন্থকার।

মহর্ষি কর্দ্দম সিংহলপাটনে বাস করিতেন। মহানাদেও তাঁহার আশ্রম ছিল। অঙ্গিরা সিংহলপাটনে অগ্নির সৃষ্টি করিয়া যজ্ঞাদির প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। ইনি বরুণের নিকট হইতে একটি নিত্যবৎসা পয়স্বিনী গবী পাইয়াছিলেন, পরে বরুণ আবার সেই ধেনুর পুনর্গ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করিলে, ইনি বলেন "দেখ, আমরা উভয়ে বন্ধু ও এক বংশজ, সুতরাং এই গবীটি লইয়া বিরোধ অসম্ভব।"

মহর্ষি বশিষ্ঠের উর্জ্জাগর্ভসম্ভূত পুত্র অনঘদেবের সিংহপুরে আশ্রম ছিল। ইনি মহানাদ রাজকন্যার অঙ্গরাগ লেপনে ও বসন ভূষণে সুসজ্জিত করিয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

অনিলের নাম বায়ু পুরাণে মলিন, ভাগবতে ইঁহার নাম বাভ্য, ব্রহ্মপুরাণে ধর্ম্মনেত্র, মহাভারতে ইলিন। ইঁহার মাতার নাম কালিন্দী।

অনুশাল্য সিংহপুর ধ্বংশ-বিনাশ বাসনায় সরোষে সিংহপুর অবরোধ করেন। পরে কৃষ্ণের উপদেশে যতিধর্ম্মাবলম্বনে জীবনের অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করেন।

সহস্রাক্ষ মহানাদে অন্নদা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিভূজা, বামহস্তে স্বর্ণময় অন্নপাত্রধারিণী, দক্ষিণ হস্তে দর্ব্বি ধারিণী, মহাদেবে অন্ন পরিবেশন কারিণী। মতান্তরে অন্নদা চতুর্ভূজা, হস্ত চতুষ্টয়ে—পদ্ম, অভয়, অঙ্কুশ, দান। আমাদিগের অন্নদা বা অন্নপূর্ণার সহিত ইটালির (ইউরোপ) ল্যাটিন গ্রন্থোক্ত অন্নপেরেণা (Annaperena) দেবীর সর্ব্বাঙ্গীন সৌসাদৃশ্য আছে। সহস্রাক্ষ অহঙ্কারে মদান্ধ হন, দেবতারা বিব্রত হইলে নারদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদিন নারদ মন্দার-উদ্যান (মান্দারণ) স্থিত পুষ্পে গ্রথিত মাল্য গলে পরিয়া সহস্রাক্ষের নিকট উপস্থিত হন। সহস্রাক্ষ সেই মাল্যের পুষ্প মন্দারোদ্যানে পাওয়া যায় শুনিয়া তথায় যাইলে, মহাদেব ইঁহার বিনাশ করেন।

কাম্বরাজ সুশর্ম্মার পর অন্ধ্র জাতীয় জনৈক ভৃত্য শিপ্রক যে রাজবংশ স্থাপন করেন, তাহা ৩০ জন রাজায় ৫০০ বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করেন।

তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণ ঋষি অবধূত মহানাদের আশ্রমে বাস করিতেন। কূটকের রাজা অর্হৎ মহানাদে বাস করিতেন।

ভগবতীর সিংহবাহিনী অষ্টভূজা মূর্ত্তি, এই মূর্ত্তিতে অভয়া সুরগণকে অভয় দান করিয়াছিলেন।

রজোগুণ বিশিষ্ট বীরপুরুষ শঙ্খনাভ প্রত্যহ লক্ষবার শঙ্খনাদ শুনিতেন। অন্য নাম দ্যুষিতাশ্ব, ভাগবতে বিধৃতি।

বশিষ্ঠ গঙ্গাতীরে বিষ্ণু শরীর হইতে বুদ্ধদেব নির্গত হইয়া নর্ম্মদা তীরে শিখিপুচ্ছধারী হইয়া অমর মূর্ত্তিতে দেখা দেন। ধর্ম্মারণ্য নামক নগরী সিংহপুরে ছিল। সিংহলপাটনে ক্রৌঞ্চারণ্য ছিল। সিংহলপাটনের জনৈক ব্যাধকন্যা অর্জ্জুনা,— মতঙ্গ মুনির প্রসন্ন নামক পুত্রের সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছিল।

সমুদ্র মন্থনে অগ্রে অলক্ষ্মীর উদ্ভব হয়। মুনিবর দুঃসহ ইহার পাণিগ্রহণ করেন। শেষে মুনিবর ইহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের পরামর্শে সিংহলপাটনে ইহাকে পরিত্যাগ করেন। দীপান্বিতা অমাবস্যায় মহানাদে ইহার পূজা প্রচলিত হয়।

জলসৃষ্টির সময়ে ভগবানের জঙ্ঘা হইতে তমোগুণাশ্রয়ে উদ্ভূত হয়— অসুর, এবং ব্রহ্মকন্যা সন্ধ্যার বিবাহে উদ্ভ্রান্ত হয়—ময়দানবের পুত্র— অসুর।

ব্রাহ্মণ আরুণি জ্যামিতি শাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। মহর্ষি আয়োদ—ধৌম্যের শিষ্য। আর্য্যভট্ট বীজগণিত ও আর্য্য-সিদ্ধান্তের প্রণেতা।

ইন্দ্র দেবগণের আবাস স্বর্গের অধিপতি। সম্বরাসুরের (Sumerians) রাজা উদব্রজের শতপুরের ৯৯টি পুর ধ্বংস করায় ইহার অপর নাম পুরন্দর। পুরাণ বর্ণিত ইন্দ্র এবং গ্রীস দেশের দেবগণের মধ্যে জিয়স একক্রিয়—সাদৃশ্যে ও সাম্যে অভেদ বলিয়া মনে হয়। দেবশত্রু বৃত্রাসুরের বধজন্য দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি দধীচির অস্থিতে বজ্র প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা অসুরকুল নির্মূল করেন। গ্রীকদের জিয়সের অস্ত্রও বজ্র, ইহাদ্বারা টাইটনদিগের উচ্ছেদ সাধন করেন। পারসীকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে ইন্দ্র বৃত্রঘ্ন বলিয়া পরিচিত। জেন্দ আবেস্তায় বৃত্র আসিরীয় দেশীয় দলপতি, ববুনগরের সমস্ত আর্য্যভূমি জনশূন্য করিতে উদ্যত হওয়ায়, যুদ্ধে ইন্দ্র কর্ত্তৃক সবংশে নিহত হয়। ইন্দ্র,—অদিতি গর্ভসম্ভূত মহর্ষি কশ্যপের পুত্র, পুলমা কন্যা শচী ইহার পত্নী, পুত্র—জয়ন্ত। ইহার হস্তী ঐরাবত, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, পুরী অমরাবতী, উদ্যান নন্দন, প্রাসাদ বৈজয়ন্ত। রাজা গৌরিবর সিংহ রচিত কবিতায় ইন্দ্রের মালাধর ও নীলাম্বর নামে আর দুই পুত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রজিৎ, ইন্দ্র জয় করেন, অপর নাম মেঘনাদ; ইনি লঙ্কেশ্বর রাবণের পুত্র। কাশ্মীরাধিপতি প্রথম বিভীষণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ সিংহপুর আক্রমণ করেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক ব্রাহ্মণ মহানাদের রাজার সভাসদ ছিলেন। গুর্জ্জর রাজ্য জয়ী সৌরাষ্ট্ররাজ ইন্দ্ররাজ পুত্র কর্ক সিংহপুর লুণ্ঠন করেন। মহর্ষি উতঙ্কের ন্যায় রাজা বসুদেব সিংহ মহানাদে আশ্রম স্থাপন করিয়া বহুবর্ষ কঠোর তপোরত ছিলেন। মহানাদে মহর্ষি বেদে আশ্রম স্থাপন করেন। ঋগ্বেদোক্ত রাজর্ষি ঋজ্রশ্ব, মহারাজ বৃষানিচের পুত্র ছিলেন। বৃষানিচার সন্তানগণ বৃটানিকা রাজ্য স্থাপন করেন।

স্মৃতিশাস্ত্রকার মুনি কাত্যায়ন, মহর্ষি গৌতমের পুত্র। কর্ম্মপ্রদীপ (ছন্দোগ পরিশিষ্ট) ইহারই প্রণীত। ব্যাকরণের বার্ত্তিককার বররুচি।

দুইজন পুরুষোত্তমের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন পাণিনীর বৃত্তিকার, অপরজন "রত্নমালা" ব্যাকরণ প্রণেতা।

দেবর্ষি নারদ সমস্ত বেদ, উপনিষদ, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ছিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ সমুদয় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। পারিজাত, রৈবত, সুমুখ, ধৌম্য প্রভৃতি কতিপয় তেজঃপুঞ্জ ঋষি সমভিব্যাহারে ভুবনত্রয়ে বিচরণ করিতেন।

মহর্ষি জতুকর্ণ মহানাদে আশ্রম করেন। মহিষাসুর বধের জন্য ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব দেহ হইতে শক্তির সমবায়ে হিমালয়স্থ কাত্যায়নীর সৃষ্টি। কাত্যায়নী দেবী দশমীতে মহিষাসুর বধ করেন। কালী, বৈদিক যুগে পবিত্র অগ্নির সপ্তজিহ্বার মধ্যে কৃষ্ণ জিহ্বা, পরে শিবোপরি প্রতিষ্ঠিতা মহাশক্তি।

মহর্ষি কামন্দক, সিংহল—পাটনের রাজা অঙ্গবিষ্টকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"যে ব্যক্তি ধর্ম্ম অর্থ ত্যাগ করিয়া কেবল কামনা পূরণে ব্যস্ত হয়, তাহার বুদ্ধি নষ্ট হয়। সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল মোহ, মোহ তাহাকে নাস্তিক ও দুরাচার করে ; এইরূপ ব্যক্তি রাজ-সমীপে দণ্ডার্হ।"

কালকেয় (Chaldians) অসুরগণের আদি মাতা কালকা সিংহল পাটন উচ্ছেদ করেন। হিরণ্যপুর ইহাদের নগর ছিল। পৌলম (Pelasgian) নামে আর এক জাতীয় দানব ইহাদিগের সহবাসী বা প্রতিবেশী ছিল। মহাবীর অর্জ্জুন নিবাত কবচ বধ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে এই অসুরদিগের (১৯০০ খ্রীঃ পূঃ) বধ করিয়াছিলেন।

বিষবিদ্যা (Poison) বিশারদ ব্রাহ্মণ কাশ্যপ মহানাদে বাস করিতেন। বৈদিক ইন্দ্রের উপাসক জনৈক ঋষি কুৎস মহানাদে বাস করিতেন। মহর্ষি পৈশ্বিঞ্জির শিষ্য কুথুমীর প্রচারিত সামবেদ শাখার

নাম কৌথুমী শাখা। সূর্য্যবংশীয় রাজা কুবলয়শ্ব মহানাদ লুণ্ঠনকারী ধুন্ধু অসুরকে নিহত করেন, ধুন্ধু নিধন জন্য মহা নাদ উপস্থিত হয়। মহর্ষি পথ্য মহানাদে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজ বাণকন্যা চিত্ররেখা চিত্রবিদ্যা কুশলা ছিলেন। চিত্রে অনিরুদ্ধ মূর্ত্তি দেখাইয়া, সহচরীর প্রিয়তমের সন্ধান পাইয়া, অনিরুদ্ধকে উষা সমীপে আনয়ন করেন; পরে মহারাজ বাণ কন্যাগৃহে অনিরুদ্ধকে দেখিয়া রোষভরে বধোদ্যত হইলে, তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। যাদবগণের কুলগুরু জ্যোতির্ব্বিদ মুনি গর্গ, বহুকাল মহানাদে বাস করেন। ইনি ব্রহ্মার পুত্র। তৎপুত্র গার্গ, মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য ছিলেন। ইনি ঋগ্বেদের অধ্যাপক, কাল যবনের পিতা, একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের পণ্ডিত এবং গার্গসংহিতা গ্রন্থের প্রণেতা। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য বৈয়াকরণ ঋষি গালব মহানাদে তপশ্চর্য্যায় ব্রহ্মচর্য্য পালনে জীবন যাপন করেন। গরুড় ও নারদ মুনিদ্বয়ের সহিত ইঁহার সবিশেষ হৃদ্যতা ছিল। সামবেদবেত্তা ঋষি গিঞ্চ মহানাদে বাস করিতেন।

চন্দ্রকেতু পুত্র চিত্রবীর্য্য প্রহ্লাদ। মহর্ষি কর্দ্দমের কন্যা চিত্রি,—মহামুনি অথর্ব্বের পত্নী; ইঁহার পুত্র মহর্ষি দধীচি ও অশ্বশিরা। চিত্রগুপ্ত—চতুর্দ্দশ যমের একজন। ইনি ব্রহ্মবাকে কোটি (Crete) নগরে গমন করিয়া চণ্ডিকার উদ্দেশ্যে তপস্যা করেন। ইনি ধর্ম্মশর্ম্মার কন্যা ইরাবতীর পাণিগ্রহণ করেন। মহানাদে জনশ্রুতি নামে এক রাজা ছিলেন, ছান্দোগ্য উপনিষদে ইঁহার নামের উল্লেখ আছে। জ্যামঘবংশীয় ব্যোম সিংহপুরে বাস করিতেন। জৈমিনি,—মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের শিষ্য, ইনি ব্যাসদেবের নিকট সামবেদ ও মহাভারত শিক্ষা করেন। ইঁহার রচিত ভারত ও পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন প্রসিদ্ধ। ইনি দ্রোণপুত্রের নিকট মার্কণ্ডেয় পুরাণ শ্রবণ করেন। ত্রয়োদশ মন্বন্তরের ইন্দ্র-শত্রু দানব টিট্টিভ (Teutons) শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক (ময়ূররূপে) নিহত হইয়াছিল।

তালজঙ্ঘা বংশীয়গণ সগরবংশ লুণ্ঠন করেন এবং ইঁহারা রাঢ়দেশে বসতি বিস্তার করেন।

ঋগ্বেদ প্রসিদ্ধ দেবশিল্পী ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যু বা সংজ্ঞা। মহর্ষি ভৃগুর সমবয়স্ক দংশ অসুর রাঢ়দেশে অনেক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ঋষি দভী সরস্বতীরুণা নামক তীর্থে অর্দ্ধকাল নামে এক তীর্থ নির্ম্মাণ করেন। নন্দিনী পূজার জন্য ছিনাআকনার উত্তরে পূর্ব্বকালে নন্দিনীপুর গ্রাম অবস্থিত ছিল। রাজা ভগীরথ সস্ত্রীক নন্দিনী পূজা করিয়া একটী পুত্র লাভ করেন বলিয়া তাঁহার নাম রঘু রাখিয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ দেবসেনের কন্যা দুঃখলব্ধিকা। ইহার সহিত যাহার বিবাহ হইত, সে বিবাহরাত্রেই পঞ্চত্ব পাইত। অনন্তর বিদূষক নামক ব্রাহ্মণ বরনামক রাক্ষসকে পরাস্ত করিয়া ইঁহার পাণিগ্রহণ করেন। দুর্ব্বাসা—মহর্ষি অত্রির ঔরসে অনুসূয়ার গর্ভে শিবাংশ সম্ভূত সন্তান, ইনি বামদেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ঋষি দেবদর্শ, মৌদগ, ব্রহ্মাবলি, শৌল্কায়নি, পিপ্পলাদ, এই পঞ্চঋষির আশ্রমস্থান মহানাদে ছিল। রাণী ধেনুমতী মহানাদে বাস করিতেন। পদ্মা,—সিংহলরাজ বৃহদ্রথের কন্যা ও কল্কীদেবের পত্নী। মহারাজ সগরসৃষ্ট শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছজাতি—পহ্লব, সিংহলপাটনে বাস করিত। পারস্য হইতে পহ্লব জাতি ভারত আক্রমণ করিত। সিংহলপাটনে পাটলা দেবীর পূজা হইত। পাটলিপুত্রের রাজা পুষ্পমিত্র রাজত্বকালে মহর্ষি পতঞ্জলি বর্ত্তমান ছিলেন। পৃষধ্র,—বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইনি গোহত্যা (গোমেধ যজ্ঞ) করায় মহর্ষি বশিষ্ঠের শাপে শূদ্র হইয়াছিলেন।

একজন স্মৃতিকার ও গোত্রকার ঋষি পৈঠীনসি মহানাদে বাস করিতেন। করূষ দেশের রাজা পৌণ্ড্রক রাঢ়ধামে এক মহতী নগর প্রস্তুত করেন। পূরিকা নগরীর রাজা (রাজা পৌরিক) রাঢ়ধামে পূরিকা নগর প্রস্তুত করেন। কণ্ঠবংশীয় রাজা ভূমি মিত্র মন্ত্রী কর্ত্তৃক

নিহত হন। রাজা শত্রুজিৎ সপ্তগ্রামে রাজত্ব করিতেন, তৎপুত্র ঋতধ্বজ যুদ্ধে পাতালকেতুর ভ্রাতা তালকেতু কূটবুদ্ধি বশে মুনিবেশ ধারণপূর্ব্বক ঋতধ্বজের মৃত্যুকথার মিথ্যা প্রচার করায় ইনি (শত্রুজিৎ) দেহত্যাগ করেন। মৌদ্গ, সামবেদজ্ঞ ঋষি দেবদর্শের শিষ্য। মৌদ্গল্য, মহর্ষি মুদ্গলের পরানুসৃত ব্রাহ্মণগণ। অন্ধভৃত্যবংশীয় রাজা যজ্ঞশ্রী সিংহপুর আক্রমণ করিয়াছিলেন। চন্দনা নদীর অনতিদূরে রাজা সৃষ্টিধর সিংহখাঁর অদ্যাপি নিবিড় জঙ্গলাকীর্ণ ভূষণা দুর্গের নষ্টাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। সিংহলপাটনের রাজা ক্ষেমমূর্ত্তি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বৃহৎক্ষেত্রের হস্তে নিহত হন। রাজা ক্ষেমমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠিত ভগবতীর শঙ্খচিল্লী মূর্ত্তি পূর্ব্বকালে মহানাদে ছিল। এই রাজার প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রদ বা বটুক ভৈরব বিগ্রহ মহানাদে ছিল। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা মহর্ষি কশ্যপের পত্নী ক্রোধার গর্ভে পিশাচ, রাক্ষস প্রভৃতির জন্ম হয়। ঔর্ব্ব—উর্ব্ব মুনির পুত্র। মতান্তরে ব্রহ্মার পুত্র, অপরত্র ভৃগুর পৌত্র। ভার্গব চ্যবনের ঔরসে আরুষীর জাত তেজস্বী ঋষি।

কৈকেয়ীর মানভঞ্জনে (রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ১০ম সর্গ) রাজা দশরথের উক্তিতে তাঁহার বিশাল রাজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়,—

"করিষ্যামি তব প্রীতিং সুকৃতেনাপি তে শপে।
যাবদাবর্ত্ততে চক্রং তাবতী মে বসুন্ধরা॥ ৩৬
দ্রাবিড়াঃ সিন্ধু সৌবিরাঃ সৌরাষ্ট্রা দক্ষিণাপথাঃ।
বঙ্গাঙ্গ মাগধা মৎস্যাঃ সমৃদ্ধাঃ কাশিকোশলাঃ॥ ৩৭"

অর্থাৎ—আমি সৎকর্ম্ম দ্বারা শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব; সূর্য্য যতদূর প্রকাশ করিয়া থাকেন, ততদূর পর্য্যন্ত আমার পৃথিবীতে অধিকার আছে,—সুসমৃদ্ধ দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবির, কোশল, কাশী, সৌরাষ্ট্র, মৎস্য, বঙ্গ, অঙ্গ, মাগধ এবং দক্ষিণ রাজ্য প্রভৃতি সমুদয় রাষ্ট্রই আমার অধীন।

মৌদ্গল্য সিংহবংশের মল্লভূমি রাঢ় বা গাঙ্গ্য প্রদেশের বহু ক্ষত্রিয়ের একটা যুদ্ধের কথা মহাভারতে লেখা আছে। এই যুদ্ধের প্রধান নেতা ভীষ্মের সহিতও পরশুরামের যুদ্ধ হইয়াছিল। তখন ভীষ্ম বৃদ্ধ নহেন, যুবা বা প্রৌঢ়। সুতরাং এক ব্যক্তির জীবনকাল মধ্যে রাম রাবণের যুদ্ধ-নেতা রাম ও মহাভারতের যুদ্ধ নেতা ভীষ্ম বিদ্যমান ছিলেন! যাঁহারা রামায়ণের যুদ্ধকে ত্রেতায় ও মহাভারতের যুদ্ধকে দ্বাপরের শেষে সংঘটিত মনে করেন এবং লক্ষ লক্ষ বৎসর যুগের পরিমাণ ধরেন, তাঁহারা একথার কি উত্তর দিবেন? বোধ হয় এই কারণেই পরশুরামকে চিরজীবী বলা হইয়াছে।

পৌরাণিক গল্পে আছে—পুরাকালে গিরিরাজির পাখা ছিল, ইহারা উড়িয়া বেড়াইত, এবং নানাস্থানে সহসা পতিত হওয়ায় সেই সকল স্থান বিনষ্ট হইয়া যাইত। দেবরাজ ইন্দ্র এই জন্য গিরিসমূহের পক্ষ ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন।

জৈন পুরাণে আছে—

* * * * *

জাবা দ্বীপের শ্রীকৃষ্ণের বংশ তালিকা—

ভরত নারায়ণ

ইনি লঙ্কার দশমুখ রাবণের বিনাশকর্ত্তা (?)
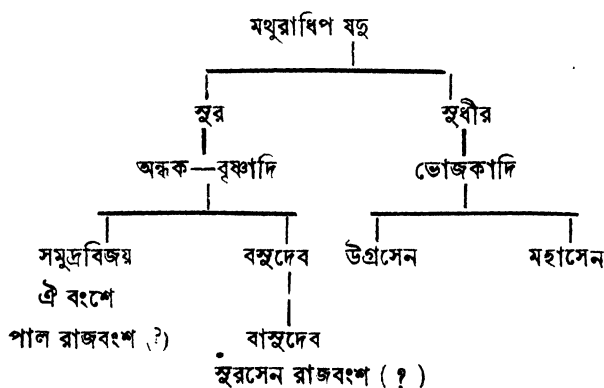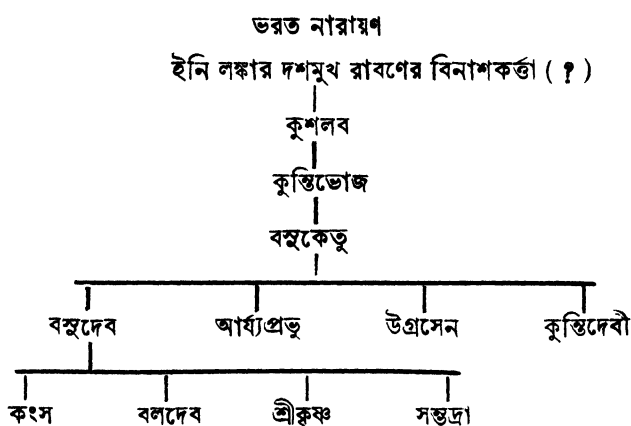
ইহার মধ্যে কতটুকু যে আমাদের পুরাণের বিকৃতি, তাহা বলা বড়ই কঠিন। মাতৃভূমিতে যে মূল কাণ্ডটি ছিল, তাহা হইতে স্বদেশে ও বিদেশে বিভিন্ন শাখা পল্লব ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

* * * * *

কুকি রাজবংশ—
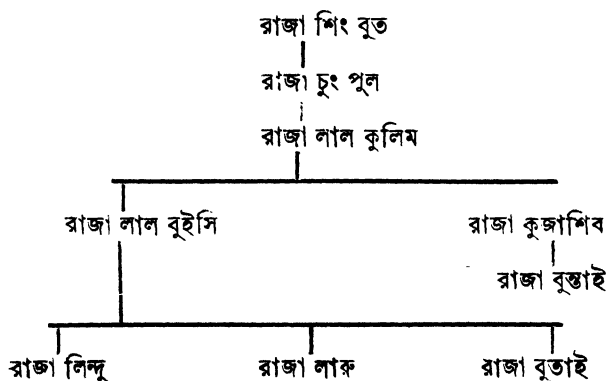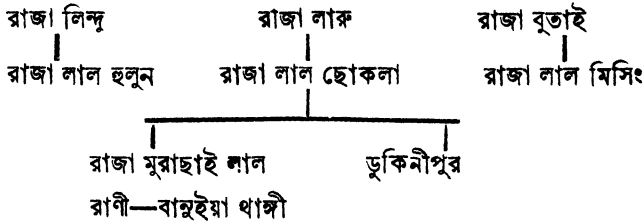
কুকি জাতি ভারতের আদিম অধিবাসী। এক্ষণে পর্ব্বতে জঙ্গলে ইহারা বাস করে। কুকিরা আজ অসভ্য হইলেও এক সময় ইহারা সভ্যতার চরম সীমায় উঠিয়াছিল এবং নাগাদের মত ইহারাও সমস্ত ভারতবর্ষ শাসন করিত। এই সময়কার ইতিহাস এত পুরাতন যে, পুরাণ-গ্রন্থ লেখকেরাও পান নাই। ইহারা দেখিতে গৌরবর্ণ, মুখশ্রী আর্য্য-দ্রাবিড়-মঙ্গল মিশ্রিত। ইহারা কাকুস্থ জাতির বংশধর।

*　　　*　　　*　　　*

অধর্ম্মের বংশতালিকা—
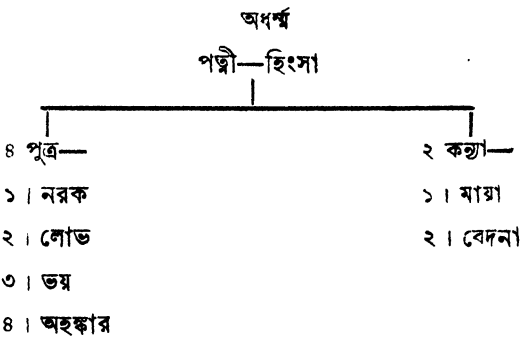
নরকের ঔরসে মায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন—মৃত্যু, বেদনার গর্ভে জন্মিলেন—দুঃখ।

(৩)

মহাভারতে কথিত হইয়াছে,—

"আত্মেব বেদিতব্যেষু প্রিয়েম্বিব হি জীবিতং।
ইতিহাসঃ প্রধানার্থঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বাগমেম্বয়ং॥"

অর্থাৎ—যেমন সমস্ত জ্ঞাতব্য বস্তু মধ্যে আত্মা, ও সকল প্রিয়বস্তু মধ্যে প্রাণ শ্রেষ্ঠ পদার্থ, সেইরূপ ইতিহাস সর্ব্বশাস্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আমাদের দেশে পর্ব্বত নাই; কেননা মৃত্তিকা প্রাচীন না হইলে পর্ব্বতের উৎপত্তি হয় না। ভূকম্পে পৃথ্বীবক্ষের কোন কোন স্থান ঢিপির ন্যায় উচ্চ হয়। হিমালয় পর্ব্বত যে কোন দিন সমুদ্র তটে বিরাজিত ছিল, তাহার প্রমাণও দুরূহ নহে।

ভূমি উৎপত্তির কারণ কি? পর্ব্বত গহ্বর ভেদ করিয়া নদী যখন সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন সেই প্রবল স্রোতবেগে ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলাখণ্ড মৃত্তিকা প্রভৃতি অতি বেগে ভাসিয়া আসে। ক্রমশঃ ঐ মাটির উপর মাটি পড়িতে পড়িতে নদীর উভয় পার্শ্বে চর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে সাগর সঙ্গমস্থলে নদীর মোহানায় যে সমস্ত চর উৎপন্ন হয়, তদুপরি মুহুর্মুহু সমুদ্র তরঙ্গ-বিক্ষিপ্ত বালুকারাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া অতি শীঘ্র সেই ভূমি উচ্চ হইয়া থাকে। উল্লিখিত কারণে নদীগর্ভস্থ চর জলসীমা অতিক্রম করিয়া উঠিবার পূর্ব্বে স্রোত অন্যদিকে ধাবিত হইলে বিল উৎপন্ন হয়। ঘাঘর নদীর চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে।

বঙ্গদেশের ভূমির পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া গিয়াছে মানবের বসতিও ক্রমে দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতেছে।

চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে জোয়ার হইয়া থাকে। কেননা উভয়েই স্বাভাবিক নিয়মে সমুদ্রের জল আকর্ষণ করে; কিন্তু সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটবর্ত্তী বলিয়া তাহার আকর্ষণও বেশী।

সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইলেই নদীতে জোয়ার হয়। অপভাষায় নদীকে "গাঙ্গ" বলে। মনে হয় গাঙ্গ শব্দ গঙ্গার অপভ্রংশ মাত্র।

স্বরূপকাটী থানার অন্তর্গত উমারের গড় নামক স্থানে জলের প্রায় তিন চারিহাত নীচে একটী বাঁধাঘাট দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কোন নৈসর্গিক কারণে উক্ত জনপদ বিলে পরিণত হইয়াছে।

১৭৬৯ খৃঃ অব্দে বা ১১৭৬ বঙ্গাব্দে বঙ্গদেশে তুমুল ঝড় বৃষ্টি ও তৎসহ সমুদ্রের জল উদ্বেলিত হইয়া অনেক স্থান প্রায় উৎসাদিত করিয়াছিল। সমুদ্রের তীরবর্ত্তী অনেক লোকালয় সেই সময় জন প্রাণী শূন্য হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে সুন্দরবনের মধ্যে অনেক দীঘি, পুষ্করিণী এবং অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

কুশদ্বীপের মধ্যভাগ দিয়া মহানাদের নিকট হইয়া মধুকুল্যা নামে নদী সিংহপুরে বর্ত্তমান ছিল। ভাগবত পুরাণের বর্ণিত মধুকুল্যা নদী এক্ষণে রাঢ় বা হুগলী জেলায় কোন অংশেই দৃষ্ট হয় না। এই মধুকুল্যা নদ তীরে বৃত্রাসুরের সিংহনাদে বা মহা-নাদে দেবতারা সকলেই বজ্রাহতের ন্যায় মুর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন।

কবি কালিদাসের মত বাল্মীকি, পাণিনি, বোপদেব, মল্লিনাথ প্রভৃতি আগে গো-মূর্খ, পরে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। ব্রহ্মার তনয় চিত্রগুপ্ত লেখনী-জীবি হইলে পর কুয়াসা কাটিয়া গেল, জ্ঞানের সূর্য্য উঠিল, দিঙ্মণ্ডল প্রকাশিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব্ব কবিত্বের স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইল।

বীণার ঝঙ্কার এক, আর কমলার ঝঙ্কার অন্য জিনিষ। মেঘনাদবধ-কাব্যকার মধুসূদন দত্ত সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, দাতব্য চিকিৎসালয়ে মরণ হইল, ইহা কায়স্থের কলঙ্ক।

"অন্নচিন্তা চমৎকার,
কালিদাসের আহাকার !!"

মুসলমানেরা বঙ্গদেশকে 'জানাতুল-বিলাৎ', 'জান্নাতাবাদ-ই-বাঙ্গলা' ও 'জোজাখপুর-ই-নিমাত' বলিত। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এদেশবাসী ঐ ম্লেচ্ছনাম উচ্চারণ করিতে অক্ষম হইত।

কলিযুগাব্দ সম্বলিত প্রাচীন লিপি বা দান পত্র ইত্যাদির সংখ্যা খুব কম।

সংস্কৃত "প্রগণ" শব্দ হইতে পরগণা প্রচলিত হইয়াছে।

নারায়ণ পালের তাম্রশাসনের উৎকলাধিপের এবং কামরূপাধিপের বিজয়ী বলিয়া কথিত জয়পালকে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে বিদায় দিয়া লাউসেন বা লাউসিংহকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় না।

রাজ্যভ্রষ্ট পালরাজগণ, দশঘরার পাল, সেনবংশ দীর্ঘংগার সেন ও শ্রীহীন সিংহরাজগণ আনুরগড়ে লজ্জাবনত বদন লোক-সমাজে দেখান ক্লেশকর বুঝিয়া স্বকীয় বিশিষ্টতা সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক, কায়স্থ জাতিতে আত্মগোপন করিয়াছেন।

সিদ্ধসাধক পূর্ণানন্দ গিরির বংশীয় ময়মনসিংহ জেলার মাঘান গ্রাম নিবাসী ৺কালীকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় "তত্ত্বাবশিষ্ট" নামে যে উৎকৃষ্ট স্মৃতি নিবন্ধ গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেক স্থলে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের মত খণ্ডন এবং অনেক স্থলে অতিরিক্ত বিষয় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইনি ময়মনসিংহের গৌরব।

রাজসাহী-বলিহার নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ময়মনসিংহ গৌরীপুরে অবস্থান করিতেছেন, ইনি একজন সুকবি। ইহার প্রণীত "মর্ম্মগাথা" "ছায়াপথ" "রামধনু" "নভোরেণু" "হাসির হল্লা" এই পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, এবং বিবিধ মাসিক-পত্রে তিনি কবিতা লিখিয়া থাকেন। যতীন বাবুর চেষ্টায় গৌরীপুর "পূর্ণিমা সম্মিলন" স্থাপিত হওয়ায় এই অঞ্চলে সাহিত্য চর্চ্চার পথ সুগম হইয়াছে।

৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মভূমি বীরসিংহ গ্রাম পূর্ব্বকালে হুগলী জেলার অন্তর্গত ছিল।

হুগলী বাবুগঞ্জ নিবাসী হাইকোর্টের উকিল ৺শম্ভুচরণ দে M.A.B.L. মহাশয় হুগলী জেলার ইতিহাস সঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহার "Hooghly Past and present" গ্রন্থে শোভা সিংহের বংশাবলী আছে।

মেদিনীপুর অঞ্চলে বাসুড়ায় বেণু রায় নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পুত্র মাহুন্তা।

মুসলমান রাজত্বকালে কোন স্থান বিশেষে অত্যাচার হউক বা না হউক, অত্যাচারের ভয়ে পল্লীবাসীরা দেব-মূর্ত্তি সকল পুষ্করিণীর জলে, নদীগর্ভে বা জঙ্গলে নিক্ষেপ করিত। এইভাবে কত মূর্ত্তি যে লোকচক্ষুর অন্তরালে পড়িয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

পিরুলী ব্রাহ্মণরা এক সময় নদীয়ায় হিন্দু সমাজ উৎসন্ন দিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

গন্ধর্ব্বসেন নামে এক রাজা নদীয়ায় রাজত্ব করিতেন।

দোসতি রণজিৎবাটী সিংহদের সাবর্ণক গোত্র।

ভাগীরথী ও অজয় নদের সঙ্গমস্থলের নিকটে উজানী বা উজ্জয়িনী গ্রাম বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের চিহ্নরাজি বক্ষে ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে।

কতুলপুর হইতে জাহানাবাদ যাইবার পথে এক বিস্তীর্ণ সরোবর বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহার নাম 'ভাগবত খাঁর দীঘি'।

মাধাইনগর প্রসিদ্ধ নিমগাছী জঙ্গলের অন্তর্গত। "ভগ্ন রাজবাড়ী"র আয়তন প্রায় দুই তিন বর্গ মাইল। উহার চতুর্দ্দিকে বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ। ঐ "বাড়ীর" কোনও স্থান খনন করিলে দুই এক হাত মাটীর নীচেই ইষ্টক ও স্থানে স্থানে প্রস্তরের খিলান দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ বাড়ীর এক স্থানে তিন হাত পরিধি একটী সুড়ঙ্গ আছে। তিন চারি হাত

নিম্নে নামিলে দেখা যায় যে, পাথরের একটী কপাট দ্বারা ঐ পথ আবদ্ধ। এই "বাড়ীর" স্থানে স্থানে পুষ্করিণী ও দীঘি আছে।

সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে, রাঢ়দেশের কোন একটী নগরে মাটির নীচে দেশ বিখ্যাত সুড়ঙ্গ ছিল, তথাকার বিজয় নামক রাজার বহুদিন পর্য্যন্ত পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি অনেক যাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন।

"হেরি সে পবিত্র ছবি রূপমুগ্ধ কবি।
বিফল প্রয়াসে চা'বে আঁকিতে ও ছবি॥"

নব্যভারত মাসিক পত্রে এক সময় প্রকাশিত হইয়াছিল,—মহানাদের চক্রপাণি দে নবাবের সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার কন্যাকে নবাব কাড়িয়া লইতে চাহিলে মহানাদ হইতে পলাইয়া একটি নিবিড় জঙ্গলে আশ্রয় লাভ করেন। সেই জঙ্গলে বিষ্ণুর নাভিস্থান পর্য্যন্ত পোঁতা আছে দেখিয়া ঐ স্থানে হরিনাভি নামে গ্রাম নির্ম্মাণ করেন (২৪ পরগণা জেলায়)। নব্যভারতে আরও লেখা আছে যে, নবাবের ভয়ে তিনি গৌড় হইতে পলাইয়া নৌকাযোগে মহানাদে আসিয়া ৺জটেশ্বরের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবতরণ করেন। মুসলমানেরা মহানাদে তাহার অনুসন্ধান করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই।

মুদ্গল রাজার পত্নী স্বামীর সাহায্যার্থে গরুর গাড়ী লইয়া যুদ্ধে গমন করেন (১০ম, ৯ অনু, ১০২ সুক্ত, ২ ঋক্‌বেদ দ্রষ্টব্য)।

আরব সমুদ্র তীরে, বেলুচিস্তান দেশের মেক্রাণ উপকুলের নিকট 'হিঙ্গলাজ' পাঠস্থানে অবস্থিত জ্বালাময়ী (জ্বালামুখী) দেবীর পীঠ তান্ত্রিক বিবরণ হইতেই পাওয়া যায়।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ও রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন খৃঃ পূঃ ২০০০ বর্ষ পূর্ব্বে ছিলেন। উতঙ্ক ঋষি খৃঃ পূঃ ৪০০০ বর্ষ পূর্ব্বে ছিলেন। মহর্ষি তৃণবিন্দু—খৃঃ পূঃ ১৯০০ বর্ষ পূর্ব্বের ব্যক্তি।

বিষ্ণু দ্বাপরের শেষে দেহত্যাগ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার ছিলেন।

জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞে মুদ্গল মুনি সদস্য ছিলেন।

মহর্ষি দীর্ঘতমা দ্বারা বলিরাজ বংশ রাঢ়ে বিস্তৃত হইল এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়কুল পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইল। হায়! আজ কলিকাতার উপবীতধারী নব্য-কায়েতরা "বিদ্যাভূষণ" "সরস্বতী" "সিদ্ধান্ত বারিধি" প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণদের গালাগালি দিয়া নিজেদের আর্য্যত্ব প্রমাণে ব্যস্ত !!!

ঘোলের সরবতের উপর গরম চা অতীব অ-বৈজ্ঞানিক। ইহাতে উদরাময় আনে। যে ব্রাহ্মণজাতি সর্ব্ব প্রথমে বিদ্যার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহারাই আজ মূর্খ বলিয়া প্রচারিত হয়। বেদ, উপনিষৎ শূদ্রের হাতে যেন ঘোলের সরবতের উপর গরম চা। পাশ্চাত্যের আদর্শে বিশ্বভারতী ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। গ্রাম্য টোল—পাঠশালার গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, আর পাশ্চাত্যের আদর্শে বিদ্যালাভের চেষ্টায়, কতকগুলা উপবীতধারী কায়েত+বদ্দীর অবতার হইয়াছে। ভারতের লোকের স্বাভাবিক আনন্দভাব, তেজ, শক্তি, নীতি ধর্ম্ম, সমাজ—কোথায় ভাসিয়া গেল!

কালিকা পুরাণ পাঠে জানা যায়, কামরূপের আদিম অধিবাসিগণই—কিরাত।

পুরাণে কিরাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ জাতিকে ভাগবত-ধর্ম্ম দান করা এবং শুদ্ধির বিষয় লিখিত আছে। শুদ্ধি এই শব্দের অর্থ বিশুদ্ধ অর্থাৎ পবিত্র অবস্থা। প্রাচীনকালে স্মৃতির যুগে পাঞ্চরাত্রগণ, ভাগবতগণ, বৌদ্ধগণ, শৈবগণ ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক হিন্দুগণ লক্ষ লক্ষ বিদেশীয় ম্লেচ্ছ জাতিকে স্ব-সমাজে স্থান দিয়াছিলেন। এ যুগেও "আর্য্য-সমাজী"র উদ্ভব হইয়াছে।

বাঙ্গালায় ভেকধারী খোট্টা বাঙ্গালী—দশনামী, সৎনামী, নৈষ্টিকী, রামকৃষ্ণি, মুক্তকচ্ছ বাবু-বৈরাগী, গেরুয়া পরা কত প্রকার সাধুই দেখা যাইতেছে। ইহার উপর উত্তর পশ্চিম—আগরায় এক রাধেশ্যামী দলের উদ্ভব হইয়াছে। তথায় তাহাদের এক মঠ আছে। এখানে রামকৃষ্ণিদের (বেলুড় মঠের) ন্যায় জাতি বিচার নাই। রাধেশ্যাম নামক একজন শিখ পোষ্টাফিসে কেরাণী ছিলেন, কোনও কারণে তাঁহার চাকরী যাওয়ায় বৈরাগ্যের উদয় হয় এবং সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে অনেকে তাঁহার চেলা হইয়াছিলেন। মতান্তরে রাধেশ্যাম নামক এক স্বতন্ত্র মতাবলম্বী শিখ-সাধু ছিলেন, পরবর্ত্তীকালে একজন পোষ্টাফিসের কর্ম্মচারী সাধু হইয়া রাধেশ্যামের মত প্রচার করেন এবং তিনি ও অন্যান্য চেলারাই মঠের উন্নতি করিয়াছিলেন। ইহারা ভজন গাহিয়া থাকেন। বাঙ্গলার সদ্গোপ ও সোণারবেণে জাতির মধ্যে অনেককে এই রাধেশ্যামিদলের চেলা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইহারাই কি "থুকপন্থী"?

পথভ্রষ্ট ব্যক্তির মনে যখন চৈতন্যের উদয় হয়, তখন সে গাহিয়া থাকে বিদ্যাসুন্দরের গান—

"শিব গড়তে বানর হোল,
এ কি বিধির বিড়ম্বনা।"

সমুদ্রবক্ষে ঝড়ের ভৈরবী তাণ্ডব লীলার মধ্যে একটা ভীষণ সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব আছে। শুধু তাহার তামাসা দেখিবার মানসে ধর্ম্মের ধ্রুব লক্ষ্য ছাড়া ও শিক্ষার সুদক্ষ নাবিক বিনা শান্তিময় তীর হইতে সমাজ-তরীকে ভাসাইয়া দিও না।

রাজনীতি, সমাজ সংস্কার, শাস্ত্রগ্রন্থের নূতন সংস্করণ, প্রভৃতি যে সকল অশুদ্ধ চিন্তা এদেশে আসিয়া উপদ্রব করিতেছে, তাহা স্বর্ণমৃগের ছলনা। ভারতলক্ষ্মীর সুস্থ চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার রাক্ষসী মায়া ভারত অভ্যুত্থান

করিতে চলিয়াছে তাহার সনাতনী অমৃত মার্গে। নব ভারতের রূপ রসায়ন জড়বাদে নাই, তাহার রূপের প্রতিষ্ঠান ভূমি হইতেছে—"পারমার্থিক স্বাধীনতা—মুক্তি"। অসুরের চাক্ষুস দৃষ্টির অনুমোদিত বিদ্যা ও বিজ্ঞানে আর্য্য সভ্যতার রূপ প্রতিভাত হইবে না।

বাইবেলে আছে—

"তখন তিনি (জিহোবা) অব্রামকে (ইব্রাহিম বা এব্রাহিম) কহিলেন, নিশ্চয় জানিও, তোমার সন্তানগণ পরদেশে প্রবাসী থাকিবে, এবং বিদেশী লোকদের দাস্য কর্ম্ম করিবে, লোকে তাহাদিগকে দুঃখ দিবে—চারিশত বর্ষ পর্য্যন্ত—আর তাহাদের চতুর্থ পুরুষ ফিরিয়া আসিবে।" ঐ চারিশত বর্ষ ও চতুর্থ পুরুষ কি?

—মার্ক ১২ অঃ ২৪ পদ। মথি ১৩ অঃ ৫২ পদ। (গ্রীক বাইবেল)।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন,—"জড় জয়ী হইবে, না,—চৈতন্য জয়ী হইবে? ভোগের জয় হইবে, না—ত্যাগের জয় হইবে?—আমাদের সিদ্ধান্ত এই ত্যাগ, প্রেম ও অপ্রতীকারই জগতে জয়ী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইহার প্রমাণ স্বরূপ দেখ—ইতিহাস আজ প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য নূতন জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছে—শূন্য হইতে উহাদের উদ্ভব—কিছুদিনের জন্য পাপ খেলা খেলিয়া আবার শূন্যে বিলীন হইতেছে। কিন্তু এই মহান্ জাতি—অনেক দুরদৃষ্ট, বিপদ ও দুঃখের ভার সত্ত্বেও জীবিত রহিয়াছে; কারণ এই জাতি ত্যাগের পথ অবলম্বন করিয়াছে।"

কত জাতি এদেশে বিজয়ী ও বিদ্রোহীর বেশে আসিয়া ভারতের আপনার হইয়া গেল; • পারিল না কেবল আফগান-পাঠানেরা। হুন-শকেরা সেবার দ্বারা সম্বন্ধকে সুন্দর করিয়া তুলিল। যে ভাবের গুণে মানুষের সম্বন্ধ স্থায়ী, প্রীতিকর ও সার্থক হইয়া উঠে, তাহার সন্ধান মুসলমানগণ এখনও পায় নাই। মুসলমান তুর্কি-তাতার ধনের লোভের

তাড়নায় এদেশে আসিয়াছিল, সেবা-প্রকৃতির প্রেরণা এখনও পায় নাই।

কলুষিত প্রাণের আহ্বানে মানুষের প্রাণ কখনও প্রকৃত সাড়া দিতে পারে না। কল্পিত অধিকারের আস্ফালন,—মোগল সাম্রাজ্য—বদ্ধদুয়ারে আঘাত পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

পরিচ্ছদ সম্পন্ন ব্যক্তি সভাজয় করেন। "টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া" পত্রে সভাপতির নিম্নলিখিত পঞ্চ লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে,—

১। সভাপতি ধীর এবং বিচক্ষণ হইবেন।

২। আইনে তাঁহার অন্ততঃ কিছু জ্ঞান থাকিবে।

৩। ব্যবহার এরূপ উচ্চ এবং উদার হইবে—যাহাতে লোকের চিত্ত স্বতঃই শ্রদ্ধার সহিত আকৃষ্ট হয়।

৪। কণ্ঠস্বর শ্রুতিমধুর এবং গম্ভীর।

৫। অপরের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকরণের ক্ষমতা থাকিবে।

(৪)

প্রতাপাদিত্যের নাম আজকাল দেশের সকলেই জানেন ও তাঁহার নামের দোহাই দিয়া অনেকে গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন, এবং কেহ কেহ মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বংশধর বলিয়াও দাবী করিতেছেন, এমন কথাও শুনা যাইতেছে! এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইলেও সাধারণের সন্দেহ দূরীকরণের জন্য আরও কিছু আলোচনা আবশ্যক।

প্রতাপাদিত্যের হিন্দু বংশধর জীবিত আছেন, তাহা এ যাবৎ কোন ঘটকগ্রন্থে বা অন্যত্রে পাওয়া যায় নাই। সুতরাং তাহা বিনা বিচারে ইতিহাসে স্থান পাইতে পারে না। প্রতাপাদিত্যের এগারটী পুত্র ছিল, সে সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যর যদুনাথ সরকার Kt., M. A. C, I. E. মহাশয় প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন, এবং এই দেশের মিথ্যা গল্পকথা যাহা নাটকে ও ইতিহাসে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।

"১৬১২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে প্রতাপাদিত্যের প্রাণে দেশ সেবা জাগে নাই।"—যদুনাথ সরকার। সুতরাং বারভূঞার অন্যতম বলিয়া যে প্রতাপাদিত্য গুহকে অমরত্ব দেওয়া হইয়াছে, তাহা খণ্ডন হইয়া গেল। এই দেশের মহাভুল, যদুনাথ সরকারই প্রথম দেখাইয়া প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে যে মত চলিতেছিল, খণ্ডন করিয়া ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

৺নবীনচন্দ্র সিংহ বলিয়াছেন,—"বিশ্বাসঘাতক গুহবংশীয় প্রতাপাদিত্যের জন্য আনুলিয়ার শেষ রাজা (বিদ্রোহী) লক্ষ্মীকান্ত সিংহ নিহত হন।"

"প্রতাপাদিত্যই রাজা সমর সিংহের মৃত্যুর কারণ।"—সংবাদ-রত্নাকর পত্রিকা, ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ।

বসন্ত রায়ের হত্যার পর গোবিন্দ রায় প্রতাপাদিত্যকে বাধা প্রদান করায় প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে নিহত করেন। বসন্ত রায়ের হত্যা প্রতাপের নিষ্ঠুরতার একটী বিশিষ্ট প্রমাণ।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বিবরণে দৃষ্ট হয় যে, কেদার রায়ের সহিত মানসিংহের যুদ্ধ হইয়াছিল। প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধের কোনই কথা নাই।

"প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি বার ভূঁইয়াদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।"

—ঐতিহাসিক মথুর মোহন বসু সাং হরিনাভী।

"প্রতাপাদিত্যের সৈন্যের সহিত মানসিংহের সংঘর্ষণ হওয়া ঐতিহাসিক সত্য নহে।"—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোবিন্দদাসের পদাবলীর ভণিতায়—প্রতাপ-অদিত নামোল্লেখ আছে। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় আমরা অবগত নহি।

রাল্‌ফ ফিচ্ এক সময়ে বঙ্গদেশে উপস্থিত হইয়া প্রসিদ্ধ ভূঁইয়াগণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; অথচ প্রতাপাদিত্যের কোন কথা তাঁহার বিবরণ হইতে জানা যায় না।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই দ্বাদশজন সামন্ত রাজের প্রসঙ্গ চলিয়া আসিতেছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে প্রধান বা মণ্ডলেশ্বর রাজার পার্শ্ববর্ত্তী নানা সম্বন্ধ যুক্ত দ্বাদশ প্রকার নৃপতির উল্লেখ আছে। মনুসংহিতা, ৭ম অধ্যায়, ১৫৫—৬ শ্লোক।

বাঙ্গলার বার ভূঞার কাণ্ডটিও প্রায় ঐ একই প্রকারের।

'হাতে বুকে বেষ্টিত বসেছে বার ভূঞা।
মহেন্দ্র খাঁ সিং আর বার জন বড় মিঞা॥"

—সংবাদ রত্নাকর।

'দিগ্বিজয় প্রকাশ'এ দেখিতে পাই, ধেনুকর্ণ রাজার পুত্র কণ্ঠহার 'বঙ্গভূষণ' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন এবং তিনি যশোহরের উত্তর ভাগ অধিকার করিয়া ভূষণ বা ভূষণা নাম রাখেন। তাঁহার বংশে এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া রাজা মুকুন্দরাম সিংহ ভূষণা দখল করিয়া বারভূঞার দলভুক্ত হন। তৎপুত্র রাজা শত্রুজিৎ সিংহ।

আবুল ফজলের বিরাট গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের নাম গন্ধ নাই। আইন-ই-আকবরী—এবং নিজামাউদ্দীন বা বদাউনীর বিস্তৃত ইতিহাস হইতে জানিতে পারি, মুনেম খাঁ, খাঁজাহান, টোডর মল্ল, বা মানসিংহের মত কত কৃতী মোগল সেনাপতি ২৫ বৎসর ধরিয়া বঙ্গভূমিতে বিদ্রোহ দমন করিলেন। কিন্তু সে বিদ্রোহী কে কে, তাহার পরিচয় নাই।

মানসিংহ বিরাটবাহিনী সঙ্গে লইয়া আমুলিয়ার প্রান্তরে আসিয়াছিলেন,—চাকদায় (প্রথম খণ্ড—৭৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। তিনি কাহার বিরুদ্ধে কিরূপে যুদ্ধ করিলেন, তাহা 'আকবর নামা' তন্ন তন্ন করিলেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু দেশের গাত্রে দেশীয়দিগের লুপ্ত ইতিহাসের পত্রে তাহার শতচিহ্ন এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

হিন্দু লেখকেরা নিজের জাতীয় চিত্র বিশেষভাবে রাখিয়া যান নাই।

মুসলমান লেখকেরা বলিয়াছেন যে, বারভূঞার মধ্যে পাঁচজন হিন্দু ছিলেন। তাঁহারা কেহই প্রতাপাদিত্যের উল্লেখ করেন নাই।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ঘোড়গাছী নিবাসী রাজা বসন্ত রায়ের বংশধর রাম গোপাল রায় মহাশয় 'সারতত্ত্ব তরঙ্গিণী' নামক এক কবিতা পুস্তক প্রণয়ন করেন। উহাতে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যে যে কথা আছে, তাহার সহিত ইতিহাসের কোন সামঞ্জস্য নাই।

যশোহরের প্রায় স্বাধীন রাজা ছিলেন—সূর্য্যকান্ত গুহ। তিনি জয়ন্তীরাজ শিবচন্দ্র গুহের পুত্র ছিলেন।

"প্রতাপাদিত্য মোগল বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া আসেন।" যশোর ও খুলনার ইতিহাস।

হিজলীর প্রাচীন ইতিহাস এখনও তমসাচ্ছন্ন। হিজলীর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের কোন রাজনৈতিক সম্পর্কের স্পষ্ট প্রমাণ নাই। বাহিরিয়া মুঠায় ভীমসিংহের বংশীয়গণের প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও মন্দির আছে।

"মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এ প্রবাদের মূলও খুঁজিয়া পাই না; এবং ইহা সত্য বলিয়া ধরিতে পারি না।"

"বিরুদ্ধ মতের সন্ধান না পাইলে হয়তঃ ইহারই উপর নির্ভর করিতে হইত; কিন্তু সমসাময়িক দুইজন লেখকের লিখিত ও পরস্পরের সমর্থিত বিবরণ উপেক্ষণীয় নহে।"—অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র।

প্রাচীন যশোর দুর্গ বলিতে হইলে তাহাকে নির্দ্দিষ্টভাবে মুকুন্দপুর ও নতিবপুর দুর্গ বলিব। ধূমঘাট দুর্গকে যশোর জেলার দুর্গও বলিব না। ইহা একটী ক্ষুদ্র গড়খাত স্থান ছিল মাত্র।

প্রতাপাদিত্য নিজ হস্তে খুল্লতাত বসন্ত রায়ের শিরশ্ছেদন করিয়া কাটা মুণ্ড নিজ হস্তে লইয়া নিজ প্রাসাদে ফিরিয়া আসেন, এবং তাঁহার খুল্লতাত পুত্রদের নিহত করেন। কেবল শিশু রাঘব রায়কে কচুবনে ফেলিয়া দিয়া রক্ষা করা হয় বলিয়া রাঘবের অপর নাম কচুরায় হইয়াছে।

"কার্ভালো (Carvalho) প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। প্রতাপাদিত্য পরিশেষে তাঁহাকে কৌশল পূর্ব্বক হত্যা করেন।—নিখিল নাথ রায়।

"প্রতাপাদিত্য (বারভূঁয়ার অন্যতম নেতা) কেদার রায়কে জয় করিয়াছিলেন।"—রাম রাম বসু।

"প্রতাপের সপ্তগ্রামে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি।"

—নিখিল নাথ রায়।

"প্রতাপাদিত্য যশোর হইতে ধূমঘাট স্বতন্ত্র করিয়া গঠন করেন এবং সম্ভবতঃ তাহা চাঁদ খাঁর রাজধানীর স্থলেই গঠিত হয়।"—ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ, ছিনা আকুনা।

ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে যে, "যমুনা ও ইচ্ছামতীর মিলন স্থলে ধূম্রঘট্ট পত্তন হয়।"

একজন প্রতাপাদিত্য সাগরদ্বীপের রাজা ছিলেন।

"কার্ভালোর হত্যা যে প্রতাপাদিত্যের নিষ্ঠুরতার আর একটী দৃষ্টান্ত, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।" নিখিল নাথ রায়।

কেদার রায়ের অধীনে কার্ভালো যেরূপ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সাধুবাদ না দিয়া ক্ষান্ত হওয়া যায় না।

"প্রতাপের ধূমঘাটে রাজত্বের পূর্ব্বে কেদার রায়. ঈশা খাঁ প্রভৃতি বারভূঁয়ার দল এজগৎ হইতে চির বিদায় লইয়াছিলেন।"

—কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাঙ্গালার বারভূঞা।"

"কোন দরিদ্রা বৃদ্ধা ভিক্ষার জন্য প্রতাপাদিত্যের নিকট বারংবার প্রার্থনা করায়, প্রতাপ তাহার কর্কশ রবে বিরক্ত হইয়া তাহার স্তন কর্ত্তনের আদেশ দেন।" —ঘটক-কারিকা।

"যশোরেশ্বরীকে মানসিংহের লইয়া যাওয়ার কোন প্রমাণ নাই।"

—পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'বাঙ্গালার ইতিহাস।'

কুলাচার্য্যগণ বলেন যে, "চাঁদরায় প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত হন।"

রাম রাম বসু প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত ইতিহাস না পাওয়ায় প্রবাদ অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত আমরা ধূমঘাটের রাজা প্রতাপাদিত্যের প্রকৃত ইতিহাস আবিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইলাম না। পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কার কৃত প্রতাপাদিত্য চরিত্র—রাম রাম বসুর গ্রন্থেরই অনুবাদ মাত্র।

জগতের সমস্ত প্রাচীন সভ্যজাতির অধঃপতনের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন।

গুহবংশীয় প্রতাপাদিত্যের বিষয়ে বা তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক বর্ণনা কেহই বলিতে পারেন না, ৺রাম রাম বসুর "প্রতাপাদিত্য"ও নয়।

"প্রতাপাদিত্য প্রবল প্রতাপে যশোহরে রাজত্ব করিতেন।" একথা আধুনিক লেখকেরা বলিতেছেন। রাম রাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত" পুস্তক পুরাতন। তাহাতে কি আছে, ইতিহাস পাঠক তাহা

দেখিয়া লইবেন। ইতিহাস - উপন্যাস নহে, সুতরাং প্রচলিত গল্পকথা, নাটক, উপকথা প্রভৃতি "মহানাদ" পুস্তকে স্থান পাইতে পারে না। নূতন আবিষ্কারের আলোকে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে অন্ধকার শিক্ষিত সমাজে দূরীভূত হইতেছে।

গুহবংশীয় প্রতাপাদিত্য স্বাধীনতা প্রিয় বীরপুরুষ ছিলেন কিনা, তাহাতেও মতভেদ আছে। সুকবি ভারতচন্দ্র রায়, প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতা ভিন্ন আর কিছুই নাই।

বর্ত্তমান কালের প্রচলিত নাটকগুলি কবির কল্পনা প্রসূত। তাহার কারণ সেই সকল প্রমাণ করিতে কাহারও একরত্তি উপাদান নাই।

কোনও ঘটকের গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যের বংশাবলী নাই। প্রতাপাদিত্য—গুহবংশীয় হইতে পারেন, কিন্তু তিনি কাহার পৌত্র বা প্রপৌত্র তাহার সঠিক প্রমাণ কাহারও নাই। তবে আন্দুলিয়ার সিংহ রাজবংশের সহিত প্রতাপাদিত্যের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কোনও পুস্তক অর্থাৎ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বের লিখিত পাণ্ডুলিপিও কেহ দেখাইতে পারেন নাই।

উদয়াদিত্য গুহের বংশধর কেহ বর্ত্তমান আছেন কিনা, তাহা সেই সমাজের লোকই বিচার করিবেন। প্রাচীন ঘটকেরা ভরত গুহকে বংশশূন্য বলিয়াছেন। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর লেখকেরা প্রতাপাদিত্য গুহকে ভরত গুহ হইতে ১৫শ পুরুষে বসাইতেছেন। ইহা কাল্পনিক কথা নহে কি?

ইতিহাসে কল্পনার স্থান নাই। সেজন্য সঠিক প্রমাণ না পাইলে প্রচলিত প্রতাপাদিত্য'কে 'বারভূঞা'র অন্যতম করিয়া, ১৬১২ খৃষ্টাব্দের ধূমঘাটের রাজা প্রতাপাদিত্য গুহকে,—সত্য গোপন করিয়া ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের খাঁচায় "কাশীতে স্বর্গপ্রাপ্তি" ঘটাইতে পারা যায় না।

মহানাদের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান পাটনা গ্রাম প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের পাটমহল ও গ্রীকদিগের বর্ণিত পালিবোথরা নামে কথিত হইত। গ্রীকেরা আমতা গ্রামকে আমিটিস বলিয়াছে।

সমুদ্র গড়ের (সমুদ্র শিখর গড়ের ?) ব্রাহ্মণ রাজা মুকুট রায় একজন ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন।

কল্যাণ শেখর ভূমের রাজা কল্যাণ শেখর মহারাজা চন্দ্রকেতুর কন্যাকে বিবাহ করিয়া (সমুদ্র) শিখর গড় যৌতুক স্বরূপ পাইয়াছিলেন। সুহ্মাধিপতি দেব সিংহকে কর্ণ সুবর্ণ রাজ শশাঙ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী মনে করি। ৯০৫ খৃষ্টাব্দে জয়পাল রাঢ়দেশ জয় করিতে অস্ত্র ধারণ করেন। এই সময়ে মহানাদের সিংহবংশ আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হন। প্রতাপান্বিত রাজগণের প্রিয় নিকেতন এখন হিংস্র শ্বাপদ সমাকুল ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। অর্দ্ধভগ্ন শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়, সুগড়গড়ে (সমুদ্রগড়ে ?) বিনোদ রায়ের বংশধর মনোহর সিংহ ছিলেন।

মহাকবি চন্দ বরদাই কৃত "পৃথ্বীরাজ রাসো" [কাশীর নাগরী প্রচারিণী সভা দ্বারা প্রকাশিত—২০ সময় (অধ্যায়)] গ্রন্থে লিখিত আছে,—পূর্ব্বদেশে সমুদ্র শিখর গড় একটি অতি সুদৃঢ় দুর্গ। সেখানে বিজয় শূর নামক যাদববংশীয় রাজা রাজ্য করিতেন। রাজ্যের পূর্ব্বসীমা সমুদ্র ছিল। তাঁহার দশ হাজার বর্ম্মাচ্ছাদিত অশ্বারোহী, তিন লক্ষ পদাতিক ও বহু রণকুঞ্জর ছিল। তাঁহার দশটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। তাঁহার অদ্বিতীয়া সুন্দরী রাণী পদ্ম সেনার গর্ভে পদ্মাবতী নাম্নী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অনন্দ সম্বৎ ১১৩০ (বিক্রম সম্বৎ ১২২১, ঈশাব্দ ১১৬৪) পদ্মাবতী বিবাহ যোগ্যা হইলে, রাজা বিজয় শূর পার্ব্বত্যদেশে কমাউঁ নগরের রাজা কুমোদ মণিকে আশীর্ব্বাদ করেন। কুমোদমণি সসৈন্যে সমুদ্রশিখরগড়ে আসিলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ

চোহান পদ্মাবতীকে হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। পদ্মাবতী একটি শুক পক্ষী পুষিয়াছিল, ঐ পক্ষী পৃথ্বীর রূপগুণ সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছিল। পদ্মাবতী পৃথ্বীকে হরণ করিতে ডাকিয়াছিলেন এবং শুকের গলায় পত্র বাঁধিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়াছিলেন। শুক একদিনে পত্র লইয়া গিয়াছিল এবং পৃথ্বীরাজ পাঁচ দিনে দিল্লী হইতে সমুদ্র শিখরে গিয়াছিলেন। দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তনের পর মহোবা নগরের রাজা পরমর্দ্দিদেবের (পরমলে) সহিত পৃথ্বীরাজের ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে পরমর্দ্দিদেব আপন রাজ্যের পশ্চিমার্দ্ধ ও মহোবা রাজধানী হারাইলেন। ইত্যাদি অনেক কথা আছে। এই ঘটনার পরবর্ত্তী দানপত্র ও শিলালেখ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল এম, এ মহাশয় "প্রবাসী" পত্রে এক সময় রাসোর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, "রাসোর কথাগুলি কল্পিত ও অনৈতিহাসিক রূপকথা মাত্র।" ইহা ৭৫০ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। যদি চন্দ বরদাইয়ের বর্ণিত ঐ কাহিনী কল্পিত গল্প না হইয়া ঐতিহাসিক হয়, তাহা হইলে বর্দ্ধমান জেলার এই সমুদ্রগড় কি রাসোর লিখিত সমুদ্রশিখরগড় ?

সেই প্রবাদ সত্য, যাহা অনেকে বলিয়া থাকেন। প্রাচীন গ্রন্থের কথাও সত্য, যদি সে পুস্তকের অস্তিত্ব থাকে। শিলালিপি ও তাম্রশাসন বিশ্বাসযোগ্য, যদি সেই শিলালিপি ও তাম্র শাসন প্রকৃত বাহির হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করা যায়।

মাৎস্য ন্যায় অর্থে—এনার্কি বা অরাজকতা। সমগ্র সমাজের শীর্ষস্থানে বসিয়া কর্ত্তৃত্ব লোভে স্বজাত্যবিরোধী, স্বধর্ম্মদ্রোহী সমাজ ধ্বংসকারী—মাৎস্য ন্যায়।

ব্রহ্মভাব—ব্রহ্মানুভূতি জাগ্রত করাই ধর্ম্ম।
মানুষের চেয়ে পশুর ঘ্রাণ শক্তি প্রবল।

সপ্তমণ্ডলী যথা—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ও অন্ধমন।

খৃষ্টীয় শতাব্দীতে কোন পুরাণকার দালভ্যবাদের * সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন। দালভ্যবাদ সত্য হইলে সূত্র সাহিত্যে, মনুতে ও যাজ্ঞবল্ক্যাদিতে উহার উৎপত্তি বিবরণ থাকিত।

বঙ্গদেশীয় বণিকগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে চীনদেশের বহুস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বিষয় শিল্প সংহিতা গ্রন্থে পাওয়া যায়।

মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদীর 'গণক তরঙ্গিণী' পাঠ করিলে অদ্ভূত সাগর প্রণেতা বল্লাল সেনকে মিথিলাধিপ বলিয়া মনে হয় এবং ইহাই সত্য হইবে।

লঘুভারতকার প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান আধিপত্য কালের ঢাকা বিক্রমপুর নগরে "প্রবাদ" (?) শুনিয়া লিখিয়াছেন—"মিথিলে যুদ্ধযাত্রায়াং বল্লালেহ ভূম্মৃতধ্বনিঃ।" এই শ্লোক অর্থশূন্য।

১২০০ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণ বণিকদের মধ্যে বল্লভানন্দ সমাজপতি ছিলেন।

দিনাজপুরের রক্ষিত শিবমন্দিরের ভগ্ন স্তম্ভে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায়, ৮৮৮ শকে বা ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে কাম্বোজ নৃপতি কর্ত্তৃক উক্ত শিবমন্দির নির্ম্মিত হয়।

পালবংশীয় সম্রাট কুমার পালের পর রাজা চন্দ্রকেতু রাঢ়েশ্বর হইয়াছিলেন। রাজা চন্দ্রকেতু কৈবর্ত্তপতিকে বিনাশ করিয়া তাঁহার পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন।

* নিঃক্ষত্রিয় করিবার সময় পরশুরাম দালভ্য ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আপনার আশ্রমে কোন ক্ষত্রিয় আশ্রয় লইয়াছে কিনা? (তৎ পূর্ব্বে কতকগুলি গর্ভবতী ক্ষত্রিয় রমণী দালভ্য ঋষির আশ্রমে আসিয়াছিলেন) ঋষি উত্তরে বলেন—"কায়স্থ"। পরশুরাম অর্থ না বুঝিতে পারিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন।

বীরভূম জেলার নাগর নগর ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিতগণের আবাসস্থান ছিল।

এই ভারতবর্ষ ভিন্ন অনেক 'বর্ষ' প্রাচীন ভারতের ভূগোলে উল্লিখিত আছে। নাভিবর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ, জম্বু, প্লক্ষ (Pacific ocean), শাল্মলী প্রভৃতি দ্বীপ, ও লবণেক্ষু সুরাসর্পি প্রভৃতি সমুদ্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে পরিচিত ছিল। সেই সমস্ত সহকারে যে পৃথিবী, সেই পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় মানব এই ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ জাতির শাসন-নিয়ম মানিয়া চলিত। *

বিশাল জ্ঞান-সমুদ্রের শ্রেষ্ঠরত্নের অনুশাসনও ছিল। আমাদের দেশের ঋষিগণ যেমন পাইয়াছেন, আর কোন দেশ তেমন পায় নাই। যদি বা কোন দিন পাইয়া থাকে, তবে এই প্রাচ্য সমুদ্রের অগাধ বারি হইতেই পাইয়াছিল ; অধুনা হারাইয়াছে বা হারাইতে বসিয়াছে, অথবা সেই রত্ন জনসাধারণের অবহেলায় অতলতলে লুক্কায়িত আছে, কেউ আর তার সন্ধান লয় না, প্রয়োজন মনে করে না।

যাহার প্রতিভার গতি যে দিকে, তাহাকে সেই দিকেই সাধনা করিবার সুযোগ দেওয়া হইত। সত্যকামের উপাখ্যানই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহর্ষি গৌতম সত্যকামকে "সত্যকুলজাত" জানিয়াই ব্রহ্মবিদ্যা দানে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। মহর্ষি গৌতম যেরূপ অন্তর্ভেদিনী ধীশক্তি এবং অধিকার বিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব।

আমাদের দেশের সভ্যতা আমাদিগকে বলিয়া দিত,—"তোমরা সকলে নিজের দেশের বাতাস গায়ে দিবে, নিজের দেশের পবিত্র জলে অভিষিক্ত হইয়া নিরাময় দেহে সুস্থচিত্তে পৃথিবীর বিত্তের অনুসন্ধান করিবে।

* "এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ ॥"

স্মরণাতীত সত্যযুগ হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত সকল যুগে, সকল দেশে সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু, গোমাতাকে এবং বসুন্ধরাকে সম্মান দেখাইয়া আসিতেছেন। বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, ভরদ্বাজ, রাজর্ষি জনক, শ্রীকৃষ্ণ, বিরাট রাজা, নকুল, সহদেব প্রভৃতি ঋষি ও রাজপুত্রগণ সকলেই গো-জাতির পরম ভক্ত ছিলেন। গো ও ব্রাহ্মণের উন্নতিতেই ভারত চিরকাল উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, আর আজ গো ও ব্রাহ্মণের অবনতিতেই ভারত অবনতির নিম্নতম গহ্বরে নিপতিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণদের নিকট হইতেই দিগ্‌দর্শন যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে। সগর রাজবংশই ইহার আবিষ্কর্ত্তা। ব্রাহ্মণ জাতি বস্তু তান্ত্রিক ও জড় জাগতিক ব্যাপারে অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়াছে। বেদুইন বা বেদে জাতির সহিত পারস্যের ও সীরিয়ার (সুরদেশ) বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ফলে (ইহার সহিত অসুর ও দেবতার জ্ঞান বিজ্ঞানের সংযোগ ঘটিয়াছিল) যে পালি সভ্যতার (খৃঃ পূঃ ১৫০০) সৃষ্টি হইয়াছিল,—খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে কপিলাবস্তু, বুদ্ধবস্তু, (আধুনিক Budapest) প্রভৃতি নগরে তাহা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তাহার পর পালি ভাষার সাহিত্যে নূতন কিছুই সৃষ্টি হয় নাই, বিজ্ঞানেরও কোন প্রগতি ঘটে নাই। বৌদ্ধ-সমাজ এখনও তাঁহাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্র-গ্রন্থগুলির উপরই নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন। প্রাচীন সিংহল পাটনের অধিবাসিগণ অত্যন্ত দেশভ্রমণ-প্রিয় জাতি ছিলেন।

বিষের সাহায্যে নরহত্যা বহুকাল হইতে, বোধকরি, সৃষ্টির আদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে শবদেহ পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারিতেন—কতদিন পূর্ব্বে, কি ভাবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা কি সেই হিন্দুর সন্তান, যাঁহারা একদা রামেশ্বর, তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী, ইলোর, মথুরাপুরী, ভুবনেশ্বর এবং কোণারক আদি স্থানে

গগনস্পর্শী বিশালায়তন অদ্রিসম গোপুরচয়মণ্ডিত বিশ্বমোহন দেবমন্দির রাজি নির্ম্মাণ করতঃ হিন্দু-স্থাপত্য এবং হিন্দু শিল্পের অতুলনীয় কীর্ত্তিচ্ছটা দ্বারা বিশ্ব মানবকে বিস্মিত করিয়াছিলেন ?

ঘটনা দ্বারাই জগতের পরিচয়। আদিকাল হইতে দেশ ও কালকে পৃথক পৃথক ভাবিতে ভাবিতে দেশ কালের সংহতি কি, তাহা ভাবিবার ক্ষমতাই মানবের নাই। কাল হইতে পৃথক ভাবে দেশকেই একটা সত্বা মনে করিতে গেলে জগৎ অনন্ত ও অসীম হইয়া পড়ে, কিন্তু আমাদের শ্রুতি স্মৃতিতে জগৎকে ব্রহ্মাণ্ড বলিয়াছে। অণ্ড যত বড়ই হউক অসীম হইতে পারে না। উহার একটা সীমা থাকিবে ; উহা সসীম হইবেই। কিন্তু শান্ত হইতে পারে না, অণ্ড সসীম কিন্তু অনন্ত। আমাদিগের জগৎ-জ্ঞান কেবল মাত্র ঘটনা জ্ঞান, ঘটনা বাদ দিলে জগতের আর আমরা কিছুই জানি না। ঘটনাও গতি মাত্র। জগতের ঘটনা সমস্তই শক্তির ক্রিয়া।

বিধর্ম্মীকে ইসলাম ধর্ম্মে কাফের বলে,—অন্ধকারকেও কাফের বলে। মহম্মদ কাফেরগণকে বলিতেছেন,—"তোমার ধর্ম্ম তোমার জন্য, আমার ধর্ম্ম আমার জন্য।" ইহা ধর্ম্ম-সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেছে ; বিধর্ম্মীকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে আনিবার আদেশ দিতেছেনা।

ভারতে চিরকালই ভগবানের অনুগ্রহ। বহুকাল হইতেই ভগবান ভারতে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া লোক শিক্ষার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। মানুষের মধ্য দিয়াই দেবতার আবির্ভাব আমরা বরাবর দেখিতে পাই।

কলিযুগে গঙ্গার সদৃশ তীর্থ নাই, কেশবের পর দেব নাই, এবং ভীষ্ম কহিয়াছেন—ব্রাহ্মণের অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নাই।

ভারতীয় বিধবাদের প্রগাঢ় স্বামীভক্তি দেখিয়া হৃদয়ে এক নূতন ভাব জাগিয়া উঠে, সহমরণ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড

বেণ্টিংক কর্ত্তৃক আইন দ্বারা সতীদাহ প্রথা বন্ধ হয়, ফলে দেশময় কুলটা স্ত্রীলোক ও বেশ্যায় নররক্ত শোষণ করিতেছে।

জাতি ভেদ ও বিবাহ বিধি এই দুইটিই হিন্দুত্বের ভিত্তি। ১লা এপ্রিল—১৯৩০ খৃষ্টাব্দের "সর্দ্দার বিবাহ আইন" দুরপনেয় কলঙ্ক ও মূঢ়তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

একদেশ দর্শিতার জন্য মনুষ্য অনেক সময় প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে না। সমগ্র প্রকৃতির গতি কল্যাণের দিকে। ঝটিকা ও বজ্রাঘাত বায়ুকে বিশুদ্ধ করে।

বাল্মীকি ভাল বাসিতেন—প্রভাত ও সান্ধ্য সূর্য্যের মনোহর মূর্ত্তি; ব্যাস ভালবাসিতেন—দিনদেবের বিরাট বিকাশ।

শকুন্তলার ক্রোধ প্রত্যেক প্রতারিতা সতীরই ক্রোধ, রতির শোক প্রত্যেক পতিব্রতা বিধবারই শোক।

পুরুষের প্রতি নারীর সহানুভূতি যখন মূর্ত্তি লইয়া দেখা দেয়, তখন বড় সুন্দর ও মধুর আস্বাদ দিয়া যায়।

রমণীরা যে পুরুষের চিত্ত হরণ করে, সৌন্দর্য্য তাহার প্রথম উপায় বটে, কিন্তু সে উপায় শেষ উপায় নহে। রূপ-বল শীঘ্র বিনষ্ট হয়। প্রথমে রূপ, তারপর গুণ চাই। লঙ্কা ও অযোধ্যার সংঘর্ষণে যে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহাই রামায়ণের বৃহৎ ব্যাপার। রামায়ণের দুইটি তুমুল কাণ্ডেরই মূলে দুইটি রমণীকে দেখিতে পাওয়া যায়। একজন মন্থরা, অন্যজন সূর্পনখা। মন্থরা লোকের কুচক্রী মন্ত্রণাময়ী মূর্ত্তি। মন্থরা অযোধ্যার রাজর্ষি সংসারের মহাকাব্য প্রকাশ করিয়াছিল। প্রকাশ করিয়াছিল রাজ-সংসারেও সত্য পালনার্থ এবং কর্ত্তব্য সাধনার্থ কঠোর ত্যাগধর্ম্ম পালনীয়। মন্থরার কল্পনায় রামচরিত্রের একেবারে বিরাট বিকাশ হয়। কবি অনেক দিনে, অনেক স্থান লইয়া সীতার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু মন্থরার চিত্র একদিনের ঘটনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ভালবাসা যতক্ষণ সংসারের ভোগ বিষয়ে থাকে, ততক্ষণ তাহার নাম কাম, আর সংসার থেকে তুলিয়া ভগবানে দিলেই তখন কাম আর থাকে না, তাহা প্রেম হইয়া যায়।

যদি প্রেম না থাকিত, তবে এই বিশ্ব সংসার ধ্বংস প্রাপ্ত হইত, তাই লতায় পাতায়—ফুলে, ফলে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, কেবল প্রেমময়ের প্রেম লীলার মূর্ত্তি নয়ন গোচর হয়। প্রেম ব্যতীত জগৎ থাকিতে পারেনা।

আমাদের মাতৃভূমির প্রশান্ত ক্রোড়ে সকলেই সস্নেহে স্থান পায়। আস্তিক ভারতবর্ষ জড়বাদী চার্ব্বাককে ঋষির আসনে বসাইয়াছে, নাস্তিক বুদ্ধকে অবতার বলিয়া পূজা করে।

লোকে সৎস্বভাব দ্বারা যেরূপ মান্য হইতে পারে, ধন বা বিদ্যা দ্বারা সেরূপ হইতে পারে না। শীলই পুরুষের প্রধান লক্ষণ।

স্বর্ণ পিঞ্জর অপেক্ষা কণ্টকাকীর্ণ মুক্ত বনভূমি অধিকতর সুখকর, দাসত্ব অপেক্ষা দারিদ্র্য সুখদায়ক।

ঠাকুর নেড়া হরিদাসকে যখন বাইশটি বাজারে মুসলমানগণ প্রহারে জর্জ্জরিত করে, তখন যে সকল হিন্দু জমিদার তাঁহাকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হন, মহানাদের সিংহবংশ তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন।

যাহার গানে ত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার নাম গায়ত্রী। গায়ত্রী ব্রহ্মার পত্নী। একদা ব্রহ্মা যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়া, সাবিত্রী আনয়নের জন্য ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। সাবিত্রী গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকায় কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিতে বলেন, তাহাতে ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া পুনর্দার গ্রহণার্থ কন্যান্বেষণে ইন্দ্রের প্রতি আদেশ করেন। ইন্দ্র উপযুক্ত বোধে এক গোপকন্যাকে আনয়ন করেন ও ব্রহ্মা তাঁহার পাণি গ্রহণ করিয়া সেই গোপকন্যার সহিত যজ্ঞসাধনে প্রবৃত্ত হন। এই গোপকন্যাই গায়ত্রী।

চন্দ্র—দেবতা, সমুদ্র মন্থনকালে ইহাঁর জন্ম হয়, ইনি লোকপাল। শ্বেতবর্ণ দশাশ্ববাহিত ত্রিচক্র রথে বিচরণ করেন। ইনি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। গুরুপত্নী তারাকে হরণ করিয়া কলঙ্কী হন এবং অসুরগণের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করায় দেবাসুরে তুমুল সংগ্রাম সংঘটিত হয়। পরে বিধাতা মধ্যস্থ হইয়া বৃহস্পতিকে তারা প্রত্যর্পণ দ্বারা বিবাদের মীমাংসা করেন। ঐ সময় ইহার ঔরসে তারার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল, তাহাতে বুধের (Put) উদ্ভব হয়। ইহার সপত্নী গর্ভজ পুত্রের নাম বর্চ্চ (Baccus)।

চার্ব্বাক—দুর্য্যোধনের জনৈক রাক্ষস বন্ধু, একজন দার্শনিক ঋষি। ইহার স্বনাম প্রসিদ্ধ দর্শনশাস্ত্রে সচেতন দেহ ভিন্ন আত্মা নাই, সুখই পরম পুরুষার্থ, প্রত্যক্ষ মাত্রই প্রমাণ। যতকাল জীবিত থাকিবে ততকাল সুখে থাকিবে, মৃতের সেই শরীর ভস্ম হইলে তাহার আর পুনরাবির্ভাব অসম্ভব। ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে গিয়া আত্মার, কষ্টভোগ মূঢ়তামাত্র। পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি হইতে যাবতীয় পার্থিব স্থূল পদার্থের সৃষ্টি! পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগে চৈতন্য শক্তির আবির্ভাব হয়, আর তাহার বিলয়ে—চৈতন্যের লোপে অচেতন অবস্থাই মৃত্যু!

আর্য্য মহাবীর—জৈন শাস্ত্রোক্ত সিদ্ধপুরুষ। একশত বৎসর জীবিত থাকিয়া মহানাদে স্বর্গারোহণ করেন। জৈন সম্বৎ ২৪৯ বৎসর পরে ইহার মৃত্যু হয়।

১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে আকবরের প্রতিষ্ঠিত নূতন ধর্ম্ম চলিত হইয়া আসিতেছে। *

* দিল্লীর মোগল আকবর মুসলমান হইলেও চগীতাই রাজপুত জাতির বংশধর ছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এদেশে পরস্পর বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি থাকিলে ভারতের অনিষ্ট হইবে। এজন্য তিনি হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতির ধর্ম্মমতের মিশ্রণে ব্রাহ্মণদের সহায়তায় এক নূতন ধর্ম্ম মতের উদ্ভাবন করেন। দারা সেকোর হত্যার পর আরংজীবের জন্য তাহা নষ্ট হয়।

মহানাদে বলরাম নামক জনৈক চৌকিদার "বলরাম ভজা" মতের প্রবর্ত্তক। ইহারা কর্ত্তাভজা।

মুসলমান আক্রমণে ভারত ভূমি নিপীড়িত হইয়া পড়ে। তখনও ধর্ম্ম প্রবাহের গতি চলিতে থাকে। রামানন্দ, কবীর, বল্লভাচার্য্য, চৈতন্য, নানক, তুকারাম, রামদাস, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্র নাথ দত্ত) প্রভৃতির সংস্থাপিত সম্প্রদায় সমূহ বর্ত্তমান সময়েও সেই ধর্ম্ম-প্রবাহের পরিচয় দিয়া থাকে।

মহানাদের রাজাদের পাঁজি গণিবার দক্ষ লোক নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের নাম ছিল 'জোশী,' "ময়নাবতীর গানে" ঐ নাম আছে। রাজবাটীতে 'ঘড়ীয়াল' থাকিত। ঘটিকা দেখিয়া বেলা নিরূপণ না করিলে রাজ-কৃত্য সম্পন্ন হইতে পারিত না। ঘটিকা, এক মাপ ঘট; তাম্র নির্ম্মিত। ইহার তলে সরু ছিদ্র থাকিত। জলে ভাসাইয়া দিয়া যত সময়ে ঘটিকা জলপূর্ণ হইয়া ডুবিয়া পড়িত, তত সময়ের নাম এক 'ঘটিকা'। ঘটিকার পরিমাণ এমন যে, এক অহোরাত্রে ঠিক ষাটবার ডুবিত। এক ঘটিকার জলে ৬০ পল হইত। ইহা হইতেই এক ঘটিকার ৬০ ভাগের এক ভাগ কালের নাম 'পল'। এক ঘটিকা কাল ইদানীং ঘড়ীতে ২৪ মিনিট। সপ্তঘটী বেলা হইলে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের (সিংহের) সভা ভঙ্গ হইত। এক ঘটিকা বেলা হইলে সভা মণ্ডপের এক স্তম্ভে বা প্রাচীরে দণ্ডাকার চিহ্ন বা দাঁড়ী করা হইত। দাঁড়ী সংস্কৃতে দণ্ড। ইহা হইতে ঘটিকা অর্থে বঙ্গে দণ্ড চলিয়াছে। ঘটিকার অপর নাম নাডী। বঙ্গের পাঁজি নাডী, নাড়ী, নালী বা নল পরিবর্ত্তে "দণ্ড" নাম ধরিয়াছে। কত দিন? রাজা মহেন্দ্র খাঁ সিংহ ইহার প্রবর্ত্তক। রাঘবানন্দ কৃত "সিদ্ধান্ত রহস্য" ও "দিন চন্দ্রিকা" পঞ্জিকাকারের নিকট সমাদরের যোগ্য বটে। প্রথম খানির অব্দ ১৫১৩ শক এবং দ্বিতীয় খানির ১৫২১ শক। তিনি মহানাদের রাজার সভাসদ

ছিলেন। তিনি তাঁহার অভিপ্রেত রাঢ় রাজ্যের পাঁজি গণিবার করণ লিখিয়াছেন। ১৪৫০ শকে "জাতকার্ণব" নামে এক করণ প্রণীত হইয়াছিল। "করণ" পাঁজি গণিবার বই। এই গ্রন্থ রাজা পৃথ্বীধর সিংহের লেখা। তাঁহার উপাধি "বরাহ মিহিরাচার্য্য" ছিল। এত বড় উপাধি রাজদত্ত হইবার কথা। আম্বুলিয়ার রাজা বীর হাম্বির সিংহ তাঁহাকে (নিজ ভ্রাতা) রাজ জ্যোতিষী করিয়াছিলেন। ১৪৪২ শকে গণেশ দৈবজ্ঞ 'গ্রহ লাঘব'' নামক করণ লিখিয়াছিলেন। কাশীর মকরন্দ (১৪০০ শক) এবং পুরীর ভাস্বতী (১০২১ শক) "বীজ" প্রয়োগ করিয়াছিলেন। মিহিরাচার্য্য হইতে জানিতে পারা যায় যে, পূর্ব্বকালে চন্দ্রগ্রহণের কাল, কখনও পূর্ণিমার কাল দেখিয়া দেশান্তর পরিমিত হইত।

জাতকার্ণবের টীকাকার রমাকান্ত শর্ম্মা টীকা লিখিতে বসিয়া 'স্বদেশ' ভুলেন নাই। লিখিয়াছেন—"রাঢ়ায়াং পঞ্চাঙ্গুলং মধ্যাহ্ন বিষুবচ্ছায়া।" কিন্তু সে 'রাঢ়া' কোথায়? মূল রাঢ়া খট্টাঙ্গ দেশ, যে—রাঢ়দেশের বহু পশ্চিমে গিয়া পড়িতেছে। রমাকান্ত শর্ম্মা যে আধুনিক নহেন, তাহা খট্টাঙ্গ দেশ নাম হইতে বুঝিতেছি। নবীনচন্দ্র সিংহ একখানি করণ গ্রন্থ প্রাপ্ত হন, তাহার নাম "গ্রহণাটবী"। হস্তলিপির সব অক্ষর সহজে পড়িতে পারেন নাই। ব, র অক্ষর, আকারে একই (র=ব), ৫ অঙ্কের আকার ইংরাজি ৬ অঙ্কের তুল্য। বানানে 'অংশ' না লিখিয়া 'অঙশ' লেখা। মহানাদে প্রায় একশত বর্ষ পূর্ব্বে "রামী" নামে একখানা বই ছিল, তাহাতে 'অংশ' স্থলে 'অঙশ' ছিল। এই পুথীর সঙ্গে সপ্ত সমুদ্র বেষ্টিত জম্বুদ্বীপের বৃহৎ চিত্র ও কোণে কোণে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ছিল। ১৫৬৬ শকে রামচন্দ্র শর্ম্মা "দিন কৌমুদী" নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাঘবানন্দ মহানাদে ছিলেন। সেকালে নবদ্বীপ রাঢ়ের মধ্যে ছিল। উজ্জয়িনী নামও

ভূমধ্য রেখার সংজ্ঞামাত্র ; সূর্য্য সিদ্ধান্ত মতে গণনা করিলে যেখানে পড়ে, সেখানে উজ্জয়িনী। রমাকান্তের "মূল রাঢ়া" মহানাদ বা দক্ষিণ রাঢ়।

রাঢ়ীয় শ্রীনিবাসোক্ত দীপিকা নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ মহানাদে পাওয়া গিয়াছিল, উড়িষ্যায় প্রচলিত আছে। রাজা পৃথ্বীধর সিংহ রাঢ়ে সংক্রমণ দিন পূর্ব্বমাসে ধরিতে আরম্ভ করেন। পূর্ব্ব ভারতে মৌদ্গল্য গোত্রীয় সিংহ হরিশ্চন্দ্র সৌর গণনা প্রবর্ত্তিত করেন। এই রাজার নাম লইয়া বাঙ্গালী গৌরব করে না। আমরা "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের" আসরে নামিলেই মগধ ও কনৌজের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যেন বাঙ্গালীর, মহানাদের যত কিছু উৎস, সবের উৎস উত্তর পশ্চিমে! অন্ততঃ এখানে সে উৎস শুষ্ক ; হয় মহানাদে—রাঢ়ে অন্বেষণ করিতে হইবে।

এই যে বাঙ্গালা দেশের আপামর সাধারণ অগণ্য পূজা পার্ব্বণ পালিয়া আসিতেছে, প্রত্যেকটির অন্তরালে অতীত ইতিহাস অনুসন্ধিৎসুর প্রতীক্ষা করিতেছে। মহানাদের সিংহবংশের কুর্শীনামায় দেখিয়াছিলাম শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের ১০৮ পুরুষ অতীত হইলে মহানাদে চন্দ্র রাজবংশের উদ্ভব হয়। পুরাণে পুরুষ গণিয়া বংশাবলীর আদিপুরুষের তারিখ ধরিয়া যাইতে বলে নাই, পঞ্জিকাকার গণিয়া আসিতেছেন। প্রায় দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে রাঢ়ে (দক্ষিণ) বগড়ীর গণিত পাঁজি চলিত। বগড়ী এক পরগণার নাম, মহানাদের দক্ষিণ পশ্চিমে। বক-দ্বীপ নামের অপভ্রংশ বগড়ী বা বাগ্দী। এখানে নাকি বকাসুর নামে এক রাজা ছিলেন। বগড়ী পরগণায় আইচ নামে এক রাজবংশ ছিল। সে বংশ উচ্ছেদ করিয়া মহানাদের মৌদ্গল্য গোত্রীয় সিংহবংশ রাজত্ব বিস্তার করেন। সিংহবংশের সময় ছাতনা, গড়বেতায় সিংহবংশের আশ্রয়ে বহু ব্রাহ্মণ বগড়ীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এককালে গড়বেতা এই পরাক্রমশালী সিংহবংশের রাজধানী ছিল। পুরাতন পাঁজি

উল্‌টাইলে সিংহরাজবংশের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। একখানি পুরাতন পাঁজিতে লেখা আছে,—হরিশ্চন্দ্র, মণিশ্চন্দ্র, তেজশেখর, বিক্রমাদিত্য, বিক্রম সিংহ, লাউসিংহ, বল্লাল সেন, দেপাল, ভূপাল, মহীপাল, রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন। এই হরিশ্চন্দ্র মৌদগল্য গোত্রীয় সিংহবংশের আদিপুরুষ, ধর্ম্ম মঙ্গলের হরিশ্চন্দ্র রাজা। আশ্চর্য্যের বিষয় দক্ষিণ রাঢ়বাসী এই পঞ্জিকাকার লক্ষণ সেন ও ধর্ম্মপালের নাম শুনেন নাই। রামলোচন সিংহ রচিত পাঁজিতে আছে,—"চন্দ্রবংশে যুধিষ্ঠিরাদি ১২০ জন রাজা ৩৬৯৫ বৎসর, ময়নাঙ্গনাদি যবন বংশোদ্ভব ৬০ জন ১২৪৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর সাহ আকবর সানি শাসন সময়ে ইংলণ্ড দেশীয় ম্লেচ্ছ রাজা ভারতভূমি শাসন করিতে আসিয়াছেন।" রামলোচন সিংহ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ৪০ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন।

৫৯৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রবংশের সমাপ্তি হয়। ইতিহাসে একথা পাই না, পুরাণেও পাই না। কিন্তু দেখিতেছি, ঠিক ঐ অব্দে আমাদের বাঙ্গলা সনের আরম্ভ ও রাঢ়ে সিংহরাজবংশের বিস্তৃতি হইতেছিল। ঐ সাল পর্য্যন্ত নন্দবংশ ও মৌর্য্যবংশ রাজত্ব করিতেছিলেন। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দে চন্দ্রবংশীয় রাজা ক্ষেমক এর নিকট হইতে শূদ্রবংশোদ্ভব মহাপদ্মনন্দ উত্তরাপথের রাজ্যশ্রী অপহরণ করেন। কাহারও মতে যুধিষ্ঠিরের ত্রিশ পুরুষ নিম্নে রাজা ক্ষেমক।

মৎস্য পুরাণের মতে জনমেজয়ের পর্য্যন্ত পৌরব বংশের (পুরুরবার বংশধর) সহস্র বৎসর গত হইয়াছিল। এই বংশের আদিপুরুষ ইল, অন্য নাম—সুদ্যুম্ন। তাঁহার কন্যা ইলাকে চন্দ্র পুত্র বুধ বিবাহ করিয়াছিলেন। এই হেতু এই বংশ চন্দ্রবংশ নামে খ্যাত। ইহাদের পুত্র পুরুরবা। এই জন্য ইনি ঐল পুরুরবা (Illyrians) নামে খ্যাত। রামায়ণ মতে ইল, বাহ্লীক দেশের রাজা ছিলেন। পুরুরবা 'প্রতিষ্ঠানে' রাজত্ব করিতেন।

বহুকাল হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ নামে এক অব্দ প্রচলিত ছিল। ইহার আরম্ভ খৃঃ পূঃ ২৪৪৮ অব্দে? যুধিষ্ঠিরের আদি পুরুষ হইতে যে অব্দ গণনা চলিয়া আসিতেছিল, তাহাই পরে যুধিষ্ঠিরের নামে চলিয়াছিল, হয়ত তিনিই প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

১৩৪৪ খৃষ্টাব্দে সুরসন নামে এক অব্দ প্রচলিত হয়, ইহা সৌরবর্ষ। সূর্য্যের মৃগশিরা নক্ষত্রে গমন হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। ১১১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে সিংহ সম্বৎ প্রচলিত হয়। ইহা বোধহয় মহানাদের সিংহরাজ বংশের কীর্ত্তি। গুজরাট হইতে জৈন রাজগণ বিতাড়িত হওয়ার সময় হইতে শিবসিংহ আর এক সিংহসম্বৎ প্রবর্ত্তিত করেন। ১০৭৬ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ ত্রিভুবনমল্ল বিক্রমাদিত্য এক নূতন সংবৎ প্রবর্ত্তিত করেন, উহা বিক্রমবর্ষ নামে অভিহিত, ৯৯৮ শক হইতে তাঁহার সংবৎ প্রবর্ত্তিত হয়; নেবার সংবৎ কার্ত্তিক মাস হইতে বর্ষারম্ভ নেপালে হয়। শ্রীহর্ষ সংবৎ, হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যকাল হইতে গণিত হইত; গুপ্তবংশের পতনের সহিত বলভী সংবৎ আরম্ভ হয়, এই অব্দ শকাব্দের ২৪১ বর্ষ পরবর্ত্তী। সহস্রার্জ্জুনের বংশধর কর্ত্তৃক কুলচুরি সংবৎ প্রচলিত হয়, সমুদ্র-গুপ্তের প্রয়াগস্থ স্তম্ভলিপিতে ইহাই অর্জ্জুনায়ন নামে উক্ত হইয়াছে। গ্রহবিবৃতি চক্র, এই সংবৎ বার্হস্পত্যচক্রের সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করি। পারদ সংবৎ এক্ষণে লুপ্ত। এক সহস্র বৎসরে পরশুরাম অব্দ হইয়া থাকে। খৃষ্ট জন্মের ১১৭৬ বৎসর পূর্ব্বে এই অব্দের প্রবর্ত্তন হয়। এই অব্দ সৌর অব্দ অনুসারে গণিত। মহানাদে ইহার ব্যবহার হইত।

ভাস্করাচার্য্যের মতে—খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলনের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে কল্যব্দ আরম্ভ। রাজাবলী মতে—৩০৪৪ কল্যব্দ গতে বিক্রমাব্দ, অর্থাৎ ৩০৪৪ + ৫৭ = ৩১০১ কল্যব্দ। মকরন্দ করও তাহাই বলিয়াছেন। চালুক্য পুলকেশীর শিলাফলক অনুসারেও ৩১০১ খৃঃ পূঃ কল্যব্দ। আর্য্যভট্ট ও "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" গ্রন্থকার তাহাই বলিয়াছেন। এই

কল্যব্দকে কেহ কেহ যুধিষ্ঠিরাব্দ বলিয়াছেন। ৺ নবীনচন্দ্র সিংহ "হাতী গুম্ফা" লিপি আবিষ্কার করেন। ঐ লিপিটি ১৬৫ মৌর্য্য সংবতে উৎকল রাজের ১৩ বর্ষ রাজত্ব কালে উৎকীর্ণ হয়। ৩২৭—১৬৫ =১৬২ খৃঃ পূঃ। ইহাতে ১৬৪ খৃঃ পূঃ বৎসরে কেতুভদ্র রাজার ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত দারুমূর্ত্তি লইয়া শোভাযাত্রার উল্লেখ আছে। মহানাদের কেতুভদ্র রাজাকে ভারতযুদ্ধের সমকালীন ধরিয়া লইলে ১৬৪+১৩০০=১৪৬৪ ভারতযুদ্ধের কাল নির্ণয় করিতে হয়। বরাহ মিহির যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ "বৃহৎ সংহিতা" রচনা করেন। ২৫২৬—১৯৩৭ =৫৮৯ খৃষ্টাব্দ। ৺ বেণীমাধব সিংহ বলেন—৩১০১—২৫২৬=৫৭৫ খৃঃ পূঃ। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ রচয়িতা কালিদাস কলির ৩০৬৭ বৎসর গত হইলে তাঁহার ঐ গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। তিনি ৩১০১—৩০৬৭ =৩৪ খৃঃ পূঃ জীবিত ছিলেন। অন্য গণনায় ১১৬৬ খৃষ্টাব্দে কালিদাসকে দেওয়া যায় না। কালিদাস,—বিক্রমাব্দ, শালিবাহন অব্দ, বিজয়াভিনন্দন অব্দ, নাগার্জ্জুন অব্দ, বরাহ-মিহির অব্দ. প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বৈপায়ন ব্যাসের সময়টি নির্দ্ধারণ করা নিতান্ত আবশ্যক। কেহ বলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রায় ২০০০ খৃঃ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বেদগুলি বিভাগ করেন এবং তজ্জন্যই তিনি ব্যাস নামে পরিচিত। তিনি দ্বাপর যুগের শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। আমাদের পূজ্যপাদ পূর্ব্ব পুরুষগণ বেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ত্রেতাযুগের প্রথম ও মধ্যভাগে দর্শন করেন। বিষ্ণু পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, বেদব্যাসের পূর্ব্বে বেদ সপ্তবিংশতিবার বিভক্ত হইয়াছিল। বেদে অনেক নৃপতির এবং ঋষির উল্লেখ আছে। পুরাণের লিখিত বংশাবলী আলোচনা করিলে তাঁহাদের সময় ৭০০০ বা ৬৫০০ বৎসরের ন্যূন হইতে পারে না। ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে পূর্ব্বতন বহু ঋষির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহাদিগের নামের কোন উল্লেখ নাই। আমাদের কোন কোন গ্রন্থে অতি প্রাচীন বেদগুলি যে,

বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হরপ্পা এবং মোহেঞ্জদারো অঞ্চলে সম্বর দিগের যে কীর্ত্তি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা যে দশ হাজার খৃঃ পূর্ব্বের নয়, ইহা কিরূপে অস্বীকার করিব? পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাস জানিতে হইলে আমাদিগের প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ ভিন্ন উপায় নাই, ইহা ইউরোপের নরনারিগণ এক্ষণে বুঝিয়াছেন। আর আমাদের দেশের লোক, বিশেষতঃ কলিকাতার ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত দল, এগুলিকে অতি নিম্নে স্থান দিয়াছেন!

"প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকার" শীর্ষক প্রবন্ধে (৩০৪ পৃষ্ঠায়) বর্ণিত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় সাহিত্যশাস্ত্রী M. A. B. L. মহাশয়ের পিতা ৺জয়নাথ রায় মহাশয়ের জন্মের কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতা পরম তাপস ৺কৃষ্ণচন্দ্র পঞ্চানন "পুত্রোৎপত্তিতেই সংসারাশ্রমের প্রয়োজনীয়তা সম্পন্ন হইল" ভাবিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক ৺কাশীধামে গমন করেন এবং তথায় প্রায় ৪০ বৎসর সাধনা-নিমগ্ন থাকিয়া ৺বিশ্বেশ্বর প্রাপ্ত হন। পিতৃস্নেহে বঞ্চিত বালক জয়নাথ রায় দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াও স্বীয় অধ্যবসায় বলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন ও উত্তরকালে ময়মনসিংহ বারের একজন খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী হইয়াছিলেন। তাঁহার বৈষয়িক বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি নিজ সংসারের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। জন্মাবধি বহুকাল দুঃখ দারিদ্র্যের কঠোর আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি দরিদ্রের প্রতি সর্ব্বদা সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। জীবনের সায়াহ্নকালে স্বদেশ ও সংসার পরিত্যাগ করিয়া পিতার ন্যায় ৺কাশীধামে চলিয়া যান এবং তথায় তিন বৎসর বাস করার পর ৬৯ বৎসর বয়সে বঙ্গাব্দ ১৩১৮ সালে ৺কাশী প্রাপ্ত হন। ইনিই প্রথমে নেত্রকোণা কালীবাড়ীর "নাটমন্দির গৃহ" নির্ম্মাণ করিয়া দেন। দীর্ঘকাল পরে প্রবল ঘূর্ণীবায়ুতে উহা ভূমিসাৎ হইলে উক্ত বিপিনবাবু বর্ত্তমান অভিনব "নাটমন্দির গৃহ" নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

কর্ম্মবীর ৺ জয়নাথ রায়।
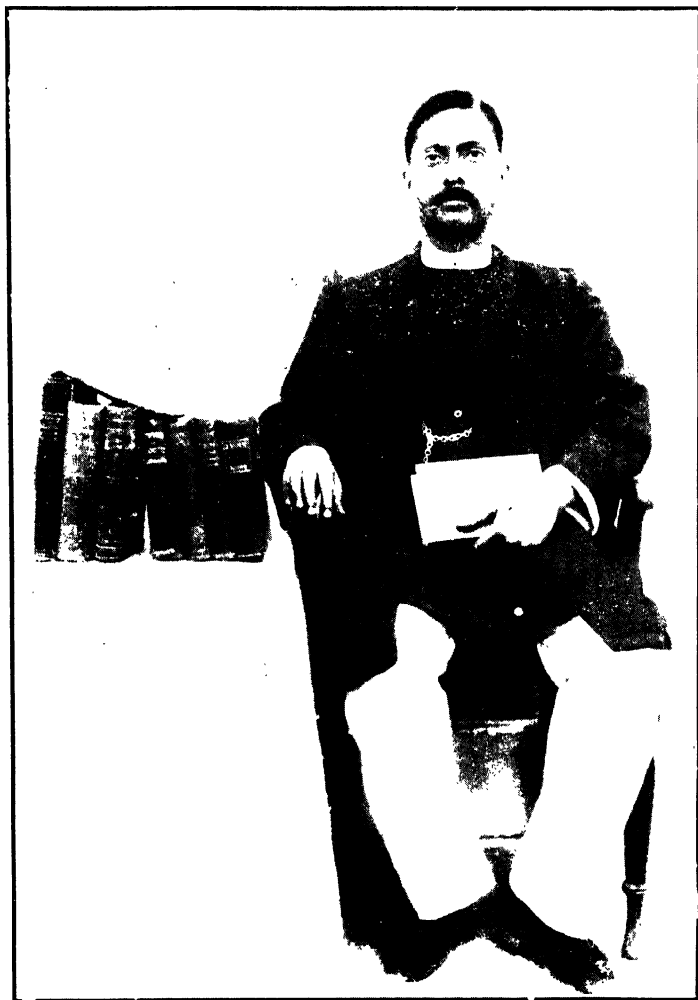
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় সাহিত্য শাস্ত্রী M. A. B. L.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অত্যুজ্জ্বল রত্ন স্বরূপ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র রায় সাহিত্যশাস্ত্রী M. A. B. L. মহাশয়ের বহুমুখী প্রতিভা ও গভীর জ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় বিদ্বৎ সমাজে কাহারও অবিদিত নাই। তিনি নিম্ন প্রাইমারী ও মধ্য ইংরাজি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ময়মনসিংহ জিলায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রেন্স্ পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "যতীন্দ্র স্বর্ণপদক" "জয়নারায়ণ পুরস্কার" এবং গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎকালে পরম বিদ্যোৎসাহী স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর নিজ জিলার গৌরব বিবেচনায় একটী পদক দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আই, এ, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বপ্রথম হইয়া "গোয়ালিয়র স্বর্ণপদক" "জুবিলী স্বর্ণপদক" "পাচেট্ বৃত্তি" "গভর্ণমেণ্ট বৃত্তি" এবং ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে "ডাফ্ বৃত্তি" লাভ করেন। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে "অনার্স" সহ বি, এ পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া "ঈশান স্কলার্ সিপ্" এবং "রাধাকান্ত" ও "পোপ" স্বর্ণপদকদ্বয় প্রাপ্ত হন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যাইয়া উচ্চ শিক্ষা লাভ করণার্থ রাজকীয় বৃত্তি "ষ্টেট্স্ স্কলার্‌সিপ্" (প্রায় দশ সহস্র টাকা) তাঁহার জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু পিতামাতা ও আত্মীয়গণ সমুদ্র যাত্রা অনুমোদন না করায় ঐ বৃহৎ বৃত্তি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় চিকিৎসকগণের পরামর্শে লেখাপড়া বন্ধ করিয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করেন। পরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে সংস্কৃতে এম্, এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন এবং "সোণামণি বৃত্তি" ও পদকাদি লাভ করেন। তিনি সাহিত্য, গণিত, দর্শন প্রভৃতি নানা বিষয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। সংস্কৃত আলোচনা তাঁহার সমধিক প্রীতিকর। চতুর্দ্দশ

বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেই সুললিত ছন্দে ও ভাষায় অতি দ্রুত সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে তিনি সিদ্ধ হস্ত। তাঁহার রচিত "মৃত্যুঞ্জয় স্তোত্রম্" "মাতৃকৃত্যে প্রার্থনা লিপি" "পিতৃকৃত্য আত্মনিবেদনম্" "কলিশাসনম্" "মুকুলাঞ্জলিঃ" প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি কিছু দিন ময়মনসিংহ সিটি কলেজে ইংরাজি ও সংস্কৃত সাহিত্যের অনারেরী অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন। পিতার ৺কাশীবাস ও ৺কাশী প্রাপ্তি সম্বন্ধে তাঁহার লিখিত শ্লোক—

(১) ধরণিধরধুরীণঃ স্বাঙ্গজালিঙ্গিতাঙ্গো,
মুকুট ধুনিবিধৌত প্রাজ্যপঙ্কো বৃষাঙ্কঃ।
চিরমধিব সতীশো যামসৌ ভাগ্যভোগ্যা,
জয়তি জয়তি কাশী ধিক্কৃত স্বর্গভাগ্যা।

(২) তস্যাং চিরস্থিতিমথো শিবতাপ্তিমিষ্টাং,
স্মৃত্বা স্বপূর্ব্বপুরুষ প্রকরৈঃ প্রজুষ্টাম্।
তেষাং পদব্যমুস্মতৌ রচিত প্রয়াস,—
স্তামেব শম্ভুনগরীং জনকোঽধ্যুবাস॥

(৩) সারাৎসারং স্মরহরপদং স্বান্ততঃ সংস্মরন্ সন্
সংসারাখ্যে জননমরণে দুঃখবীজং বিজানন্।
অস্মৎস্নেহং তৃণমিব জহদ্ হন্ত! তাতঃ সুপুণ্যঃ
শৈবেনূনং কচন পরমে জ্যোতিষি প্রাঙ্ নিলীনঃ॥

নিজ উপাধি সম্বন্ধে তদীয় বিনয়োক্তি—

প্রনষ্ট নেত্রো নলিনাক্ষ নামা
গৌরাঙ্গসংজ্ঞোঽস্তি সুকৃষ্ণচর্ম্মা।
শূন্যোঽপি সাহিত্যধিয়া তথাহং
সাহিত্যশাস্ত্রীত্যভিধা মবাপম্॥

বিপিনবাবুর পুত্রদ্বয় উভয়েই সুশিক্ষিত। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত অনুকূলচন্দ্র

রায় বি, এল, মহাশয় ময়মনসিংহ বারের উকীল এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় এম, এ, বি, এল, বেদতীর্থ মহাশয় ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক। ইনি ঋগ্বেদের উপাধি পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৫)

সত্যযুগে পৃথিবী বায়ুমণ্ডল ও সমুদ্র সমন্বিত হয়, সম্ভবতঃ, এই কল্পেই প্রাণের রহস্যময় সূচনা বা উৎপত্তি হয়। জীবনের সমস্ত ব্যাপারই রহস্যময় প্রহেলিকাপূর্ণ।

মানুষের পরম গৌরব এবং চরম সম্পদ সেইখানে, যেখানে তাহার চিন্তা করিবার ক্ষমতা আছে। মানুষ চিন্তা করে, পশু তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা একটা বিশেষভাবে কাজ করিতে বাধ্য হয়। পশুর জীবন, মরণের মধ্যে নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যায়। মানুষ মরে, কিন্তু মরিয়াও সে তাহার মনের সৃষ্টির মধ্যে অমর হইয়া থাকে। তাহার শিল্প, কাব্য, চিত্র, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও দার্শনিক চিন্তার দান, মরণকে অতিক্রম করিয়া সগৌরবে বাঁচিয়া থাকে। মানুষের যত কিছু দুঃখ, তাহার চরিত্রের যত কিছু নীচতা—সকলের মূলে রহিয়াছে তাহার জ্ঞানের অভাব। এই জ্ঞানের অভাবে সে আজও প্রকৃতির অত্যাচার এবং মানুষের অত্যাচার সহ্য করিতেছে।

যে সমাজ পশুত্ব হইতে মানুষকে দেবত্বে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিবার শক্তি না রাখে, তাহা ধার্ম্মিক সমাজ নহে। এদেশের মুসলমানেরা এই দেশীয় জাতির সন্তান হইলেও ভারতের উন্নতির পথে বাধা দিতেছে ইহারাই।

শাস্ত্রবাক্যে হিন্দু আজ অবহেলা করিয়া চলিতেছে !!! ধর্ম্মের সুনিয়ন্ত্রিত পথই মানবকে তাহার মহান্ অভিষ্ট লাভ করিতে সক্ষম

করে। ধর্ম্ম যতই পুরাতন হইয়া যায়, ততই তাহার উপর মানুষ তাহার দুর্ব্বুদ্ধির বাহাদুরী ফলাইতে গিয়া ধর্ম্মকে বিকৃত করিয়া ফেলে। হিন্দুর আজ তাহাই হইয়াছে—বিরাট রাবিশের মধ্যে এখন তাহার প্রকৃত সত্তা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পশম বাছিলে কম্বলের যে দশা হয়, হিন্দুর কদাচার বাছিতে গেলেও তাহাই হয়!

ষড়ৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর ভগবান তাঁহার বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে নানা ঐশ্বর্য্যের লীলা ছড়াইয়া দিয়াছেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিয়াছেন—"পৃথিবীতে যতকাল মনুষ্যের কীর্ত্তি পতাকা উড্ডীন হইতে থাকে, তাবৎকাল সে স্বর্গে পূজিত হয়।"

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন কহিয়াছেন—"একস্থানে চিরবাস প্রীতিকর হয় না।' প্রাচীন কালে অনেকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক পুরাতন স্থান ত্যাগ করিয়া নূতন স্থানে বাস করিতেন। পক্ষীরাও নূতন নূতন বাসা নির্ম্মাণ করে, এক বাসায় থাকে না।

দ্রুপদ কহিয়াছেন—"নিখিল ভূতের মধ্যে প্রাণী, প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমানের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ পুরুষেরাই শ্রেষ্ঠ।"

বিদুর বলেন—"যেমন প্রস্তর হইতে কাঞ্চন সকল সঙ্কলিত হয়, সেইরূপ উন্মত্তদিগের প্রলাপ ও বালকদিগের জল্পনা হইতে সার গ্রহণ করিবে।"

"বিষয় বাসনা কেবল স্বীয় পরিতাপের হেতু, যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করিতে পারে, সে দুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়।" সঞ্জয় বলেন—"পরলোকে পুণ্য বা পাপের ক্ষয় হয় না, মনুষ্যকে জন্মান্তরে পূর্ব্বকৃত স্বকীয় কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়।"

ভীষ্ম বলেন—"ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরাও স্বার্থচিন্তা সময়ে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন।"

"যিনি জীবিত থাকিতে বাসনা করেন, সর্ব্বাস্ত্র কুশল পাণ্ডবগণের কথা দূরে থাকুক, অতি সামান্ত শত্রুকেও উপেক্ষা করা উচিত নহে।" ইহা মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন।

নারদ বলেন—"যে ব্যক্তি কর্ত্তব্য বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া তদনুষ্ঠানে অসমর্থ হয়, তাহার পুণ্যকর্ম্ম ও ইষ্টাপূর্ত্ত বিনষ্ট হয়।

দেশ বা জাতি যখন তাহার ইষ্টবেদিকায় সত্যের পার্শ্বে মিথ্যাকে বসাইতে বাধ্য হইয়া দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে, তখন তিনি মিথ্যাকে সত্যের চরণ রেণু করিয়া দিয়া, সেই সর্ব্বনাশা সমস্যায় যে অভিনব সমাধান করিলেন, তাহাই 'ভক্তি' আখ্যা লাভ করিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল। মহাভারতের এ এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা।

মহর্ষিগণও পুত্রোৎপত্তির জন্য দার গ্রহণ করিতেন। ইহাতে সংসারীর অবশ্য কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয়, অধর্ম্ম হয় না।

আত্মজ্ঞান সর্ব্বভূতের সহিত একত্বানুভূতির সঞ্চার করে। ঘৃণা উদ্ভূত হয় অসম্পূর্ণ জ্ঞান হইতে।

মানুষের বিবেক বুদ্ধি সমূলে নিষ্ক্রিয় নহে। বিবেক বুদ্ধির দ্বারা মানুষ মোটামুটি ভাবে ভাল মন্দ বুঝিতে পারে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বকের দ্বারা মানুষের যত বিধ অনুভূতি জন্মে, বিবেক তাহাতে স্বকীয় প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে! কিন্তু সকল সময় তাহাও সম্ভবপর হয় না। কারণ বিবেক অবশ্য স্বীকার করিবে যে, মৃতদেহের নিকট কোন শক্তি নাই, উহা মানুষকে কোনরূপে ভয় প্রদর্শন বা অভয় প্রদান করিতে পারে না। তবুও মানুষ গভীর রাত্রে কোন নির্জ্জন স্থানে মানুষের একটি মৃতদেহ দেখিলে অমনি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যায়, এবং গভীর অন্ধকার রাত্রে বট বা অশ্বত্থ গাছের নিকট দিয়া একাকী যাইতে ভয় পায়। মানুষের বিবেক বুদ্ধি আশঙ্কার নিকট পরাজিত হয় বলিয়া সে এরূপ স্থানে ভয় পাইয়া থাকে।

যে কোন বিষয় আমরা বাহ্যিক পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা জানিতে পারি না, তজ্জন্য আমাদিগকে যুক্তি তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। তাহাতেই নানা মুনির নানা মতের সৃষ্টি। বস্তুতঃ সময় ও অবস্থা মানুষকে এমন করিয়া তুলে যে, একব্যক্তি জীবনের সকল অবস্থায় কোন একটি জিনিষকে একরূপে গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বরূপ নহিলে রূপের জন্ম হয় না। রূপ স্বরূপের প্রতিচ্ছায়া। রূপ ধ্বংসশীল—স্বরূপ অমর। স্বরূপ সুপ্রতিষ্ঠ থাকিলে রূপ নবরূপে আবির্ভূত হয়।

মানুষের প্রাণ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অন্বেষণ করিয়া অবশেষে অনন্তের সান্নিধ্যে যাইয়া দণ্ডায়মান হয়। অনন্তকে ধরিতে পারে না, বুঝিতে পারে না; কিন্তু "নমো নমঃ" বলিয়া আপনার মনঃপ্রাণ সেইখানেই উৎসর্গ করিয়া দিয়া, নির্ভরের ভাবে আশ্বস্ত ও নিক্ষিপ্ত হয়। যে অজ্ঞেয় সর্ব্বব্যাপী পদার্থ হইতে বজ্র ও বিদ্যুতের স্ফুরণ হয়, সেই পদার্থের নাম ইন্দ্র।

দুর্দ্দান্ত জড়বাদ নিখিলের মানব ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়া বিশ্বব্যাপী এক অভিচার-যজ্ঞের শ্মশান-বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতকে মোহ স্পর্শ করিয়াছিল,—জড় সৃষ্টির উপর যে একটা অতীন্দ্রিয় জগৎ আছে, যাহা বাক্য-মনাতীত, এ অনুভূতি না হইলে জড়ের উপাসনা পরিত্যাগ করা যায় না। নানা বিপ্লব বিপর্য্যয়ে হিন্দুর এই সনাতনী প্রজ্ঞাদৃষ্টি লোপ পাইয়াছিল। বিশেষ করিয়া ফেরঙ্গ সভ্যতার অভিচার ক্রিয়ায় ইহাকে বলি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল, অথচ ইহাই ভারতের নিজস্ব।

ইউরোপীয় খৃষ্টানেরা প্রথমেই ধরিয়া লইয়াছেন যে, ভারতে আর্য্য-সভ্যতার জন্ম হয় নাই; শিক্ষা সভ্যতার এমন কি দর্শন বিজ্ঞানেও চিরকালই ইউরোপের মুখাপেক্ষী। তাঁহাদের মনের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ় মুদ্রিত থাকায়, অনুসন্ধানের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা ধারণানুযায়ী

ফল লাভ করিয়াছেন, সুতরাং সত্যানুসন্ধান ব্যর্থপ্রায় হইয়াছে। বেদমন্ত্রগুলি যে কাব্য নহে, সে বিচার তাঁহারা করেন নাই।

ভারতের সভ্যতার ইতিহাসের প্রতি ইউরোপীয় মনোভাবের চরম পরিচয়,—মাসিডনবীর সেকেন্দর বা অলীক সুন্দর কর্ত্তৃক বিতস্তা বা ঝিলম নদীপার হইতে নয়,—১৯২৮ খৃষ্টাব্দে মারকিন লেড়কি মিস্ মেয়োর "মাদার ইণ্ডিয়া" পুস্তকে পাওয়া গিয়াছে! তাঁহারা বই লিখিবার আগেই ধরিয়া লইয়াছেন, ইউরোপই সভ্যতার আদি জন্মভূমি, তবে মিশরকে গুরু মহাশয়ের প্রাপ্য একটু সম্মান মাত্র দেওয়া যাইতে পারে।

মহানাদের অতীতের আলোচনা যেমন গৌরবময় রোমাঞ্চ কীর্ত্তি কাহিনীতে সমুজ্জ্বল, বর্ত্তমান অবস্থা তেমনই নিরাশা পরিপূর্ণ ঘোরান্ধকারে সমাচ্ছন্ন। ভাওয়ালের কবি গোবিন্দ চন্দ্র দাসের একটি কবিতায় তাহা সুস্পষ্ট করিয়া দেয়,—

"শ্মশান নিশান মূলে, চিতা ভস্ম তুলে তুলে,
বাজায়ে মড়ার মাথা ভূত করে গান,
উড়িতেছে পত পত শ্মশানে নিশান।"

কিন্তু প্রবুদ্ধ মহানাদ এবার তাহার বোধিসত্বায় প্রতিষ্ঠিত ও অভ্যুদিত হইতে চায়। এবার পরম সত্যের অধিষ্ঠান ভূমিতে দাঁড়াইয়া নব্য মহানাদ গঠন করিতে হইবে। মহানাদের দেবমন্দির গুলি দাঁড়াইয়া আছে, নিখিল মানবের চিত্তে অমৃত বোধের সম্প্রসারণ জন্য—পশুকে দেবতা করিবার জন্য। জড় দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা থাকিলে, জড় জগতে জয়ী হইতে পারা যায়। একটা বিরাট ব্রহ্মযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বে যাহা একদিন অঙ্কুরের মত উন্মেষিত হইয়াছিল, আজ মহাক্রমে মহা ভারতের সৃষ্টিতে তাহা বিরাটরূপ পরিগ্রহ করিবে। ইহার পূর্ণাহুতিতে যে সিদ্ধি লাভ হইবে, তাহা হয়ত আর কখনও

মহানাদের ভাগ্যে হয় নাই। নব্য ভারতের রূপদক্ষ শিল্পী তাই স্বরূপ দর্শন করিয়া সৃজন-যজ্ঞে অবতীর্ণ হইবেন।

মায়াবাদীর মোক্ষ প্রার্থনা যেমন কামনার পারিজাত পুষ্প, লীলাবাদীর মর্ত্তের বুকে নিত্য বৃন্দাবন স্থাপনের স্বপ্নও তেমনি কামনারই সুবিকশিত শতদল পদ্ম। কামবীজই সত্য, শাশ্বত; যত লয় হয়, ততই ইহার সৌরভ ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পায়। "অদ্বৈত স্বরূপের লীলাভেদ আনন্দের রূপ, ইহাতে তত্ত্ব ভেদ হয় না। যোগী তত্ত্ব ছাড়িয়া লীলায় লীন হয়, তাই দ্বন্দ্ব—তাই সংশয়।" তানে লয়ে যে ছেদ তাহাই যে পরিপূর্ণ সঙ্গীত, বিমুক্ত চৈতন্য বলিয়াই তাহা অনুভূত হয় না। অন্ধকারের আড়াল আছে বলিয়াই আমাদের ধর্ম্ম দ্বন্দ্বময়. আমাদের জীবন ঘোরতর অসামঞ্জস্য পূর্ণ। জাগরণের পর নিদ্রার দাবী। ধ্বনির পর বিরামের ছন্দ অখণ্ডত্বের হানি করে না। শ্রীযুত কালিদাস রায় বলেন—"নিদ্রার প্রশংসা তারই কণ্ঠে, যে জাগরণের আস্বাদে চেতনা হারায়, আবার জাগ্রত জীবনের গৌরবে আত্মহারা ব্যক্তি সুষুপ্তিতে আত্মঘাতী হয়। ইহার একমাত্র কারণ—আমাদের জীবন যোগহীন।"

এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষেই একদিন ধার্ম্মিক প্রবর বলিরাজার ন্যায় দানশীল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ দানশক্তি বলে সকলের দারিদ্র্য কষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন। একদিন এই পুণ্য ভারতবর্ষেই দরিদ্রের কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য সকলে বদ্ধ পরিকর হইতেন,—জলসত্র, অন্নসত্র খুলিয়া এদেশের লোকে দরিদ্রের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিতেন। নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়াও এদেশের লোকে পরের দুঃখ দূর করিয়া জগতীতলে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। দানের তুল্য সৎকার্য্য আর নাই।

"দানই ধর্ম্ম, দানই কর্ম্ম, দানই ত্রিদিব বাস।
দানই শক্তি, দানই মুক্তি, দানই যমের ত্রাস॥"

ভগবানের মহিমা সুন্দররূপে বর্ণনা করিতে হইলে তাঁহাকে "কবি" এবং বিশ্বরাজ্যটিকে তাঁহার রচিত "কবিতা" বলিলেই সম্পূর্ণ ভাবটি প্রকাশিত হয়। সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তকালে তাঁহার শিল্পনৈপুণ্য আমরা প্রত্যক্ষ করি।

বিশ্বদেববাদ বা বিশ্বে আত্মবাদই, মহানাদের প্রথম ও প্রাচীন ধর্ম্ম মত। ভক্তি দেবদত্ত সুধা। যেখানে ভক্তি সেইখানেই ভগবান।

"অন্তরীক্ষে হের হরি
হরিময় এ সংসার।"

মহাভারতে ইহাই পরীক্ষিতের বিশ্বময় হরিদর্শনরূপে বর্ণিত। বেদের সমুদয় মন্ত্রে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের এই ভাব যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাঁহারা বিশ্বকে আত্মীয় ও কুটুম্বরূপে অনুভব করিয়া, কেমন ভাবে তাহাদের মহত্বে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন, সমগ্র বৈদিক সংহিতার স্তুতি সমূহে এই সব ভাব ব্যক্ত হইতেছে।

"হয়ে যেন মধুময় এ বিশ্বের সমুদয়
মধুময় মোদের করুক।"

বাঙ্গলার ইতিহাস নাই, বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ নাই, আরও কত কি নাই, যাঁহারা বলেন,—হাসি পায় তাঁদের কথায়।

"পানিমে মীন পিয়াসী,
শুনত শুনত লাগে হাসি।"
"পাগলে কি না বলে,
ছাগলে কি না খায়?"

নানা কারণে বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। বিশ্বকবি স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর D. Litt. দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বলিয়াছেন,—

'আট কোটী সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননি !
রেখেছ বাঙ্গালী করি মানুষ করনি ।"

সাধক নীলাম্বরের ভক্তিমাখা সঙ্গীত—

'সাধে কি তোয়, বলি কালি !
(ও তুই) ছিলি বাজীকরের মেয়ে।
ভুবন ভুলিয়ে রেখেছিস মা—
(একটা) মায়া ভেল্কী লাগিয়ে দিয়ে ।"

জানি, লক্ষ যোজন দূরস্থ একটী দীন সন্তানের ক্ষীণ কণ্ঠের কাতর স্বর তোমার কর্ণপুটে শত বজ্রের ন্যায় বাজে, তোমায় ব্যাকুল করিয়া তুলে,—তোমার ত্রিদিব আসন টলে ;—আর আজ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয় গর্জ্জন তোমার কর্ণকূহরে কি প্রবেশ করিতেছে না, তোমার যোগনিদ্রা কি ভঙ্গ হবে না, মা ?

ধূলায় মাথা লোটাইয়া সাষ্টাঙ্গে আজ প্রণাম করি—শুভ্র কান্তি সেই দেবীকে, যিনি জ্ঞানের প্রতিমা, যাঁহার জ্যোতির খড়্গাঘাতে অন্ধকার ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া যায়,—যিনি মানুষের নয়নে নূতন দৃষ্টি দান করেন,—তাহাকে বন্ধন হইতে মুক্তির পথে লইয়া যান।

আর প্রণাম করি আমার সেই মাকে, যিনি স্বর্গাদপি গরীয়সী, যাঁর কোলে কত যাই কত আসি,—কত কাঁদি কত হাসি।

সুনীল সাগরাম্বরাং শ্যামাং চন্দ্রার্কবিম্বিতাং।
নমামি জন্মভূমিঞ্চ জীবধাত্রী বসুন্ধরাং ॥

এই খানেই গ্রন্থকারের

বিশ্রাম।

———

পিতৃভুমি দর্শন

মিঃ বি, কে, সিংহ।
(প্রথম বাঙ্গালী বৈমানিক)

"মহানাদ প্রথম খণ্ড" প্রকাশিত হওয়ার পর মহারাজা চন্দ্রকেতুর বংশধর শ্রীযুক্ত বটুকৃষ্ণ সিংহ B. Sc,. M. E., A. M. Aes , F.B. Soc. E. (Lond) মহাশয় তাঁহার পিতৃভুমি মহানাদ দর্শন করিতে একাধিকবার আগমন করিয়াছিলেন। তিনি "পিতৃভুমি দর্শন" শীর্ষক একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহার কতকাংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"১৩৩৬ বঙ্গাব্দে দুইবার আমি পিতৃভূমি দর্শন করিয়াছি। প্রভাস বাবু দয়া করিয়া সকল স্থানই দেখাইয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপ ও চন্দ্রদহের দক্ষিণ দিকে গড়ের শুষ্ক খাতের উপর দাঁড়াইয়া প্রাচীন যুগের মনুষ্য হস্তের অদ্ভুত দুর্গ রচনার শিল্পকার্য্য দেখিয়াছি। দুর্গের খাল খুবই প্রশস্ত ছিল। বর্ত্তমানে শুষ্ক খাত মনুষ্য চক্ষে বিস্ময় উৎপাদন করিয়া দিয়া থাকে। রাজবাটীর

উত্তরাংশে বিগত বর্ষার সময় একটা স্থান ধ্বসিয়া যাওয়ায় একটি কূয়া বা কূপ বাহির হইয়াছে, যাহা এতকাল যে কোন প্রকার জিনিষ দিয়া তদুপরি মাটী ঢাকা ছিল। ধনপোঁতা হইতে দক্ষিণাংশে প্রায় অর্দ্ধ মাইল স্থান ভগ্ন ইষ্টক স্তূপে আবৃত দেখিলাম। ৺ জটেশ্বর নাথ মহাদেবের মন্দির সম্মুখে প্রসিদ্ধ 'জামাই জাঙ্গাল' আরম্ভ হইয়াছে। ইহারই সম্মুখে দুইটি কৃষ্ণ প্রস্তর রাজবাটীর কক্ষ মধ্যে প্রোথিত আছে। ছকু বাবুর রাস্তা রাজবাটীর দালানের উপর দিয়া ভেদ করিয়া গিয়াছে। শতাধিক বৎসরের গাড়ী যাতায়াতেও স্থানে স্থানে টালি অভগ্ন অবস্থায় আছে দেখিলাম। ঐ রাস্তার উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ে ইষ্টক স্তূপ দেখিলে মনে হয়, রাজবাটী অতি বৃহৎ ও উচ্চ ছিল। দক্ষিণ ভাগে যে রাজবাটীর ইষ্টকস্তূপ দেখিলাম তাহার মধ্যে ভগ্ন প্রস্তর পাওয়া গেল। মনে হইল এই স্থানে প্রস্তর নির্ম্মিত দালান ইত্যাদি ছিল, কোন কারণে মনুষ্য হস্ত দ্বারা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলা হয়। এই স্থান বহু বিস্তীর্ণ এবং সকল স্থানের ন্যায় ইহাও জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন। বড় বড় প্রস্তর কয়েক খণ্ড এখানে সেখানে পড়িয়া আছে। মৃত্তিকার অভ্যন্তরের অট্টালিকার উপরিভাগ দেখিলাম। "সিং-পুকুর" পাড়ে ইষ্টকের বাঁধা ঘাট এক্ষণে নাই, চিহ্ন দৃষ্ট হয়; গ্রামবাসী ইষ্টক উঠাইয়া লইয়া গিয়াছে। কর মহাশয়দের বৃহৎ পূজার দালান ও বড় বড় ভগ্ন অট্টালিকা জঙ্গলের মধ্যে আছে। এই স্থানও চন্দ্রকেতুর গড়ের মধ্যে। বেণে রাজার প্রাচীরের গাঁথনির মধ্যে পুরাতন বাটীর 'ইষ্টক সুরকীর চাপ' দেখিয়া মনে হইল, চন্দ্রকেতুর রাজবাটীর ইষ্টক লইয়া বেণে রাজা সুদীর্ঘ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

মহানাদ ষ্টেশনের উত্তর দিকে সিংহ বংশের প্রচুর কীর্ত্তির নিদর্শন দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলে স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়। এত বড় গড়, এত বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় স্বাধীন রাজবংশ না হইলে কেহ নির্ম্মাণ

করিতে পারেনা। বশিষ্ঠগঙ্গা হইতে একটী সুপ্রশস্ত খাল রাজহাট পর্য্যন্ত ৪।৫ মাইল গিয়া একটী নদীতে মিলিত হইয়াছে। ইহা বোধহয় সিংহ রাজগণের কীর্ত্তি। এইরূপ আর একটী খাল পূর্ব্বকালে কাণা নদীতে মিলিত ছিল। এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া মনে হয়, মহানাদ এক সময় স্বাধীন রাজার দেশ ছিল। "নৌবিদ্যা" শিক্ষা করিবার এবং বৈদেশিক আক্রমণ হইতে রাঢ় দেশকে রক্ষা করিবার জন্য মহানাদে সকল প্রকার সুব্যবস্থাই ছিল। বঙ্গদেশে এই মহানাদের ন্যায় আর কোন নগরী "Well-fortified" ছিল না। এই পুণ্যস্থান যে মুসলমানদের কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়, তাহা নিশ্চয়। এই স্থান এক্ষণে অরণ্যে পরিণত হইলেও, অদ্যাপি ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব রমণীয়।

বোধহয় সিংহল পাটনের সময় হইতে মুসলমান রাজত্বের শেষভাগ পর্য্যন্ত মহানাদ রাঢ়ের মধ্যে একটী বিশিষ্ট সমৃদ্ধিশালিনী নগরী বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ ছিল। বিশ্ববরেণ্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সুবিশাল সাম্রাজ্য পত্তনের সূচনা কালেও কিছু কিছু চিহ্ন থাকার কথা জানা যায়। কালচক্রের বিচিত্র বিবর্ত্তনে মহানাদ এক্ষণে একটী নিতান্ত নিঃস্ব দুরবস্থাপন্ন গ্রামে পরিণত হইয়া পড়িয়াছে। ইদানীং উহার স্থানে স্থানে ভগ্ন প্রাসাদমালার ইষ্টকরাশি, সংস্কারের অভাবে জীর্ণ শীর্ণ দেবমন্দির সমূহ এবং পঙ্কপূর্ণ শুষ্কপ্রায় দীর্ঘিকাদি সুদীর্ঘ অতীতের ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যের সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান। প্রভাস বাবু "মহানাদ ১ম খণ্ডে" বিস্তর ক্ষুদ্র বৃহৎ পুষ্করিণীর নামোল্লেখ করেন নাই। মহানাদের সমৃদ্ধি সময়ে বশিষ্ঠ গঙ্গা বিশাল কলেবর তরঙ্গ সমাকুল দুস্তর নদ ছিল, এক্ষণে উহা একটী সামান্য শীর্ণকায়া পয়ঃপ্রণালীতে পরিণত হইয়া স্বীয় জরা জীর্ণ বার্দ্ধক্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে মাত্র। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘার মত দুইটী প্রস্তর মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উত্থিত আছে।

মানুষ আশা করিতে পারে মাত্র, পূর্ণ করিবার কর্ত্তা ভগবান।

আমার পিতৃদেব মহানাদের ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করিয়াও সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। সংসারের কুটিলতা তাঁহার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার অনেক অর্থও নষ্ট হইয়াছে।

মহানাদে অনেক কিছু দেখিবার আছে। ঐতিহাসিক লেখকগণ ইতিহাসের মালমসলা এইখানেই পাইবেন। ভগ্ন রাজবাটীর ইষ্টক স্তূপের ভিতর ভগ্ন প্রস্তর ব্যতীত, অতীত কালের নিদর্শন পাওয়া যাইবেই যাইবে। কিন্তু অন্বেষণ করিবার ব্যক্তি নাই। যাঁহারা আজ মনুষ্য নামে পরিচিত, তাঁহারাই জাল তাম্রশাসন ও জালগ্রন্থ লিখিতে ব্যস্ত, সুতরাং বাঙ্গলার নরম মাটীতে গরম জিনিষ কেহ চায় না।

পরবর্ত্তীকালে রাজবাটী ভেদ করিয়া ছোট বড় রাস্তা হইয়াছে। দুর্গের খাল স্থানে স্থানে শুষ্ক হওয়ায় গড়ের চতুর্দ্দিকের খাল স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় না। পুষ্করিণীর ধারে মাটীর অভ্যন্তরের অট্টালিকা পাওয়া গিয়াছে। ইহার তত্ত্ব অনুসন্ধানের মানুষ বঙ্গদেশে এতদিন জন্মায় নাই। প্রভাস বাবু সেই জন্য মহানাদের ইতিহাস লিখিয়া বাঙ্গলার ইতিহাসে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন। "মহানাদ" তাঁহার মহা শঙ্খধ্বনি।

ব্রাহ্মণের আশীস্ মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করিয়া আমি পিতৃভূমি দর্শন করিয়াছি সত্য, কিন্তু আমি বড় দরিদ্র, হতভাগ্য, আশ্রয় হীন; পৃথিবীতে আমার থাকিবার কোন কারণ নাই, অধিকার নাই, শুধু ভিখারী বেশে পিতৃভূমির ধূলিকণা ললাটে মাখিয়া তরুমূলে বসিয়া আছি। প্রভাস বাবু ব্রাহ্মণ, আমার দেবতা। দেবতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহা মনুষ্য-ভাষায় বর্ণনীয় নহে। পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া যেন প্রভাস বাবুর পদতলে বসিয়া মহানাদের অতীত ইতিহাস শ্রবণ করিতে পাই।

শ্রীবটুকৃষ্ণ সিংহ।

সম্পূর্ণ।